ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও
দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২
Fruit and Vegetable Cultivation-2

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক
কৃষিবিদ তরিকুল ইসলাম
মুখ্য প্রশিক্ষক
কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

সম্পাদক
কৃষিবিদ মো: আইনুল হক
প্রাক্তন অধ্যক্ষ
কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

পরিমার্জনায়
প্রফেসর ড. মো: আব্দুল আলীম
ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০১৬

পুনর্মুদ্রণ: , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র		
অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	ফলের পরিচিতি ও গুরুত্ব	১–১৪
দ্বিতীয়	ফল চাষের সাধারণ নিয়মাবলি	১৫–২১
তৃতীয়	উল বাগানের পরিকল্পনা ও নকশা	২২–৩৪
চতুর্থ	ফলগাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ	৩৫–৪০
পঞ্চম	ফল গাছের অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা	৪১–৪৫
ষষ্ঠ	ফল গাছে সেচ ও নিষ্কাশন	৪৬–৫৬
সপ্তম	ফল ও ফল গাছের পোকা দমন	৫৭–৬৫
অষ্টম	ফল ও ফল গাছের রোগ দমন	৬৬–৭৬
নবম	ফল সংগ্রহ ও বাচাইকরণ পদ্ধতি	৭৭–৮৫
দশম	আম, কাঁঠাল ও কুলের চাষাবাদ	৮৬–৯৬
একাদশ	কলা, পেঁপে, লেবু এবং পেয়ারার চাষাবাদ	৯৭–১১২
	ব্যবহারিক	১১৩–১৫০

	দ্বিতীয় পত্র	
অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
প্রথম	বাংলাদেশ ফল চাষের বর্তমান অবস্থা	১৫১–১৬৩
দ্বিতীয়	ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব	১৬৪–১৭০
তৃতীয়	পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলের অবদান	১৭১–১৭৫
চতুর্থ	ফল উৎপদানে সমস্যাসমূহ ও সম্ভাব্য সমাধান	১৭৬–১৮০
পঞ্চম	ফল চাষের বংশ বিস্তার পদ্ধতি	১৮১–১৮৪
ষষ্ঠ	ফল বাগানের পরিকল্পনা ও নকশা (লে-আউট) তৈরি	১৮৫–১৯৭
সপ্তম	ফল গাছ রোপনের জন্য গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ	১৯৮–২০২
অষ্টম	ফলের চারা কলম রোপন ও পরিচর্যা	২০৩–২১২
নবম	ফল গাছে সেচ ও নিষ্কাশন	২১৩–২২৫
দশম	ফল ও ফল গাছের পোকা দমন	২২৬–২৩৪
একাদশ	ফল ও ফল গাছের রোগ দমন	২৩৫–২৪৯
দ্বাদশ	ফল সংগ্রহ ও বাচাইকরণ পদ্ধতি	২৫০–২৫৮
ত্রয়োদশ	লিচু, নারিকেল চাষাবাদ কৌশল	২৫৯–২৬৭
চতুদর্শ	আমড়া, কামরাঙ্গা চাষাবাদ কৌশল	২৬৮–২৭২
পঞ্চাদশ	আংগুর ও লটকন চাষাবাদ কৌশল	২৭৩–২৭৮
ষোড়শ	ফল বাগানে সাথী ফসলের চাষাবাদ	২৭৯–২৮২
সপ্তাদশ	অফলন্ত গাছকে ফলবতী করতে করণীয় ধাপগুলো	২৮৩–২৮৯
	ব্যবহারিক	২৯০–৩২৭
	তথ্য সূত্র	৩২৮

প্রথম অধ্যায়

ফলের পরিচিতি ও গুরুত্ব

ফল আমাদের দেশের একটি জনপ্রিয় উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন যথেষ্ট নয় বলে এর গুরুত্ব সেভাবে বিবেচনা করা হয় না। তবে কোনো দেশের জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণের ওপর। মরণাতীত কাল হতেই ফল আবাল বৃদ্ধবনিতা সকল মানুষের নিকট সুখাদ্য হিসেবে পরিচিত ও সমাদৃত। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ বছর পূর্বে খেজুর চাষ এর সাক্ষ্য বহন করে। মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক এক লক্ষ আম গাছের বাগান তৈরি, পর্তুগিজদের দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে আনারস ও পেঁপে চাষের প্রবর্তন ইত্যাদি হতে বোঝা যায় যে ফলের প্রতি মানুষের আগ্রহ অতীত কাল থেকেই ছিল। বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে ফলকে বেহেস্তি খাবার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফলের স্বাদের প্রতি আমরা সবাই অনুরাগী হলেও অনেকে এর পুষ্টি মূল্য এবং ফল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল নই। ফল মানুষের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থে ভরপুর। অন্যান্য খাবারের পরিপূরক হিসেবে ফল খাওয়া যায়। অধিকাংশ ফল দেখতে আকর্ষণীয়, সুস্বাদু এবং সকলের কাছে পছন্দনীয়। ফল রান্না ছাড়া সরাসরি খাওয়া যায় বলে এর পুষ্টিমান নষ্ট হয় না। তাই ফলের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সবটুকুই শরীর গ্রহণ করতে পারে। ফল প্রচুর পরিমাণ খেলেও তেমন কোন অসুবিধা হয় না এবং পুষ্টিতে কোন সমস্যা থাকে । ফলে বিশেষ করে ক্যারোটিন (যা ভিটামিন 'এ' তে রূপান্তরিত হয়), ভিটামিন 'সি', ক্যালসিয়াম, লৌহ ও অন্যান্য উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাই মানব দেহের পুষ্টিতে ফলের অবদান অনেক বেশি। খাদ্য ঘাটতি পূরণেও ফল গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখতে পারে। উন্নত দেশের মানুষ আমাদের তুলনায় বেশি পরিমাণে ফল খায় বলে তাদের স্বাস্থ্য অনেক ভালো, সুঠাম দেহের অধিকারী এবং তারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে।

পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে, চিকিৎসা কাজে, খাদ্য ঘাটতি পূরণে, নুতন শিল্প স্থাপনে, কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে, আয় বৃদ্ধিতে, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে, রুচির পরিবর্তনে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ফল বিভিন্ন ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের প্রতিদিন মাথাপিছু কমপক্ষে ১১৫ গ্রাম করে ফল খাওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে আমরা পাই প্রায় ৩৮ গ্রাম। বাংলাদেশে ফল চাষের আওতায় জমির পরিমাণ এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ খুব ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় মাথাপিছু ফল খাওয়ার পরিমাণ বাড়ার চেয়ে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ফলই ব্যবসায়িক বা বাজার চাহিদার ভিত্তিতে বেশি করে চাষাবাদ করা যায় না। যার ফলে প্রকৃতপক্ষে চাষের আওতায় জমির পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। মনে করা হয় বাংলাদেশের মোট চাষভুক্ত জমির মধ্যে ফলের আওতায় ১ - ২ % জমি আছে। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ফলভিত্তিক আয়ের ১০% আসে ফল থেকে। বর্তমান বিশ্বে ফলের পুষ্টি মূল্য ছাড়াও ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। বাজারে ফলের চাহিদা ছাড়াও মূল্য বেশি বিধায়, এটি চাষাবাদে অতিরিক্ত আয় নিশ্চিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ফল উৎপাদনের সাথে জড়িত সম্প্রদায়ের আর্থিক সচ্ছলতা আসে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। অধিক ফল উৎপন্ন করে এবং তা রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করা সম্ভব।

বিভিন্ন ফলের পরিচিতি ও তালিকা তৈরি

ফলের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে ফল হলো ফুলের নিষিক্ত এবং পরিণত ডিম্বাধার। ফল গঠনে নিষেক উদ্দীপকের কাজ করে। আর সে জন্যই নিষেকের পর হতেই ফুলের গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়টি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করে পূর্ণাঙ্গ ফলে পরিণত হয়। ডিম্বাশয়টি বীজ ধারন করে। নিষিক্তকরণ ছাড়াও ফুলের ডিম্বাশয় বা অন্য কোন অংশ বর্ধিত ও পরিপষ্ট হয়ে ফলে পরিণত হতে পারে। কলা, আপেল, চালতা, হলো এমন ধরনের ফলের উদাহরণ। নিষেক ক্রিয়া ছাড়া সৃষ্ট ফলে বীজ হয় না। সচরাচর ফল একটি মাত্র ফুল হতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ফুলের সমপূর্ণ অংশ যেমন—বৃতি, পাপড়ি, পুপাক্ষ, সম্পূর্ণ পুষ্প মঞ্জুরী ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে।

ফুলের পুংকেশরের পরাগধানী হতে তৈরি পরাগরেণু পুংজনন কোষ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে স্ত্রীকেশরের ডিম্বাশয়ের ভেতরে অবস্থিত ডিম্ব থেকে উৎপন্ন হয় স্ত্রীজনন কোষ। উপযুক্ত পুং এবং স্ত্রী জননকোষ একত্রে মিলিত হওয়াকে নিষেক বলে। নিষেকের পূর্বে পুংকেশরের পরাগ রেণু স্ত্রীকেশরের গর্ভমুন্ডে বিভিন্ন উপায়ে পতিত হয়। এ পতিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে। ফুল হতে ফল গঠনে নিষেক প্রক্রিয়ায় ফুলের বিভিন্ন অংশের অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে ফলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ক) প্রকৃত ফল ও খ) অপ্রকৃত ফল।

ক) প্রকৃত ফল: নিষেকের পর ফুলের শুধু ডিম্বাশয়টি ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে। এতে ফুলের অন্য কোন অংশ ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে না। যেমন— আম, জাম, নারিকেল, লিচু, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি।

খ) অপ্রকৃত ফল: নিষেকের পর ফুলের সাহায্যকারী অংশসমূহ ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে যে ফল গঠন করে তাকে অপ্রকৃত ফল বলে। এতে ফুলের সাহায্যকারী অংশসমূহ যেমন—বৃতি, দলমণ্ডল ইত্যাদি ফল গঠনে অংশগ্রহণ করে। যেমন— আপেল, কাঁঠাল, চালতা, আতা ইত্যাদি। এছাড়াও আর এক ধরনের ফল পাওয়া যায়। যথা পারথেনাকোরপিক ফল।

গ) পারথেনোকারপিক ফল: এ ফলে ডিম্বাশয় নিষিক্ত না হয়ে ফলে রূপান্তরিত হয়। এতে কোন বীজ থাকে না। যেমন—আনারস, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদি।

সাধারণত একটি আদর্শ ফলের দুটি অংশ থাকে। যেমন— ক) ফলত্বক ও খ) বীজ

ক) ফলত্বক ও এটি ফুলের গর্ভাশয়ের প্রাচীর বা বহিরাবরণ । আদর্শ ফলের ফলত্বক সাধারণত দু'ধরনের।

(১) পুরু ও রসালো এবং (২) পাতলা ও শুস্ক

২২০২

১। পুরু ও রসালো

এ ফলত্বককে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। উদাহরণ-আম, জাম, কুল ইত্যাদি এ ধরনের ফল। ভাগ গুলো হলো - (ক)- বহিত্ব (খ)- মধ্যত্বক ও (গ) - অন্তত্বক

(ক) বহিত্বক: এটি ফলের সবচেয়ে বাইরের স্তর। এ স্তর মসৃণ ও চামড়ার ন্যায়।

খ) মধ্যত্বক: এ স্তর বহিত্বকের নিচের স্তর। এ স্তর মাংসল ও রসালো। তবে ফলভেদে এই মাংসল স্তরের পুরুত্ব কম বা বেশি হতে পারে।

(গ) অন্তত্বক: এ স্তর ফলের সবচেয়ে ভেতরের স্তর। পরিপুষ্ট ফলে এ স্তর বেশ পুরু ও শক্ত হয়। এ স্তর বীজপত্রকে আবৃত করে রাখে।

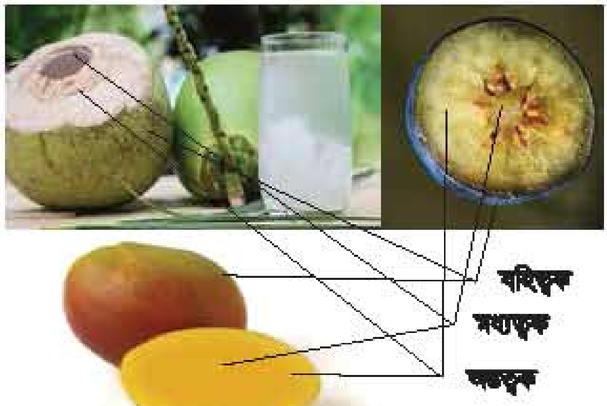

চিত্রঃ বহিত্বক, মধ্যত্বক ও অন্তত্বক

২। পাতলা ও অন্তত্বক

ফলের এ ত্বক পাতলা ও শুষ্ক এবং বীজত্বক ফলত্বকের সাথে লেগে থাকে। বীজত্বক ও ফলত্বক বাদে বাকি অংশে অন্তবীজ বা শস্য। উদাহরণ - ধান, গম, ভুট্টা, সরগাম, চিনা, কাউন ইত্যাদি।

(ক) বীজ: এটি অন্তত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। বীজে দুটি পুরু ও মাংসল বীজপত্র থাকে। কিন্তু বীজপত্র কিছুটা শক্ত।

ফলের শ্রেণিবিন্যাস

ফলের পরিচিতি ও ফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনের জন্য ফলের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে কিছুটা জানা আবশ্যক। কেননা ফলকে বিভিন্নভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

১। ফলের বীজপত্রের (Cotyledon) সংখ্যার ভিত্তিতে

ক) এক বীজপত্রী ফল: তাল, নারিকেল, সুপারী, খেজুর ইত্যাদি।

খ) দ্বি বীজপত্রী ফল: আম, গাব, কাঁঠাল ইত্যাদি।

গ) বহু বীজপত্রী ফল: পেঁপে, কাঁঠাল, পেয়ারা, তরমুজ ইত্যাদি।

চিত্রঃ দ্বিবীজপত্রী (আম, কাঁঠাল)

চিত্রঃ বহু বীজপত্রী (পেঁপে, পেয়ারা)

২। পরাগায়ণের ভিত্তিতে

ক) স্ব - পরাগী ফল ও আমলকী, পেয়ারা, আঙ্গুর, সফেদা, ডুমুর ইত্যাদি

খ) পর - পরাগী ফল : আম, জাম, লিচু, পেঁপে, তাল, সুপারী খেজুর, আনারস, কুল, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি।

গ) স্ব ও পর পরাগী ফল : কাঁঠাল, নারিকেল, লেবু জাতীয় ফল, কাজুবাদাম, ডালিম ইত্যাদি।

চিত্রঃ স্বপরাগায়ণ ফল (ডুমুর) চিত্রঃ পর পরাগায়ণ ফল (আম) চিত্রঃ স্ব ও পর পরাগায়ণ ফল (কাজুবাদাম)

৩। জীবনকালের ভিত্তিতে

ক) স্বল্পমেয়াদি ফলঃ কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি

খ) দীর্ঘমেয়াদি ফলঃ আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি

৪। গাছের ফল প্রদানের প্রকৃতি অনুসারে

ক) মনোকারপিক ফলঃ কলা, শসা, তরমুজ, বাঙ্গী ইত্যাদি।

খ) পলিকারপিক ফলঃ আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি। ২০২২

৫। উৎপত্তি বা উদ্ভব অনুসারে

ক) প্রকৃত ফল: আম, জাম, কালোজাম, লিচু, লেবু, পেঁপে ইত্যাদি

খ) অপ্রকৃত ফলঃ আপেল, নাশপাতি, কাজুবাদাম ইত্যাদি।

গ) পারথেনোকারপিক ফলঃ আনারস, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদি।

চিত্রঃ প্রকৃত ফল (পেঁপে)

চিত্রঃ অপ্রকৃত ফল (চালতা)

চিত্রঃ পারথেনোকারপিক ফল

৬। পুষ্পমঞ্জরীর ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে

ক) সরল ফলঃ আম, জাম, নারিকেল, কলা ইত্যাদি।

খ) যৌগিক ফলঃ যৌগিক ফল আবার দু'প্রকার

i) এগ্রিগেট বা গুচ্ছ ফলঃ আতা, শরীফা, রাস্পবেরী, কাঁঠালী চাপা ইত্যাদি।

ii) মাল্টিপল ফলঃ কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।

৭। পেরিকার্পের বুনটের ওপর ভিত্তি করে (Texture of the pericarp)

ক) নীরস বা শুষ্ক ফলঃ কাঠবাদাম, সুপারি, এপ্রিকট ইত্যাদি।

খ) সরস ফলঃ সরস ফল আবার পাঁচ প্রকার

i) ড্রুপঃ আম, কুল, নারিকেল ইত্যাদি

ii) বেরীঃ কলা, পেয়ারা, কালোজাম, গোলাপজাম ইত্যাদি।

iii) পামেঃ আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি

iv) পেপোঃ শসা, তরমুজ, বাঙ্গি ইত্যাদি।

v) হেসপেরিডিয়ামঃ কমলা লেবু, কাগজী লেবু, বাতাবী লেবু ইত্যাদি।

৮। জলবায়ুর চাহিদার ওপর ভিত্তি করে

ক) উষ্ণ মণ্ডলীয় ফল: খেজুর, অ্যাভোকেডো, কলা, নারিকেল, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি

খ) অবউষ্ণমণ্ডলীয় ফলঃ পেয়ারা, ডালিম, কুল, কলা, জলপাই, লেবু জাতীয় ফল, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি।

গ) শীত মণ্ডলীয় ফলঃ স্ট্রবেরী, রাশবেরী, পীচ, ইউরোপীয় আঙ্গুর ইত্যাদি।

বাংলাদেশের ফলের তালিকা

বাংলাদেশে উৎপন্ন ফলগুলোর ধরন ও গোত্র অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা দেয়া হলো

ক) আম গোত্র ভুক্তঃ আম, আমড়া, বিলাতি আমড়া ও কাজু বাদাম।

খ) কাঁঠাল গোত্র ভুক্তঃ কাঁঠাল, ডেউয়া, ডুমুর, রুটিফল, রুটীফল ও ডুরিয়ান।

গ) লিচু গোত্রভুক্তঃ লিচু, আঁশফল ও রাম্বুটান।

ঘ) পেয়ারা গোত্র ভুক্তঃ পেয়ারা, জাম, জামরুল ও গোলাপজাম।

ঙ) অন্যান্য জাতীয়ঃ শরিফা ও আতা।

২০২২

চ) সফেদা গোত্রভুক্ত: সফেদা, বকুল ও মহুয়া।

ছ) লেবু জাতীয়: লেবু, কাগজি লেবু, জামির, বাতাবি লেবু, কমলা লেবু ও সাতকরা।

জ) বেল জাতীয়: বেল ও কদবেল।

ঝ) টক-প্রধান: কুল, তেঁতুল, আমলকী, কামরাঙা, বিলিম্বি, জলপাই, চালতা, করমচা ও লৌহ।

ঞ) আপেল জাতীয়: পিচ, নাশপাতি, চেরি ও ও ট্রপিক্যাল আপেল।

ট) অন্যান্য বৃক্ষ জাতীয় ফল: অ্যাভোকেডো, বইচি, পানিয়াল, কাউফল, গাব, লটকন ও ডালিম।

ঠ) লতা জাতীয়: প্যাসল ফল ও আঙ্গুর।

ড) পাম জাতীয়: নারিকেল, তাল ও খেজুর।

ঢ) অবৃক্ষ জাতীয়: কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, ফুটি, স্ট্রবেরি ও পানি ফল।

এগুলোর মধ্যে ৫-৬টি ফল বিদেশ থেকে সাম্প্রতিককালে আনীত (প্যাকেন, রাম্বুটান, স্ট্রবেরি, অ্যাভোকোডা)

সারণি-১ দেশের মাটিতে সাম্প্রতিক প্রবর্তিত ও চাষযোগ্য বিদেশি ফল ও জাতের নাম

ক্র নং	ফলের নাম	উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নাম ও পরিবার	জাতের নাম	জন্মস্থান
১	আম	Mangifera indica অ্যানাকার্ডিয়েসি	হাইব্রিড জাত-মল্লিকা, আম্রপলি, রত্ন, অরুণা (হাইব্রিড-১০), (হাইব্রিড১৩), নীল উদ্দিন, সিন্ধু ইত্যাদি। অন্যান্য জাত মিয়াচাও, অঙ্গচ্যানলে, সিনফেলিন, থাই কাঁচামিঠা, গোলাপখাস, হাসনাহে তোতাপুরী, টমি অ্যাটকিনসন ইত্যাদি	ভারতীয় উপমহাদেশ
২	পেয়ারা	Psidium guajava মির্টেসি	থাই পেয়ারা, থাই সিডলেস	দক্ষিণ আমেরিকা
৩	তেঁতুল	Tamarindus indica সিসালপিনিয়েসি	থাই মিষ্টি তেঁতুল	আবেসিনিয়া
৪	বাতাবি লেবু	Citrus grandis রুটেসি	থাই জাম্বুরা	দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
৫	আমড়া	Spondias dulics অ্যানাকার্ভিয়েসি	থাই বারোমাসি আমড়া	ওটেহাইট ও ফ্রেন্ডলি দ্বীপপুঞ্জ
৬	কুল	Zizyphus mauritiana র‍্যামনেসী	থাইকুল, তাইওয়ান কুল	চীন

২০২২

৭	কামরাঙা	Averrhoa carambola অক্সালিডেসি	হাইব্রিড় কামরাঙা,মিষ্টি কামরাঙা	আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়া
৮	করমচা	Carissa ovata অ্যাপাসোইনেসি	হাইব্রিড মিষ্টি করমচা	মালাকা
৯	অরবরই	Phyllanthus acidus ইউফরবিয়েসি	মিষ্টি অরবরই	ভারতবর্ষ
১০	স্ট্রবেরি	Fragaria রাজেসি	ক্যালিফোর্নিয়া, বারি-২, বারি-৩	অজানা
১১	সফেদা	Achras Sapota স্যাপাটেসি	থাই সফেদা অমর	দক্ষিণ আমেরিকা
১২	আমলকি	Emblica officinalis ইউফরবিয়েসি	কাবেরী	ভিয়েতনাম
১৩	জামরুল	Syzygium samarangense মির্টেসি	রাজে আপেল, থাই জামরুল	আন্দামান-নিকোবর ও মালাকা
১৪	জলপাই	Olea europea ওলিয়েসি	থাই জলপাই	দক্ষিণ ইউরোপ
১৫	লংগান	Euphoria longana স্যাপিনডেসি	অজানা	চীন
১৬	রাম্বুটান	Nephelium lappaceum স্যাপিনডেসি	থাই লংগান	ভারত, মালয়েশিয়া
১৭	অ্যাভোকেডো	Persea americana লরেসি	অজানা	আমেরিকা
১৮	শানতালে	Sandoricum indicum মেসিয়েসি	থাই শানতালে	থাইল্যান্ড
১৯	জাবটিকাবা	Myrciaria cauliflora মির্টেসি	অজানা	ব্রাজিল
২০	পিচফল	Prunus Persica লরেসি	অজানা	অজানা
২১	স্টার আপেল	Chrysophyllum cainito স্যাপোটেসি	অজানা	মধ্য আমেরিকা
২২	প্যাসন ফল	Passiflora edulis var flavicarapa (প্যাসিফোরেসি)	অজানা	অজানা
২৩	ব্রেডফুট	Artocarpus altilis অ্যানোনেসি	অজানা	অজানা

২০২২

২৪	সাওয়ারসপ	Annona muricata অ্যানেনেসি	অজানা	অজানা
২৫	কাজু বাদাম	Anacardium occidentale অ্যানাকোর্ডিয়েসি	অজানা	তাহিতি দ্বীপ
২৬	আরবের খেজুর	Phoenix dactyliferas পামিসি	অজানা	মেসাপেটেমিয়া
২৭	কমলা	Citrus reticulate রুটেসি	খাসিয়া, নাগপুরী, ছাতক । কমলা, বরি কমলা ১ ইত্যাদি	চীন
২৮	আংগুর	Vitis vinifera ভিটেসি	জ্যাককাউ, বাক পার্ল ও ব্যাক রুবি	আর্মেনিয়া
২৯	ডুমুর	Ficus carica মোরেসি	পাকিতানি	আরব
৩০	নাশপাতি	Pyrus communis রোজেসি	অজানা	ইউরোপ

কয়েকটি বিদেশি ফলের পরিচয়

১. পিচ (Prunus persica)

এদেশে সৈয়দপুর, নীলফামারিতে প্রথম এক নার্সারিতে প্রচুর ফল ধরা পিচ ফলের একটি গাছ দেখে বিশ্বাস হয় যে এ দেশে পিচ ফল হওয়া সম্ভব । স্থানীয় বাসিন্দারা পীচ ফলের নাম বলেছিল মাজু ফল । এ নামে পিচ ফলের কোন বাংলা বা থানীয় নাম আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি । কিন্তু এর ইংরেজি নাম Peach, এ নামটাই এ দেশেও পরিচিত হয়ে উঠেছে । পরে অবশ্য সাভার, গাজীপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকায় ফলধরা বেশ কিছু পিচ ফলের গাছ চোখে পড়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে ফলটি শীতপ্রধান এলাকায় ভালো জন্মে । ভারতের সিমলাতে অনেক পীচ ফলের গাছ আছে । পিচ গাছ মাঝারি আকারের বৃক্ষ, পাতা অনেকটা ডালিম বা শরিফা পাতার মতো দেখতে । পাতার গোড়ায় অনেক ছোট ছোট পাতা থাকে । ফুলের রঙ লাল বা গালোপি । ফল দেখতে ডিম্বাকার তবে মুখটা আমের মতো বাকানো ও সুচালো । কাঁচা ফলের রঙ সবুজ পাকলে হালকা হলুদের ওপর লাল আভা সৃষ্টি হয় । কাচা ফল শক্ত, খোসা খসখসে । কিন্তু পাকলে নরম হয়ে যায় ও টিপ দিলে সহজে ভেঙে যায় । পাকা ফলের রসালো শাস হালকা হলুদ ও ভেতরের দিকে লাল, শাসের স্বাদ টক । ফলের মধ্যে খয়েরি রঙের একটা শক্ত বিচি থাকে । পিচ ফল পাকে মে - জুন মাসে । এক কেজি ফল থেকে প্রায় ৪৭০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় । চোখ কলম করে পিচ ফলের বংশবৃদ্ধি সম্ভব ।

২. অ্যাভোকেডো

অ্যাভোকেডো আসলে আমেরিকার ফল । সে দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে অ্যাভোকেডো চাষ হয়ে আসছে । ইনকা সভ্যতার আমলেই অ্যাভোকেডোর পুষ্টি ও খাদ্যমান নির্ণিত হয়েছিল । এখন সারা বিশ্বে অ্যাভোকেডো ইংরেজি

ইংরেজি নামেই পরিচিত। বাংলা কোন নাম নাই। কিন্তু ফলটি যেভাবেই হাকে সমতল বাংলার মাটিতেও ফলে। গাজীপুরের কালিয়াকৈর, চাপাইনবাবগঞ্জে কল্যাণপুর হর্টিকালচার সেন্টার ও ময়মনসিংহের ভালুকায় লাগানো অ্যাভাকেডো বৃহৎ আকারের গম্বুজ আকৃতির চিরসবুজ গাছ। গাছ ১৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা সরল তবে আকার আকৃতিতে ভিন্নতা দেখা যায়। পাতা ১০-৪০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। ছোট ছোট হালকা সবুজ রঙের ফুল ফোটে থাকা ধরে। ছড়ায় ফুল ঝুলতে থাকে। ডালের আগায় সাধারণত ফুল ফোটে। অ্যাডভোকেডোর লাখ লাখ ফুল ফোটে, কিন্তু আমের মতোই ফল হয় খুব কম ফুল থেকেই। ফোটা ফুলের মাত্র ০.১ শতাংশ ফুল থেকে ফল হয়। কারণ দিনের এক সময় ফোটে পুরুষ ফুল, অন্য সময় ফোটে স্ত্রী ফুল। ফুল ফোটে শরতের শেষে এবং ফল পরিণত হতে ৬-১২ মাস লেগে যায়। অ্যাভোকেডো ফল বেশ বড়, প্রতিটি ফলের ওজন ১-৩ কেজি পর্যন্ত হয়। ফলের ভেতরে একটা বড় শক্ত বীজ থাকে বীজের চারদিকে থাকে শাস। শাঁসের ওপরে থাকে চামড়ার মতো খোসা। দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো আকার। তবে গোলাকার জাতেরও আছে। ফলের রং সবুজ বা হলদে সবুজ থেকে হলুদ।

৩. স্টার আপেল

আজকাল প্রায়শই কিছু নার্সারির লোকেরা একটি গাছকে আপেল গাছ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। যে গাছটিকে আপেল গাছ বলা হচ্ছে, সেটি আপেল নয়, তারকা ফলের গাছ। এ দেশে আপেল হবে না। কারণ আপেল জন্মাতে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় বরফ পড়তে হয়। তারকা ফলের নামের সাথে যে আপেল শব্দটা রয়েছে সেটা মুখে মুখে রটতে রটতে স্টার গিয়ে বসেছে আকাশের তারা হয়ে, হয়ে গেছে আপেল। তা ছাড়া তারকা ফল দেখতেও অনেকটা সবুজ আপেলের মতো। তাই, একে আপেলের ভাই বলে। এ দেশে আপেল হয় না সত্য তবে স্টার আপেল হয়। গাজীপুরে বিএআরআইয়ের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রে স্টার আপেলের বয়সী গাছটাতে যেভাবে ডাল ভেঙে ফল ধরেছে, তাতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। তা থেকে আশা করা যায় এ দেশেও ভালো ফল ফলতে পারে। তারকা ফলের গাছ বৃহৎ আকারের শোভাময়ী বৃক্ষ। গাছ ১০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা দোরঙা। অর্থাৎ ওপরের পিঠ গাঢ় সবুজ ও নিচের পিঠ মেরুন বাদামি। পাতা কিছুটা ডিম্বাকার, বর্শার ফলার মতো।

দ্রুত উৎপাদনশীল ফলের তালিকা

পৃথিবীতে শত শত প্রকার ফল জন্মে। এদের মধ্যে কতগুলো গ্রীষ্ম মন্ডলীয় (Tropical), কতগুলো প্রায়গ্রীষ্ম মন্ডলীয় (Subtropical) এবং কতগুলো নাতিশীতাষ্ণ জলবায়ু (Temperate) উপযোগী। অবশ্য কোন কোন ফল গ্রীষ্ম প্রধান হতে প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান পর্যন্ত এবং কোনটি প্রায়গ্রীষ্ম প্রধান হতে নাতিশীতাষ্ণে জলবায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রায় সকল ফল এবং প্রায় গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের কোন কোন ফল জন্মে। বাংলাদেশে অনেক ধরনের ফল গাছ জন্মে। তবে যে সব ফলের ব্যাপক চাষ হয় বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় সেগুলো হচ্ছে - আনারস, কলা, পেঁপে, আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, তরমুজ, ফুটি, লেবু জাতীয় ফল, নারিকেল ও স্ট্রবেরী। এগুলোর মধ্যে কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, ফুটি, দ্রুত বর্ধনশীল অবৃক্ষ জাতীয় ফল। কুল, পেয়ারা ইত্যাদি বৃক্ষ জাতীয় দ্রুত বর্ধনশীল ফল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের মোট উৎপাদিত ফলের প্রায় ৫০ ভাগের অধিক দ্রুত বর্ধনশীল স্বল্প মেয়াদী গাছ থেকে উৎপন্ন হয়। আবার দ্রুত বর্ধনশীল ফলের শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে কলা। দ্রুতবর্ধনশীল ফল গুলোর মধ্যে আনারস, কলা, পেঁপে, তরমুজ ও ফুটি স্বল্প মেয়াদী ফল গাছ হিসেবে পরিচিত। কারণ খুব অল্প সময়েই অর্থাৎ কয়েক মাস থেকে শুরু করে এক বা দুবছরের মধ্যেই এগুলো ফল দিয়ে থাকে এবং খুব দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘজীবি নয়।

কয়েকটি দ্রুত বর্ধনশীল ফলের পরিচিতি

১। আনারস (Pineapple)

আনারস টক-মিষ্টি, রসালোযৌগিক ফল যা সরোসিস নামে পরিচিত। এর উৎপত্তি হল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল বা প্যারাগুয়ে অঞ্চলে। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল (মধুপুর), সিলেট ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষাবাদ হচ্ছে। আনারসের তিনটি জাত হানিকুইন, জায়ান্ট কিউ ও ঘোড়াশাল বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। গাছ দ্বিবর্ষজীবি এবং একটি গাছ একবার মাত্র একটি ফল দিয়ে থাকে। পাঁচ রকমের সাকার দিয়ে অঙ্গজ পদ্ধতিতে এর বংশ বিস্তার করা হয়। যেহেতু বেশির ভাগ চারা আশ্বিন-কার্তিকে পাওয়া যায় সেহেতু চারাগুলো পৌষ মাঘে রোপণ করতে হয়। আনারসের শেকড় মাটির গভীরে যায় না। সুতরাং বাগানে আগাছা পরিষ্কার রাখা জরুরি। রোপণের পর ১৪-১৬ মাস বয়সের গাছে ফুল আসে। সাধারনতঃ ৬০ ভাগ গাছে ফল আসে। তবে ইথরেল ৫০০ পিপিএম বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০,০০০ পিপি এম প্রয়োগে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ গাছে ফল আসে। হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন ফলন হয়। যথাযথ পরিচর্যা করলে দুটি মুড়ি ফসল পাওয়া যায়।

২। পেঁপে (Papaya)

পেঁপে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো জন্মে। গাছ সারা বছরই ফুল ও ফল দিয়ে থাকে। সামান্য সময়ের জন্য হলেও জলাবদ্ধতা গাছের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রীফুল আলাদা গাছে থাকে। পেঁপে পরপরাগায়িত ১. এবং বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার হয়ে থাকে বলে অসংখ্য প্রকারের পেঁপে দেখা যায়। বিশেষ কোনো জাত আবাদ ও সংরক্ষণ করতে হলে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়নের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা উচিত। প্রতি গর্তে তিনটি পেঁপে চারা রোপণ করা হয়। তাহলে প্রতি গর্তে অন্তত একটি স্ত্রী গাছ পাওয়া যায়। বাগানের শতকরা ন্যূনতম ৫ ভাগ পুরুষ গাছ পরাগায়নের সুবিধার্থে থাকা প্রয়োজন। সেচের ব্যবস্থা থাকলে আশ্বিন মাঘ মাস চারা রোপণের উত্তম সময়। তাছাড়া মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হলে জ্যৈষ্ঠ মাস ভালো সময়। রোপণের ৪/৫ মাস পরে ফুল দেখে স্ত্রী বা পুরুষগাছ চেনা যায়। তখন গর্তে একটি স্ত্রী গাছ রেখে বাকিগুলো উপড়ে ফেলতে হয়। ফল ধরার দুমাস পরেই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। পাকা খাওয়ার জন্য গাছে পেঁপের গায়ে একটু হলুদ রং দেখা দিলেই আহরণ করা উচিত। পেঁপের ফলন গাছ প্রতি ১৫-২৫ কেজি এবং হেক্টর প্রতি ৩০--৩৫ টন হতে পারে।

৩। কলা (Banana)

কলা উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের ফল। কলা সাধারণত পাকা ফল হিসেবে খাওয়া হয়। কলার অনেক জাত আছে যেগুলো সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। আফ্রিকার অনেক উপজাতির প্রধান খাদ্য কলা। কলাচাষের অনুকূল তাপমাত্রা ১৫-৩৫° সেলসিয়াস। প্রতিমাসে ২০ সে.মি. বৃষ্টিপাত গাছের বৃদ্ধির জন্য উত্তম। কলাগাছ ঝড়াবোতাস সহ্য করতে পারে না। কলার সাধারণত অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। কলার জাতসমূহ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা-১। পাকা অবস্থায় ভক্ষণ যোগ্য বীজহীন জাতসমূহ ২। বীচি কলা বা আটি কলার জাতসমূহ ৩। আনাজী বা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত কলার জাতসমূহ। সেচের ব্যবস্থা থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সাকার রোপণের উত্তম সময়। মুড়ি ফসল কলাচাষের একটি বাড়তি সুবিধা। হেক্টর প্রতি সাধারণত ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

২০২২

ফল গাছের বাংলা, ইংরেজি ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম

পৃথিবীতে বহু ধরনের ভাষা প্রচলিত থাকায় একই উদ্ভিদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— আম, গাছকে বাংলায় আম বা আম্র, গুজরাটিতে আমরি, পুর্তগীজে ম্যাংগা, ফরাসীতে ম্যাংগু, চীনা ভাষায় ম্যাংকো, এবং ইংরেজিতে ম্যাংগো বলা হয়। শুধু তাই নয় দেখা গেছে একই ভাষা ভাষীরাও একই ফলকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। তাই এ অসুবিধা দূর করার জন্য International Code of Binomial Nomenclature (ICBN) নীতি অনুসরণ করে প্রতিটি উদ্ভিদের আন্তর্জাতিকভাবে নামকরণ করা হয়েছে। উক্ত নামটি ল্যাটিন ভাষায় এবং রোমান অক্ষরে লিখতে হয়। অন্য ভাষায় হলে লাটিনের মত করে লিখতে হয়। প্রতিটি নামের দুটি অংশ আছে - একটি জেনেটিক ইপিথেট বা গণের অংশ অপরটি স্পেসিস ইপিথেট বা প্রজাতির অংশ। জেনেটিক অংশ বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম ল্যাটিন শব্দে না লেখা হলে জেনিটিক ও স্পেসিস নামের নিচে পৃথক পৃথকভাবে দাগ (Under line) দিতে হবে। উদ্ভিদতাত্ত্বিক নামের শেষে এর প্রবর্তকের নামও লিখতে হয়। এটিই দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি। নিচের সারণিতে ফল গাছের বাংলা, ইংরেজি, উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও পরিবারের নাম দেয়া হলো

সারণি-২ ও ফল গাছের বাংলা, ইংরেজি, উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও পরিবারের নাম

ক্রনং	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম	পরিবার
১	আম	Mango	Mangifera Indica	Anacrdiaceae
২	আমড়া (দেশি)	Hog plum	Spondias mangifera	Do
৩	কাজুবাদাম	Cashew nut	Anacardium occidentale	Do
৪	পেস্তাবাদাম	Pistachio	Pistacia vera	Do
৫	আতা/নোনাফল	Bullock's heart	Annona reticulata	Annonaceae
৬	শরীফা	Custard apple	Annona squamosa	Do
৭	করমচা	Carunda	Carissa carandas	Annonaceae
৮	কামরাঙ্গা	Carambola	Averrhoa carambola	Annonaceae
৯	বিলিম্ব	Bilimbi	Averrhoa bilimbi	Do
১০	ডুরিয়ান	Durian	Durio zibethinus	Bombaceae
১১	টক আতা	Sour Sop	Annona maricute	Annonaeae
১২	পানি ফুল	Indian plum	Flucourtia india	Flacourtiaceae
১৩	আনারস	Pineapple	Ananus comosus	Bromeliaceae
১৪	পেঁপে	Papaya	Carica papaya	Caricaceae
১৫	তরমুজ	Water melon	Cirullus lanatus	cucurbitaceae
১৬	বাংগি/ফুটি	Musk melon	Cucumis melo	Do
১৭	চালতা	Indian dillenia	Dillenia Indica	Dilleniaceae
১৮	বিলাতী গাব	Velvat apple	Diosopyros discolor	Ebenaceae

২০২২

১৯	দেশি গাব	River ebony	Diosphros peregrina	Do
২০	পার্সিমন	Persimmon	Diosphyros kaki	Do
২১	জলপাই (দেশি)	indian olive	Elaeocarpus floribundus	Elaeocarpaceae
২২	আমলকি	Aonla	Phyllanthus emblica	Euphorbiaceae
২৩	অরবরই	Star goose berry	Phyllanthus acidus	Do
২৪	লটকন	Burmese grape	Baccaurea sapida	Do
২৫	বইচি	Madagascar	Flacourtia indica	Flacourtiaceae
২৬	কাউ	Madagascar	Flacourtia indica	Flacourtiaceae
২৭	ম্যাংগোষ্টিন	Mangosteen	Garcinita mangostana	Do
২৮	দেওফল	Eggtree	Garcinita xanthochymus	Do
২৯	এভোকেডো	Avocado	Persea americana	Lauraceae
৩০	তেতুল	Tamarind	Tamarindus indica	Fabaceae
৩১	সফেদা	Sapota	Achras sapota	Sapotaceae
৩২	তারকা ফল	Star apple	Cyrysophy llum cainito	Do
৩৩	মিঠা কমলা	Malta/sweet orange	Citrus sinunsis	Rutaceae
৩৪	গ্রেপ ফুট	Grape Fruit	Citrus paradisi	Do
৩৫	কাঁঠাল	Jackfruit	Artocarpus heterophyllus	Moraceae
৩৬	ডেউয়া	Monkey jack	Artocarpus lakoocha	Do
৩৭	ডুমুর	Fig	Ficus carica	Do
৩৮	তুঁত	Mulberry	Morus alba	Do
৩৯	কাঁচ কলা	Plantain	Musa pardisiaca	Musaceae
৪০	সাগর/সবরী কলা	Banana	Musa sapientum	Do
৪১	জাহাজী কলা	Dwarf banana	Musa cavendishi	Do
৪২	এটে কলা	Seeded banana	Musa acuminata	Do
৪৩	পেঁয়ারা	Guava	Psidium guajava	Mytraceae
৪৪	কালোজাম	Indian black berry	Syzygium cumini	Do
৪৫	গোলাপ জাম	Rose apple	Syzygium jambos	Do
৪৬	অমৃত ফল	Malay apple	Syzgium malaccense	Do
৪৭	জামরুল	Waxjambu	Syzygium samarangense	Do
৪৮	শাপলা	Water lilly	Nymphaca nouchali	Nymphaceae
৪৯	ম্যাকনা	Gargan nut	Euryale ferox	Do
৫০	জলপাই	Olive	Olea europaea	Oleaceae

৫১	তাল	Palmyra plam	Borassus flabellifer	Palmaceae
৫২	নারিকেল	Coconut	Cocos nucifera	Do
৫৩	খেজুর	Date Plam	Phoenix sylvestris	Do
৫৪	পানি ফল	Water chestnut	Trapa bispinosa	Trapaceae
৫৫	চাউর	Fish tail palm	Caryota urens	Do
৫৬	ম্যাকাডামিয়ানাট	Macadamia nut	Macadamia integrifolia	Proteaceae
৫৭	ডালিম	Pome granate	Punica granatum	Punicaceae
৫৮	প্যাশন ফ্রুট	Passion fruit	Passiflora edulis	Rhamnaceae
৫৯	বরই	Jujube	Zizyphus jujuba	Proteaceae
৬০	নাশপাতি	Pear	Pyrus communis	Rosaceae
৬১	চেরী	Cherry	Prunus avium	Do
৬২	স্ট্রবেরি	Straw berry	Fragaria ananassa	Do
৬৩	পিচ	Peach	Prunus persica	Do
৬৪	আপেল	Apple	Malus sylvestris	Do
৬৫	লকুয়াট	Loquat	Eriobotrya japonica	Do
৬৬	বাদাম	Almond	Prunus amygdalus	Do
৬৭	খুবানী	Apricot	Prunus armeniaca	Do
৬৮	আলুবুখারা	Plum	Prunuss domestica	Do
৬৯	আলুচা	Japanese plum	prunus salicdina	Do
৭০	বেল	Bel	Aegle marmelos	Rutaceae
৭১	কদবেল	Wood apple	Feronia limonia	Do
৭২	ট্রাইফলিয়েট অরেঞ্জ	Trifoliate orange	Poncirus trifoliata	Do
৭৩	জামির	Rough lemon	Citrus jambhiri	Do
৭৪	কাগজি লেবু	Lime	Citrus aurantifolia	Do
৭৫	পাতি/এলাচী লেবু	Lemon	Citrus limon	Do
৭৬	টক লেবু	Sour orange	Citrus aurantium	Do
৭৭	জাম্বুরা/বাতাবী লেবু	Pommelo/Shad dock	Citrus grandis	Do
৭৮	লিচু	Litche	Litchi chinensis	Sapotaceae
৭৯	রাম্বুটান	Nepheslium longana	Nymphaca nouchali	sapindaceae
৮০	আঙ্গুর	Vitis vinifore	Euryale ferox	Vitaceae

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আমাদের প্রতিদিন মাথাপিছু কমপক্ষে কত গ্রাম ফল খাওয়া উচিত।

২। বাংলাদেশের মোট চাষভুক্ত জমির মধ্যে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ শতকরা কতটুকু ?

৩। নিষেক প্রকিয়ার উপর ভিত্তি করে ফলকে কত ভাগে ভাগ করা যায়।

৪। আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদী ফল কোনগুলো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল বলতে কি বোঝায় ?

২। নিষেক প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ফলকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ?

৩। আদর্শ ফলের কয়টি অংশ থাকে চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।

৪। মানুষের পুষ্টি সরবরাহে ফল কীভাবে অবদান রাখে লেখ।

৫। উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নামসহ ৫টি ফলের বাংলা ও ইংরেজি নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল বলতে কি বোঝায়। ফলের শ্রেণি বিন্যাস গুলোর নাম লেখ এবং প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

২। বাংলাদেশে প্রচলিত দেশি ফলের একটি তালিকা তৈরি কর।

৩। বাংলাদেশের মাটিতে সাম্প্রতিক প্রবর্তিত চাষযোগ্য ১০টি বিদেশি ফলের নাম, উদ্যানতাত্ত্বিক নাম, পরিবার, জাত ও উৎপত্তি স্থান লেখ।

৪। টিকা লেখ: ক) প্রকৃত ফল খ) অপ্রকৃত ফল গ) মনো ও পলিকারপিক ফল ঘ) উদ্যানতাত্ত্বিক ফল

ঙ) একবীজপত্রী ফল চ) ব - পরাগী ও পরপরাগী ফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফল চাষের সাধারণ নিয়মাবলি

অধিকাংশ ফল দীর্ঘমেয়াদি ফসল হিসেবে বিবেচিত। এ জন্য কোনো স্থানে ফল বাগান স্থাপন করতে হলে সেই জায়গার পরিবেশ, জলবায়ু ও মাটি সম্বন্ধে অবশ্যই সম্যক ধারণা থাকতে হবে। ফল বাগানের জন্য উঁচু জমি, যেখানে বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না বা পানি নিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে এ রকম খোলামেলা জায়গা ফল বাগানের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

প্রত্যেক ফল গাছই একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ ও মাটি পছন্দ করে। তাই গাছের উপযোগী পরিবেশ ও মাটি নির্বাচন করতে হবে। এছাড়াও ফল বাগান স্থাপনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা খুব প্রয়োজন। কারণ স্বল্পমেয়াদি ফসলের ক্ষেত্রে কোন ভুলত্রুটি হলে তা পরবর্তী সময়ে সহজে সংশোধন করা যায়। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী বৃক্ষ জাতীয় ফল বাগান প্রতিষ্ঠার সময় কোন ভুলত্রুটি থাকলে তা পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগ থাকে না। এ জন্য বৃক্ষ জাতীয় ফল চাষের জন্য বাগান বিন্যাস, গাছ নির্বাচন, বাজারজাতকরন, সেচ, পানি নিস্কাশন, কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা, ফল প্রক্রিয়াজাতকরন, শ্রমিক সরবরাহ, সুষ্ঠ বাগান ব্যবস্থাপনা, ফলের জাত, গাছের আকার আকৃতি ও বৃদ্ধির প্রকৃতি ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াবলি সম্বন্ধে একজন আধুনিক ফলচাষীর অবশ্যই তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান থাকতে হবে।

জলবায়ু, জমি ও মাটিভেদে ফল গাছের শ্রেণিবিভাগ

ফলের ফলন নির্ভর করে তার সঠিক চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর। চাষাবাদ পদ্ধতির ধরন এবং এর বাস্তবায়ন আবার নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ু, জমি, মাটি ও গাছের প্রকৃতি ইত্যাদির ওপর। ফল দীর্ঘমেয়াদি ফসল বিধায় কোন স্থানে বাগান স্থাপন করার পূর্বে চাষীদের অবশ্যই সেই জায়গার পরিবেশ, জলবায়ু ও মাটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। এছাড়া ফল বাগান স্থাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী ফসলের ক্ষেত্রে কোন ভুল ত্রুটি হলে তা পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগ থাকে তাছাড়া ক্ষতি হলেও ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ফসলের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ থাকে না এবং ক্ষতির পরিমান বেশি হয়। সুতরাং ফল চাষাবাদের জন্য জলবায়ু ভেদে উপযুক্ত গাছ নির্বাচন, মাটি নির্বাচন, বিভিন্ন আন্তঃপরিচর্যা সম্পাদন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

কোন নির্দিষ্ট আবহাওয়ায় সব ধরনের ফলের চাষ করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ফল চাষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে খুব বেশি বা খুব কম তাপমাত্রায় কোন গাছ ভালভাবে জন্মাতে পারেনা। ফলের বাগান যে এলাকায়ই হাকে না কেন, মাঝে মাঝে প্রতিকুল আবহাওয়ার মুখোমুখি হতে হয়। সে সময় কিছু কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয়।

কোন স্থানের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের গতিবেগ, বাতাসের আর্দ্রতা, শিলাবৃষ্টি, আলো, কুয়াশা ইত্যাদির দৈনিক পরিবর্তনকে ঐ স্থানের আবহাওয়া বলে। কোন স্থানের আবহাওয়ার কয়েক বছরের গড়কে সে স্থানের জলবায়ু বলে। কোন স্থানের জলবায়ুর সাথে ঐ স্থানের ফল চাষের সরাসরি সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ ফল গাছ প্রায় সব জায়গায় জন্মাতে পারে। কারণ বাংলাদেশের একস্থান হতে অন্যস্থানের আবহাওয়ার মধ্যে তেমন বেশি পার্থক্য নেই। তাই বাংলাদেশের সব ফল সব এলাকায় কমবেশি জন্মানো যাবে এবং ফল ধরবে। আমাদের দেশে এলাকা বিশেষে আবহাওয়ার তারতম্য কিছুটা আছে, বিধায় স্থান বিশেষে কোন কোন ফল বেশি লাভজনকভাবে জন্মানো যায়। এছাড়া এলাকা বিশেষে ফলের গুণাবলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কেননা ফল গাছে ফল ধরার জন্য মাটি ও আবহাওয়ার বিভিন্ন প্রভাবকগুলো কাজ করে। মাটির প্রভাবকগুলো আধুনিক প্রযুক্তি ও নতুন নতুন কৌশল দ্বারা অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। আবহাওয়ার প্রভাবক গুলোর পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। তাই আবহাওয়ার প্রভাবক গুলোর ওপর নির্ভর করে ফলকে চার ভাগে ভাগ করা যায়-

ক) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল
খ) অব গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল
গ) শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল
ঘ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফল

ক) গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল

বিষুব রেখার ২৩-২৭০ হতে ২৩-২৭০ উত্তর দক্ষিণ অংশের মধ্যবর্তী এলাকায় যে সব ফল জন্মে সেগুলোকে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল বলে। উদাহরণ -আম, পেঁপে, কলা, আনারস, নারিকেল, কাঁঠাল ইত্যাদি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং দিনের দৈর্ঘ্য ১১ থেকে ১৩ ঘন্টার মধ্যে সীমিত থাকে। বাংলাদেশে বেশির ভাগ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল উৎপন্ন হয়।

খ) অগ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল

২৩.২৭° হতে ৪০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী এলাকায় যেসব ফল জন্মে সেগুলোকে অব গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল বলে। এ অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময় ধরে শীতকাল বিরাজ করে। কিন্তু শীত তেমন তীব্র হয় না এবং তাপমাত্রা বরফ জমা অবস্থায় নামে না। এ এলাকার ফলগুলো হলো - কমলা লেবু, লিচু, কুল, খেজুর, ডুমুর, ডালিম, নাশপাতি, আঙ্গুর ইত্যাদি।

গ) শীত প্রধান অঞ্চলের ফল

৪০ হতে ৬০° উত্তর দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে সব ফল জন্মে সেগুলোকে শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল বলে। এ অঞ্চলে আবহাওয়ায় শীতের তীব্রতা থাকে। শীতপ্রধান অঞ্চলের ফলগাছে ফুল ও ফল ধরার পূর্বে কিছুদিনের জন্য গাছকে বরফজমা তাপমাত্রায় অতিবাহিত করতে হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ১৮-২১° সেলসিয়াস ও শীতকালে ৬-৯° সেলসিয়াস থাকে। এ অঞ্চল বছরের প্রায় ৫০ থেকে ৭৫ দিন তুষার মুক্ত থাকে। এ অঞ্চলের ফল গাছের পাতা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঝরে পড়ে যায়। তবে শীত প্রধান অঞ্চলের ফলগাছ তীব্র শীত সহ্য করতে পারে। এ অঞ্চলের ফল গুলো হলো- আপেল, পীচ, নাশপাতি, স্ট্রবেরি, আঙ্গুর, চেরী, পারসিমন ইত্যাদি।

ঘ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফল

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে শুস্ক এবং শীতকালে বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে রাত্রে অতিরিক্ত কুয়াশা পড়ে এবং রাত্রিকালীন বাতাসে আর্দ্রতা বিরাজ করে। অধিকাংশ ফলই এ অঞ্চলে ভালোভাবে জন্মে থাকে। তবে এ অঞ্চলে ফলগাছে দুইবার সুপ্ততা দেখা যায়। যেমন—শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডার সময় একবার এবং গ্রীষ্মকালে খরার সময় আর একবার শীতকালের বৃষ্টিপাত গাছের বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। এ অঞ্চলের ফলগুলো হলো- খেজুর, ডালিম, কমলা, জলপাই, আঙ্গুর, ডুমুর ইত্যাদি।

ফল গাছ রোপণের সময় বা মৌসুম এবং চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা

আমাদের দেশে মে থেকে জুলাই মাস অর্থাৎ গ্রীষ্মের শেষ এবং বর্ষার প্রথম ভাগ ফল গাছের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময় পরিমাণ মত বৃষ্টি হয় এবং বাতাসে এবং মাটিতে প্রচুর আর্দ্রতা থাকায় গাছ সহজে মাটিতে লেগে যায়। যে সব জায়গায় পানি সেচের উত্তম ব্যবস্থা আছে, সেখানে বসন্তের প্রথম ভাগে চারা রোপণ করা যায়। বৃষ্টি না হয়ে থাকলে চারা রোপণের পূর্বদিন গর্তে কিছু পানি সেচ দেয়া যেতে পারে। রোপণের জন্য বিকাল প্রকৃষ্ট সময়। চারার শেকড় যতখানি বিস্তৃত ও গভীর ততখানি বিস্তৃত ও গভীর করে গর্তের মাটি উঠিয়ে নিয়ে গর্তে চারার নিম্নাংশ প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। তারপর মূলগুলোকে গর্তের মধ্যে ২০২২

বেশ ভালো ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আতে মাটি চাপা দিতে হবে। চারা রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোপিত চারার গর্ত জমি হতে উঁচু হয়। তা না হলে বর্ষাকালে গর্তের মাটি বসে গিয়ে চারার চারদিকে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করবে। চারা যাতে সহজে খাড়া থাকতে পারে এজন্য রোপণের পর চারার পাশে খুটি পুঁতে খুটির সাথে চারা বেধে দিতে হবে। চারা রোপণের অব্যবহিত পরে এবং প্রথম কিছুদিনের জন্য প্রতিদিন ঝাঝরি দ্বারা চারার গোড়ায় পানি দ্বারা সেচ দেয়া উচিত। তা ছাড়া চারা রোপণের পর অতিরিক্ত সূর্যালোকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চারার উপরে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং গোড়ায় শুষ্ক ঘাস, খড় ইত্যাদি চেপে দিতে হবে।

চারা রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

জমিতে চারা রোপণের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চারাটির যত্ন নিতে হবে যাতে করে তা মাটিতে সহজে লেগে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এ জন্য চারার গোড়ায় বেশ কিছুদিন ঝরণা দিয়ে পানি দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে চারার গোড়ায় কোন কারণে পানি জমলে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়াও চারার গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা নিড়ানী দিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। চারার গোড়ার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকলে চারার গোড়ার চারপাশে শুকনা খড়, ঘাস ইত্যাদি বিছিয়ে দিতে হবে। এভাবে মাটিতে পানি সংরক্ষণের পদ্ধতিকে মালচিং বলা হয়। এছাড়া চারা গাছটি যাতে সোজা হয়ে বেড়ে উঠতে পারে সে জন্য বাঁশের খুটি দ্বারা গাছকে বেধে দিতে হবে। অনেক সময় চারা গাছের গোড়া থেকে শাখা প্রশাখা বের হয়। প্রয়োজন মোতাবেক শাখা প্রশাখা রেখে বাকীগুলো ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। গাছের প্রজাতি অনুসারে চারার প্রুনিংয়ের (Pruining বা ছাঁটাই) ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় খুব অল্প সময়ে কলমের চারা গাছে ফুল আসে। যার ফলে চারা গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ফুল ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। বৎসরে দুবার গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয়েছে সেই পরিমাণ সার সমান দু'ভাগে ভাগ করে বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তী সময় সারের পরিমান বৎসর ওয়ারী বৃদ্ধি করতে হবে। এভাবে চারা গাছ লাগানোর পর তা ফলবতী হওয়া পর্যন্ত যত্ন নিতে হবে। যাতে সুস্থ ও সবল গাছ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে কাঙ্ক্ষিত ফলন দেয়।

ফল গাছ রোপণের জন্য জমির উপযুক্ততা

প্রত্যেক ফল গাছ একটি নির্দিষ্ট ধরনের মাটিতে ভাল ফলন দেয়। অত্যধিক বেলে মাটি এবং শক্ত ভারী এটেল মাটি ফল চাষের জন্য কিছুটা অনুপযুক্ত। আর এ ধরনের মাটিতে কম্পাষ্টে সার প্রয়োগ করে ফল গাছ রোপণ উপযোগী করে তোলা সম্ভব। কিন্তু এ কাজ সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। সব সময়ই বাগানের জন্য পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত মাটি প্রয়োজন। সাধারণত বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম এবং এ মাটি অনুর্বর। এ ধরনের মাটিতে কুল, কাজুবাদাম, খেজুর প্রভৃতি ফল ভাল হলেও অন্যান্য অনেক ফল ভালভাবে জন্মাতে পারে না।

অম্ল মাটিতে চুন, ডলোমাইট (ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট সমৃদ্ধ) প্রয়োগে অম্লতা কমানো যায় এবং ক্ষার বা লবণাক্ত মাটিতে জিপসাম (ক্যালসিয়াম সালফেট) প্রয়োগে ক্ষারত্ব প্রশমন করা যায় । টক জাতীয় ফুল গাছ যেমন—

লেবু জাতীয়, আমড়া, অরবরই, আনারস প্রভৃতি অম্লযুক্ত লাল মাটি পছন্দ করে। নারিকেল গাছ লবণাক্ত মাটি বেশি পছন্দ করে। কাঁকুরে বা পাথুরে লাল (ল্যাটেরাইট) মাটিতে আঙ্গুর, কুল ভাল হয়। ভেজা ও স্যাতসেঁতে মাটিতে কলা, আমড়া, লটকন, পেয়ারা ইত্যাদি ভাল হয়। পানি স্তর নিচে ও রং ধুসর এ ধরনের মাটিতে আম ভাল হয়।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ জমি সমতল। যে সমস্ত জমিতে বর্ষা বা বন্যার পানি একেবারেই দাড়ায় না সে সমস্ত স্থান কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি ফল চাষের জন্য চিহ্নিত করতে হবে। আর যে সব জমি অল্প সময়ের জল প্লাবিত হয় সে সব জমিতে স্বল্প সময়ের জন্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এমন ফল চাষ করা যেতে পারে। যেমন- আম, জাম, দেওফল, চালতা, গাব, খেজুর, বেত ফল ইত্যাদি।

পাহাড়ি এলাকায় চাল ৪৫ এর কম হলে সেখানে ভালভাবে ফলের চাষ করা যায়। বেশি ঢাল পাহাড়ে বিশেষ পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয়। উচু পাহাড়ের উত্তর পাশে সূর্যের আলো বেশি পড়ে না, এ রকম স্থান ফল চাষের জন্য তেমন উপযোগী নয়। ফল চাষের জন্য যোগাযাগে ব্যবস্থা, জমির মূল্য, শ্রমিকের সহজলভ্যতা, বাজার ব্যবস্থা, বাগানে কাজের যন্ত্রপাতি, সেচ ব্যবস্থা, সার, বীজ ও ফল সংক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজে ও কম মূল্যে প্রাপ্তির বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

বাণিজ্যিক ফল চাষের জন্য এলাকা নির্বাচন অর্থাৎ নির্দিষ্ট ফলের জন্য অনুকূল জলবায়ু ও মাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- মান সম্পন্ন ভাল আম ও লিচু দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে ভাল জন্মে। সমভূমি অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার কাজুবাদাম, এ্যাভেক্যাডো, আঙ্গুর, কমলালেবু ইত্যাদি ভাল জন্মে। মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং সিলেট ও চট্টগ্রামের অম্লত্ব ও লালমাটি এলাকায় আনারস ভাল জন্মে। অনুরূপভাবে উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা নারিকেলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে ঝড় তুফানের প্রকোপ বেশি। তাই আম, কলা পেঁপে ইত্যাদি ফল গাছ সেখানে লাগানো হলে ঝড়ে খুব সহজেই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাই এসব ফল ঐ এলাকায় চাষ করা উচিত নয়। তবে কিছু কিছু অপ্রধান ফল যেমন- গাব, আমড়া, চালতা, জাম, ডেউয়া, দেওফল, লটকন ইত্যাদি স্যাঁতসেঁতে, বৃষ্টিবহুল ও ঝড়ো এলাকায়ও ভালভাবে টিকে থাকে এবং ফলন দিতে পারে। ফল চাষের জন্য দোঁআশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। অত্যধিক বেলে বা এটেল মাটি, বেশি লবণাক্ত বা বেশি অম্ল মাটি বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়।

কলা গাছ রোপণের জন্য মাটির প্রকারভেদ

এক এক ধরনের ফল গাছ এক এক ধরনের নির্দিষ্ট পরিবেশ; তথা বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ বিভিন্ন ধরনের মাটি, স্থান, জলবায়ু ও পরিচর্যা পছন্দ করে। এ ছাড়া ফল চাষের উদ্দেশের ওপর নির্ভর করে কিছু কিছু নিয়মাবলি অনুসরণ করতে হয়। যেমন—

ক) পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য ফল চাষ।
খ) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফল চাষ।
গ) সৌখিন ফল চাষ।
ঘ) মিউজিয়াম হিসেবে ফল চাষ।
ঙ) সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ফল চাষ।
চ) প্রযুক্তিগত অবস্থার প্রেক্ষিতে ফল চাষ।

এখানে ফলচাষের জন্য মাটি নির্বাচনে করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা কর হয়েছে। ফল গাছ মাটি হতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। এ পুষ্টি সরবরাহের জন্য জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ ফসলের চেয়ে ফল গাছে প্রচুর খাদ্য, পানি ও পুষ্টির প্রয়োজন হয়। গাছ মাটি হতে সবসময় পুষ্টি গ্রহণের ফলে মাটিতে পুষ্টির ঘাটতি পড়ে এবং ফলের ফলন কমে যায়। গাছে সব সময় ও সব বয়সে এক ধরনের এবং একই পরিমাণ পুষ্টির দরকার হয় না। তাই গাছের জীবনকাল ও চাহিদা বিবেচনা করে সার প্রয়োগ করতে হয়। তবে অধিকাংশ ফল গাছই দীর্ঘ মেয়াদী। যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল, বেল ইত্যাদি। গাছ গর্তে বসানোর সময় সার দেয়া হয়। এছাড়া প্রতিবছরই গাছে সার দিতে হয়। আবার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণ পরিবর্তন করতে হয়। গাছের বাড়ন্ত সময় ও ফল ধরার আগে পরিমাণ মত সার দিতে হয়। অন্যথায় ফলন কমে যায়। বিজ্ঞানীরা ১৭টি উপাদানকে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে যে কয়টি উপাদান গাছের জন্য বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেগুলোকে মুখ্য উপাদান বলে। আর যেগুলো কম পরিমাণে প্রয়োজন হয় সেগুলোকে গৌণ উপাদান বলে। জীবন্ত গাছপালায় সাধারণত ৯৫% কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে। এগুলো বাতাসে যথেষ্ট বিদ্যমান বলে তেমন অভাব হয় না। অবশিষ্ট ৫% প্রয়োজনীয় উপাদান গাছ মাটি হতে শোষণ করে থাকে। এই অবশিষ্ট উপাদানের প্রাপ্তির ওপর ফলের ফলন নির্ভর করে থাকে।

আমরা সাধারণত নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ জাতীয় সার প্রয়োগ করে থাকি। এগুলো মুখ্য উপাদান। অনুর্বর ও বৃষ্টিবহুল মাটিতে গৌণ উপাদানের খুবই অভাব দেখা যায়। কিন্তু এগুলো পরিমাণে কম লাগলেও ফলের ফলনের জন্য খুবই অত্যাবশ্যকীয়। তবে কোন মাটিতে কোন ধরনের পুষ্টি উপাদান ঘাটতি থাকতে পারে তা দেয়া হলো।

মাটির অবস্থা	পুষ্টিগত অবস্থা
১. কম জৈব পদার্থ সম্পন্ন মাটিতে	বেশির ভাগ উপাদান ঘাটতি থাকে
২. বেলে মাটিতে	বেশির ভাগ উপাদান ঘাটতি থাকে
৩, অম্ল মাটিতে	ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতি থাকে
৪. বার মাটিতে	লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ও দস্তা ঘাটতি থাকে
৫, অতি অম্ল ও ক্ষার মাটিতে	ফসফরাস, বোরণ ঘাটতি থাকে
৬. পুরাতন লাল মাটিতে	পটাসিয়াম, সালফার ঘাটতি থাকে

মাটির অবস্থাভেদে কোন উপাদানের ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা থাকলে তা পূরণ না করে সেখানে ফলপ্রসুভাবে ফল চাষ করা সম্ভব হবে না। ফল চাষে মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলির গুরুত্ব অনেক। ভৌত গুণাবলি বলতে মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবিধা, মাটির মধ্যে ছিদ্র, মাটির কণার আকার এবং মাটির স্তর কত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত তা বোঝায়। বৃক্ষজাতীয় ফল গাছের জন্য দুই মিটার গভীর পর্যন্ত সুনিষ্কাশিত মাটি সবচেয়ে ভাল। মাটির বুনট ভাল হলে পানি ধারণ ক্ষমতা, গাছের পুষ্টি উপাদান সরবরাহ এবং মাটির মধ্যে ছিদ্র বেশি থাকে। এতে গাছের শেকড় সহজে বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য শোষক শেকড় মাটির বেশি গভীর হতে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

২০২২

মাটির বুনট ভালো না হলে পানি নিষ্কাশন ঠিকমত হবে না। ফলে পানির উপরে উঠে আসে। মাটির ভেতর। পানিতর ফুল চাষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানির উপরে হলে মাটিতে ছিদ্র কমে যাবে, বায়ু চলাচলে অসুবিধা হবে এবং শিকড়ের শোষণ প্রক্রিয়া ব্যহত হবে। এমনকি এর ফলে শেকড় পঁচে যেতে পারে। যেমন— কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি। মাটির কণার আকৃতির ওপর নির্ভর করে মাটির বুনটের পরিবর্তন হয়।

অধিকাংশ ফল যে কোন ধরনের বুনটের মাটিতে অর্থাৎ বেলে, বেলে দো-আশ, এটেল, এটেল দো-আশ ও কাকরযুক্ত মাটিতে পরিচর্যার মাধ্যমে চাষ করা যায়। হালকা বুনটের মাটিতে কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, কলা, তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং ফলের মিষ্টতা বেশী হয়। আবার ভারি মাটিতে এগুলোর আকার বড় হয়, কিন্তু মিষ্টতা কম হয়। মাটির ভৌত গুণাবলী পরিবর্তন করতে অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। মাটির ভৌত গুণাবলির ওপর মাটির ভেতরের তাপমাত্রা নির্ভর করে, যা গাছের শেকড়ের বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে। তাই গাছের শেকড়ের বৃদ্ধির জন্য মাটির ভেতরে অনুকূল তাপমাত্রা থাকা প্রয়োজন। মাটির রাসায়নিক গুণাবলী বিশেষ করে মাটির পিএইচ মানাংক ও মাটির লবণাক্ততা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফুল চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো পিএইচ হলো ৫.৫ হতে ৮.০। মাটি বেশি অম্লীয় হলে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম বেশি দ্রবীভূত হয়, যা গাছের জন্য বিষাক্ত। মাটি বেশি ক্ষারীয় হলে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, কপার ও কোবাল্ট মাটিতে কম দ্রবীভূত হয়, যা গাছ শোষণ করতে পারে না। সাধারণত মাটি বেশি অম্ল হলে চুন এবং বেশি ক্ষারীয় হলে সালফার জাতীয় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। ক্ষারীয় মাটিতে আনারসে লৌহের অভাব দেখা যায়। লবণাক্ত মাটিতে নারিকেল ছাড়া অন্য ফল লাভজনকভাবে জন্মানো যায় না। মাটিতে গৌণ খাদ্যের অভাবে নারিকেল ফলের অপক্কতা, ঝরে পড়া, ফল ও শাস গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। দস্তার অভাবে লেবু গাছের ছালে, লেবুর খোসায় আঠার থলের সৃষ্টি হয়, ফল ফেটে যায়, পাতার কিনারা শুকিয়ে যায়।

সাধারণত উঁচু জমি, পানি জমে না বা বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতা হয় না বা নিকাশের সুব্যবস্থা আছে এমন স্থান ফল চাষের জন্য ভাল। মাঝারি উঁচু জমি যেখানে অল্প সময়ের জন্য পানি জমে থাকে সেখানে অল্প সময়ের জন্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এমন ফল গাছ রোপণ করা যায়। আম, জাম, গাব, দেওফল, বেত ফল, নারিকেল, খেজুর, তাল ইত্যাদি এ শ্রেণিভুক্ত। অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে গাব ও পানিজাম চাষ করা সম্ভব হয়। সমুদ্র উপকূলবর্তী ও লোনা মাটিতে সব ধরনের ফল চাষ করা যায় না। তবে এ ধরনের মাটিতে ফসফরাস ও পটাশের তেমন অভাব হয় না বলে নারিকেল, সুপারী, কাউফল ও আমড়া জাতীয় ফল ভালভাবে জন্মাতে পারে।

পাহাড়ী এলাকায় পাহাড়ের ঢাল কতটুকু তার ওপর নির্ভর করে ফল চাষ করতে হয়। কেননা ঢাল বেশি হলে অর্থাৎ ৪৫-এর বেশি ঢালে ফল চাষ করা দুরুহ। তবে বেশি ঢালে বিশেষ পদ্ধতিতে গাছ রোপণ করতে হয়। পাহাড় উচু হলে তার উত্তর দিকে বেশী আলো পৌঁছেনা। এ রকম স্থান ফল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়। তামাটে বর্ণের পাহাড়ী মাটি অম্লীয় ও সুনিষ্কাশিত হলে মাটির পিএইচ মানাংক সাধারণত ৪ - ৪.৫ হয়। এ ধরনের মাটিতে কাজুবাদাম, আনারস, এ্যাভাকোডো, কাঁঠাল, সুপারি ইত্যাদি জন্মানো যায়। সাধারনভাবে বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই সব ধরনের ফল মোটামুটি জন্মাতে পারে। তবে কিছু কিছু ফল সবস্থানে ভাল ফলন দিতে পারে না যেমন— উৎকৃষ্টমানের আম দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে ভাল জন্মে। পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা কমলালেবুর চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আনারস চাষের জন্য অম্ল মাটি উপযোগী। মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং সিলেট ও চট্টগ্রামের লালমাটি এলাকা অম্লীয় বিধায় আনারস চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। লোনামাটির এলাকা বরিশাল বিভাগ ও খুলনার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা নারিকেল চাষের জন্য উত্তম। এ ছাড়াও বৃষ্টি বহুল এবং স্যাঁতসেতে পরিবেশ বিরাজ করে বলে গাব, চালতা, জাম, দেওফল, লটকন ইত্যাদি ভালো ভাবে জন্মাতে পারে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আমাদের দেশে ফলের চারা/কলম রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় কখন ?

২। আবহাওয়ার প্রভাবকের উপর নির্ভর করে ফলকে কত ভাগে ভাগ করা যায়।

৩। কোন মাটি ফল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ?

৪। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের মাটি নারিকেল চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল বাগানের জন্য কিরূপ জমি নির্বাচন করা উচিত।

২। আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে ফলকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটির ৫টি করে উদাহরণ দাও।

৩। আবহাওয়ার প্রভাবকগুলোর ওপর ভিত্তি করে ফলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

৪। ফল চাষের উপর তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

৫। ফল গাছ রোপনের সময় বা মৌসুম বলতে কি বোঝায় ?

৬। বৃষ্টিপাত কিভাবে ফল উৎপাদনের প্রভাব ফেলে?

৭। সমুদ্র উপকূলবর্তী ও লোনা মাটিতে কোন কোন ফল ভালো জন্মে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে ফল উৎপাদন অঞ্চলসমূহের বর্ণনা দাও।

২। ফল গাছ রোপণের জন্য জমির উপযুক্ততা সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

৩। জলবায়ুর প্রভাবকগুলো ফল উৎপাদন কিভাবে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা কর।

৪। ফল গাছ রোপণের জন্য মাটির প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। গাছ রোপণের সময় বা মৌসুম সম্পর্কে লেখ।

৬। চারা রোপণ সময়ের পরবর্তী পরিচর্যা গুলো সংক্ষেপে লেখ।

৭। ফল চাষের জন্য জমি তৈরি সংক্ষেপে লেখ।

৮। টীকা ও লেখ ? ক) জলবায়ুর চাহিদা অনুযায়ী ফলের শ্রেণিবিভাগ খ) উষ্ণমণ্ডলীয় ফল গ) অব উষ্ণমণ্ডলীয় ফল

২০২২

তৃতীয় অধ্যায়

ফল বাগানের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি

ফল বাগানের পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফল বাগান স্থাপনের পূর্বেই সার্বিকদিক বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করতে হবে। বেশিরভাগ ফল গাছই বৃক্ষজাতীয় গাছ। পারিপার্শিক পরিবেশ, আবহাওয়া, মাটির গুণাগুণ, জনগণের চাহিদা, বাজার ব্যবস্থা উন্নতজাত ও প্রযুক্তি প্রাপ্তি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে বাগানের পরিকল্পনা করতে হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা না করা হলে অযথা অর্থব্যয় হবে ও ফল চাষে ব্রতী হবে। ফল বাগানের জন্য সব সময়ই উঁচু, খোলামেলা, পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত এবং জলাবদ্ধতা হয় না এমন খান। নির্বাচন করতে হয়। বিভিন্ন জাতের ফল গাছ বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়া ও মাটিতে ভালভাবে জন্মাতে পারে। মাটির গুণাগুণ অনেক ক্ষেত্রে পরিচর্যার মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তন করা যায় না। ফলের গাছ স্বল্প মেয়াদী, মধ্যম মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদি হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদি ফল গাছ ৩০/৪০ থেকে ৫০/৬০ বছর পর্যন্ত ভালভাবে ফল দিয়ে থাকে। মধ্য মেয়াদি ফলগাছ ১৫ থেকে ২০ বছর ভালভাবে ফল দিয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদি ফল গাছ ১-৩ বছর পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে। দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদি ফল গাছ রা পণের সময় স্থান নির্বাচনে, নকশা তৈরিতে, রোপণের দূরত্ব নির্ধারণে, জাত বাছাই ইত্যাদি বিবেচনায় যদি ভুল হয়, আর তা যদি বাগান স্থাপনের কয়েক বছর পর জানা যায় তাহলে তা সারিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না। বাগান লাভজনক করতে হলে দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী বাগানে আন্তফসলের চাষ করা যেতে পারে। যেমন— আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি ফল গাছ ৮-১০ বছরের আগে ভালভাবে ফল দেয় না। সে জন্য এ সময় সেখানে পেঁপে, কলা, আনারস, জামরুল, আতা, শরিফা, কুল লাগিয়ে খরচ পুষিয়ে নেয়া যেতে পারে।

ফল বাগান পরিকল্পনার সাধারণ নীতিমালা

(১) ফল বাগান স্থাপন এবং কোন নির্দিষ্ট ফল ভালভাবে চাষের জন্য তার উপযোগী আবহাওয়া, জমির উচ্চতা, মাটির প্রকারভেদ, ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, পরিবহণ ও বিপণনের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(২) পতিত জমিতে বাগান করতে হলে সেখানে পুরাতন গাছ বা গাছের গোড়া থাকলে তা পরিষকার করে গভীরভাবে চাষ করতে হবে। পাহাড়ী এলাকা হলে কন্টুর এবং সিড়িবাধ তৈরি করে কিছু দূর পর্যন্ত সমতল করে নিতে হবে।

(৩) বাগান তৈরিতে রাস্তা, সেচ ও নিষ্কাশন নালা, বাগানের গুদামঘর ইত্যাদি কাজের জন্য কোনক্রমেই মোট জমির শতকরা দশভাগের বেশি ব্যবহার করা সমিচিন হবে না।

(৪) বাগানে সেচ সুবিধার জন্য কাছাকাছি পানির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৫) চিরসবুজ গাছগুলো বাগানের সামনে এবং ভেতরে লাগাতে হবে। পাতা ঝরে যায় এমন গাছ যেমন— বেল, আমড়া, বরই ইত্যাদি পিছনে এবং বাইরে লাগাতে হবে।

(৬) সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় এমন গাছ পানির উৎসের কাছাকাছি এবং বৃষ্টিনির্ভর গাছ পানির উৎস হতে দূরে লাগাতে হবে।

(৭) ছোট আকারের গাছ বাগানের সামনে এবং লম্বা ধরনের গাছ পেছনের দিকে লাগাতে হবে, তাতে বাগান তত্ত্বাবধানে সুবিধা হবে।

(৮) বর্ষার শুরুতে সঠিক দূরত্বে গর্ত করে পরিমাণ মত সার দিয়ে চারাগাছ লাগাতে হবে।

(৯) গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য পরিমাণ মত জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

(১০) ফলের বাগানে আন্তফসলের চাষাবাদ করলে গাছের দূরত্বের সর্বোচ্চ দূরত্বে এবং তা না করলে সর্বনিম্ন দুরত্বে গাছ লাগাতে হবে।

(১১) বাগানের চারিদিকে প্রয়োজনে বেড়া দিতে হবে। প্রবল বাতাস থেকে গাছ রক্ষার জন্য উত্তর পশ্চিম দিকে বায়ুরোধকারী বৃক্ষ ঘন সারি করে লাগাতে হবে। বেড়া গাছ গ্রীষ্মের গরম বাতাস এবং শীতের শুষ্ক ও ঠান্ডা বাতাস থেকে বাগানের ফল গাছকে রক্ষা করবে। বেড়ার চারদিকে কাটাওয়ালা পাতি, কাগজি ও গন্ধরাজ লেবুর গাছ ও করমচা গাছ লাগানো যেতে পারে। এতে বেড়ার কাজ হবে এবং ফলও পাওয়া যাবে। তবে বেড়ার জন্য লাগালে এসব গাছ ছাটা ঠিক হবে না।

(১২) উর্বর জমিতে লাভজনকভাবে ফল চাষের জন্য যে সমস্ত ফল গাছ মাটামুটি একই সময়ে ফল দেয় সে সমস্ত ফল গাছগুলোকে পাশাপাশি লাগাতে হবে।

(১৩) বাগানের নক্সা তৈরির আগে গাছের আকার, জমির পরিমাণ ও জমির আকৃতি, গাছ রোপণ প্রণালী ঠিক করে নিতে হবে।

(১৪) ফলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বাঁশের ঝুড়ি, চটের ব্যাগ, কাঠের বা পিচবার্ডের বাক্সে প্যাকিং করে বাজারে পাঠাতে হবে। তাই বাগান এলাকার আশেপাশে এ সমস্ত উপকরণসমূহের সহজলভ্যতা থাকতে হবে।

(১৫) ফল চাষ করে সহজে এবং কম খরচে যাতে বাজারে বা চিহ্নিত স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে।

(১৬) বাগানের পরিচর্যার জন্য যন্ত্রপাতি যথা- কোদাল, নিড়ানি, ঝাঝরি, ফর্ক, রেফ, দা, প্রুনিংস, কাঁচি, বাডিং ছুরি, প্রেয়ার, এক চাকার ঠেলাগাড়ি প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ফল গাছ লাগানোর নকশার প্রকারভেদ

উন্নত পদ্ধতিতে এবং লাভজনকভাবে ফল বাগান করতে হলে বাগানে গাছ লাগানোর জন্য নকশা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। বাগান তৈরির আগে প্রথমে কাগজে নকশা তৈরি করে ভুলত্রুটি দেখে নিতে হবে। বাগানের নকশা তৈরি করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাগানের অফিসঘর, গুদামঘর, গার্ডশেড, পানির পাম্পের স্থান, ভেতরের রাস্তা, সেচ ও নিকাশ নালা, নির্দিষ্ট ফল গাছের জন্য নির্বাচিত স্থান, বেড়ার গাছ যথাস্থানে আছে বা করা যাবে কিনা তা জেনে নিতে হয়। জমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জমির অপচয় রোধে প্রত্যেকটি কাজের জন্য জমি চিহ্নিত করে ফল গাছের রোপণ পদ্ধতি অনুযায়ী রোপণ দূরত্ব ঠিক করে, সেচ পদ্ধতি পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয় বাগানের নকশায় উল্লেখ করতে হবে। বাগানের নকশা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ও অবস্থান দেখে সর্বাধিক সংখ্যক গাছ লাগানো যায়। তাতে প্রতিটি গাছ সুন্দরভাবে আলো-বাতাস পেয়ে বড় হতে পারে। পরিকল্পনা মোতাবেক গাছ লাগালে নির্ধারিত দূরত্ব বজায় থাকে এবং একটি অন্যটির বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে না। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফল বাগানের নকশা বা পরিকল্পনা করা হয়। এ পদ্ধতিগুলো যথা—

১। আয়তকার

২। বর্গাকার

৩। পঞ্চম সংস্থান বা তারকাকৃতি বা কুইনকাংশ

৪। ত্রিকোনী বা ত্রিভুজাকার

৫। ষড়ভুজী

৬। কন্টুর বা সিঁড়িবাধ

উলিখিত ছয় প্রকার গাছ রোপণ পদ্ধতির প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো। তবে রোপণ পদ্ধতি নির্ধারণ করার সময় কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করা উচিত। যথা—

২০২২

(ক) নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কত বেশি সংখ্যক গাছ রোপণ করা যাবে।

(খ) জমি চাষ, পানি সেচ ও নিকাশ, গাছের পরিচর্যা কত সহজে ও সুষ্ঠুভাবে করা যাবে।

(গ) চারা রোপণের পদ্ধতির কারণে যেন গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত না হয়।

(ঘ) এমনভাবে গাছ লাগাতে হবে যাতে বাগান দেখতে সুন্দর দেখায়।

চারা রোপণের জন্য নকশা প্রণয়নে করণীয় কাজসমূহ

ক) মূলরেখা চিহ্নিতকরণ: প্রতিটি জমিতে চারা রোপণের আগে জমির কিনারা বা আইল দিয়ে সীমানা রেখা টানতে হবে। এরপর একটি মূলরেখা টেনে নিতে হয়। সাধারণত প্রতিটি জমিতে গাছের প্রথম সারিটি মূল রেখা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এ সারিটি জমিতে সারি থেকে সারির যে দূরত্বে গাছ লাগানো হবে মূলরেখাটি জমির কিনারা বা আইল হতে তার অর্ধেক দূর দিয়ে নিতে হবে। এ সারিকে মুল সারি বা ভিত্তি সারি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর উপর গাছ হতে গাছের দূরত্ব চিহ্নিত করে অপরাপর সারিগুলো এমনভাবে টানতে হবে যেন একটি আরেকটির সাথে পরস্পর সমান্তরালভাবে থাকে।

খ) জমিতে লম্বরেখা গঠন: জমির এক কোণে দাঁড়িয়ে বা মূল সারির এক প্রান্তে দাড়িয়ে যথাযথ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। একটি রশি ধরে ৩:৪:৫ অনুপাতে বা ১২, ১৩, ২০ মিটার হিসেবে জমির দুই দিকের আইল বরাবর রশি ধরে চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ কৌণিক স্থান হতে উভয় দিকের আইল বরাবর দুদিকে রেখা টেনে একটিতে ১২ মিটার এবং অপরটিতে ১৬ মিটার দূরত্ব চিহ্নিত করতে হবে। এই চিহ্নিত স্থান দুটি সোজাসুজি সংযোগ করা হলে সংযোজিত রেখাটি যদি ২০ মিটার হয় তাহলে সংযোগস্থলে ৯০ ডিগ্রী কোণ তৈরি হবে। এরপর উভয়দিকের রেখা সরল রেখা হিসেবে প্রসারিত করা হলে একটি অপরটির উপর লম্বরেখা হিসেবে অঙ্কিত হবে। এর একটিকে মূলরেখা ধরে সমান্তরাল রেখা টানতে হবে। তবে মূল রেখাটি জমির কিনারা বা আইলে না ধরে সারি হতে সারির অর্ধেক দূরত্বে ধরতে হয়।

গ) মুক্ত রেখা প্রস্তুতকরণ: জমিতে আইল বরাবর লম্ব রেখা টেনে তারপর মূলরেখা তৈরি করা হয়। এ মূলরেখার গাছ রোপনের চিহ্নিত স্থান হতে পরবর্তী রেখার বা সমান্তরাল রেখার চিহ্নিত স্থানে লম্ব রেখার উপর হতে মূল রেখার সমান্তরাল রেখা সংযোগে করা হলে মুক্ত রেখা তৈরি হয়। এ ভাবে মূলরেখার ওপর গাছের দূরত্ব অনুসারে প্রতিটি সারিতে সারি হতে সারির অংকিত রেখায় যতগুলো সম্ভব স্থান চিহ্নিত করে সংযোগ করতে হবে। তবে মূলরেখার উপর এক দিক হতে বা উভয়দিক হতে গাছ রোপণের জন্য নির্ধারিত দূরত্বের অর্ধেক দূরত্ব হতে গাছ রোপণের নিমিত্তে উলিখিত রেখাগুলো তৈরির জন্য চিহ্নিতকরণ দন্ড বা গোজ, দূরত্ব মাপার ফিতা, রশি, গাছের স্থান চিহ্নিত করে রাখার জন্য চিকন কাঠির প্রয়োজন।

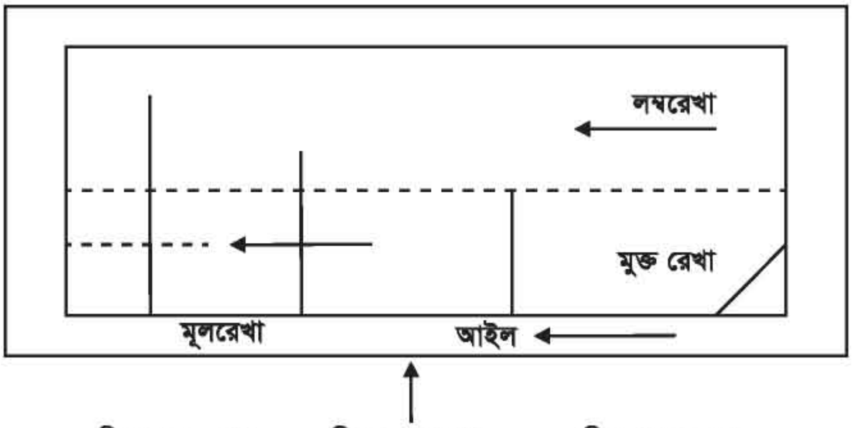

চিত্র: মূল রেখা চিত্র: লম্ব রেখা চিত্র: মুক্ত রেখা

২০২২

ফল গাছ রোপণের পদ্ধতিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো

(১) আয়তাকার পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক সমান্তরাল সারির মধ্যে মূল সারিতে গাছের স্থান চিহ্নিত করতে হবে। এরপর মূল রেখার চিহ্নিত স্থান হতে পরবর্তী সারিগুলোকে লম্বরেখায় চিহ্নিত করে মুক্ত রেখা চিহ্নিত করতে হবে। এর ফলে পাশাপাশি দুসারির মধ্যে চারটি গাছের সমন্বয়ে একটি আয়তক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে।

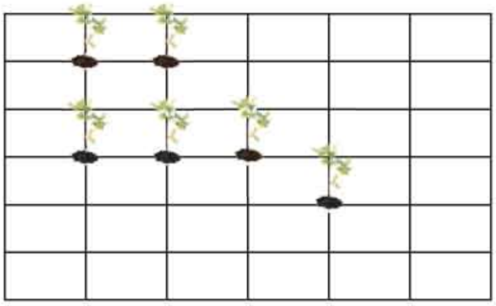

চিত্র: আয়তাকার পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর নকশা

সাধারণত আয়তাকার পদ্ধতিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব গাছ থেকে গাছের দূরত্বের চেয়ে বেশি থাকে। এ পদ্ধতিতে লাগানো ফল বাগানে আন্ত পরিচর্যা যেমন- চাষ, পানি সেচ, কোপানো, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ সুবিধাজনক হয়। বাগানের জন্য রোপিত গাছ বড় হওয়ার আগে এর মাঝে শাক, আলু, তরমুজ, ফুটি, হলুদ, কচু, ডাল জাতীয় শস্য ইত্যাদি কয়েক বছর করা যায়। এর ফলে বাড়তি আয় করা সম্ভব হয়।

হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি (আয়তাকার বা বর্গাকার পদ্ধতি):

এক হেক্টর জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = এক হেক্টর জমি = ১০০০০ বর্গমিটার

সারি থেকে সারির দূরত্ব (ব:মি:)×গাছ থেকে গাছের দূরত্ব (ব:মি:) অথবা

সারির সংখ্যা প্রতি সারিতে গাছের সংখ্যা

উদাহরণ: পেঁপে বাগানে ৫ মিটার দূরত্বে সারি করে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে এক হেক্টর জমিতে কতটি চারা রোপণ করা যাবে—

মোট পেঁপে গাছের সংখ্যা $\dfrac{\text{১০০০০ বর্গ মিটার}}{\text{৫ মি.×২ মি:}} = \dfrac{\text{১০০০০ বর্গমিটার}}{\text{১০ বর্গমিটার}} = \text{১০০০ টি}$

অর্থাৎ এক হেক্টর জমিতে ১০০০টি চারা রোপণ করা যাবে।

(২) বর্গাকার পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি দু'সারির গাছগুলোকে এমনভাবে রোপণ করা হয়, যাতে সারি হতে সারি এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব পরস্পর সমান থাকে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুসারির চারটি গাছ মিলে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে। বর্গক্ষেত্রের চারকোনার স্থানগুলোতে গাছ রোপণ করা হয়। আম, কাঁঠাল, লিচু, সফেদা, জাম, জামরুল, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি ফল গাছের চারা এ পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়। এ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং মাঠে সহজে নকশা প্রণয়ন করা যায়।

জমিতে মুলরেখা তৈরি করার পর নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুসারে সম্পূর্ণ মূল রেখায় কাঠি বা গোজ পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে। মূলরেখার সঙ্গে লম্বরেখা টেনে সারি হতে সারির দূরত্ব চিহ্নিত স্থান হতে মূল রেখার

সমান্তরাল রেখা টানতে হবে। এরপর প্রথম সারি বা মূলরেখার চিহ্নিত স্থান হতে লম্বরেখা টেনে নিলে পরবর্তী সারিগুলোতে যেখানে রেখাগুলো অতিক্রম করবে সে স্থানগুলোতে কাঠি বা গোঁজ পুঁতে দিতে হবে। প্রত্যেকটি স্থানে গাছ রোপণ করা হলে প্রতি চারটি গাছ মিলে এক একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করবে। এ পদ্ধতিটি বেশি প্রচলিত এবং দেখতে সুন্দর দেখায়। এখানে উল্লেখ্য যে মূলরেখাটি জমির আইল হতে সারি হতে সারির দূরত্ব বাদ দিয়ে প্রথম গাছের স্থান চিহ্নিত করা হয়। বর্গাকার পদ্ধতিতে মোট গাছের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য আয়তাকার পদ্ধতির অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

উদাহরণ একটি আম বাগান করার জন্য ১০ মিটার দূরে দূরে সারি ও ১০ মিটার দূরে দূরে চারা/কলম রোপণ করা হলে এক হেক্টর জমিতে মোট কতটি চারার প্রয়োজন হবে।

এক হেক্টর জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = এক হেক্টর জমি = ১০০০০ বর্গমিটার

সারি থেকে সারির দূরত্ব (ব:মি:)×গাছ থেকে গাছের দূরত্ব (ব:মি:)

বা সারির সংখ্যা×প্রতি সারিতে গাছের সংখ্যা

$$\text{মোট আম গাছের সংখ্যা} = \frac{\text{১০,০০০ বর্গ মিটার}}{\text{১০ মি.×১০ মি:}} = \frac{\text{১০০০০ বর্গমিটার}}{\text{১০০ বর্গমিটার}} = \text{১০০ টি}$$

অর্থাৎ এক হেক্টরে ১০০টি চারা বা কলম রোপণ করা যাবে।

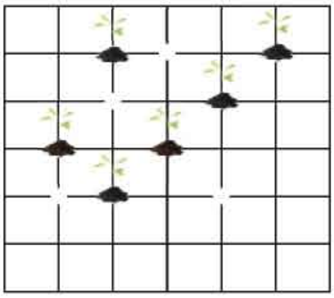

চিত্র: বর্গাকার পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর নকশা

(১) কুইনকাংশ বা পঞ্চম সংস্থান বা তারকাকৃতি পদ্ধতি: এ পদ্ধতিটি বর্গাকার পদ্ধতির একটি বিশেষ রূপ। বর্গাকার পদ্ধতির প্রতি চার কোণের চিহ্নিত স্থান হতে মূল রেখার উপর বা পরবর্তী সারিগুলোতে দুই গাছের চিহ্নিত মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে। অনুরূপভাবে মুক্ত রেখাগুলোর উপর প্রতি দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে। এখন মূল রেখা বা পরবর্তী সারিগুলোর মধ্যবর্তী স্থান এবং মুক্ত রেখার মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর মুল রেখা বা পরবর্তী সারিগুলোর মধ্যবর্তী স্থান এবং মুক্ত রেখার মধ্যবর্তী স্থান হতে সামনা সামনি দিকে রেখা টানলে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হবে। এই কেন্দ্রবিন্দু হবে পঞ্চম সংস্থান। কেন্দ্রবিন্দুর সংস্থানকৃত গাছটিকে ফিলার বা পূরক বলে। বর্গাকার পদ্ধতিতে চারকোনে মধ্যম মেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী গাছ লাগানো হয় এবং পুরক গাছটি স্বল্পমেয়াদী হিসেবে লাগানো হয়। যেমন— দীর্ঘমেয়াদী গাছ হলো আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, কামরাঙ্গা, তেঁতুল এবং স্বল্পমেয়াদী গাছ হলো লেবু, ডালিম, পেয়ারা, আতা, শরীফা, জাম্বুরা, কলা, জামরুল, করমচা ইত্যাদি। পুরক গাছগুলো যখন মধ্যমমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি গাছের সাথে আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান, পানি ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতায় যাবে তখন পূরক গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে। স্থায়ী গাছের দূরত্ব কমপক্ষে ৭ মিটার না হলে এ পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ হিসেবে অনুশীলন করা যাবে না। ২০২২

কুইনকাংশ বা পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয়

জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = (সারির সংখ্যা×সারিতে গাছের সংখ্যা) + পুরক গাছ

পুরক গাছ = (প্রধান সারিতে গাছের সংখ্যা -১)×(সারির সংখ্যা - ১)

উদাহরণ: কোন জমিতে ১২টি সারি তৈরি করে প্রতিটি সারিতে ১০টি করে চারা রোপণ করা হলে ঐ জমিতে পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতিতে কতটি চারা রোপণ করা যাবে।

জমিতে গাছের সংখ্যা = (সারির সংখ্যা×সারিতে গাছের সংখ্যা) + পুরক গাছ

= (১২×১০) + পুরক গাছ
= (১২×১০) + ৯৯
= ১২০+৯৯

আমরা জানি,
পুরক গাছ = (সারির গাছের সংখ্যা-১)×(সারির সংখ্যা -১)
= ২১৯ = (১০-১)×(১২ -১)
= ৯×১১
= ৯৯ টি

অর্থাৎ মোট ২১৯ টি চারা রোপণ করা যাবে।

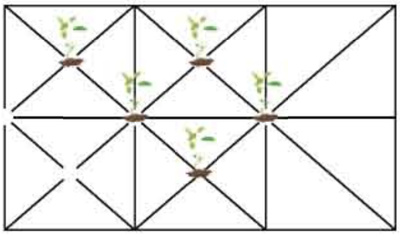

চিত্র: পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর নকশা

৪) ত্রিকোণী বা ত্রিভুজাকার পদ্ধতি: মূলরেখা তৈরি করে মূল রেখার উপর বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় গাছের দূরত্ব চিহ্নিত করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় সারিতে জমির কিনারা হতে গাছের দূরত্বের পূর্ণ দূরত্বে চিহ্ন করতে হবে। এই ভাবে পরবর্তী চিহ্নগুলো গাছের পূর্ণ দুরত্বে করতে হবে। এতে মূলরেখায় গাছের নির্ধারিত দুটি গাছের চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দ্বিতীয় সারিতে গাছের চিহ্ন পড়বে। এ পদ্ধতিতে প্রতি একান্তর বা জোড়া সারিতে প্রথম সারির দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ লাগানো হয় এবং এরপর প্রতি বেজোড় সারিতে বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় গাছ লাগানো হয়। এতে প্রথম বা মূলরেখার দুটি এবং একান্তর সারির একটি গাছের চিহ্ন যোগ করা হলে মাত্র একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে একান্তর বা জোড় সারির একটি গাছ তৃতীয় বা বেজোড় সারির দুটি গাছের চিহ্নের সাথে যাগে করা হলে ত্রিভুজের সৃষ্টি করে। ত্রিভুজগুলো সমবাহু ত্রিভুজ হয়। ১ম, ৩য়, ৫ম বা বেজোড় সংখ্যক লাইনে বর্গাকার প্রণালীতে গাছ লাগানো হয় এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ বা জোড় সংখ্যক লাইনে বেজোড় লাইনের দুটি গাছের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ লাগানো হয়। এ পদ্ধতিতে সারি হতে সারির দূরত্ব গাছ হতে গাছের দূরত্ব অপেক্ষা বেশি রাখা হয়। প্রতি এক সারি পর পর বা একান্তর সারিতে একটি করে গাছ কম হয়। এতে করে মোট জমিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কমে যায়।

ত্রিভুজাকার পদ্ধতিতে জমিতে মোট গাছের সংখ্যা নির্ণয়

জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা×মোট সারির সংখ্যা) - একান্তর ক্রমিক (জোড়) সারির সংখ্যা

উদাহরণ: এটি জমির দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার। এ জমিতে ১০ মিটার দূরে দূরে সারি করে একই দূরত্বে গাছ রোপণ করা হলে মোট কতটি গাছ রোপণ করা যাবে।

আমরা জানি,

প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা = $\frac{\text{জমির প্রস্থ}}{\text{চারার দূরত্ব}} = \frac{৩০}{১০}$ = ৩ টি

সারির সংখ্যা = $\frac{\text{জমির দৈর্ঘ্য}}{\text{সারির দূরত}} = \frac{৫০}{১০}$ = ৫টি

একান্তর ক্রমিক বা জোড় সারি সংখ্যা = $\frac{\text{সারির সংখ্যা - ১}}{২}$

$= \frac{৫-১}{২}$

$= \frac{৪}{২}$

$=২$

মোট গাছের সংখ্যা = (৩×৫)-২ = ১৫-২

= ১৩ টি

অর্থাৎ মোট ১৩টি গাছ রোপণ করা যাবে।

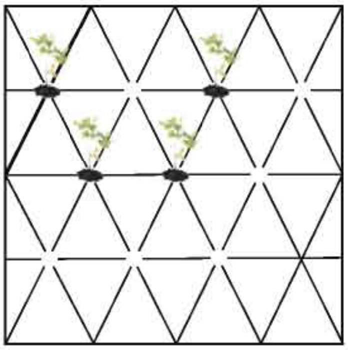

৫। ষড়ভুজী পদ্ধতি: ষড়ভুজী পদ্ধতি একটি সমবাহু ত্রিভুজাকার পদ্ধতি। এখানে পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ মিলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি করে। পাশাপাশি তিন সারির ছয়টি গাছ মিলে একটি ষড়ভুজ তৈরি করে। এর কেন্দ্রস্থলে একটি গাছ থাকে। গাছের দূরত্ব নির্দিষ্ট রাখতে হলে সারি হতে সারির দূরত্ব কমিয়ে দিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ষড়ভুজ তৈরি কিছুটা জটিল হলেও গাছ লাগানো হলে দেখতে সুন্দর দেখায়। যে কোন দিক হতে তাকালে লাগানো গাছগুলো একটি সরল রেখায় দেখা যায়। একগাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব সমান থাকে। ফলে আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান, পানি ইত্যাদি সকল গাছ সমানভাবে পায়। আম, কলা, আপেল, পীচ, লেবু, পেয়ারা, নারিকেল কাজুবাদাম প্রভৃতি ফল গাছের চারা এই পদ্ধতিতে লাগানো হয়। ষড়ভুজ পদ্ধতিতে গাছ লাগালে দূরত্ব। ঠিক রেখেও ১৫% গাছ বেশি লাগানো যায়। ফলে একই জমি থেকে ১৫% অধিক ফল উৎপাদন করা সম্ভব।

ষড়ভুজী পদ্ধতি জমিতে চারা সংখ্যা নির্ণয়

জমিতে মোট চারার সংখ্যা = (মোট সারির সংখ্যা×প্রধান বা প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা) - জোড় বা একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা। ২০২২

উদাহরণঃ এক খণ্ড জমির দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৪০ মিটার। ৫ মিটার দূরে দূরে সারি এবং ৮ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করা হলে ঐ জমিতে মোট কতটি চারা রোপণ করা যাবে।

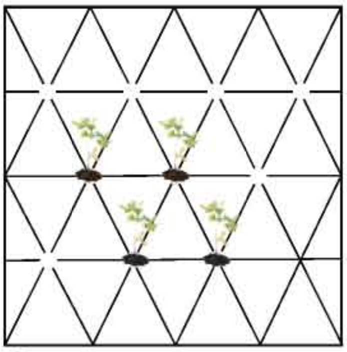

চিত্রঃ ষড়ভুজী পদ্ধতিতে জমিতে চারা লাগানোর নকশা

(৬) কন্টুর বা ঢাল এবং সিড়িবাধ পদ্ধতিঃ - পার্বত্য অঞ্চলে ঢাল এবং সিড়িবাঁধ নির্মাণ করে ঢালের আড়াআড়িভাবে ফলের চারা রোপণ করা হয়। জমিতে চাল ৩ শতাংশের বেশি এবং ১০ শতাংশের কম থাকলে সেখানে কন্টুর বা ঢাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে জমির ঢাল অনুযায়ী সমান স্থানগুলোকে একই রেখা দ্বারা সংযোগ করে দেয়া হয়। যেখানে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে এবং সেচ দেয়া অসুবিধাজনক সেখানে এ পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয়। এখানে স্বাভাবিক ভাবে লাগানো গাছের পারস্পরিক দূরত্ব কখনও সমান রাখা সম্ভব নয়। পাহাড়ের ঢাল ১০ শতাংশের বেশি হলে পাহাড় কেটে সমতল সিঁড়িবাধ তৈরি করা হয় এবং ঢালের সাথে আড়াআড়িভাবে সারি করে গাছ লাগানো হয়। এখানে প্রথম সারির দুটি গাছের মধ্যবর্তী স্থানে পরবর্তী সারিতে গাছ লাগিয়ে জমির ক্ষয়রোধ করা হয়। এর ফলে সিড়ি বাঁধ পদ্ধতিতে পানিসেচ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ঠিকমত করা যায় ও ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। এ কাজের জন্য ঢালের নিচের দিকে কিছুটা উঁচু করে আইল বা বাঁধ দিতে হয়।

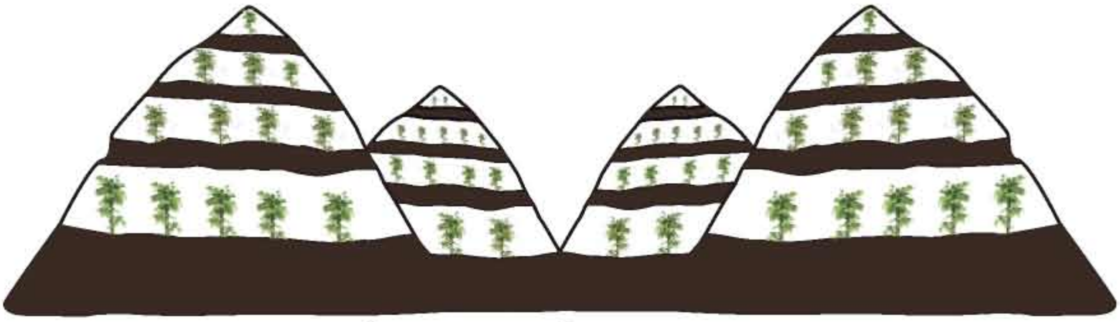

চিত্রঃ (ক) ঢাল পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর নকশা

সকল প্রকার পদ্ধতিতেই গাছ লাগানোর মানে কাঠি বা গেজ দিয়ে চিহ্ন করতে হয়। গোজ তুলে দিয়ে ফল গাছের আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন আকারের গর্ত খুড়ে পরিমাণ মত সার দিয়ে গর্ত পূরণ করতে হয়। সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করে অন্তত ৮-১২ দিন পরে ঐ গর্তে ফলের চারা রোপণ করতে হয়। ফল গাছ রোপণের জন্য নকশা সঠিক নির্বাচন এবং সঠিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অপর্যাপ্ত পরিসরে গাছ ভালোভাবে বাড়তে পারে না। ফলে ফল কম ধরে ও নিম্নমানের হয়। গাছ কাছাকাছি হলে রোগ

২০২২

ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে। অন্যদিকে অধিক পরিসরে গাছ লাগালে মূল্যবান জমির অপচয় হয়, জমিতে বেশি আগাছা হওয়ার সুযোগ পায়, জমি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় ও ভূমির ক্ষয় হয়।

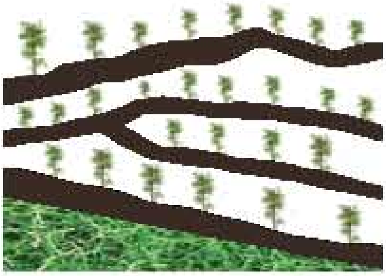

চিত্রঃ (খ) সিড়িবাধা পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর নকশা

বর্গাকার পদ্ধতি

সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ। কেননা মাঠে নকশা প্রণয়নে কোন ঝামেলা হয় না।

(২) বর্গক্ষেত্রের প্রতি কোণায় একটি করে গাছ লাগানো হয়। তাই প্রতিটি গাছ সমান দূরত্ব পায় এবং সহজে বেড়ে উঠতে পারে।

(৩) স্বল্পমেয়াদি ও দ্রুতবর্ধনশীল ফল গাছের জন্য এ পদ্ধতি সঠিক উপযোগী।

অসুবিধা

(১) সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি এবং বর্ধনশীল ফসলসমূহ এ পদ্ধতিতে লাগানো বিশেষ উপযোগী নয়।

(২) ফল গাছ লাগানোর কিছু কিছু নকশায় বেশি গাছ লাগানো যায় কিন্তু এ পদ্ধতিতে কম সংখ্যক গাছ লাগানো যায়।

(৩) গাছ গোলাকার ভাবে চর্তুদিকে বাড়ে ফলে বর্গক্ষেত্রের চার কোণায় লাগানো গাছ হতে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্র কিম্বা বা মাঝখানের জায়গা অব্যবহৃত থাকে। আয়তাকার পদ্ধতি সুবিধা ও অসুবিধা বর্গাকার পদ্ধতির অনুরূপ

পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতি

সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে বর্গাকার বা আয়তকার পদ্ধতি অপেক্ষা কোন নির্দিষ্ট জমিতে বেশি সংখ্যক গাছ লাগানো যায়।

(২) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়।

(৩) এ পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদি গাছের সাথে স্বল্পমেয়াদি গাছের সমন্বয় করা যায়।

(৪) ফিলার গাছ কেটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

অসুবিধা

(১) দীর্ঘমেয়াদি গাছের সাথে স্বল্পমেয়াদি গাছের সমন্বয় করে না লাগানো হলে বাগান লাভজনক হয় না।

(২) পঞ্চম স্থানের ও চার কোণার গাছের ফল বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করতে হয় ।

(৩) এক জাতীয় রোগ ও পোকামাকড় অন্য জাতীয় গাছে পরজীবি হতে পারে ।

ত্রিকোণী বা ত্রিভুজ পদ্ধতি সুবিধা

(১) তিনদিক থেকে গাছের অতি পরিচর্যা সহজে করা যায় ।

(২) বাগান দেখতে সুন্দর দেখায় ।

অসুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয় ।

(২) নকশা করা কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ ।

(৩) জমির অপচয় হয় ।

ষড়ভুজী পদ্ধতি

সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে এক গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব সমান থাকে ।

(২) তিন দিক থেকে বাগানের গাছে আন্ত পরিচর্যা করা যায় ।

(৩) বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা ১৫ % গাছ বেশি লাগানো যায়

(৪) এ পদ্ধতিতে লাগানো বাগান দেখতে সুন্দর দেখায়

অসুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতি (বর্গাকার বাদে) অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয় ।

(২) নকশা তৈরি কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ ।

(৩) জমির অপচয় হয় ।

চান্স বা সিঁড়ি বাঁধ পদ্ধতি সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে সুষ্ঠু নকশা প্রণয়ন করে গাছ লাগিয়ে ভূমির ক্ষয় কমানো যায় ।

(২) এ পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিগুণ গাছ লাগানো যায় ।

(৩) গাছ লাগানোর জন্য রেখা তৈরির ফলে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে বিভিন্ন দিকে চলাফেরা করা যায় ।

(৪) উঁচু দিক হতে পাইপ দ্বারা নিচের দিকে সহজে সেচের পানি প্রবাহিত করা যায় ।

অসুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয় ।

(২) নকশা তৈরি কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ

মিশ্র ফল বাগান

বাংলাদেশে লোক সংখ্যার তুলনায় জমির মতো বেশি অভাব যে, এখানে ফলের বাগান করতে গিয়ে জমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা আবশ্যক । বর্তমানে বাংলাদেশে ৮২-৯০ লাখ হেক্টর জমি থেকে খাবার যোগান দিতে হচ্ছে প্রায় ১৫ কোটি জনগাষ্ঠীর । গত ত্রিশ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে কিন্তু চাষযোগ্য জমির

২০২২

পরিমাণ বাড়েনি। বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছে গড়ে ৯২৬ জন মানুষ, ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ একদিকে যেমন কমে যাচ্ছে সেই সাথে কমছে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও। অন্যদিকে মোট খাদ্যশস্যের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সে জন্য অতিরিক্ত খাদ্যঘাটতি মেটাতে নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশি খাদ্য আমদানি এবং দাতাগাষ্ঠীর সাহায্যের ওপর। অন্যদিকে ফল আমাদের দরিদ্র জনগাষ্ঠীর নাগালের বাইরে। তাই বেশী পরিমাণ ফল উৎপাদন করে পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব। একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থতার জন্য প্রতিদিন ১২০ গ্রাম করে ফল খাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা খাই মাত্র ৩৫-৩৮ গ্রাম, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

আবার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটি দেশের শতকরা ২৫% ঘন বনাঞ্চল তথা উদ্ভিজ্জ আচ্ছাদন থাকা প্রয়াজন। অথচ আমাদের প্রকৃত উদ্ভিজ্জ আচ্ছাদন মাত্র ৮.৫% যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং জাতীয় চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বনভূমি বা কৃষি জমি বাড়ার যেখানে কোনো সম্ভাবনা নেই, সেখানে ফলদ ও বনজ গাছের সাথে কৃষি উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের মিশ্র চাষের দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। প্রচলিত চাষ বিন্যাস রূপান্তরের মাধ্যমে বহুস্তর বিশিষ্ট ফল বাগান করে একক জমিতে ফলন বাড়ানোর বিকল্প নেই।

মিশ্র বাগান কী ?

মুলত মিশ্র বাগান হচ্ছে একই জমিতে বিভিন্ন চাষযোগ্য বৃক্ষ, বিরুৎ ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতির ৩-৪ তর বিশিষ্ট বৃক্ষ রাজী সহযোগে গঠিত উদ্ভিদগুলোর একটি নিবিড় সহাবস্থান।

মিশ্র ফল বাগানের সুবিধা

এ ধরনের বাগান পদ্ধতিতে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশের মতো ভূমি স্বল্পতার দেশে এ পদ্ধতির বাগান কৃষিতে এক যুগান্তকারী উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। ভূমি ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন-আলো, মাটির পুষ্টি উপাদান, পানি ইত্যাদির সর্বাধিক ব্যবহার এ পদ্ধতিতে সম্ভব। এ ধরনের বাগান পদ্ধতিতে চাষকৃত বিভিন্ন উদ্ভিদ খাড়াভাবে বিভিন্ন স্তর থেকে সূর্যালোক গ্রহণ করে। যে পরিমাণ সুর্যের আলো পৃথিবীতে আসে তার ২০-৩০ ভাগ ব্যবহার করে উপরের স্তর অর্থাৎ বৃক্ষ, ২০-৪০ ভাগ ব্যবহার করে মধ্য স্তর অর্থাৎ বিরুৎ এবং সর্ব নিম্ন স্তরে থাকে ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ যা বাকি ২০-৩০ ভাগ সূর্যের আলো গ্রহণ করে।

অন্যদিকে গাছের মূলতন্ত্র মাটির বিভিন্ন গভীরতা থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে যেমন, ছায়া প্রদানকারী উদ্ভিদ মাটির ওপরের স্তর থেকে পুষ্টি নেয়, মধ্যম সতরের উদ্ভিদ মাটির আরো নিচে এবং ওপরের স্তরের উদ্ভিদ মাটির আরো গভীর থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে। এতে করে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষা হয়।

মিশ্র ফল বাগান পদ্ধতি আর্থিকভাবে কৃষকের জন্য ঝুঁকিমুক্ত। কেননা, কোনো কারণে কৃষক এক স্তরের ফসলপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলেও অপর স্তর থেকে ফলন পায়। এছাড়াও বছরব্যাপি এ ধরনের বাগান থেকে ফল সংগ্রহের মাধ্যমে অর্থ পাওয়া সম্ভব। কেননা একই জমিতে বিভিন্ন ফসল থাকায় বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তা সংগ্রহ ও প্রয়োজনে বিক্রয় করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিজ্জ বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণ করা সম্ভব। একই জমিতে বছরের প্রায় সব সময়ই বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিজ্জের উপস্থিতি ফসল চাষে বহুমুখিতার পাশাপাশি ফসল তথা উদ্ভিদের বৈচিত্র্যতা রক্ষায় সহায়ক হয়।

নিবিড় চাষ করা হয় বিধায় বসতবাড়ির মহিলারা বা বেকার যুবকরা উৎপাদন কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে। এতে করে বেকার সমস্যা দূরীকরণের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও এ ধরনের বাগান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

২০২২

বাংলাদেশের জন্য বহুস্তরবিশিষ্ট মিশ্র ফল বাগানের কাঠামো

ভূমি সংলগ্ন লতাপাতা সমৃদ্ধ নিম্নস্তর,

বৃক্ষসমৃদ্ধ উচ্চতর এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্তর নিয়েই বসতবাড়ীর বহুস্তর বাগান। নিম্নস্তরটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে ১মি. এর কম উচ্চতা বিশিষ্ট সর্বনিম্নভরে আনারস, তরমুজ এবং ১-৩ মি. উচ্চতায় কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে। ওপরের স্তরটির দুটি ভাগে ভাগ করে ২৫ মি. বেশি উচ্চতায় সুউচ্চ কাঠ ও ফলদ বৃক্ষ যেমন- আম, কাঁঠাল, নারিকেল এবং ১০-১২ মি. উচ্চতায় মাঝারি উচ্চতার ফল যেমন- বামন আকৃতির আম, লিচ, সফেদা ইত্যাদি উদ্ভিদ লাগানো যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি ফল বাগানে কি ধরনের মিশ্র ফসল করা যায় সেগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করা হলোঃ

১। ক) অধিক সুয্যালোক পছন্দকারী - কলা, পেঁপে, পেয়ারা, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি।

খ) মাঝারী সূর্যালোক পছন্দকারী- লেবু, আনারস, ডালিম, পেয়ারা, জামরুল, জামবুরা, করমচা স্ট্রবেরি, মিষ্টিআলু শাক, কলমিশাক ইত্যাদি।

গ) কম সুর্যালাকে পছন্দকারী লটকন, ইত্যাদি। বাগানে নতুন অবস্থায় উপরোক্ত বিষয় বিচেনা করে কয়েক বছর সূর্যালোক ও মাঝারি সূর্যালোক পছন্দকারী ফসল মিশ্র সাথী ফসল হিসেবে সফলভাবে জন্মানো যায়। পরবর্তীতে ফলগাছ লাগানোর জমিতে ছায়া পড়ে গেলে কম সূর্যালোকে জন্মাতে পারে এমন ফসল চাষ করা উচিত।

২। ক) দীর্ঘমেয়াদি মূল জাতীয় ফসলের সাথে স্বল্পমেয়াদি সাথী ফসল কোন কোন ক্ষেত্রে জন্মানো যায়। যেমন— আম, কাঁঠাল, লিচু এবং জামের সাথে ডালিম, জামরুল পেঁপে ইত্যাদি চাষ করা যায়।

খ) গভীর মূল জাতীয় ফসলের সাথে অগভীর মূল জাতীয় ফসল নির্বাচন করতে হবে। যেমন—

i) আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদির সাথে কলা, আনারস পেঁপে ইত্যাদি।

ii) কলা, পেঁপে, ডালিম, পেয়ারা, শরিফা, আতা, জামরুল, লেবু ইত্যাদির সাথে তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি।

iii) দীর্ঘমেয়াদী বা বহুবর্ষজীবী ফসলের সাথে ১-৩ বর্ষজীবি ফসল নির্বাচন করতে হবে। যেমন— আম, জাম, কাঁঠাল লিচু ইত্যাদির সাথে কলা, পেঁপে, আনারস, ষ্ট্রেরি, বেগুন ইত্যাদি।

iv) সাথি ফসল যাতে এ ধান ফসলের ফুল ও ফল ধারণ, ফল বড় হতে বা ফলের গুণগত মানে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। সে বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

v) সাথী ফসল কোন সময় প্রধান ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় গেলে সাথে সাথে সাথী ফসল কেটে দিতে হবে।

মিশ্র বহুস্তরবিশিষ্ট বাগানের জন্য উদ্ভিদ/ফসল নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ক্ষেত্রের নিম্লোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

- বাগানে গাছ লাগানোর জন্য ছায়া পছন্দকারী বা ছায়াসহকারী উদ্ভিদ ফসল হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।
- নির্বাচিত বিভিন্ন ফসল/উদ্ভিদের সমম্বয় এমন হতে হবে যেন ফসল উৎপাদন চক্র এবং মাত্রা সারা বছর নিয়মিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারে। আবহাওয়া ও জলবায়ুগত কারণে বছরের কোন কোন সময় ফসল সংগ্রহের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে; কিন্তু প্রাত্যহিক কিছু না কিছু উৎপাদন যেন অব্যাহত থাকে। অর্থাৎ বছরের প্রায় সবসময়ই যেন ফলন এবং উপজাত হিসেবে জ্বালানি ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায়।
- বাগানে উৎপাদিত সামগ্রী কৃষকের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে এবং অতিরিক্ত আয়, দৈবাৎ কৃষি ফসল হানিতে ও দুফসলের মধ্যবর্তী সময়ে কৃষককে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবে। পারিবারিক সদস্যদের ন্যূনতম শ্রমের মাধ্যমেই বাগানে গাছের পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ করা যায় তা নিশ্চিত হতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। স্বল্পমেয়াদি ফল গাছ কত দিন ফল দিয়ে থাকে ?

২। ষড়ভুজ পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা কত শতাংশ গাছ বেশি লাগানো যায় ?

৩। মিশ্র বাগানের সুবিধা কী ?

৪। সাথী ফসল কী ?

৫। কন্টুর বা ঢাল এবং সিড়ি বাঁধ পদ্ধতিতে কিভাবে চারা রোপণ করা হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাগানের নকশা কত ধরনের ?

২। কুইনকাংশ পদ্ধতিতে প্রতিটি বর্গের মাঝে লাগানো গাছকে কী বলে?

৩। ষড়ভুজী পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতির চেয়ে কত ভাগ বেশি গাছ লাগানো যায় ?

৪। ফল বাগানের পরিকল্পনার জন্য কি কি বিষয় বিবেচনা করা দরকার, তা লিপিবদ্ধ কর।

৫। বর্গাকার পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা লেখ।

৬। মিশ্র ফল বাগান বলতে কি বোঝায়?

৭। ফল বাগানের জন্য কেন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল বাগান পরিকল্পনার নীতিমালা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২। ফল গাছ লাগানোর নকশাগুলোর নাম লেখ। চারা রোপণের জন্য নকশা প্রণয়নে করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। ফল বাগানে গাছ রোপণ প্রণালির গুরুত্ব কী ? ফল বাগানে বিভিন্ন গাছ রোপণ প্রণালি বর্ণনা কর।

৪। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মিশ্র ফল বাগান তৈরির পরিকল্পনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

ফল গাছ রোপণের জন্য জমি তৈরি, গর্ত খনন ও সার প্রয়োগ

জমি প্রস্তুতকরণ

ফল চাষের জন্য জমি তৈরি করা অন্যতম কাজ। স্থান নির্বাচনের কাজ শেষ হলে নির্বাচিত স্থানের ভূমিকে নকশা করার উপযোগী করে তৈরি করে নিতে হয়। এ উদ্দেশে নিচু জমি ভরাট করা, মাটি সমতল করা, সুবিধাজনক ভাবে প্লট তৈরি করা, সেচ নিকাশের জন্য নালা, বাগানের অভ্যন্তরীন রাস্তা ও গার্ডসেড ইত্যাদির জন্য স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন। জমির বন্ধুরতা ও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী এসব কাজ এমনভাবে করতে হবে যেন পরবর্তীকালে বাগানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সহজ ও কম ব্যয়বহুল হয় এবং মূল্যবান জমি নষ্ট না হয়। জঙ্গল ঘেরা জমিকে কলা বাগানে পরিণত করতে হলে প্রথমে সমস্ত জঙ্গল ও অপ্রয়োজনীয় গাছ শেকড়সহ উপড়ে ফেলে মাটিকে সমান করে সুবিধাজনকভাবে প্লটে বিভক্ত করে নিতে হবে। পতিত জমি হলে প্রয়োজনানুসারে প্লট আকারে তৈরি করে নিতে হবে। স্বল্প মেয়াদি ফল যেমন কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ইত্যাদির জন্য ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি ফসলের ক্ষেত্রে জমি গভীরভাবে চাষ দিতে হবে। পাহাড়ী এলাকায় ভূমি ক্ষয়ের ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং ক্ষয়রোধ করার জন্য মাটি তেমন ওলট পালট না করেই বাগান তৈরি করতে হবে। ভালোভাবে জমি চাষের ফলে অনেক বিষাক্ত পদার্থ অপসারিত হয়। এতে করে চারা লাগানোর পর সহজে চারা রোপণজনিত ধকল সহ্য করে বেড়ে উঠতে পারে।

সারণি - ক

গাছের আকৃতি অনুযায়ী চারা বসানোর গর্তের মাপ নিম্নে দেয়া হলো

গাছের আকৃতি	চারা বসানোর গর্তের মাপ
১। বড় গাছ (আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু ইত্যাদি)	৯০×৯০×৯০ সে. মি.
২। মাঝারী গাছ (পেয়ারা, আতা, ডালিম, লেবু ইত্যাদি	৬০×৬০×৬০ সে. মি.
৩। ছোট গাছ (কলা, পেঁপে, তরমুজ, ফুটি, ইত্যাদি)	৫০×৫০×৫০ সে. মি.
৪। খুব ছোট গাছ (আনারস, স্ট্রবেরী, শরীফা ইত্যাদি)	৫০×৫০×৫০ সে. মি.

ফল গাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরীর কৌশল

বাগানে কাঙ্খিত পরিমাণ ফলন পেতে হলে চারা রোপণের জন্য গর্ত করা এবং গর্তে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা অপরিহার্য। চারাগাছ লাগানোর সময় পরিমিত আকারের গর্ত খনন করা আবশ্যক। তবে গর্তের আকার নির্ভর করে চারার আকার ও গাছের প্রজাতির উপর। ফল গাছের চারা রোপণের জন্য অন্তত পক্ষে ৩টি কাজ করা আবশ্যক। যথা—

(ক) সঠিক সময় ও সঠিক মাপে গর্ত খনন

(খ) গর্তে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ ও

(গ) গাছের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক চারা রোপণ ও পরিচর্যা

ক) গর্ত খনন: চারা রোপণের জন্য গর্ত খননের গভীরতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত আছে। গর্ত বর্গাকার ও অগভীর হলে চারার শেকড় কুণ্ডলী পাকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তবে যতদূর সম্ভব গর্ত যথেষ্ঠ গভীর ও চওড়া হওয়া বাঞ্চনীয়। চারা অবস্থায় শেকড় দুর্বল থাকে তাই গর্তের চারিপাশের শক্ত মাটিভেদ করে সহজে খাদ্য ও রস সংগ্রহ করতে পারে না। গর্তের আকার বড় করে এবং উপরের মাটি নিচে দিয়ে গর্ত ভর্তি

করে দিতে হয় । এতে দুর্বল ও নরম মুল সমূহ নরম মাটি হতে সহজে রস নিয়ে তাড়াতাড়ি বড় হতে পারে । অনুর্বর মাটিতে এই পদ্ধতি অনুশীলন অত্যন্ত ফলপ্রসু । শুষ্ক ও বৃষ্টিপাতহীন অঞ্চলের মাটিতে শক্ত ও অপ্রবেশ্য স্তর থাকে । এক্ষেত্রে শক্তিশালী যন্ত্র ব্যবহার করে শক্তস্তর ভেঙ্গে দিয়ে ভালভাবে গাছ জন্মানো যায় ।

বৃক্ষ জাতীয় গাছের জন্য ৫ ফুট ব্যাস ও ৪ ফুট গভীর করে গর্ত করা যায় । গর্ত খননের পর উপরের মাটি নিচে দিয়ে গর্ত পুরণ করতে হয় । এতে গাছের শেকড় খুব ভালভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে । বড় গর্তে রোপণকৃত গাছের শিকড় ১ বৎসরে ৭.৫ ফুট গভীরে এবং পাশে ৬ ফিট পর্যন্ত ছড়াতে পারে । অথচ ছোট গর্তে রোপণকৃত গাছের শেকড় ১ বৎসর ২ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ।

চারা রোপণের জন্য এক সপ্তাহ হতে প্রায় একমাস পূর্বে গর্ত খননে অনেকক্ষেত্রেই তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে । বেশি আগে গর্ত খনন করে রাখলে গর্তের পাশের ও তলদেশের মাটি শক্ত হয়ে যায় । এরূপ ক্ষেত্রে চারা রোপণের আগে পুনরায় গর্ত খনন করে নিতে হয় ।

অনুর্বর মাটিতে গর্তের উপরের মাটির সাথে সার মিশিয়ে নিচে দিয়ে গর্ত ভরাট করা হলে গাছের তেজ বেশি হয় । কিন্তু চারার গোড়ার চারপাশে যদি নিয়মিত সারযুক্ত মাটি প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে গাছের বৃদ্ধি আস্তে আস্তে কমে যায় ।

ফল গাছ রোপণের জন্য জাত ভেদে গর্ত করার সময়

বর্ষাকাল অর্থাৎ মে থেকে জুলাই মাস জাত ভেদে সকল ধরনের চারা লাগানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময় । চারা লাগানোর পর এ সময় সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না । বর্ষা বেশী হলে বর্ষার পরও চারা লাগানো যেতে পারে । মেঘলা দিনে বা বিকেলের দিকে চারা লাগানো ভালো । পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে বসন্তের প্রথমেও চারা লাগান যায় । জাতভেদে সকল ধরনের ফল গাছ রোপনের জন্য বর্ষার আগে অর্থাৎ বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ত করা উত্তম । গাছের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ এবং শেকড়ের বৃদ্ধির জন্য গাছ রোপণের আগে গর্ত করা একান্ত প্রয়োজন । ভিন্ন ভিন্ন গাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুরত্বের এবং আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে । সাধারণত কোন গাছের জন্য কী আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে, তা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে । যথা—

ক) গাছের আকৃতি

খ) শেকড়ের গভীরতা

গ) শেকড়ের বিস্তৃতি

ঘ) চাষের মেয়াদকাল

ঙ) গাছের খাবারের চাহিদা ইত্যাদির ওপর

গাছের আকার, মৌসুম ও মাটি ভেদে গর্তের আকার ও আয়তন

জমি তৈরি সম্পন্ন হলে রোপণ প্রণালী নির্বাচিত করে নির্দিষ্ট দুরত্বে গাছ লাগান উচিত । গাছ লাগানোর জন্য নির্বাচিত স্থানে গর্ত করা উচিত । গর্ত তৈরির জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে ।

গর্ত তৈরির ধাপ: গর্ত তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন- কোদাল, বেলচা, খুন্তি ইত্যাদি আগেই যোগাড় করতে হবে ।

১) জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিতে হবে । মাপ দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে ।

২০২২

২) চারা রোপণের ২০-৩০ দিন আগে গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে পরিমাণ মত সার দিয়ে মাটি ভরাট করে দিতে হবে। গর্তের মাটি এমনভাবে চেপে দেয়া দরকার যাতে মাটি আলগা না থাকে।

৩) যে সব জায়গায় উইপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে সেখানে উইপোকা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। নারিকেল গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে এটি খেয়াল রাখা উচিত।

৪) গাছের আকৃতি বিবেচনা করে গর্তের ব্যাস ও গভীরতা নির্ণয় করতে হবে। যেমন—

(ক) ছোট আকারের গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে ৫০ সে:মি: এবং গভীরতা হবে ৫০ সে:মি: (খ) মাঝারি আকারের গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে ৬০ থেকে ৭৫ সেমি এবং গভীরতা হবে ৬০-৭৫ সেমি (গ) বড় বা বৃক্ষ জাতীয় গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে প্রায় ১ মিটার এবং গভীরতা হবে প্রায় ১ মিটার।

ছক: গাছের আকৃতি অনুযায়ী চারা লাগানোর গর্তের মাপ ও চারার দুরত্ব

গাছের আকৃতি	চারা লাগানোর গর্তের মাপ	একটি চারা থেকে আরেকটি চারার দূরত	গর্ত খনন বা রোপনের মৌসুম
(ক) বড় বা বৃক্ষজাতীয় গাছ (আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, বেল তেঁতুল ইত্যাদি)	১ মিটার ব্যাস ও মিটার গভীর বা ৯০×৯০ সে:মি:	৭-৮ মিটার	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত
(খ) মাঝারি গাছ (পেয়ারা, আতা, শরিফা, সফেদা, লেবু, ডালিম, পীচ, জামরুল, জাম্বুরা, অরবরই ইত্যাদি)	৬০ সে:মি: মিটার ব্যাস ও ৬০ সে:মি: গভীর বা ৭৫×৭৫ সে:মি:	৪ মিটার	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত
(গ) ছোট গাছ (কলা, পেঁপে, সুপারি ইত্যাদি)	৫০ সে:মি: ব্যাস ও ৫০ সে:মি: গভীর	২ মিটার	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে
(ঘ) খুব ছোট (আনারস, স্ট্রবেরী ইত্যাদি)	১৫ সে:মি: ব্যাস ও ১৫ সে:মি: গভীর	৩০ সে:মি:	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে

মাটির বুনট বুঝে গর্তের আকার কম বা বেশি করা যেতে পারে। যেমন- বেলে দোঁআশ মাটির জন্য গর্তের আকার কিছুটা ছোট করা যেতে পারে। কেননা বেলে মাটিতে গর্ত বড় করা হলে চারপাশের পাড় ভেঙ্গে গর্ত ভরাট হয়ে যেতে পারে। আবার এটেল বা এটেল দোআশ মাটির জন্য গর্তের আকার কিছুটা বড় করা যেতে পারে। বৃক্ষ শ্রেণির গাছের জন্য ৫ ফুট ব্যাস ও ৪ ফুট গভীরতাবিশিষ্ট গর্ত খনন করা যেতে পারে। বড় গর্তে রোপণকৃত চারার শেকড় ১ বছরে ৭.৫ ফুট গভীরে এবং পাশে ৬ ফুট পর্যন্ত ছড়াতে পারে। অথচ ছোট গর্তে রোপণকৃত গাছের শেকড় ১ বছরে ২ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ ছোট গর্তের চারিদিকের শক্ত মাটির স্তর থাকে।

(৫) গর্ত খনন করার সময় গর্তের খননকৃত মাটি ছড়িয়ে রেখে শুকায়ে নেয়া ভাল। গর্তের উপরিভাগে ১৫ সে:মি: বা তিনভাগের দুইভাগ মাটি একদিকে রাখতে হবে। অনুরূপভাবে গর্তের নিচের দিকের তিনভাগের একভাগ মাটি অন্য দিকে রাখতে হবে। গর্তের উপরের দিকের মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে থাকে।

২০২২

(৬) গর্তের উপরের মাটির সাথে প্রয়োজনীয় সার মেশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি নিচে দিতে হবে। আর নিচের অংশের আলাদা করে রাখা মাটি গর্তের উপরিভাগে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি বেশি উর্বর। উপরের মাটি নিচে দিলে গাছ দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান তাড়াতাড়ি পাবে।

গর্তে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা

ফল গাছে সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্য গাছের চেয়ে ফল গাছে মাটি হতে প্রচুর খাদ্য ও পুষ্টি টেনে নেয় এবং এই পুষ্টি ক্রমাগত কমার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। ফলে মাটির উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলশ্রুতিতে ফলন কমে যায়।

সব গাছের সমান পরিমাণ খাবার লাগেনা । আবার গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরিমাণ পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর ফল গাছের সারের মাত্রা নির্ভর করে।

১। ফল গাছের ধরন	২। গাছের আকার ও বয়স	৩। ফলের জাত
৪। গাছের বৃদ্ধির স্বভাব	৫। গাছের বৃদ্ধির পর্যায়	৬। আবহাওয়া
৭। উৎপাদন মৌসুম	৮। মাটির প্রকৃতি এবং উর্বরতা শক্তি	৯। সার ব্যবহার পদ্ধতি
১০। চাষাবাদ পদ্ধতি	১১। সেচ ব্যবস্থাপনা	১২। জমির ফসল বিন্যাস

সার ব্যবহারে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং ফলের উৎপাদন বেড়ে যায় কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে ত্রুটিপূর্ণ সার ব্যবহারের ফলে গাছের ক্ষতিও হতে পারে। অসময়ে গাছে সার ব্যবহার করলে গাছের ফল ধারণ ব্যাহত হতে পারে। তাই সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে ও পরিমাণে সার ব্যবহার করা উচিত।

গর্তে সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

গাছের (ছোট বা বড়) আকৃতির ওপর নির্ভর করে ছকে (ছক-১) বর্ণিত ও অন্যান্য নিয়ম মোতাবেক গোবর বা কম্পাস্টে সার , হাড়ের গুড়া বা টিএসপি সার, ছাই বা এমপি সার মাটির সাথে মেশাতে হবে।

চারার উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য গর্তে সময়মত সার ব্যবহারের ফলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় এবং ফল ধরার পরিমাণ বেড়ে যায়। এছাড়া অসময়ে সার ব্যহার করা হলে সারের অপচয় হয় এবং গাছের ফল ধারণে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করার পর মাটি শুকনা থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে। এর কমপক্ষে ১০-১২ দিন পর গাছ লাগাতে হয়। কেননা সার প্রয়োগের পর পর চারা লাগানো হলে রাসায়নিক সারের বিক্রিয়ায় চারা মারা যেতে পারে। রাসায়নিক সার গর্তের নিচের ৩০ সেমি. মাটির সাথে মিশানো উত্তম। গাছের আকার বিবেচনা করে হাড়ের গুড়ার পরিবর্তে তার অর্ধেক পরিমাণ টিএসপি এবং ছাই-এর পরিবর্তে প্রতি কেজি ছাই এর জন্য ১০০ গ্রাম এমপি সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছক: গাছের আকৃতির ওপর নির্ভর করে

গাছের আকৃতি	গর্তে সারের পরিমাণ (কেজি)		
	গোবর	হাড় গুড়া	লাকড়ি কাঠের ছাই
বড় গাছ	২০-৪০	১	১
মাঝারি গাছ	১৫	১১.৫	১
ছোট গাছ	১০	১.৫	১.৫
খুব ছোট গাছ	৫	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম

২০২২

সার মিশ্রিত মাটি গর্তে দেয়ার পর পা দিয়ে মাটি চেপে দিতে হবে। কেননা বৃষ্টিপাত বা সেচ দেয়ার পর গর্তের মাটি নিচু হয়ে গেলে পানি জমে চারার ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত চারা রোপণের পূর্বে গর্তে যে পরিমাণ সার দেয়া হয় তার অর্ধেক পরিমাণ সার বর্ষার শুরুতে একবার এবং বর্ষার শেষে বাকী অর্ধেক দিতে হবে। পরবর্তীতে চারার বৃদ্ধির সাথে সাথে বৎসরওয়ারী সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এভাবে চারা লাগানোর পর হতে ফলবান হওয়া পর্যন্ত যত্ন নিতে হবে, যাতে গাছ সুস্থ সবল ও সতেজ থাকে। সার প্রয়োগের সময় চারার একেবারে গোড়ায় সার দেয়া উচিত নয়। চারা বা ছোট গাছের ক্ষেত্রে চারার গোড়া হতে কমপক্ষে ০.৫ মিটার ও বড় গাছের ক্ষেত্রে ১ মিটার দূর দিয়ে সার ব্যবহার করতে হবে। তবে সাধারণভাবে চারার পাতা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ঠিক ততদুর পর্যন্ত দূর দিয়ে সার দিতে হবে। কারণ পাতার বিস্তৃতির সাথে সাথে শেকড়ের বিস্তৃতির একটা সম্পর্ক আছে। শুধু মাটির উপর সার দিলে সারের অপচয় হবে। তাই দুপুর বেলায় যতদূর গাছের ছায়া পড়ে ততদূর দিয়ে বৃত্তাকারে দাগ দিয়ে নিয়ে সেটুকু স্থানের মাটি আলগা করতে হবে। মাটি আলগা করার সময় কোদাল বা খুরপি ব্যবহার করতে হবে। চারার চারিদিকে বৃত্তাকারভাবে ঘুরে ঘুরে মাটি আলগা করা প্রয়োজন। এতে চারার শেকড় কম কাটার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া স্থানে স্থানে গর্ত করে বা চিকন নালা কেটেও সার প্রয়োগ করা যায়। সার দেয়ার পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গর্ত বা নালা করা হলে তা সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। সার দেয়ার পর হালকা পানি দেয়া উচিত। তাহলে সার থেকে খাদ্য উপাদান গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারবে। সার

ছক: চারা লাগানোর পর থেকে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত গাছ প্রতি জৈব সারের পরিমাণ (কেজিতে)

গাছের আকৃতি	রোপণের একবছর পর গোবর সার	প্রতিবছর বাড়াতে হবে গোবর সার	১৫ বছর পর গোবর সার
বড় গাছ	১০	১০	১৫
মাঝারি গাছ	৫	৭	২০
ছোট গাছ	৫	-	-
খুব ছোট গাছ	২	-	-

ছক: চারা লাগানোর পর থেকে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত গাছ প্রতি রাসায়নিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)

গাছের আকৃতি	গাছ লাগানোর ৪ মাস পর			১ বছর পর প্রয়োগ করতে হবে			প্রতি বছর প্রয়োগ করতে হবে			১৫ বছর পর প্রয়োগ করতে হবে		
	ইউ	টিএসপি	এমপি	ইউ	টিএসপি	এমপি	ইউ	টিএসপি	এমপি	ইউ	টিএসপি	এমপি
১। বড় গাছ	১২৫	৫০	১২	১২৫	৫০	১২৫	১২৫	৫০	১২৫	৪৫০	৫০০	১০০০
	১০০	৪০	১০	১০০	৪০	১০০	১০০	৪০	১০০	৩৪০	২৫০	৫০০
১। ছোট গাছ	৬০	২৫	৬০	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ইউ= ইউরিয়া, টিএসপি = ট্রিপল সুপার ফসফেট, এমপি =মিউরিয়েট অব পটাশ

রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে টিএসপি'র পরিবর্তে হাড়ের গুড়া সার এবং এমপি'র পরিবর্তে ছাই ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে টিএসপি সার যে পরিমাণ ব্যবহার করা হয় তার দ্বিগুণ পরিমাণ হাড়ের গুড়া সার ব্যবহার করতে হবে। আর এমপি সার যে পরিমাণ ব্যহার করা হয় তার আটগুণ পরিমাণ ছাই ব্যবহার করতে হবে। সারের মোট পরিমাণকে দু'ভাগে ভাগ করে একভাগ গ্রীষ্মের শুরুতে এবং আর একভাগ বর্ষার শেষে প্রয়োগ করা ভালো।

ফল গাছের জন্য সার (দীর্ঘমেয়াদি ফল গাছের জন্য)

সারের নাম	গর্তে সারের পরিমাণ	বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ	১০ বছরে অধিক বৎসের জন্য
পচা গোবর	১০ কেজি	১০ কেজি	১০০ কেজি
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম
টিএসপি	২৫০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	২ কেজি
এমপি/ছাই	১০০ গ্রাম/১ কেজি	৫০ গ্রাম/৫০০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম/৬ কেজি
হাড়ের গুড়া	৫০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৪ কেজি

উৎস: ফুল ফল ও শাকসবজী - কামাল উদ্দিন আহমেদ

সারের মোট পরিমাণকে দুভাগ করে এক ভাগ বর্ষার শুরুতে ও অপর ভাগ বর্ষার শেষে মাটিতে প্রয়োগ করতে হয়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিত প্রশ্ন

১। বড় গাছ রোপণের গর্তের মাপ কত ?

২। গর্তের আকার কিসের উপর নির্ভর করে ?

৩। চারা বা ছোট গাছের ক্ষেত্রে চারার গোড়া হতে কমপক্ষে কত দূর দিয়ে সার ব্যবহার করতে হয় ?

৪। ফল গাছে কখন সেচ দিতে হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল গাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।

২। গাছ রোপণের জন্য জাতভেদে গর্ত করার সময় উল্লেখ কর।

৩। গর্তে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৪। গাছ রোপণের জন্য জাতভেদে গর্তের আকার কিরূপ হওয়া উচিত।

৫। নিম্নলিখিত আকৃতির গাছ রোপণের জন্য গর্তের আকার লেখ। বড়, মাঝারি , ছোট ও খুব ছোট।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।

২। জমিতে গাছ লাগানোর জন্য গর্তকরণ ও সার প্রয়োগ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। গাছের আকার, মৌসুমে ও মাটি ভেদে গর্তের আকার ও আয়তন সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

৪। গর্তে সার প্রয়োগের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২০২২

পঞ্চম অধ্যায়

ফল গাছের অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

জমিতে বা বাগানে চারা রোপণের পর হতে ফল সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও ফল ধারনের জন্য যে সমত পরিচর্যা এবং সেই সাথে স্থায়ী গাছের জন্য একবার ফল ধরা পর্যন্ত যে সমস্ত পরিচর্যা করা হয় সেগুলোকে অন্তবর্তীকালীন বা আন্তপরিচর্যা বলে ।

ফলচাষে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যার ধাপ ফল বাগানে বিভিন্ন অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্ষণ, আগাছা দমন, শূন্যস্থান পূরণ, মালচিং, পানিসেচ ও নিষ্কাশন, সার প্রয়োগ, মাচা দেয়া, অঙ্গা ছাঁটাই, সাথী ফসলের চাষ, ভূমিক্ষয় রোধ, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন ইত্যাদি । নিম্নে বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো-

১) আন্তকর্ষণ বা ইন্টার টিলেজ (Inter-tillage)

আগাছা দমন ও জমিতে রস সংরক্ষণের জন্য বর্ষার আগে এবং বর্ষার শেষে আঁচড়া বা কোদাল ইত্যাদির সাহায্যে ফল গাছের চারদিকে কুপিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা হয় । এতে করে মাটির অভ্যন্তরে অনায়াসে পানি ও বায়ু চলাচল করতে পারে। আকর্ষণের ফলে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী জীব ও জীবাণুসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও গাছের খাদ্যোপাদান আহরণে সুবিধা হয় । যথারীতি/নিয়মিত আন্তকর্ষণ সম্পন্ন করলে মাটির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষতিকর আগাছা থেকে জমি মুক্ত থাকে ।

২) শূন্যস্থান পূরণ

জমিতে চারা রোপণের পর অনেক সময় বিভিন্ন কারণে ফলগাছের চারা মারা যায় এবং শূন্য স্থানের সৃষ্টি করে । এতে একদিকে যেমন বাগানের সৌন্দর্য হানি হয় অন্যদিকে জমির অপচয় হয় এবং গাছের সংখ্যা কমে গিয়ে বাগানের ফলন কমে যায় । তাই যথাসম্ভব শূন্যস্থানে একই জাতের ও সমবয়সের চারা রোপণ করা উচিত ।

৩) মালচিং

মালচিং-এর বাংলা অর্থ আচ্ছাদন দেয়া । মাটির রস সংরক্ষণ এবং আগাছা দমনের জন্য মালচিং খুবই উপকারী । কচুরীপানা, করাতের গুড়া, চিটাধান, গাছের শুকনা পাতা, খড় ইত্যাদি মালচিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয় ।

৪) পানি সেচ ও নিষ্কাশন

গাছের বৃদ্ধি ও ফল ধারনের জন্য পানি অত্যাবশ্যক । অগভীরমুলী ফলের বাগানে শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি । অনেক ফল গাছ আবার জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না । বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বিধায়, গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে থাকে সেজন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা খুবই জরুরি । ফল গাছের জন্য প্রয়োজনে সেচের ব্যবস্থা করা এবং জমে থাকা পানি সরানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ।

৫) সার প্রয়োগ

বাগান হতে ভালো ফলন পেতে হলে ফল গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ দরকার । কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকরা ফল বাগানে সার প্রয়োগে অনীহা প্রকাশ করে থাকেন । এ জন্য বাগানে ফলনও অনেক কম হয়ে থাকে । গাছের বয়স, আকার, মাটির উর্বরতা, উৎপাদন মৌসুম, গাছের প্রজাতি ইত্যাদির উপর সার প্রয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে । ফল গাছে নির্ধারিত মাত্রায় দু'বার সার প্রয়োগ করতে হয় । গ্রীষ্মের শুরুতে এবং বর্ষার শেষে ফল গাছে সার প্রয়োগ করা আবশ্যক ।

৬) বাউনি বা মাচা দেয়া

লতানো প্রকৃতির ফল যেমন - আঙ্গুর ও প্যাশন ফ্রুট গাছ ভালোভাবে বেড়ে উঠার জন্য বাঁশ, কঞ্চি, পাটকাঠি বা সম্ভব হলে তার দিয়ে মাচা করে দিতে হয়। সময়মত বাউনি না দিলে এসব গাছের বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না বিধায় ফলনও কমে যায়।

ফল বাগানে আগাছা দমনের উপকারিতা

কৃষি খামার স্থাপনের উদ্দেশ্য হলো অধিকতর উৎপাদান। কিছু রোগ ও কীটপতঙ্গের ন্যায় আগাছা ও উদ্যান মাঠ ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে উৎপাদন ব্যাহত করে। প্রাথমিকভাবে আগাছাজনিত কারণে ফসলের যে ক্ষতি হয় তা বোঝা না গেলেও সামগ্রিকভাবে কীটপতঙ্গ ও রোগজনিত কারণের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি এদের দ্বারা হয়। আসলে আগাছা ফসল উৎপাদনকারীদের জন্য অবাঞ্চিত বা অনাকাংক্ষিত গাছ। বাংলাদেশে আগাছার জন্য মাঠ ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন ২৫ শতাংশ পর্যন্ত কম হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। অতএব, মাঠ ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে ক্ষতিকর আগাছা শনাক্ত করে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে। আগাছা ফসলের মারাত্মক শত্রু। আগাছা জায়গা দখলসহ খাদ্য উপাদান, পানি, সূর্যরশ্মি এবং বাতাসের জন্য ফল গাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। সুতরাং প্রথম হতে এদের শনাক্ত করে ধ্বংসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্বল্প মেয়াদী ফলগাছের জন্য আগাছা দমন একটি অন্যতম করণীয় কাজ। দীর্ঘমেয়াদি ফলের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় আগাছা দমনের প্রয়োজন হলেও পরবর্তীতে তা খুব দরকার হয় । কারণ আগাছা পরবর্তীতে দীর্ঘ মেয়াদী ফল গাছের সাথে পালা দিয়ে টিকে থাকতে পারে না।

তবে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ফল বাগানে প্রাথমিক অবস্থায় আগাছা দমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গাছের বাড়ন্ত সময়ে আগাছা ফল গাছের জন্য প্রদত্ত সার ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান, সূর্য রশ্মি ও বাতাসের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই সময় আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিয়ে আন্ত চাষের মাধ্যমে আগাছাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে এগুলো পরবর্তীতে পঁচে জৈব পদার্থ হিসেবে মাটির সাথে মিশে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করে। আগাছা শুধুমাত্র ফসলের উৎপাদন বা ফলনহ কমায় না বরং ফসলের গুণাগুণও মারাত্মকভাবে হ্রাস করে।

দীর্ঘ মেয়াদী বাগানের জন্য রোপণকৃত ফল গাছের প্রাথমিক দিকে আগাছা খাদ্যে ভাগ বসায়। এ জন্য গাছ রোপণের পরবর্তী পর্যায় থেকে শুরু করে প্রতি বছর বর্ষার প্রারম্ভে এবং বর্ষার শেষে ফল বাগানের আন্ত চাষের মাধ্যমে আগাছা দমনের ব্যবস্থা নিতে হয়। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি, বিকাশ ও মানসম্মত ফলনের জন্য ফল বাগানে গাছের গোড়া সব সময় আগাছা মুক্ত রাখা উচিত। চারার গাড়ার চারদিকে অন্তত এক মিটার পরিধির মধ্যে যেন কোন আগাছা না জন্মে সেদিকে খেয়াল রেখে নিয়মিত নিড়ানি দিতে হয়। মাটির মধ্যে বায়ু যেন ঠিকমত চলাচল করতে পারে এ জন্য ১২-১৫ সে:মি: গভীর করে চারধারের মাটি নিড়ানী দিয়ে আলগা রাখতে হয়। বছরে ২-৩ বার বয়স্ক বা ফলন্ত গাছের গোড়ার চারিদিক কয়েক মিটার পর্যন্ত (সাধারণত দুপুর বেলা যে পরিমাণ এলাকায় ছায়া পড়ে) ১২-১৫ সে:মি: গভীর করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা রাখা প্রয়োজন। খেয়াল রাখতে হবে মাটি কুপানারে সময় যেন গাছের শেকড় বেশি কাটা না পড়ে।

ফল গাছে প্রুনিং-এর প্রয়োজনীয়তা

গাছের অপ্রয়োজনীয় কোন অংশকে কেটে সরানোকে সাধারণভাবে ছাঁটাইকরণ বা প্রুনিং বলা হয়। প্রধানত: দুটি উদ্দেশে গাছের অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। যথা—গাছের কাঠামো গঠন এবং ফুল ও ফলের সংখ্যা ও গুণগত মানের উন্নতি সাধন। বোঝার সুবিধার্থে গাছের কাঠামো গঠনের উদ্দেশে ছাঁটাইকরণকে ট্রেনিং (Training)

২০২২

নামে অভিহিত করা হয়। অপরপক্ষে ফুল ও ফলের গুণগত মানের জন্য ছাঁটাইকরণকে প্রনিং (Pruning) বলা হয়।

প্রুনিং-এর সময় (Time of pruning)

গাছের সুপ্তাবস্থা (dormant period) অঙ্গ ছাঁটাই-এর জন্য উপযুক্ত সময়। গাছ বৃদ্ধির সময় ছাঁটাই পরিহার করা উচিত। পত্রপতনশীল গাছের বেলায় পাতা পড়ে যাওয়ার পরই ছাঁটাই করা যেতে পারে। আবার কুঁড়ি বের হওয়ার অনেক আগেই ছাটাই-এর কাজ সারা চাই। বেল, আঙ্গুর, শরীফা, কামরাঙ্গা, আমড়া প্রভৃতি ফল গাছের জন্য শীতকাল ছাঁটাইয়ের উপযুক্ত সময়। চির সবুজ (evergreen) গাছের বেলায় ফল সংগ্রহের পর পরই ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। কুল, কাঁঠাল, আম, লিচু, পেয়ারা, প্রভৃতি ফল গাছের জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

কোন গাছের জন্য কিরূপ ছাঁটাই

কম বয়স্ক ও যে সমস্ত গাছে ফলোৎপাদন শুরু হয় নাই সে সমস্ত গাছের জন্য এবং কমবয়সী ফলোৎপাদনকারী গাছের বেলায় হালকা ছাঁটাই প্রয়োজন। পুরাতন গাছের ক্ষেত্রে সারা গাছ জুড়ে অধিক সংখ্যক ছাঁটাই করা প্রয়োজন। মৃত ও রোগাক্রান্ত শাখা দ্রুত ছাটাই করা উচিত। অতি পুরাতন এবং কম ফল ধরে এমন গাছে কখন কখনও ও নির্দয়ভাবে বড় রকমের ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। কুল গাছের সকল শাখা প্রশাখা কেটে দেয়া হয়। কাঁঠাল গাছের কিছু কিছু ছোট শাখা এবং ফলের বোঁটার নিম্নস্থ শাখা কাটা হয়। লিচু গাছের শাখা ছাঁটাই হয়ে যায় শাখাসহ ফল সংগ্রহের কারণে। আম, পেয়ারা, লিচু, কমলা, কামরাঙ্গা, বেল, শরীফা, আতা, আমড়া, জাম প্রভৃতির প্রয়োজন মত শাখা ছাঁটাই করা যেতে পারে।

ফল গাছের অঙ্গ ছাঁটাই

বেশির ভাগ বৃক্ষ জাতীয় ফল গাছের চারা অবস্থায় কিছু কিছু অঙ্গ ছাঁটাই করা হলে চাহিদা মোতাবেক গাছের আকৃতি সুগঠিত ও সুন্দর করা যেতে পারে। কলমের চারার ক্ষেত্রে অঙ্গ ছাঁটাই বিশেষভাবে উপকারী। অনেক সময় বয়স্ক গাছের অঙ্গও ছাঁটাই করা প্রয়োজন পড়ে। যেমন— কুল, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল গাছ-এর উপযুক্ত উদাহরণ। মুলত অঙ্গ ছাঁটাই বলতে গাছের অপ্রয়োজনীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ বড় হলে সমস্যা হতে পারে কেটে বাদ দেয়াকে বোঝায়। অঙ্গ ছাঁটাই করা হলে গাছের ফলন বাড়ে এবং গাছটি সুন্দর দেখায়। ছাটায়ের সময় চারার/গাছের ছোট ছোট অংশ/ডালপালা ছেটে ছোট করে দেয়া হয়। কোন গাছের একই সাইজের দুটো ডালের-মধ্যে যদি একটি অপেক্ষা আরেকটি বেশি ছাঁটাই করা যায় তাহলে বেশি ছাঁটাই করা ডালটি কম বাড়বে। গাছের আকৃতি সুন্দর ও ফল বেশি হওয়ার জন্য অনেক সময় ডালপালা ছাঁটাই করে কমিয়ে দেয়া হয়। ছাঁটাই-এর সাথে ফল উৎপাদনের পরিমাণের সরাসরি সংযোগ আছে। অনেক ফলবতী গাছ বেশি ছাঁটাই করা হলে দীর্ঘদিন ধরে ফলন কম হবে। তাই গাছ বিশেষে সতর্কতার সাথে সঠিকভাবে ছাঁটাই করতে হবে। লতানো গাছে ফলন বৃদ্ধি ও সঠিক আকার দেয়ার জন্য ছাঁটাই অপরিহার্য। আঙ্গুরের মত লতানো ফল গাছকে ছোট মাচায় দিলে বেশি ফলন দেয়। এছাড়া অনেক সময় বড় গাছের মাথা হেঁটে ছোট করে রাখলে ফল পাড়তে, যত্ন নিতে ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যার সুবিধা হয়। কিছু কিছু চারা গাছ লাগানোর পর প্রধান কাণ্ড বা ডগা তাড়াতাড়ি বেড়ে লম্বা হয় এবং ডালপালা কম হয় বা আদৌ হয় না। এসব ক্ষেত্রে প্রধান কাণ্ড বা ডগা কেটে দিলে ডালপালা গজায়ে ঝাকড়া হয়, যা ফলন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। গাছের ভারসাম্য রক্ষার জন্য চারদিকে সম দূরত্বে তিন থেকে পাঁচটি ডাল রাখলে ভালো হয়। বড় গাছের ভেতরে ছোট ছোট এবং গাছের ভিতর বাতাস ও রোদ চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করে। গাছের কাণ্ড মজবুত করা এবং ফলন বাড়ানোর জন্য চারা লাগানোর দুই/তিন বছরের মধ্যে প্রধান কাণ্ডের সাথে গাছের ডালের বিন্যাস ঠিক করে হেঁটে দিতে হয়।

২০২২

যেমন— রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডাল সব সময় হেঁটে দিতে হয়। কেননা রোগাক্রান্ত ডাল থেকে সব সময় রোগ ছাড়ানারে সম্ভাবনা থাকে।

মূল ছাঁটাই (Root Pruning)

ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দ্যেশে মূল ছাঁটাই একটি কার্যকর ব্যবস্থা। এর ফলাফল সচরাচর শাখা ছাঁটাইয়ের বিপরীতে হয়ে থাকে। গাছের গোড়া হতে কিছু দূরে অর্থাৎ গাছের আকার অনুযায়ী ৩ হতে ১০ ফুট দুরে নালা খনন করে সেখানকার সকল মূল কেটে দেয়া মুল ছাঁটাই-এর একটি পদ্ধতি। নালাটি গাছের চার পাশ দিয়ে সম্পূর্ণ চক্রাকারে, অর্ধচন্দ্রাকারে, এক চতুর্থাংশ চক্রাকারে প্রভৃতি বিভিন্ন পরিধি বা দৈর্ঘ্যের হতে পারে। গাছ হতে কিছু দূরে গর্ত করলে কিছুটা মূল ছাটাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। আবার সারা বাগান বা মাঠ জুড়ে লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষ করলেও মুল ছাঁটাই হয়ে যায়। যেসব গাছের অঙ্গ অধিক বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ভালোভাবে ফলবতী হয় না তাদের মূল ছাঁটাই ফলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মূল ছাঁটাই করলে গাছে নাইট্রোজেন সরবরাহের পরিমাণ কমে যায়, ফলে গাছের মধ্যস্থিত নাইট্রোজেনও কার্বোহাইড্রেটের অনুপাত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং ফুল ও ফল উৎপাদনে সহায়তা করে।

পাতা ছাঁটাই (Pruning of leaves)

হাপর হতে চারা স্থানান্তরিত করে রোপণের সময় চারার অনেক মূল নষ্ট হয়ে যায়, তাতে গাছে পানি সরবরাহের পরিমাণ কমে যায়। অথচ গাছের উপরিভাগের পাতার মাধ্যমে আগের মত প্রবেদন ক্রিয়া চলতে থাকে। ফলে গাছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির অভাব দেখা দেয় এবং পানির অভাব অতিরিক্ত হলে গাছ মরে যায়। এ জন্য হাপর হতে চারা উঠিয়ে কিংবা উঠানোর ঠিক আগেই কিছু পাতা হেঁটে দিলে গাছ বাঁচানো সহজ হয়।

ফুল ও ফল পাতলাকরণ (Thining of flower and fruit)

গাছে অতিরিক্ত সংখ্যক ফুল এলে তাদের কিছু কিছু ভেঙে দেয়া যেতে পারে। তাতে অপর ফুল সমূহের ফলে পরিণত হতে সুবিধা হয়। অতি ছোট গাছে ফুল আসলে ফুলকে ফলে পরিণত হতে না দিয়ে ভেঙে দিলে ফলের দরুণ গাছ দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গাছে অনেক সময় অতিরিক্ত ফুল ধরলে ফলের আকার ও গুণগত মান কমে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে ফল ছিড়ে পাতলা করে দিলে অবশিষ্ট ফল আকারে বড় হয় এবং তাদের গুণাগুণ ঠিকমত প্রকাশ পায়। আবার ফল বেশি পাতলা করে দিলে গাছের খাদ্যসামগ্রী তথা কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ ব্যয় না হওয়ার দরুণ পরের বৎসর ফল ধরার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রুনিং (Pruning) সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য

ছাঁটাই এমনভাবে করা উচিত যাতে কাটা অংশটি ভূমির সমান্তরাল না হয়ে যথাসম্ভব ভূমির সাথে খাড়াভাবে হয়। তা হলে এ স্থানে সূর্যের কিরণ দ্বারা ফেটে যাওয়ার এবং বৃষ্টির পানি জমে রোগ ও কীটের উপদ্রবের সম্ভাবনা কমবে। কুঁড়ির ঠিক উপরের দিকে কাটলে ভাল হয়। এতে করে কুঁড়ি হতে নতুন শাখা বের হওয়ার সুবিধা হবে। এমনভাবে কাটতে হবে যাতে কাটার নিম্নাংশ কুঁড়ির দিকে এসে ওটার বিপরীত দিকে থাকে। দেড় ইঞ্চি অপেক্ষা কম ব্যাস বিশিষ্ট শাখার কাটা স্থানে কোন প্রলেপ না দিলেও চলে। দেড় ইঞ্চির অধিক ব্যাস বিশিষ্ট শাখার জন্য সাধারণ পেইন্ট, বোর্দাপেষ্ট ইত্যাদির প্রলেপ দেয়া যেতে পারে।

ফল গাছের পোকা ও রোগ বালাই দমন

বাংলাদেশের মাটি এবং উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ফল উৎপাদনের উপযোগী। তেমনি ভাবে এখানকার জলবায়ু নানা প্রকার রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রবের অনুকূল। পোকা মাকড় ও রোগ বালাই ফসলের মারাত্মক শত্রু। তাদের আক্রমণে বাগানের সমপূর্ণ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ জন্য সঠিক সময়ে ফল ও ফল গাছকে ক্ষতিকর পোকামাকড়, রোগ বালাই ও নানাবিধ প্রতিকূল পরিবেশগত অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পোকা মাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে ঢালাওভাবে পোকা মাকড় ধ্বংস করা উচিত নয়। কেননা ফল বা ফল গাছের অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের সাথে অনেক উপকারী পোকাও থাকে। এরা ফুলের পরাগায়নে সাহায্য করে এবং অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া খেয়ে অনেক উপকার করে থাকে। ফলে বা ফল গাছে পোকা মাকড় ও রোগ বালাই আক্রমণের পূর্বে সর্তকতামুলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কেননা আক্রমণের পর দমন করা অপেক্ষা আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা উচিত।

এ জন্য সময়মত জমি চাষ, আগাছা দমন, পরিমাণ মত সার ব্যবহার, পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভালো জাত নির্বাচন করে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে রোপণ করে সুস্থ গাছ জন্মাতে হবে। গাছ দৈহিকভাবে দুর্বল হলে নানা প্রকার পোকামাকড় ও রোগ বালাই এর আক্রমণ বেশি হতে পারে। তাই মান সম্মত ফল উৎপাদনের জন্য সঠিক সময়ে পোকা মাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ফল বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা, ফল গাছ হতে পরজীবি উদ্ভিদ অপসারণ, মরা ডাল, পাতা ইত্যাদি অপসারণ এবং পোকা মাকড় ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিত প্রশ্ন

১। ফল বাগানে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা কখন করা যায়।

২। আন্তঃকর্ষণের উপকারীতা কী ?

৩। ফল বাগানে শূন্যস্থানে কী রকম চারা লাগানো উচিত ?

৪। প্রুনিং কখন করতে হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যার সংজ্ঞা লেখ।

২। প্রনিং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৩। ফুল ও ফল গাছের পোকা ও রোগ বালাই দমন সম্পর্কে লেখ।

৪। ফল গাছে প্রনিং-এর সময় উল্লেখ কর।

৫। মূল ছাঁটাই-এর উপকারিতা বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল চাষে অন্তর্বর্তী পরিচর্যার ধাপগুলোর বর্ণনা কর।

২। প্রুনিং-এর পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা কর।

৩। ফল বাগানে আগাছা দমনের উপকারিতা বর্ণনা কর।

৪। ফল ও ফল গাছের পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।

২০২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফল গাছে সেচ ও নিষ্কাশন

ফসল উৎপাদন ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় সেচ ও নিষ্কাশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিপূর্ণ বিকাশ ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পানি কৃত্রিম উপায়ে মাটিতে সরবরাহ করাকে সেচ বলে। অপরদিকে মাটি থেকে কৃত্রিম উপায়ে অতিরিক্ত পানি ও লবণকে অপসারণ করাকেই নিষ্কাশন বলে। সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা মুলত দুটি পারস্পরিক এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতির পরিপুরক। স্থায়ী ও নির্ভরযাগ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম পূর্ব শর্ত হচ্ছে সেচ ও নিষ্কাশন মানব সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ যখন চাষাবাদ শুরু করে তখনই সেচ ও নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে।

ফল গাছে পানি সেচের গুরুত্ব

পানি মৃত্তিকাস্থ খাদ্যোপাদানসমূহকে দ্রবীভূত করে গাছের বিভিন্ন অংগে সঞ্চালন, অংগার (Carbon) আত্মকরণ, শস্যের সজীবতা, প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সরবরাহ প্রভৃতি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটিতে পর্যাপ্ত রসের অভাব হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত অধিক হলেও এটি বার মাস সমভাবে বিস্তৃত নয়। ফলে আষাঢ় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অতিবৃষ্টি আর কার্তিক হতে জ্যেষ্ঠ মাস পর্যন্ত অনাবৃষ্টির কারণে ফল গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। উদ্ভিদের জন্য পানি একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। যখনই পানির অভাব ঘটে তখনই উদ্ভিদে নানারূপ বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ সময় পানির অভাব হলে গাছ মারা যেতে পারে। মাটিতে যখন গাছের জন্য প্রয়োজনীয় পানি (মাটির রস) সহজ লভ্য অবস্থায় থাকে না তখন কৃত্রিম উপায়ে গাছে পানি সরবরাহ করা হয়। গাছে কখন কিভাবে কতটুকু সেচ দিতে হবে তা বিভিন্ন অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যেমন- আবহাওয়া, মাটির বুনট, গাছের প্রকৃতি, গাছের বৃদ্ধির পর্যায়, বাড়ন্ত ফুল ও ফল অবস্থায়, বয়স্ক গাছ ইত্যাদি।

ফল গাছের জন্য পানি সেচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফল গাছ লাগানোর পর দ্রুত বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে নিয়মিত সেচ দিতে হয়। ফলধারী গাছে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দেয়া উচিত। বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে ফল গাছ রাপেণে অল্প ক্ষতি হলেও দীর্ঘ সময় অনাবৃষ্টিতে গাছের প্রচুর ক্ষতি হয়। অগভীর মূলবিশিষ্ট গাছের জন্য শুষ্ক মৌসুমে পানি দেয়া বা সেচ আবশ্যক। যেমন- নারিকেল, সুপারী, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, আতা, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদি। অপরদিকে গভীর ও অগভীর মূল বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক ফল গাছ আছে যেগুলো স্বল্পদিন অনাবৃষ্টিতে তেমন ক্ষতি হয় না। এমনকি জলাবদ্ধতায়ও তেমন কোন অসুবিধা হয় না। যেমন— আম, জাম, গাব, ডেওয়া, চালতা, তাল, খেজুর, লিচু ইত্যাদি।

ফল গাছে পানি নিষ্কাশনের গুরত্ব

জমিতে যেমন পানি সেচ দেওয়া দরকার তেমনি প্রয়োজন অতিরিক্ত পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা। গাছপালা সুন্দরভাবে জন্মানোর জন্য গাছের গোড়া বা শেকড় অঞ্চল হতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়া হলো নিষ্কাশন। পানি জমে থাকলে জলাবদ্ধতা হয়। এতে গাছের প্রয়োজনীয় উপাদান প্রাপ্তিতে নানাবিধ সমস্যা হয়। এমনকি জলাবদ্ধতায় অনেক গাছ মারা যায়। তাই গাছ জন্মানোর জন্য নিকাশন অপরিহার্য।

২০২২

কোন কোন ফল গাছ যেমন কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, কলা ইত্যাদি পানির প্রতি বেশি সংবেদনশীল অর্থাৎ এসব গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছের খুব ক্ষতি হয়। এমন কি গাছ মারা যেতে পারে। যেমন— কাঁঠাল গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছ মারা যায়। তাই কাঁঠাল বাগানে কোন গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে তা জরুরি ভাবে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সুন্দরভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য বাগানের চারদিকে নিষ্কাশন নালা থাকা আবশ্যক যেন সেচের অতিরিক্ত পানি বা অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে অতিরিক্ত পানি অনায়াসে বের হয়ে যেতে পারে। নিষ্কাশন নালা খাল বা জলাশয়ের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

মাটিতে পানির অভাব হলে যেমন গাছ পালা বাড়তে পারে না। আবার জমি হতে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত পানি বের করে না দিলেও গাছপালা বাড়তে পারে না।

ফল গাছে পানি সেচের সময় ও পানির পরিমাণ

জমিতে বা ফলের বাগানে কখন সেচ দিতে হবে এবং কী পরিমাণ সেচ দিতে হবে এ দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সেচের পানি প্রদানের লক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে-

* শস্যের পানির আবশ্যকতা (Crop water requirement)
* সেচ পানির প্রাপ্যতা (Water availability)
* শেকড় অঞ্চলে মৃত্তিকার পানি ধারন ক্ষমতা (Water holding capacity)
* সেচ ব্যবস্থাপনা।

উলেখিত বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, আবহাওয়া, সেচের পানির উৎস ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উপাত্ত ও তথ্যাদির প্রয়োজন। মৃত্তিকার যে সব তথ্যাদি বিশেষ ভাবে জানা ও বিশেষণ আবশ্যক সেগুলো হচ্ছে মাটির বুনট, গভীরতা, সংযুক্তি, লবণাক্ততা বা ক্ষারত্ব, বায়বীয়তা, নিষ্কাশন, অনুপ্রবেশ, অনুস্রবণ, চুয়ানো, ভূগর্ভস্থ পানি তলের গভীরতা এবং পানি ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি।

উদ্ভিদ সম্পর্কিত জরুরি তথ্যাদি হচ্ছে ফসলের প্রকার, শেকড়ের বৈশিষ্ট্য, বর্ধনের সময় বিভিন্ন ধাপে পানির ব্যবহার, মৃত্তিকায় পানি স্বল্পতার কারণে উদ্ভিদের যে ধাপ সর্বাধিক ক্ষতিগত হয় ইত্যাদি।

আবহাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে চাষাবাদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি বীজ বপন অথবা চারা রোপণের তারিখ, গাছের ঘনত্ব, সারির দূরত্ব, সার ব্যবহার, আগাছা অথবা পাকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

উদ্ভিদের ক্ষরা সহনীয়তা বলতে বোঝায় মৃত্তিকাস্থ শেকড় অঞ্চলে যে পরিমাণ সঞ্চিত পানি (%) গাছ ব্যবহার করলে গাছের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। অধিকাংশ ফসলের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, গাছ মৃত্তিকায় সঞ্চিত পানির ৫০% ব্যবহার করার পরে যদি সেচ দেয়া হয় তাহলে ফসল উৎপাদনের মাত্রা কমে যায় না। এ ক্ষেত্রে সেচকে বলা হয় মৃত্তিকাস্থ প্রাপ্য পানির ৫০% কমতিতে সেচ প্রদান। কোন কোন ফসলের ক্ষেত্রে ৭৫% পানি কমতিতে ও ফসলের উৎপাদনের ক্ষতি হয় না। তবে ৫০% মাত্রাকেই সাধারণ সেচের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তিনটি প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সেচের সময় ও পরিমাণ নির্বাচন করা যায় যথা—

ক) মৃত্তিকা সম্পর্কিত

খ) উদ্ভিদ সম্পর্কিত

২০২২ গ) আবহাওয়া সম্পর্কিত

ক) মৃত্তিকা সম্পর্কিত

এ পদ্ধতিতে প্রধানত মাটিতে পানির প্রাপ্যতা মাপা হয়। জমি থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহের সময় মনে রাখতে হবে যেন এই নমুনা যে জমি থেকে মাটি নেয়া হবে মোটামুটিভাবে সেই জমির মাটির প্রতিনিধিত্ব মূলক হয়। এক্ষেত্রে অনুভব পদ্ধতি এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাটিতে পানির প্রাপ্যতা নির্ধারণ করা যায়।

১। অনুভব পদ্ধতি (Feel Method) - এ পদ্ধতিতে মৃত্তিকার অবস্থা দেখে এবং স্পর্শ করে মৃত্তিকার পানির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা হয়। মৃত্তিকার পানি ধারন বা রসের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ফসল ভেদে ৩০-১০০ সে:মি: নিচ থেকে অথবা সংশিষ্ট ফসলের শেকড়ের গভীরতার ৬০-৭০% নিচ থেকে মাটি খুঁড়ে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা থেকে এক মুঠো মাটি হাতের মুঠিতে চেপে বল বানানো হয় এবং স্পর্শের অনুভূতি ও অবস্থা সারণি-১ প্রদত্ত অবস্থার সাথে তুলনা করে পানি সেচের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা যায়।

সারণি-১ হাতের সাহায্যে মৃত্তিকার পানির পরিমাণ পদ্ধতি ও সেচের সময় নির্ধারণ

মৃক্তিরসের পরিমাণ (পানিধারন ক্ষমতার অংশ %	সূক্ষ্ম বুনটের মৃত্তিকা (এটেঁল মৃত্তিকা, পলি এটেঁল প্রভৃতি)		মধ্যম থেকে মোটা বুনটের মৃত্তিকা	
	মৃত্তিকা অবস্থা	করণীয় ব্যবস্থা	মৃত্তিকা অবস্থা	করণীয় ব্যবস্থা
০-২৫	খুব শুষ্ক	অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে	খুব শুষ্ক	অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
২৬-৫০	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বেঁধে যায় এবং চাপ দেয়ার সাথে সাথে গুড়ো গড়ো হয়ে যায়।	অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে না	অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
৫১-৭৫	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে শক্ত ও কিছুটা আঠালো দলা বাধে এবং ফেলে দিলে ভাঙ্গে না।	২-৩ দিন পর সেচ দিলেও চলে	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে, ফেলে দিলে দলা ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যায়।	১-২ দিন পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
৭৬-১০০	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে এবং তালু ভিজে যায়, কিন্তু রস বের করে না ফেলে দিলে দলা ভাঙ্গে না।	২-৩ দিন পর সেচ দিতে হবে	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে পানি বের হয়না ফেলে দিলে দলা ভাঙ্গে যায়।	২-৩ দিন পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
১০০	কাদা মাটি হাতের মুঠোয় চাপ দিলে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে মাটি বের হয়ে আসে।	সেচ দিতে হবে না। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে ভেজা দলা বাধে। তালু ভিজে যায়,কিন্তু পানি বের হয়ে আসে না	সেচ দিতে হবে না। ৭দিন পর পুনঃ মাটি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

২০২২

খ। উদ্ভিদ সম্পর্কিত পদ্ধতি

উদ্ভিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেও সেচের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। যখন মৃত্তিকাস্থ পানির পরিমাণ কমে যায় তখন গাছের পাতার রং বদলে যেতে পারে (যেমন— সবুজ থেকে হলুদ বর্ণ ধারণ), পাতা কুঁকড়িয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও গাছের বৃদ্ধির হার কমে যেতে পারে। কোন উদ্ভিদের এ জাতীয় উপসর্গ সেচের আবশ্যকতা নির্দেশ করে। তবে এই পদ্ধতির সমস্যা এই যে, এ সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয়ার বেশ আগেই গাছ অতিরিক্ত পানি পীড়নের শিকার হয়, ফলে গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়।

গ। আবহাওয়া সম্পর্কিত পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে আবহাওয়ার বিভিন্ন দিক যেমন- বৃষ্টিপাত, সোলার রেডিয়েশন, তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বাষ্পীভবন ইত্যাদি মাপা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ নির্ণয় করা হয়। বাষ্পীয় প্রস্বেদন, বৃষ্টিপাত, অনুপ্রবেশ, চুয়ানোসহ অন্যান্য অপচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে সেচের আবশ্যকতা ও সময় নির্ধারণ করা যায়।

সেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা

জমিতে সেচের পানি বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যায়। ফসলের পানির প্রয়োজনীয়তা, পানির উৎস ও প্রাপ্যতা, পানির গুণাগুণ, মাটির প্রকার, জমির অবস্থান, চাষাবাদের ধরন ইত্যাদির ভিত্তিতে সেচের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। আধুনিক সেচ পদ্ধতিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায় যথা—

১। ভূ - উপরিস্থ (Surface)
২। ভূ - মধ্যস্ত (Sub-surface)
৩। স্প্রিংকলার (Sprinkler)
৪। ট্রিকল (Trickle)

১। ভূ - উপরিস্থ সেচ পদ্ধতি (Surface irrigation system)

এ পদ্ধতিতে পানি সরাসরি জমিতে দেয়া হয় ও সেচের পানি জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এক্ষেত্রে জমিতে কয়েক সে:মি: পানি দিয়ে প্লাবিত করা হয়। পানির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জমিকে প্রথমে মসৃন এবং পরে জমিতে বর্ডার (পাড় বা কিনার) ফারো (লাঙলের ফলার গভীর দাগ), করোগেশন (ঢেউ খেলানে আকৃতি) ইত্যাদি তৈরি করা হয়। ভূ -উপরিস্থ সেচ পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। অনিয়ন্ত্রিত পাবন পদ্ধতি (Uncontrolled flooding)

২। নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি (controlled flooding)। এ পদ্ধতি আবার ৩ প্রকার। যেমন— ক) বর্ডার স্ট্রিপ (Border Strip)

খ) চেক প্লাবন (Check flooding)

গ) বেসিন (Basin)

৩। ফারো পদ্ধতি (Furrow Method)। এ পদ্ধতি আবার ২ প্রকার। যেমন—

ক) ফারো (Furrow)

খ) করোগেশন (Corrugation)

১। অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি (Uncontrolled flooding)

যখন নালা থেকে পানি কোন রকম বাঁধ অথবা ডাইক অথবা অন্য কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই জমিতে দেয়া হয় তখন তাকে অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি বলে। যেখানে অত্যন্ত সস্তায় প্রচুর পরিমাণে সেচের পানি পাওয়া যায় সেখানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

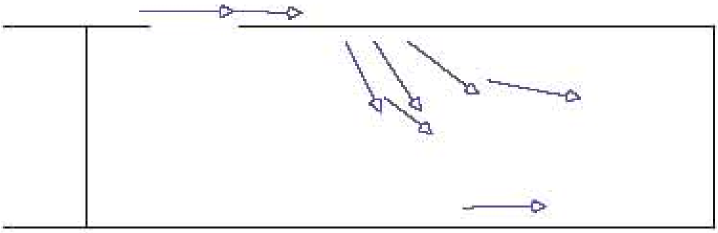

চিত্রঃ অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি সুবিধা

সুবিধা

- কম শ্রমিক দ্বারা অল্প সময়ে বেশি জমি ভেজানো যায়
- এতে কোন বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না।
- জমি সমতল বা একদিকে সামান্য ঢাল করে নিলেই হয়।

অসুবিধা

- সেচের পানির প্রায় ৮০ ভাগই অপচয় হয়
- ভূমিক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- জমি সমতল করা প্রয়োজন হয়
- সেচের সময় তদারকির দরকার হয়

২। নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতিঃ এ পদ্ধতিতে মুক্ত প্লাবনের পানিকে নিয়ন্ত্রণ বা বাধ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবাহিত করা হয়।

ক) বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতি (Border strip)

এ পদ্ধতিতে মাঠকে অনেক গুলো খণ্ড বা ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই খণ্ডগুলো সাধারণত ১০-২০ মিঃ প্রশস্ত ও ১০০-৪০০ মিটার লম্বা হয়। একটি খণ্ড থেকে অন্য খণ্ড নিচু বাধ দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয়। সরবরাহ নালা থেকে পানি এই খণ্ডসমূহে সরবরাহ করা হয়। পানি নিচের দিকে প্রবাহিত যে সমস্ত খণ্ডের জমিকেই ভিজিয়ে দেয়। প্রতিটি খণ্ডে আলাদাভাবে সেচের পানি দেয়া হয়। সব ধরনের মৃত্তিকাতেই এই পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যায়।

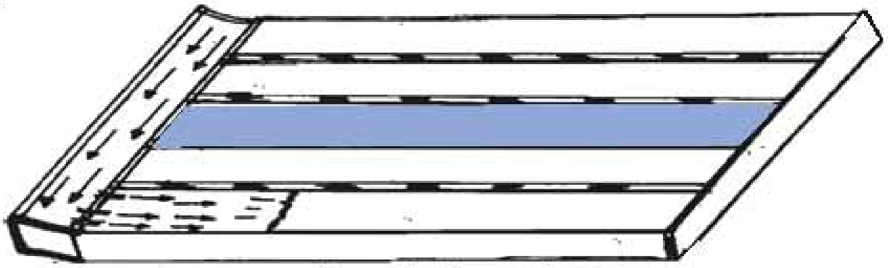

চিত্রঃ বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতি

খ. চেক প্লাবন পদ্ধতি (Check Flooding) এ পদ্ধতিতে চারদিকে নিচু বাঁধ দ্বারা ঘেরা তুলনামূলক সমতল জমিতে বেশি পানি দেয়া হয়। অত্যন্ত পরিশোষক মৃত্তিকার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশি উপযোগী। এছাড়াও ভারি মৃত্তিকা যেখানে পানির হার কম সেখানেও এ পদ্ধতি কার্যকর। বস্তুত এই পদ্ধতি বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতির একটি রূপান্তর।

গ) বেসিন পদ্ধতি

নিচু বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত সমতল জমিতে দ্রুত পানি দেয়া হয় এবং জমি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত পানি ধরে রাখা হয়। ধান চাষের জন্য এ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও ফল বাগানে সেচ প্রদানের জন্য এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। একটি বেসিনের আওতায় ১ থেকে ৫ অথবা বেশি পরিমাণ সেচ দেয়া হয়।

সুবিধা

- পানির অপচয় বেশি হতে পারে না।
- যে বাগানে যতটুকু পানি প্রয়োজন সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।
- জমির অবস্থান বিবেচনা করে সমস্ত জমি সমতল করার প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা

- জমিতে অনেক আইল করার কারণে জমির অপচয় হয়।
- শ্রমিক খরচ বেশি।
- আংশিক ভূমি ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে।
- বাঁধ যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য সার্বক্ষণিক তদারকি এর জন্য শ্রমিক রাখা প্রয়োজন হয়।

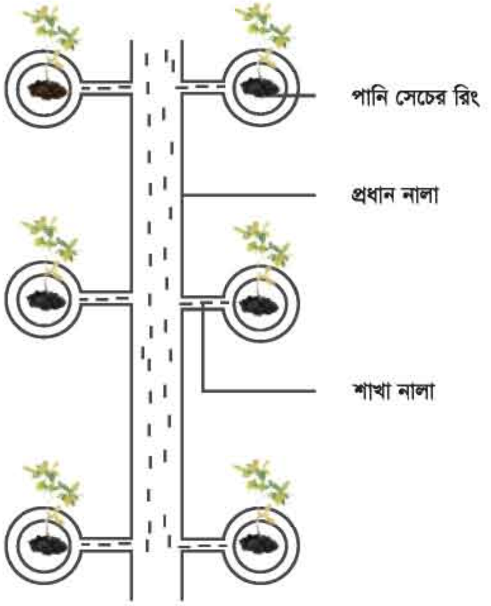

২০২২

চিত্রঃ বেসিন পদ্ধতি

৩। ফারো পধতি

ফারো পদ্ধতি দু ধরনের যথা ফারো ও করোগেশন

ক) ফারো: ফারো পদ্ধতিতে শস্য/গাছের সারির মধ্যবর্তী ফারোতে (ছোট নালা) পানি সরবরাহ করা হয়। নালা গুলো সাধারণত প্রায় সমুন্নত ভূমি অথবা জমির ঢাল অনুযায়ী করা হয়। যে সমস্ত শস্য সারিবদ্ধ ভাবে চাষ করা হয় তাদের জন্য এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

খ) করোগেশন: এটি ফারো পদ্ধতিরই একটি রূপান্তরিত অবস্থা। এ পদ্ধতিতে পানি ছোট নালায় দেয়া হয় এবং এই নালাগুলো সমস্ত মাঠ জুড়ে নির্মাণ করা হয়। পানি এই নালার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং চুইয়ে দুই নালার মধ্যবর্তি এলাকাতে সেচ প্রদান করে।

সুবিধা

- ভারি মাটিতে পানির অপচয় কম হয়, যেহেতু সমস্ত জমিতে ভাসানো সেচ দিতে হয় না
- ভূমির ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই

অসুবিধা

- সর্তকতার সাথে নালা তৈরি করতে হয়
- হালকা মাটি হলে পানি চুয়ায়ে বেশি ক্ষতি হয়
- হালকা মাটিতে নালার পাড় ভেঙ্গে নালা বন্ধ হয়ে যায়

২। ভূ - মধ্যস্থ সেচ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে মাটির বুনট এবং ফসলের শেকড়ের গভীরতার ভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠের নিচে পানি প্রবাহিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় পানি শেকড় অঞ্চলে পৌঁছায়। গভীর নালা, মাটিতে প্রোথিত সিমেন্ট বা ধাতু নির্মিত ছিদ্র যুক্ত পাইপ, টাইল, ড্রেন ইত্যাদির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের নিচে গাছের শেকড় অঞ্চলে পানি সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে ভূ-অভ্যন্তরে এমন একটি কৃত্রিম পানির তল তৈরি করা হয় যেখানে গাছ প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করতে পারে।

চিত্র: ভূ - মধ্যস্থ সেচ পদ্ধতি

সুবিধা

- পানির অপচয় হয় না
- মাটি শক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না
- ভূমি ক্ষয় হয় না
- ভূমি নষ্ট হয় না

অসুবিধা

- নল বা পাইপ বসানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন,
- নল বা পাইপ বসানোর জন্য শ্রমিক বেশি লাগে, খরচ বেশি,
- গাছের শেকড় বা মাটি দ্বারা পাইপের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩। স্প্রিংকলার বা ছিটানো পদ্ধতি/সিঞ্চন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে পানি পাইপ ও স্পিংকলার নজল-এর মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং তা বৃষ্টির মতই মাটিতে পড়ে। এ পদ্ধতি প্রায় সব রকম ফসল ও মৃত্তিকার জন্যই উপযোগী।

সুবিধা

- পাহাড়ি বা অসমতল জমিতে এ পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি উপযোগী
- পানির অপচয় কম হয় এবং সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- সার ও কীটনাশক এ পানিতে মিশিয়ে দেয়া যায়

অসুবিধা

- পাইপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির খরচ বেশি
- সেচের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন
- জোরে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় সেচ দেয়া যায় না

৪। ট্রিকল বা ড্রিপ পদ্ধতি

এটি ড্রিপ পদ্ধতি হিসেবেও পরিচিত। এ পদ্ধতিতে ছোট ব্যাসযুক্ত পাইপের একটি বিস্তারিত নেটওয়ার্ক থাকে। যার দ্বারা পানি সরাসরি গাছের গোড়ায় ফোটায় ফোটায় দেয়া হয়। এই পদ্ধতি ফল বাগান ও গ্রীন হাউসের জন্য বিশেষ উপযোগী।

সুবিধা

- তুলনামূলক ভাবে পানি কম লাগে।
- প্রতিটি গাছের গোড়ায় সঠিক ও সম পরিমাণ সেচ দেয়া যায়।
- বেলে মাটি ও অসমতল পাহাড়ি জমিতে সেচ দিতে বিশেষ উপযোগী।
- শ্রমিক খরচ ও আগাছার প্রকোপ কম হয়।

অসুবিধা

- সব এলাকায় সেচ দেয়া সুবিধাজনক নয়
- স্থাপন বেশ ঝামেলাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল
- পানির নল ও পানি নিঃসরক প্রায়ই বন্ধ হতে পারে
- খুবই পরিষ্কার পানির দরকার
- পানির প্রবাহ অবিরাম পর্যবেক্ষণ করতে হয়

২০২২

নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি: নিষ্কাশন নালা বা নর্দমার মাধ্যমে ফসলের শেকড় অঞ্চল থেকে অপ্রয়াজনীয় বা অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়াকে নিষ্কাশন বলে। নিষ্কাশন নালা প্রধানত দুধরনের হয় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। কার্য পদ্ধতি অনুসারে নিস্কাশন নালা তিন প্রকার। যথা -

(১) ভূ -- পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Surface)

(২) ভূ নিম্নস্থ নিষ্কাশন নালা (Sub -- Surface or tile)

(৩) সম্মিলিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-নিম্নস্থ নিষ্কাশন নালা (Combinaton of surface and sub- surface drains)

(১) ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা

যে সমতল জমিতে উপরিস্তরের গভীরতা কম এবং ভূ-পৃষ্ঠের অল্প নিচেই অপ্রবেশ্য স্তর যেমন- লাঙল তল, শক্ততল বা এটেল মাটির স্তর রয়েছে সে সব জমির জন্য ভূ-পৃষ্ঠসহ নিষ্কাশন নালা উপযোগী।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা তিন রকমের। যেমন-

ক) স্টর্ম নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা গভীর নালা ব্যবস্থা

খ) চুয়ানো নিষ্কাশন ব্যবস্থা

গ) সম্মিলিত স্টর্ম ও চুয়ানো নিষ্কাশন ব্যবস্থা

ক) স্টর্ম বা গভীর নিষ্কাশন নালা- এ নালা সাধারণত অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নির্দিষ্ট সময়ে বের করে দেয়ার জন্য গভীর করে তৈরি করা হয়।

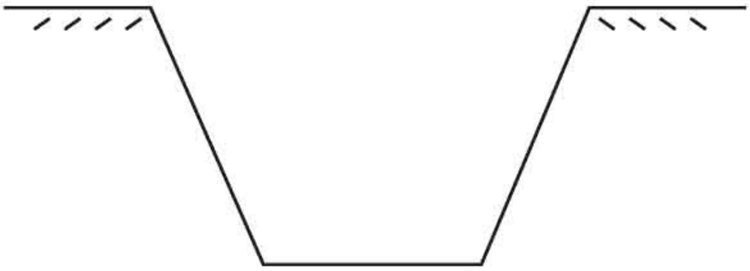

চিত্র: স্টর্ম নিষ্কাশন নালা

(খ) চুয়ানো নিষ্কাশন নালা (Seepage drain): সেচ নালার বা খালের পানি পাশের জমির চেয়ে উঁচু দিয়ে প্রবাহিত হলে পাড় চুঁইয়ে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। চুয়ানো পানি নিষ্কাশনের জন্য সেচ খালের পাড়ের পাশেই চুয়ানো খাল খনন করা হয়। খাল গভীর করে খনন করতে হয়। চুয়ানো পানি জমা হলে এখান দিয়ে নিকাশিত হয়।

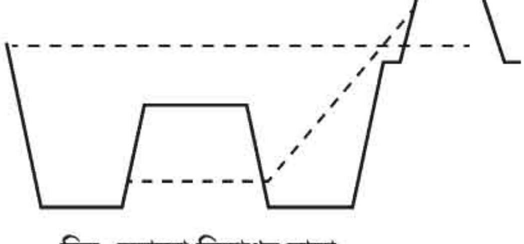

চিত্র: চুয়ানো নিষ্কাশন নালা

২০২২

(গ) সম্মিলিত স্টর্ম ও চুয়ানো নিষ্কাশন নালা- এ নালা প্রথমে চওড়া ও অগভীর করে তৈরি করে মাঝখান দিয়ে কম চওড়া করে অগভীর নালা করা হয়। এতে বৃষ্টির পানি এবং চুইয়ে আসা পানি উভয়ই বের হতে পারে।

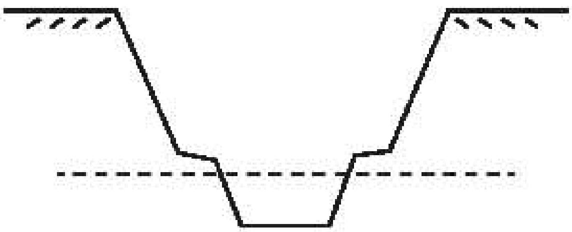

চিত্রঃ সম্মিলিত স্টর্ম ও চুয়ানো নিষ্কাশন নালা

ভূ - পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা ব্যবস্থার প্রকার

পাঁচ ধরনের ভূ -পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা ব্যবস্থা আছে। ফসল ক্ষেতের অবস্থা বিবেচনা করে এ পাঁচ প্রকার ব্যবস্থা থেকে দুটি বা ততোধিক ব্যবস্থা সম্মিলিতভাবে ব্যবহার করতে হতে পারে। ব্যবস্থাগুলো নিম্নরূপ-

ক) এলাপোথাড়ি নালা ব্যবস্থা (Random drain)

খ) প্রবাহ পথে আটককরণ নালা ব্যবস্থা (Interception)

গ) ভিন্নদিকে প্রবাহিতকরণ নালা ব্যবস্থা (Diversion)

ঘ) উপরিভাগ নালা ব্যবস্থা (Bedding)

ঙ) মাঠ নালা ব্যবস্থা (Field drain)

২। ভূ-মধ্যস্থ বা ভূ-নিম্নস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা/টাইল (Sub-Surface or tile): এ পদ্ধতিতে মাটির অভ্যন্তর থেকে পানি টাইল অথবা মোল (Tilte or mole) নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করে ভূ-গর্ভস্থ পানির তল গাছের শেকড় অঞ্চলের নিচে নামানো হয়। এই নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে টাইল নিষ্কাশন ব্যবস্থাও বলে। এই নিষ্কাশন ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের নিচে নিষ্কাশন নালা স্থাপন বা তৈরি করা হয়। ভূগর্ভস্থ পানি তলের অবস্থান গাছের শেকড় থেকে গভীরে নামিয়ে শেকড়ের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও শেকড় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় বায়ু চলাচলের সুবিধার জন্য এ নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরি। বাংলাদেশে উঁচু জমিতে আবাদকৃত ফসলের জন্য এই ধরনের নিষ্কাশন নালা ব্যবহার করা যেতে পারে।

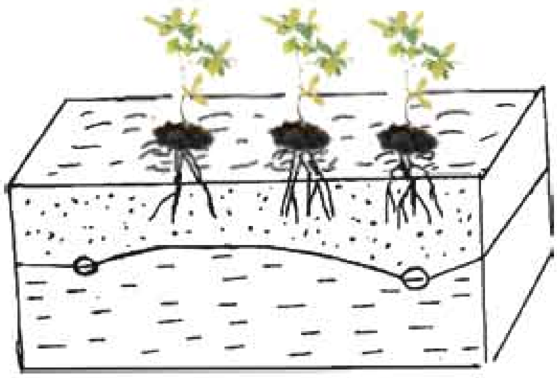

চিত্রঃ ভূ-নিম্নস্থ নিষ্কাশন নালা

বিভিন্ন উপযোগিতা বিবেচনায় টাইল নালা পদ্ধতিতে কয়েক ধরনের বিন্যস্ততা দেখা যায়। সাধারণ টাইল নিষ্কাশন পদ্ধতিসমূহ হলো-

১। ইন্টারসেপশন (Interception)
২। র‍্যানডম (Randon)
৩। ডাবল মেইন (Double main)
৪। পারালাল (Parallel)
৫। গ্রিড আয়রন (Gridiron)
৬। হেরিং বোন (Herring bone)

(৩) সম্মিলিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-নিম্নস্থ বা ভূ-মধ্যস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা

এই পদ্ধতিতে উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার নিষ্কাশন পদ্ধতি একত্রে ব্যবহার করা হয়। এ ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি নিষ্কাশনের নালার তল মাটির নিচে নিষ্কাশন নালা তৈরি করা যায়। এ নালার চতুর্দিকে ফিল্টার দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশত হলো কী ?

২। কোন কোন ফল গাছ সেচের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

৩। অনুভব পদ্ধতি কী ?

৪। আধুনিক সেচ পদ্ধতিতে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?

৫। একটি বেসিনের আওতায় কতটি গাছকে সেচ দেয়া যায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পানি সেচ বলতে কী বোঝায়।

২। সেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

৩। নিষ্কাশনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪। নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৫। ফল বাগানে সেচের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সেচের প্রধান পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ সহ যে কোন একটি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

২। পানি নিষ্কাশনের উদ্দেশ্য এবং সুবিধা অসুবিধা লেখ।

৩। বাগানে সেচের প্রয়াজনীয়তা নির্ধারণের বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

৪। ফল বাগানে পানি সেচের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫। নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর বিবরণ দাও।

২০২২

সপ্তম অধ্যায়

ফল ও ফল গাছের পোকা দমন

বাংলাদেশের মাটি এবং উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ফল উৎপাদনের উপযোগী। তেমনিভাবে নানা প্রকার রাগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব্যের জন্যও অনুকূল। পোকামাকড় দমনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়। তবে ঢালাও ভাবে পোকামাকড় ধ্বংস করা উচিত নয়। কেননা, ফল বা ফল গাছের অনষ্টিকারী পোকামাকড়ের সাথে অনেক উপকারী পোকাও থাকে। এরা ফুলের পরাগায়ণে সাহায্য করে এবং অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া খেয়ে অনেক উপকার করে থাকে।

ফল বা ফলগাছে পোকামাকড় ও বালাই আক্রমণের পূর্বে সর্তকতামূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কেননা আক্রমণের পর দমন করা অপেক্ষা আগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া অনেক ভাল। এ জন্য সময়মত জমিচাষ, আগাছা দমন, সুষম সার ব্যবহার, পানিসেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হয়। এছাড়া ভাল জাত নির্বাচন করে সঠিক সময় ও সঠিক স্থানে রোপণ করে সুস্থ গাছ জন্মাতে হবে। গাছ দৈহিকভাবে দুর্বল হলে নানা প্রকার পোকামাকড় ও বালাইয়ের আক্রমণ বেশি হতে পারে। পোকামাকড়ের আক্রমণের লক্ষণ ও কীটের উপস্থিতি বিভিন্নভাবে বোঝা যায়। যেমন- ফল ছিদ্রকরা, পাতা ফ্যাকাশে বা হলদে হয়ে যাওয়া, ফল বা পাতা খাওয়া, পাতা চিবানো, পাতা মাড়ানো, কাণ্ড বা শেকড় নষ্ট করা, গাছে সুড়ঙ্গ সৃষ্টিকারী পোকার মলের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারা যায়।

ফল ও ফল গাছের আক্রমণকারী প্রধান প্রধান পোকা

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফলে ও ফল গাছে নানা ধরনের পোকা মাকড় আক্রমণ করে থাকে। নিম্নের সারণিতে ফল ও ফল গাছে আক্রমন কারী প্রধান প্রধান পোকামাকড়ের তালিকা দেয়া হলো।

ফসলের নাম	পোকামাকড়ের নাম	আক্রান্ত স্থান
১। আম	১। আম ফলের ভোমরা পোকা	ফল
	২। আম ফলের মাছি পোকা	ফল
	৩। আম ফলের শোষক পোকা (হপার)	ফল
	৪। আমের ডগার মাজরা পোকা	শাখা /ডগা
	৫। আমের কাণ্ডের মাজরা পোকা	গাছের কাণ্ড
	৬। আমের পাতার বিছা পোকা	গাছের পাতা
	৭। আমের মিলিবাগ	
	৮। গল পোকা	
২। কাঁঠাল	১। ফলের মাজরা পোকা	ফল
	২। কান্ডের মাজরা পোকা	গাছ
৩। নারিকেল	১। পিপড়া, ইদুর	ফল
	২। গোবরে পোকা	গাছ
	৩। গন্ডার পোকা	গাছ
	৪। পাতা খনক	গাছ
	৫। উই পোকা	গাছ
	৬। লাল কেড়ি পোকা, কালো মাথা শূয়া পোকা	গাছ

৪। লিচু	১। বিটল ২। সাদা মাছি ৩। লিচুর মাকড়সা ৪। বিছা পোকা ৫। গুড়ির মাজরা পোকা ৬। কাণ্ডের মাজরা পোকা	ফল ফল গাছ গাছ গাছ গাছ
৫। কলা	১। বিটল পোকা ২। ঘোড়া পোকা ৩। কান্দ্রের ভোমরা পোকা ৪। মাজরা পোকা ৫। নেমাটোড	ফল গাছ গাছ গাছ শিকড়/গাছ
৬। জমি	১। সাদা মাছি ২। সুড়ঙ্গ পোকা ৩। থ্রিপস পোকা	ফল গাছ গাছ
৭। পেয়ারা	১। ফলের মাছিপোকা ২। শোষক পোকা ৩। জাব পোকা	ফল গাছ গাছ
৮। কুল	১। ফলের মাছি পোকা ২। কুলের উইভিল পাতা খেকো ৩। শুয়া পোকা ৪। লাক্ষা পোকা	ফল গাছ/পাতা গাছ গাছ
৯। আনারস	১। মিলিবাগ ২। খোসা পোকা বা স্কেল পোকা	ফল ফল
১০। পেঁপে	১। ফলের মাছি পোকা ২। লাল মাকড়সা ৩। লিফহপার ৪। কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা ৫। থ্রিপস পোকা ৬। জব পোকা	ফল ফল ও গাছ গাছ গাছ গাছ গাছ
১১। লেবু	১। লেবু প্রজাপতি ২। লিফ মাইনর ৩। লেবুর হলদে খোসা পোকা ৪। লেবুর মাছি পোকা ৫। লেবুর ছাতরা পোকা	গাছের কচি পাতা ও ডগ গাছের কচি পাতা গাছের কচি পাতা ও শাখা গাছ পাতা ও শাখার রস
১২। আমড়া	১। আমড়া পাতার বিটল পোকা	গাছের পাতা ও ডগ
১৩। তরমুজ	১। তরমুজের মাছি পোকা ১। তরমুজের লাল পাম্পকিন বিটল	ফল গাছের পাতা
১৪। ডালিম	১। ডালিমের প্রজাপতি	ফল

২০২২

ফল ও ফল গাছের আক্রমণের ধরন দেখে পোকা শনাক্ত

ফল ও ফল গাছের অনিষ্টকারী পাকামাকড় দমন করতে হলে এর স্বভাব , প্রকৃতি, বিস্তৃতি, জীবন বৃত্তান্ত, আবির্ভাবের সময় ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিম্নের বর্নিত ফলের প্রধান প্রধান পোকার আবির্ভাবের সময় ও ক্ষতির লক্ষণ দেখে শনাক্তকারী পোকার বাংলা ও ইংরেজি নাম দেয়া হলো।

ক্র নং	অবির্ভাবে সময়	আক্রমণের ধরন/বতির লক্ষণ	শনাক্তকারী পোকার বাংলা ও ইরেজি নাম
১	জানুয়ারি - এপ্রিল ও জুন-জুলই	বাচ্চা ও পূর্ণবয়ক অবস্থায় কচি পাতা ও ফুলের রস চুষে খায়। গাছ দুর্বল হয়, যথেষ্ট ফুল হওয়া সত্ত্বেও গুটি হওয়ার আগেই ফুল ঝরে পড়ে।	আমের হপার পোকা Mango hopper
২	এপ্রিল - মে	স্ত্রী পোকে কাঁচা আমের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে ফলের শাঁসের মধ্যে আঁকা বাঁকা সুড়ঙ্গ তৈরি করে খেতে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক উইভিলে পরিণত হয়ে আমের খোসা ছিদ্র করে বাইরে বের হয়ে যায় ।	আম ফলের ভোমরা পোকা Mango fruit weevil
৩	মার্চ - নভেম্বর	স্ত্রী পোকা আম গাছের কাণ্ড ও শাখায় গর্ত করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে কাণ্ড বা শীখার মধ্যে সুড়ঙ্গ করে ঢোকে। আক্রান্ত শাখা সহজেই ভেঙ্গে যায়। চারা গাছের কাণ্ড আক্রান্ত হলে গাছ মারা যেতে পারে।	আম গাছের কাণ্ডের মাজর পোকা Mango stem borer
৪	মার্চ - নভেম্বর	বিছা পোকার কীড়া আম গাছের পাতা খেয়ে গাছকে পশুন্য করে দেয়। ফলে গাছে ফুল ও ফল আসে না।	আম পাতার বিছা পোকা Mango leaf gall midges
৫	এপ্রিল - মে	কীড়া আমের ভেতর ঢুকে শাঁস খাওয়ার ফলে আম পঁচে যায়। আক্রান্ত ফল কাটলে তার মধ্যে অসংখ্য কীড়া কিলবিল করতে দেখা যায়	আমের মাছি পোকা Mango fruit fly
৬	মে - অক্টোবর	কাঁঠাল ছিদ্র করে ভেতর ঢুকে পচিয়ে ফেলে।	কাঁঠালের ফল ছিদ্রকারী পোকা Stone weevil
৭	এপ্রিল - আগষ্ট	পূর্ণ বয়স্ক বিটল কঁচি কলা পাতা ও কচি কলার খোসা খায়। ফলে কলার পাতা ও ফলের ওপর ছোট ছোট দাগের সৃষ্টি হয়।	কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা Banana leaf and fruit beetle
৮	জুলাই - অক্টোবর	পুর্ন বয়স্ক উইভিল কলা গাছের গোড়ায় শিকড়ের ওপর ডিম পাড়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে কাণ্ডের ভেতর ঢুকে যায়। ফলে আক্রান্ত অংশ পচে যায়, ডগার পাতা শুকিয়ে গাছ মরে যায়।	কলা গাছের কাণ্ডের শুড় পোকা Banana Stem weevil
৯	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল	কীড়া ফসলের বোটার দিকে ছিদ্র করে ঢুকে শাঁস ও বীজ খায়।	লিচু ছিদ্রকারী পোকা Litchi fruit borer

১০	মার্চ - জুন এবং আগস্ট-অক্টোবর	ক্ষুদ্র মাকড় পাতার নিচে ছিদ্র করে রস শোষণ করে। ফলে আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায় ও শুকিয়ে ঝরে পড়ে।	লিচু পাতার ক্ষুদ্র মাকড় Litchi mite
১১	মে - অক্টোবর	পাতা থেকে রস চুষে খায়।	পেয়ারা সাদা মাছি whitefly
১২	মে - অক্টোবর	ফল ছিদ্র করে শাঁস খায়।	ফলের মাছি Fruit fly
১৩	জুন - সেপ্টেম্বর	ডগা, ফল, কুড়ি থেকে রস চুষে খায়, ফলের আকার ছোট হয়।	ছাতরা পোকা Mealy bug
১৪	সারা বছর	নারিকেল গাছের মাথায় না বের হওয়া পাতা কেটে ক্ষতি করে।	নারিকেল গাছের গন্ডার বা গোবরে পোকা Rhinoceros beelle

পোকা দমনের পধতি

ফসল জন্মানোর কালে প্রায়শ এগুলোকে কীট কিংবা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। কীট কিংবা রোগ দমন করতে না পারলে ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফসলের পোকামাকড় দমনে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো কোন সময় অর্থাৎ ফসলের বৃদ্ধি ও পোকার আক্রমণের কোন স্তরে প্রয়োগ করা হবে তার উপর নির্ভর করে দমন পদ্ধতিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (ক) প্রাফোইল্যাক্সিস- পোকামাকড় যাতে গাছ বা ফলে আক্রমণ করতে না পারে সে জন্য পূর্বেই যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তাকে প্রতিরোধক বা প্রিভেনটিভ ব্যবস্থা বলে। (খ) থেরাপি- আক্রান্ত গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি ঠেকানারে জন্য বা দমনের জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয় তাকে প্রতিষেধক বা কিউরেটিভ ব্যবস্থা বলে।

গাছ সুস্থ ও সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য চারার যথাযথ যত্ন, জমি কর্ষণ, ও সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। এর ফলে গাছের পোকামাকড় আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে। গাছ কখনো কখনো শারীরিকভাবে দুর্বল হতে পারে। এ সময় কোন কোন পোকামাকড় গাছে বা ফলে আক্রমণ করতে পারে। তাই গাছের অবস্থা দেখে পানি বা খাদ্য উপাদানের ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করে গাছকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তাতে গাছে পোকামাকড় আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মাবে এবং গাছ শক্তিশালী হবে।

গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ ঠেকাতে দুটি দমন ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিরোধক বা প্রিভেনটিভ ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণও বলা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রাকৃতিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ক) আবহাওয়াগত অবস্থার পরিবর্তন খ) জমির উচু নিচু অবস্থানগত অবস্থা গ) পরিবেশগতভাবে এক ধরনের পোকা দ্বারা অন্য ধরনের পোকা ধ্বংস হওয়া এবং ঘ) আশ্রয়দাতার নিকট হতে আক্রমণকারী পোকাকে বিচ্ছিন্ন করা।

অপর দমন ব্যবস্থা যথা- প্রতিষেধক বা কিউরেটিভ ব্যবস্থাকে প্রয়োগিক নিয়ন্ত্রণ বলা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে গাছে পোকামাকড়ের আক্রমণ কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ পদ্ধতিকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন—

১। যান্ত্রিক দমন (Mechanical control)

২। জৈবিক দমন (Biological Control)

২০২২

৩। পরিচর্যামূলক দমন (Cultural Control)

৪। পোকামাকড় প্রতিরোধী জাত (Use of resistant variety)

৫। রাসায়নিক দমন (Chemical Control)

৬। আইনগত দমন (Legal Control)

৭। ভৌত দমন

যান্ত্রিক উপায়ে পোকা দমন পদ্ধতি ও উপকারিতা

পোকামাকড় দমনে প্রতিষেধক পদ্ধতির অন্তর্গত যান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো।

১। যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পোকামাকড় দমন করা যায়। যেমন- আলোর ফাদ, প্রতিরক্ষামূলক বাধা, জালি, ভৌতশক্তি, উত্তাপ অথবা শৈত্যের ব্যবহার, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি। যান্ত্রিক উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ হলো বিশেষ ধরনের কোন যন্ত্র, মানুষের শ্রম ও কোন বিশেষ দ্রব্যের সাহায্যে কীটপতঙ্গ দমনের একটি কৌশল। কৌশলগতভাবে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক ভাবে সাধারণত লাভজনক হয়ে থাকে। কিন্তু এ পদ্ধতি ব্যবহার করে অধিক সংখ্যক কীটপতঙ্গ দমন করা সম্ভব হয় না, তবে এ পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব। যান্ত্রিক উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

(i) হাত দ্বারা আহরণ

যে সব পোকা ডিম গাদা করে পাড়ে এবং ডিম ফুটার পর শুককীট/কীড়া একত্রে গাদা করে অবস্থান করে সে সব পোকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এ পদ্ধতি উত্তম। এ সব পোকার ডিম হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মারা যায়। যেমন বেগুন, শিম, কাঁকরালে ও করলা গাছের পাতা হতে এপিল্যাকনা বিটলের ডিমের গাদা এবং বিটল হাত দ্বারা সংগ্রহ করে সহজেই মেরে ফেলা যায়। অথবা আক্রান্ত ডিমের গাদাসহ ডাল বা পাতা কাঁচি দিয়ে কেটে সংগ্রহ করে পিষে বা মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করা যায়।

(ii) পোকা ধরার জাল ব্যবহার

আক্রান্ত ক্ষেতে পোকা ধরার জাল দ্বারা সুইপ করে ঝাড়া দিয়ে অনেক পোকা আটকানো যায়। পরে এ গুলোকে মাটিতে পুঁতে মেরে ফেলা যায়। যেমন- ধানের পামরী পোকা এ পদ্ধতির মাধ্যমে সহজেই দমন করা যায়।

(iii) পিটিয়ে এবং খুঁচিয়ে

যে সকল পোকা খাদ্য দ্রব্য পেলে সেখানে দলে দলে ভিড় জমায় সে সকল পোকা মাকড় ঝাড়ু বা অন্যকোন বস্তু দ্বারা পিটিয়ে দমন করা যায়। যেমন- তেলাপোকা, পিপড়া ইত্যাদি। আবার কিছু পাকা আছে যারা পোষকের দেহে গর্ত করে বা ফাটলে লুকিয়ে থেকে ক্ষতি করে। এদেরকে লাহোর শিক দ্বারা খুচিয়ে মেরে ফেলা যায় যেমন নারিকেলের বিটল পোকা।

(vi) ঝাঁকিয়ে (Shaking)

ছোট ছোট গাছে পোকা আক্রমণ করলে সেগুলো অনেক সময় কঁকিয়ে মাটিতে ফেলে মেরে ফেলা হয়। যেমন আমড়া, লিচু, কলা ইত্যাদি গাছের বিটল। গাছ কুপিয়ে মাটিতে ফেলে এ সমস্ত পোকা মেরে ফেলা যায়।

(v) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে

কীট পতঙ্গ যাতে কাঙ্খিত ফসলের সংস্পর্শে আসতে না পারে সে জন্য প্রতিকন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি করে ফসলকে রক্ষা করা যায়। যেমন পাটের বিছা পোকায় আক্রান্ত ক্ষেতের চার পাশে নালা করে সেখানে কীটনাশক মিশ্রিত পানি দিলে পোকা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে যেতে পারে না।

অনুরূপভাবে ডালিম, কুমড়া বা কলা কচি অবস্থায় কাপড়, চট বা । নিচের দিকে মুখ ভালো পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিলে এ ফসলগুলোর ফল যেমন- ডালিমের প্রজাপতি, ফলের মাছি পোকা এবং কলার বিটলের আক্রমণ হতে রক্ষা করা যায় ।

(vi) চালুন দ্বারা চেলে ও কুলা দ্বারা ঝেড়ে চেলে

গোলাজাত শস্যের কতগুলো পোকা এ পদ্ধতির মাধ্যমে দমন করা যায় । যেমন- ময়দার কেড়ী পোকা, চালনি দ্বারা চেলে এবং চালের কেড়ী পোকা কুলা দ্বারা ঝেড়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।

(vii) যান্ত্রিক ফাঁদ

ফাদের সাহায্যে শস্যের কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ একটি উত্তম পন্থা । কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু যাত্রিক ফাদ আবিষকৃত হয়েছে যেমন- আলোর ফাঁদ, আঠা লাগানো ফঁদ ইত্যাদি । উজ্জ্বল আলোর নিচে বড় গামলা বা পাত্রে কীটনাশক মিশ্রিত বা সাবান মিশ্রিত পানি রেখে দিলে পোকা আলোতে আকৃষ্ট হয়ে উড়ে এসে পানিতে পড়ে মারা যায়, যেমন- ধানের মাজরা পোকার মথ, চুংগী পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং ইত্যাদি । ছোট ছোট পোকা, যেমন ফলের মাছি পোকা, আঠা লাগানো ফাঁদের সাহায্যে আকৃষ্ট করে মারা যায় ।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা দমনের উপকারীতা

১ । দৈহিক উপায়ে পোকা দমনের ফলে অর্থাৎ কীটনাশকের পরিবর্তে হাত দিয়ে পোকা ধরে অথবা পাতার ডিমের গুচ্ছ হাত দিয়ে তুলে ধ্বংস করে, পোকামাকড়ের আশয়স্থল নষ্ট করে, আলোর ফাঁদ পেতে এবং পোকা খেকো পাখিকে জমিতে বসতে দেয়ার ব্যবস্থা করে পোকা দমন করলে পরিবেশ দূষণ রোধ হয় ।

২ । কীট ও বালাই নাশকের মত ব্যবহার পরবর্তী পার্শ্বক্রিয়া না থাকায় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের কোন ক্ষতি হয় না ।

৩ । উপকারী পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গের সুরক্ষা হয় এবং জীব বৈচির্ত্য অক্ষুন্ন থাকে ।

৪ । কীট ও বালাই নাশকের ব্যবহার কমিয়ে আর্থিক সাশ্রয় করা যায় ।

৫ । উপকারী পোকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যেমন- মৌমাছি, মাকড়সা

পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উপকারীতা

বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত মানের প্রচুর খাদ্য উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে । ফলে ব্যাপক রাসায়নিক দ্রব্য যেমন- সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে । এগুলো প্রয়োগের ফলে পোকা মাকড়ের জীবনচক্র এবং বংশবৃদ্ধিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে । শুধু তাই নয় লাগামহীন বালাই নাশক প্রয়োগের দরুন সকল প্রজাতির পোকা মাকড়সহ মানব দেহে দেখা দেয় বিভিন্ন রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া । যারা এ সকল বালাই নাশক ক্ষেতে ও ফসলে ছড়াচ্ছে তারাতো এর শিকার হচ্ছেই তাছাড়া সাধারণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী দৈনন্দিন যে খাদ্য খাচ্ছে তার মধ্যে বালাই নাশকের অবশিষ্টাংশ হিসেবে তাদের দেহে এসব বিষ যাচেছ । এ বিপর্যয় শুধু আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার নামে কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদির যথেচ্ছ অপব্যবহারের ফলে ঘটে চলেছে । যদিও ফসলে বালাই বলতে ফসলের অনিষ্টকারী সকল প্রকার পোকা মাকড়, রোগ জীবানু আগাছা ও মেরুদন্ডী প্রাণী যা মানুষের স্বার্থে আঘাত হানে তাকে বোঝায় । বালাই দমনের জন্য বালাইনাশকের ওপর নির্ভর করার ফলে বহুবিধ সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, যেমন- আগের তুলনায় পরবর্তী ফসলে পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি, মানুষ ও পশু পাখির বিষক্রিয়াজনিত বিপদ, ফসলের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূমি করণ । এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা একান্তভাবে দরকার । ২০২২

সাফলাজনকভাবে পোকা মাকড় দমন করতে হলে শুধু মাত্র বালাইনাশকের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। বালাইনাশক প্রয়োগ ছাড়াও পোকা মাকড় দমনের অন্যান্য পদ্ধতিগুলো জানা এবং প্রয়োগ করা দরকার। সাধারনভাবে বলতে গেলে অল্প খরচে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের কোন ক্ষতি না করে যখন যে ব্যবস্থাটি প্রয়োজন তা প্রয়োগ করে ফসলের শুত্র পোকামাকড়ের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাকে পোকা মাকড় দমনের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) বলা হয়। অন্যভাবে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হচ্ছে, রোগ ও পোকামাকড় সহ অনিষ্টকারী প্রানী ইত্যাদি বালাই দমনে ব্যবহার্য সকল দমন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমত্তার সাথে বিবেচনা করে সঠিক, সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি নির্বাচন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা। এতে করে নির্বাচিত এক বা একাধিক পদ্ধতি অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশের দিক থেকে গ্রহন উপযোগী হয়। এ ব্যবস্থাপনা ফসলের বালাইকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে করে তা কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি করতে পারে। আর এ জন্যই বলা হয় যে, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো অধিক ফসল ফলানোর মাধ্যমে ভোক্তাদের জন্য কোনরূপ ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকবে । সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার উপকারিতা নিচে দেয়া হলো।

১। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়।

২। প্রাকৃতিতে বিদ্যমান জৈবিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সহায়তা করে।

৩। বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার কম হওয়ায় পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকে।

৪। উপকারী পোকা মাকড়, মাছ, ব্যাঙ, পশুপাখি ইত্যাদি সংরক্ষণে সহায়তা করে

৫। অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও বালাইর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

৬। বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যদির যথেচ্ছ ব্যবহার কমিয়ে আনে।

৭। অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ও ক্ষতিকারক বালাইসমূহ কীটনাশক ও বালাই নাশক সহনশীলতা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করার সুযোগ পায় না।

৮। উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ বজায় থাকে।

২। জৈবিক দমন

এই পদ্ধতিতে পোকার প্রাকৃতিক শত্রু সমূহ যেমন- পরভোজী, পরজীবি এবং রোগজীবাণু কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করে আক্রান্ত শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে দমন করা হয়। অনেক পোকা আছে যারা পরজীবি ও পরভোজী হিসেবে অন্য পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়। রোগ জীবাণুর মধ্যে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি সফলভাবে জৈবিক দমনে ব্যবহৃত হয়।

৩। পরিচর্যামূলক দমন

ফল বাগান ও শস্য ক্ষেতে নিয়মিত পরিচর্যার দ্বারা কীটপতঙ্গের ক্ষতি থেকে ফল ও ফসলকে মুক্ত রাখা সম্ভব। বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যা যেমন- জমি কর্ষণ, আগাছা নিধন, শস্য বপন ও রোপণের তারিখ পরিবর্তন, বাগানে ও শস্য ক্ষেতে সেচ ও নিষ্কাশন, ফল গাছ ও শস্য ছাঁটাই, পরিমিত সার প্রয়োগ ইত্যাদি।

৪। পোকা মাকড় প্রতিরোধীজাত (Resistant variety)

পোকা প্রতিরোধীজাত ব্যবহার, কীটমুক্ত চারার ব্যবহার ইত্যাদি পদ্ধতিতে পোকা দমন করা যায়।

৫। রাসায়নিক দমন

বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদির মাধ্যমে কীটপতঙ্গ দমন করা হয়। এ সব দ্রব্যাদির মধ্যে কীটনাশক, আকর্ষক, বিকর্ষক, হরমোন ও খাদ্য নিরোধক উল্লেখযোগ্য।

রাসায়নিক দমনের জন্য কীট নাশককে আবার বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন—

১। রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তি করে।

২। কীট পতঙ্গ বা গাছের মধ্যে কীটনাশকের কার্য প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এবং

৩। কীট পতঙ্গ বা গাছের মধ্যে ঔষধের প্রবেশ প্রণালির ওপর ভিত্তি করে।

তবে কীট নাশকের ক্রিয়া এবং প্রবেশ প্রণালীর ওপর ভিত্তি করে কীট নাশককে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) পাকস্থলীর বিষ (খ) স্পর্শ বিষ (গ) অন্তর্বাহী বিষ (ঘ) ধুপন বিষ এবং (ঙ) বিতাড়ণকারী বিষ

আকর্ষকের মধ্যে ফেরামোন কৃত্রিমভাবে তৈরি করে পুরুষ পোকাকে আকৃষ্ট করে মারা যায়। বিকর্ষক কীট পতঙ্গকে নিরুৎসাহ, এড়িয়ে চলার প্রবণতা, অনাগ্রাসন ইত্যাদির মাধ্যমে দুরে সরিয়ে রাখে। হরমোন কীট পতঙ্গ দমনের আধুনিক পদ্ধতি। কৃত্রিম হরমোন যেমন- এলটুসিড, ডিমিলিন আক্রান্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলে কীট পতঙ্গ সরাসরি মরে না, কিন্তু বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সেই সাথে বিকলাঙ্গ, স্বল্পায়ু প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে দমন কর যায়। খাদ্য নিরোধক, কীট পতঙ্গকে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণে বিরত রাখে।

কীটনাশকের শ্রেণিবিভাগ

কীটনাশক

- পাকস্থলীর বিষ
- স্পর্শ বিষ
- অন্তর্বাহী বা প্রবাহমান বিষ
- ধুপন বিষ বা ধুম্র বিষ
- বিতাড়ণকারী বিষ

৬। আইনগত দমন

কোন ক্ষতিকর পোকা কোন দেশ বা অঞ্চলে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য আইনগত ভাবে বাধা প্রদান করা হয়। আক্রান্ত গাছের অংশ ও বীজ এক দেশ থেকে অন্য দেশ বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলাচলে আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে অনেক পোকা ও রোগের ব্যাপক বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই দমন পদ্ধতিকে কোয়ারেন্টাইন দমন পদ্ধতি বলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন সামুদ্রিক বন্দর, আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সীমান্ত এলাকায় পোকা দমনের জন্য আইনগত ব্যবস্থা আছে। সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের গাছ বা বীজ বা চারা আনা নেয়ার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আইন আছে।

৭। ভৌত দমন

অধিক তাপমাত্রা প্রয়োগ করে, যেমনঃ গুদামে ১০-১২ ঘন্টা ৫০° সে তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে, অন্য দিকে আক্রান্ত শস্য দানাকে প্রখর রোদ শুকালে, অনেক ক্ষতিকর পোকা মারা যায়। অধিক ঠান্ডা যেমনঃ গুদাম ঘর ৫-১০° সে. তাপমাত্রায় কয়েক ঘণ্টা রেখে দিলে অনেক শস্য দানার ক্ষতিকর পোকা দমন হয়। ২০২২

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আম ফলের প্রধান পোকা কোনটি ।

২। পোকা দমন পদ্ধতিগুলোকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?

৩। গাছে ও ফলে পোকার আক্রমণ সচরাচর কখন ঘটে থাকে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আমের প্রধান অনিষ্টকারী পোকাগুলোর নাম লেখ। আম ছিদ্রকারী পোকার ক্ষতির ধরন বর্ণনা কর।

২। কলার পাতা ও ফলের বিটলের বৈজ্ঞানিক নাম কী।

৩। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা দমনের কৌশলগুলোর নাম লেখ।

৪। রাসায়নিকভাবে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো লিপিবদ্ধ কর।

৫। ফল ও ফল গাছের পোকা দমনে আইপিএম পদ্ধতি গ্রহণ করলে কীভাবে লাভবান হওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

৬। ফল ও ফল গাছে আক্রমণের ক্ষতির চিহ্ন দেখে কিভাবে পোকা সনাক্ত করা যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল ও ফল গাছের আক্রমণকারী প্রধান প্রধান পোকার নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।

২। আম, লিচু ও নারিকেলের প্রত্যেকটির ৩টি পোকার নাম, তাদের ক্ষতির লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

৩। পোকা দমন পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ পূর্বক যে কোন একটি পদ্ধতির বিবরণ দাও।

৪। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা দমনের সুবিধা অসুবিধা এবং উপকারিতা বর্ণনা কর।

৫। আইপিএম বলতে কি বোঝায়। ফল ও ফল গাছে পোকা দমনে আইপিএম পদ্ধতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম অধ্যায়

ফল ও ফল গাছের রোগ দমন

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রম ব্যাহত হওয়াকে উদ্ভিদের রোগ বলে। উদ্ভিদের শ্বসন, শোষণ, প্রশ্বেদন ও সালাকে সংশেষণ প্রক্রিয়া কোন কারণে বিঘ্নিত হলে উদ্ভিদ দেহে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়। এ অস্বাভাবিকতাকে উদ্ভিদের রোগ বলে। খাদ্য প্রাণে ভরপুর ফল অতিগুরুত্বপূর্ণ ফসল। শারিরিক সুস্থতা ও সুঠাম দেহ রক্ষায় ফলের ভুমিকা অপরিসীম। রোগ ফলের সে গুণাগুণ নষ্ট করে। অতএব ফলের ও ফল গাছের রোগের ধরন, তার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

ফল ও ফল গাছে নানা প্রকার রোগ হতে পারে। গাছে রোগ হলে তার নানা প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাছে বা ফলে আক্রমণের লক্ষণ বিভিন্ন রকম হয়। এই লক্ষণ গাছের শেকড়, কাণ্ড, পাতা ও ফলসহ বিভিন্ন অংশে হতে পারে। গাছে বা ফলে এই অসুস্থতার লক্ষণ দেখামাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাই রোগ হওয়ার মত বা ছড়ানো উপযোগী আবহাওয়া দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। গাছে রোগ হওয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে অনেক রোগ থেকে গাছ ও ফলকে রক্ষা করা যায়। এমনকি রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

কার্যকারণের দিকে দৃষ্টি রেখে, বিজ্ঞানী ফল ও ফল গাছের রোগ ব্যধিসমূহকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১। ছত্রাকজনিত রোগ, ২। ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ ৩। ভাইরাস জনিত রোগ ৪। নেমাটোড জনিত রোগ এবং ৫ পুষ্টি উপাদানের অভাব জনিত রোগ। সবচেয়ে অধিক সংখ্যক রোগ হচ্ছে ছত্রাক জনিত, মোট রোগসমূহের প্রায় ৫০ ভাগের অধিক হবে। অপরপক্ষে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ঘটতি রোগের সংখ্যা ৩০-৩৫ ভাগ হতে পারে। নেমাটোড দ্বারা আক্রান্ত রোগের সংখ্যা অন্যান্যদের তুলনায় কম।

বাংলাদেশের ফল ও ফল গাছের প্রধান প্রধান রোগের তালিকা

ক্র নং	রোগের নাম	ফসলের নাম	ফল বা ফল গাছের আক্রান্ত অংশ
১	আগা মরা (Die- back)	আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু, লিচু, নারিকেল	কাণ্ড
২	স্যুটি মোল্ড (Shooty mould)	আম, জাম পেয়ারা, পেঁপে, কাঁঠাল, লিচু, লেবু	পাতা
৩	ফোস্কা, ফল পঁচা (Anthrac nose)	আম, পেয়ারা, কলা	ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড
৪	লাল মরিচ (Red rust)	আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা,বেল	পাতা ও ফল
৫	পিংক রোগ (Pink)	আম, কাঁঠাল, লেবু	আম
৬	বিকৃতি (Malfomation)	আম	ফল
৭	পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)	আম, কুল, পেঁপে	ফুল ও কান্ড, পা ও ডাল
৮	বৃন্ত পঁচা (Stalk-rot)	আম, কলা, পেঁপে	ফল
৯	সিগাটোকা (Sigatoka)	কলা	গাছ
১০	পানামা (Panama)	কলা	গাছ
১১	ফল পঁচা (Fruit rot)	আম, কলা, পেঁপে, কুল	ফল
১২	গোড়া পঁচা (Collar rot)	পেঁপে, কলা	গাছ

১৩	মোজাইক (Mosaic)	পেঁপে	পাতা
১৪	রাইজোপাম ফল পঁচা	কাঁঠাল	ফল
১৫	গ্রে লিফ স্পট (Grey leaf spot)	নারিকেল, লিচু	পাতা
১৬	কাণ্ডের রস ক্ষরণ (Stem bleeding)	নারিকেল, লেবু	গাছের কাণ্ড
১৭	উইল্ট (Wilt)	পেয়ারা	চারা
১৮	ক্যাংকার (Canker)	লেবু	ডালপাতা, ফুল ও ফল
১৯	স্ক্যাব (Scab)	লেবু	পাতা
২০	কাণ্ড পঁচা	আনারস	গাছ

ফল ও ফল গাছের রোগের লক্ষণ দেখে শনাক্তকরণ

ক্র নং	ফসল/ফলের নাম	রোগের লক্ষণ	রোগের কারণ/ বৈজ্ঞানিক নাম	রোগের নাম
১	লেবু, পেয়ারা	শিকড় ছাড়া, সব অঙ্গেই ফোস্কার মতো উচু দাগ পড়ে দাগের চারদিকে গ্রিজের মতো মনে হয় এবং বৈশিষ্ট্যমূলক হলুদ দাগ দেখা যায়।	ছত্রাক কলেটট্রিকাম গিরওসপরিঅইডিস Colletotricum gleosporiodis	আগামরা (Die back)
২	আম, পেয়ারা, আনারস, পেঁপে, লেবু, নারিকেল	পাতায় বাদামি রঙের কোনাচে দাগ হয়। বোটা আক্রান্ত হলে কাল হয়ে আম ঝরে পড়ে। আক্রান্ত মঞ্জুরী ফুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে।	ছত্রাক	এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)
৩	আম, পেঁপে, কুল, আনারস, তরমুজ	কচিপাতা, পুষ্প মঞ্জুরী, কচি ফলে সব স্থানে প্রথমে সাদা এবং মাঝে মাঝে ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা আবৃত হয়। পুষ্প মঞ্জরি এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।	ছত্রাক Oidium sp (অডিয়াম এসপি)	পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)
৪	আম. জাম, পেয়ারা, লেবু	সুটি মোল্ড পাতার কালো পাউডারের আস্তরণে ঢেকে যায় ও কুৎসিৎ করে ফেলে ।	ছত্রাক Capnodium sp (ক্যাপননাডিয়াম এসপি)	স্যুটি মোল্ড Shooty mould
৫	আম, পেঁপে, কলা	রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ফলের বোটার গোড়ার নিচে চারদিক দিয়ে কালচে হয়ে আসতে থাকে। দাগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বৃন্তকে ঘিরে ফেলে এবং সম্পূর্ণ আম কালো হয়ে যায়।	ছত্রাক Diplodia theobromae/ Diplodia natalensis	বৃন্ত পচা (Stemend Rot)
৬	কলা	প্রথমে পাতাতে শিরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সমান্তরাল ভাবে ছোট ছোট ও লম্বাটে ঈষৎ হলুদ রঙের দাগ দেখা দেয় পরে লম্বা হয়ে গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে।	ছত্রাক Bata Cercos pora musae (সারকোসপোরা মিউসি)	সিগাটেকা Sigatoka

২০২২

৭	আম,কলা, পেঁপে	ফলের খোসা শুকায়ে বাদামি রং ধারণ করে। খোসা উঠানো হলে ভিতরে শাঁস ঘোলাটে ও অস্বচ্ছ দেখায় এবং হালকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়।	ছত্রাক Colletotrichum sp (কলেটট্রিকাম এসপি)	ফল পচা (Fruit rot)
৮	কাঁঠাল	আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ রং ধারণ করে এবং সম্পূর্ণ গাছ ফ্যাকাশে হয়ে আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে। ডাল বা শিকড়ের ছালা উঠালে কাঠের উপর দিয়ে সাদা এবং বাদামি ছত্রাক দেখা যাবে যায়।	ছত্রাক Pestal oliopsis palmarum	বাদামী শিকড় রোগ
৯	পেঁপে	আক্রান্ত পাতা সাদাটে হয় ও পাতা কুকড়ে যায়। পাতার ক্লোরফিল নস্ট হয়ে পাতায় ছিটিছিট হলুদ সবুজ মোজাইক দাগ পড়ে	ভাইরাস	মোজাইক রোগ Mosaic
১০	লেবু	আক্রান্ত চারার পাতা বাদামি বর্ণ ধারণ করে। আগা থেকে শুরু করে নিচের দিকে আস্তে আস্তে পাতা বাদামী রঙ ধারণ করে।	ছত্রাক	সিডলিং ব্লাইট
১১	পেয়ারা, লেবু	এই রোগ কাণ্ডে হলে কাণ্ড ফেটে যায়, কাল দাগ পড়ে। ফল আক্রান্ত হলে সবুজ ফল ত্বকে কালো দাগ দেখা যায়। দাগগুলো গভীর হয় না।	ব্যাকটেরিয়া Xantho monas campestris pv, citi	ক্যাংকার রোগ (Canker)
১২	লেবু	পাতা ও ফলে আক্রমণ করে। পাতা আক্রান্ত হলে ছোট ছোট বাদামী রং এর ফোলা ফোলা দাগ পড়ে। এই দাগ পরে বড় হয়ে চ্যাপ্টা শক্ত আঁচিলের মত হয়। আঁচিলের চার পাশে হালকা হলুদ রঙ ধারণ করে।	ছত্রাক Elsinoe fawcetti (এলসিনে ফসেটি)	স্ক্যাব (Scab)s
১৩	বেল	এ রোগে পাতায় ও ফলে মরিচা পড়া দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতায় বাদামি দাগ পড়ে এবং পাতা হলুদ হয়ে যায়।	ছত্রাক Cephaleuros parasitica (সেফালিওরস প্যারাসাইটিকা)	মরিচা পড়া রোগ Red rust
১৪	আমড়া	মাঝে মাঝে কচি ডালের মাথা হতে নিচের দিকে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়।	ছত্রাক	আমড়ার চারার ডগা মরা রোগ
১৫	কলা	মাথার পাতা ছোট আকারের হয় নতুন। পাতগুলো ঘন হয়ে বের হয় এবং আগা গুচ্ছ রূপ ধারন করে।	মাইকোপ্লাজমা Micoplasma	গুচ্ছ মাথা রোগ Bunchy top (বাঞ্চি টপ)

ফল ও ফল গাছের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার

বৈজ্ঞানিক কৃষির বিকাশ ও উদ্ভিদ রোগের বিকাশ ফসল চাষাবাদের শুরু থেকে সমান্তরালভাবে চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ শুরু করে। যেমন-

১। নতুন জাতের আবাদী ফসল/গাছ

২। অধিক ফলনশীল ফসলের জাত

৩। উন্নত ও আধুনিক সারের উদ্ভাবন ও ব্যবহার

৪। অঢেল সেচের পানি এবং

৫। পতিত না রেখে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার

কিন্তু রোগ ব্যাধির প্রতি বিশেষ নজর না রেখে এসব প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মাধ্যমে রোগ বালাই বিস্তার লাভ করে। যেমন-

১। বীজ ও অন্যান্য অঙ্গজ বংশবৃদ্ধির উপকরণের সাথে শক্তিশালী রোগজীবাণুর আবির্ভাব

২। নতুন শস্য জাত চাষের ফলে পূর্বের রোগ জীবাণুর অধিকতর শক্তি সঞ্চয়

৩। বিরাট এলাকা জুড়ে একই ফসল ও একই জাত চাষ, নিবিড় চাষ এবং সারা বছর ফসল দ্বারা মাঠ আচ্ছাদিত থাকায় রোগজীবাণু বেঁচে থাকার, বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ পায়।

৪। সার ও পানি নির্বিচারে ব্যবহার রোগজীবাণু বিস্তারে সহায়ক। সুতরাং যে প্রযুক্তি বা কৌশল আমরা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ করছি তা রোগ জীবাণু বৃদ্ধির জন্য অনুকূল। আধুনিক প্রযুক্তি রোগ জীবাণু সম্পর্কিত বিপদ বৃদ্ধির যেমন সহায়ক, তেমনি বৈজ্ঞানিক ভাবেই রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণও সম্ভব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোকাবেলায় অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োজন। একইভাবে রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো-

১। মাঠে বা বাগানে যা রোপণ বা বপন করা হবে তা শস্য/গাছে পরিণত হবে।

২। যা আবাদ করা হবে তা থেকে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যাবে।

৩। যা উৎপন্ন হবে তা নিরাপদে বাজারে আসবে এবং অবশেষে তাই গ্রাহকের নিকট পৌঁছাবে। উপরোক্ত তিনটি বাক্য হতে এটা বোঝায় যে, ফসল চাষাবাদের প্রত্যেকটি বা যে কোন ধাপে রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগ দমনের প্রয়োজন রয়েছে; উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখে লক্ষ মাত্রায় পৌঁছার জন্য।

উদ্ভিদ রোগ দমনের মূলনীতি (Principle of plant disease control)

একটি কার্যকরি উদ্ভিদ রোগ দমন কর্মসূচি প্রণয়নে নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার।

১। শস্যের প্রকার ও লতা, গুল্ম গাছ, অর্থকরী ফসল, খাদ্য শস্য ইত্যাদি শস্যের বৃদ্ধির পর্যায়।

২। রোগজীবাণুর প্রকৃতি ও ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি রোগ জীবাণুর জীবনচক্র, বীজ, মাটি বা বায়ু বাহিত, বিস্তারের ধরন ইত্যাদি।

৩। রোগের প্রকৃতি ও অভ্যন্তররীণ বাহ্যিক, বীজ, মুল, ফুল, পাতায় আক্রমন এ সকল বিষয় মনে রেখে উদ্ভিদ রোগ দমন কর্মসূচি নিম্নলিখিত ৪টি মূলনীতির ভিত্তিতে প্রণয়ন করা যায়।

ক. রোগজীবাণু বর্জন (Exclusion of pathogen)

খ. রোগ জীবাণু নির্মুল (Eradication of the pathogen)

২০২২ গ. রোগ জীবাণুর হাত থেকে ফসলকে বাঁচানো

ঘ. রোগ প্রতিরোধী জাত উন্নয়ন (Resistant variety)

উপরোক্ত ৪(চার) মূলনীতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের রোগ দমনে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

১। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে (Legislative measures)

২। চাষাবাদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (Cultural practices)

৩। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার (Use of Chemicals)

৪। রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার (Use of resistant variety)

৫। জৈবিক দমন (Biological control)

৬। সমন্বিত রোগ দমন (IPM- Intergrated Pest Management) রোগ দমন ব্যবস্থা কোন সময় নেয়া হলে তার উপর ভিত্তি করে রোগ দমন পদ্ধতি দু'প্রকার

১। প্রোফাইলক্সিস: রোগ যাতে সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা নেয়াকে প্রিভেনটিভ ব্যবস্থা বলে।

২। থেরাপি: রোগ শুরু হওয়ার পর রোগের বৃদ্ধি রহিত করার ব্যবস্থাকে কিউরেটিভ ব্যবস্থা বলে।

সারণি ১ উদ্ভিদের রোগ দমন পদ্ধতিগুলো নিমে ছকে দেখানো হলো

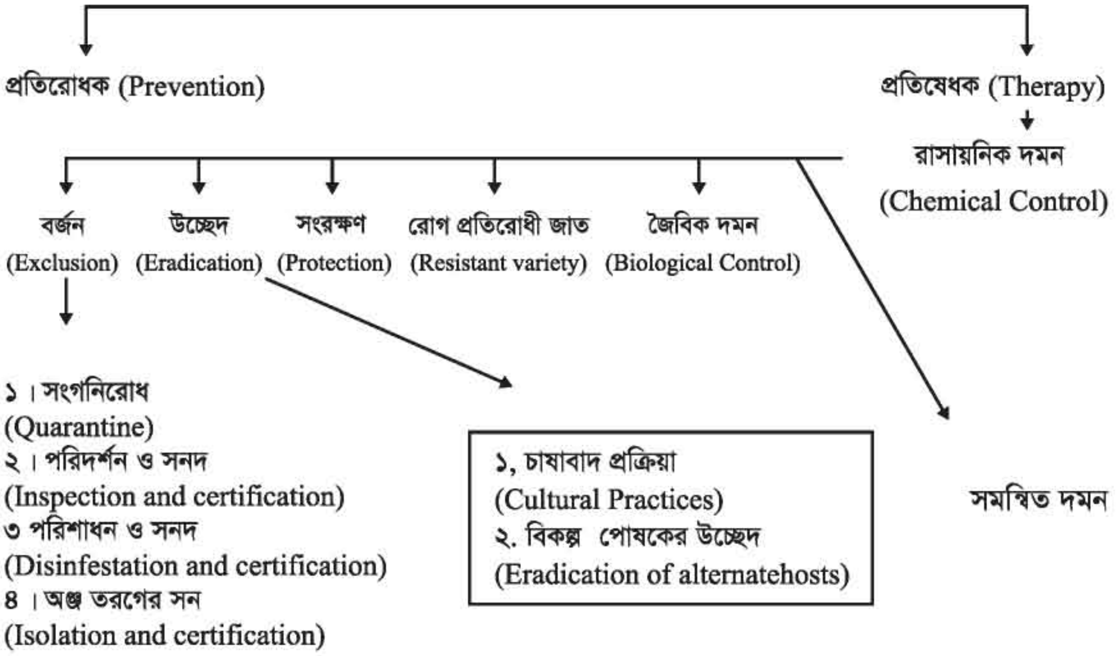

উদ্ভিদ সংগনিরোধ (Plant Quarantine)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি আইন যার মাধ্যমে কোন এলাকায় কোন নতুন বা অধিকতর শক্তিশালী রোগ জীবাণু প্রবেশে বাধা দেয়ার উদ্দেশে কৃষিজাত পণ্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বলা হয়।

১৬৬০ সালে কারবারী গাছ নিষিদ্ধ করে ফ্রান্স প্রথম উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন চালু করে। পরবর্তীতে ১৯১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল কোয়ারেন্টাইন আইন চালু হয়। বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে ক্ষতিকর বালাই আইন প্রণীত হয় যা ১৯৮৯ সালে সংশোধিত ও ১৯৯২ সালে বর্ধিত আকারে অনুমোদিত হয়ে চালু রয়েছে। কোয়ারেন্টাইল বা সংগনিরোধ ব্যবস্থাকে ২ ভাগে প্রয়োগ করা যায়। ২০২২

ক) Exclusive guarantine: এটা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কার্যকরি করা হয়। যেমন— আলুর মড়ক রোগ দেখা দিলে কোন দেশ ইচ্ছে করলে সে বৎসর পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে আলু বীজ আমদানী বন্ধ রাখতে পারে। অথবা নির্দিষ্ট কোন দেশ থেকে আলু বীজ আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।

খ) নিয়ন্ত্রিত কোয়ারেন্টাইন: এটা কিছুটা শিথিল আইন। পরিদর্শন সনদপত্র প্রদান, বীজ পরিশাধন ও সনদপত্র প্রদান এবং সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে বীজ আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উপরোক্ত আইন সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের জন্য দরকার পোষক ও রোগজীবাণুর প্রাকৃতি ও রোগ বিভারের ধরনের উপর সম্যক জ্ঞান।

কোয়ারেন্টাইন আইন কোন দেশের প্রবেশ পথে বিমান বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর, স্থল বন্দর ইত্যাদি কার্যকরী করা যায়। ঐ সব পথে কোয়ারেন্টাইন বস্তু পরীক্ষা করা হয়। কোয়ারেন্টাইন বস্তু বলতে বোঝায়, চারা গাছ, গাছের পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড, মূল বা মূল সমষ্টি, বীজ সমষ্টি, বীজ, মাটি টবের গাছ ইত্যাদি যাদের মাধ্যমে অনাকাংখিত রোগজীবাণু বাহিত হতে পারে।

প্রবেশ পথে রোগজীবানুকে তিনটি শ্রেণিতে বিবেচনা করে কোয়ারেন্টাইন বস্তু পরীক্ষা করা হয়। যথা-

শ্রেণি ক: যে রোগজীবাণু কোন এলাকায় সম্পূর্ণ নতুন ও শক্তিশালী। যেমন- বাংলাদেশের জন্য 'Septoria nodorum' (গমের ব্লচ রোগ), সিনকাইট্রিয়াম এন্ডাবোয়োটিকাম (আলুর ওয়ার্ট রোগ)।

শ্রেণি খ: যে রোগজীবাণু নতুন নয় কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী যেমন: ফাইটোপথেরা ইনফেসটানস (আলুর মড়ক রোগ)।

শ্রেনী গ: যে রোগ জীবাণু সব সময় কিছু না কিছু রোগ ছড়ায় তবে মারাত্মক নয়। বাইপালোরিস অরাইজি (ধানের বাদামি দাগ রোগ)।

চাষাবাদ পদ্ধতি (Cultural practices)

চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমেও ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন ভাল এবং সুস্থবীজ বাছাই করে বপন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জমি তৈরি, ভালোভাবে জমি চাষ দেয়া, সুষম সার ব্যবহার, শস্য পর্যায় বা জমি পতিত রেখে, আগাছা দমন করে, পরিষ্কার সেচের পানি ব্যবহার, পরিপক্ক ফসল কাটা, ফসলের আবর্জনা পরিষ্কার, ফসল সঠিকভাবে শুকানো ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে রোগ-জীবানু এড়িয়ে চলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে সুস্থ বীজ বপন করলে বীজ বাহিত রোগের তীব্রতা কমে। জমিতে পটাশ সারের অভাব হলে ধানের কাণ্ড পঁচা রোগ যেমন বেশি হয়, তেমনি নাইট্রোজেনের আধিক্যে ধানের ব্লাস্ট ও ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ বেশি হয়।

আগাছা অনেক রোগজীবাণুকে আশ্রয় দেয়। যেমন- বন্য বেগুন গাছ কেটে ফেললে আলুর মড়ক রোগ এড়ানো যায়। শস্য পর্যায় অবলম্বন করে বায়ু বাহিত রোগ লিফ রাষ্ট, পাউডারি মিলডিউ, অলটরনারিয়া ব্লাইটের তীব্রতা কমানো যায়। জমি পতিত রেখে কৃমি জনিত শেকড়-গিট, গোড়াপচা ও মুল পঁচা রোগ দমন করা যায়।

উচ্ছেদ (Eradication)

ও প্রধান পাষক বা বিকল্প পোষক ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ দমন করা যায়।

জৈবিক দমন (Biological Contorl)

উদ্ভিদ রোগ জীবাণুকে জীবিয় এজেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রণকে জৈবিক দমন বলে। এ সমস্ত এজেন্টকে এন্টাগনিষ্ট বলে। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি কৃত্রিম এন্টাগনিস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এন্টাগনিস্ট-এর বৈশিষ্ট্য হলো এরা উদ্ভিদের রোগ উৎপাদন করে না।

মাটিতে বা পত্রপৃষ্ঠে রোগজীবাণু ও এন্টাগনিষ্ট একত্রে বাস করে। এ দুয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। ভারসাম্য বজায় থাকলে ফসলে রোগ হয় না বা তীব্রতা কম থাকে। কিন্তু ভারসাম্য ক্ষুন্ন হলে

২০২২

অর্থাৎ এন্টাগনিস্ট যদি শক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে ফসলের রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি মহামারী দেখা দিতে পারে। এন্টাগনিস্ট-এর শক্তি বৃদ্ধি করে এ ভারসাম্য পুনরায় স্থাপন করা যায়।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে এটা করা যায়। যেমন-

১। হাইপার প্যারাসিটিজম: এখানে এন্টাগনিষ্ট রোগজীবাণুর রোগ সৃষ্টি করে।

২। আরোপিত প্রতিরোধ: রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাশীল ভাইরাস স্ট্রেন অনুপ্রবেশের দ্বারা উদ্ভিদের প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে পরবর্তীতে অধিকতর শক্তিশালী ভাইরাস ঐ গাছের রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। রোগ জীবাণু দমনের এ কৌশলকে Cross Protection বলে।

৩। ব্যাকটেরিয়া ও ফাজ প্রয়োগ: ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস প্রয়াগের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস।

৪। ফাঁদ শস্য: কিছু শস্যের সংস্পর্শে আসলে কৃমি খাদ্যাভাবে মারা যায়। তিতা বেগুন জমিতে লাগালে কৃমির সংখ্যা কমে যায়।

৫। বৈরীভাবাপন্ন গাছ: এসপারাগাস ও মেরিগোল্ড প্রভৃতি গাছের মুল থেকে বিষাক্ত পদার্থ (পটাশিয়াম সায়ানাইড) বের হয় বলে সংবেদনশীল শস্যের সাথে এদের মিশ্র ফসল চাষ করলে কৃমির সংখ্যা কমে যায়।

৬। মিশ্র ফসল: পোষক ও অপোষক শস্য মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করলে অপোষক গাছ রোগজীবাণুর সহায়ক নয় বলে পোষাকের রোগের তীব্রতা কমে যায়।

৭। বীজবাহিত রোগ: এন্টাগনিস্ট ব্যাকটেরিয়া পাউডার বীজের সাথে মিশ্রিত করে বীজ বপন করলে বীজের পচন। চারার বরাইট ইত্যাদি রোগ কমে যায়।

৮। মাটির জৈব সংশোধন: সবুজ সার, করাতের গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া, সরিষার খৈল, ছাই ইত্যাদির দ্বারা মাটি পরিশোধন করলে মাটিতে উপকারী অণুজীবের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে ফসলের রোগের তীব্রতা কমে যায়।

পোকা দমনের মত উদ্ভিদ রোগের জৈবিক দমন এখনও কার্যকরীভাবে ব্যবসায়িকভিত্তিতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। কিন্তু ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া Antagonist হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। যেমন Trichoderma harzianum নামক ছত্রাক।

উদ্ভিদ নির্যাস দ্বারা রোগ দমন (Plant extract)

উদ্ভিদের নির্যাস ব্যবহার করে উদ্ভিদের রোগ দমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদশেও উদ্ভিদ রোগ দমনে উদ্ভিদ নির্যাস সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন- রসুনের রস (পানি: রসুন -১:১) কিংবা মান্ডার পাতার রস (পানি ও পাতা = ১৪১) দ্বারা বীজ শাধেন করলে চযড়সড়ংরং বহীহধং অনেক বীজবাহিত ছত্রাককে দমন করা যায়।

রোগ প্রতিরোধীজাত ব্যবহার (use of disease Resistant variety)

রোগ প্রতিরোধী বলতে পোষাকের দ্বারা পরজীবীর আক্রমণ প্রতিহত করার মতোক বুঝায়। পোষাকের এই ক্ষমতা নিজস্ব বংশ পরম্পরায় স্থায়ী। এটা জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা প্রকট (dominant) ও রোগ সংবেদনশীল প্রচ্ছন্ন বিশিষ্ট্য! প্রকট জিন যে জাতে থাকে সে জাত রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পন্ন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে (নির্বাচন, সংকরায়ন, টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) এ প্রকট "জিন" সংবেদনশীল জাতে স্থানান্তর করা যায়। রোগপ্রতিরোধ জাত ব্যবহারই হচ্ছে উদ্ভিদ রোগ দমনে উত্তম ও আধুনিক পন্থা।

২০২২

রাসায়নিক দমন (Chemical Control):

উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টির পূর্বে বা পরে রোগনাশক প্রয়োগে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় । কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে রোগনাশককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা-

১) প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক

২) নিরাময়কারী রোগনাশক এবং অ্যান্টিবায়োটিক

প্রতিরক্ষামূলক (Preventive) রোগনাশক

এগুলো প্রতিরোধের লক্ষে রোগাক্রমণের পূর্বে বা শুরুতে প্রয়োগ করা হয় । প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক অজৈব ও জৈব রাসায়নিক প্রকৃতির হতে পারে । রোগ দমনের ঔষধগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- তাম্র ঘটিত রাগ নাশক, গন্ধক ঘটিত রোগনাশক, জৈবরোগনাশক (ঔষধ), পারদ ঘটিত রোগ নাশক এবং ধুম্র উৎপাদক মাটি পরিশাধেক । অধিকাংশ ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগ ঔষধ প্রয়োগে দমন করা যায় । ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ঔষধ ব্যবহারে তেমন ফল লাভ হয় না বরং বীজ পরিশোধন দ্বারা রোগ বিস্তার রোধ করা হয় । ভাইরাস রোগ আক্রান্ত গাছকে সুস্থ করার কোন ঔষধ নেই, কেবলমাত্র আক্রান্ত গাছে কীটনাশক ছিটিয়ে জাবপোকা, হপার প্রভৃতির বিস্তৃতি রোধ করা যায় । ভাইরাস হতে পরিত্রাণের লক্ষে সুস্থ গাছ হতে বীজ নেয়ার ব্যবস্থা করা হয় । নেমাটোড জনিত রোগ ও অন্যান্য কোন কোন রোগের বেলায় মাটি পরিশোধন করতে হয় ।

সাধারণত আক্রান্ত গাছ কিংবা অজাকে রক্ষা করা ও রোগকে সরাসরি দমন করার উদ্দেশে তাম্র ঘটিত, গন্ধকঘটিত ও জৈব ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয় । পারদ ঘটিত ঔষধ গুঁড়ার আকারে ডাস্টিং এর কাজে ব্যবহার করা হয় বীজ শাধেনের জন্য । ফিউমিগ্যান্ট বা ধুম্র উৎপাদক ঔষধ ব্যবহৃত হয় মাটি শোধনের জন্য । বোর্দোমিকচার সহ কয়েকটি ঔষধ নিজেরাই তৈরি করে নেয়া যায় । যে সব স্থানে বোর্দোমিকচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । সেখানে বোর্দো মিকচারের স্থানে অন্যান্ন তাম্র ঘটিত ঔষধ যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড, কপার-এ- কম্পাউন্ড, কুপ্রাভিট ও পেরেনকসের যে কোনটি প্রযোজ্য ।

উপরে বর্ণিত রোগনাশকগুলো গাছ বিশোষণ করে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা করলেও তা সর্বাঙ্গে ছড়ায় না । সাধারনত এগুলো স্থানীয় ভিত্তিতে কাজ করে । এগুলো গাছের রোগের আক্রমণ কমায় তাতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু আক্রান্ত গাছকে রোগমুক্ত করে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে না ।কিছু কিছু রোগ-নাশক আছে যা গাছে বিশোষিত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের দেহের মধ্যে জীবাণু থাকলে অথবা প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাকে ধ্বংস করে এবং রোগ নিরাময় করে গাছকে সুস্থ করে । নিরাময়কারী রোগনাশক সিস্টেমিক বা সর্বাঙ্গবাহী, অক্সামিন, পিরাসিডিন ও বেঞ্জি মিডাজেল শ্রেনীর, সিস্টেমিক প্রকৃতির অক্সামিন, ভিটাভেক্স ও পরান্ট ভ্যাক্স । পিরামিডিন-মিলকার্ব, মিলটেক্স বেঞ্জি মিডোজল- বেনোমিল-এবং ব্যাভিস্টিন অ্যান্টিবায়াটিক রোগনাশক এটি .অণুজীব থেকে উৎপন্ন এক প্রকার দ্রব্য যা অন্যান্য অনুজীবের ক্ষতি কারক । সিস্টেমিক রোগনাশকের ন্যায় এটিও সর্বাঙ্গীয় প্রকৃতির । স্ট্রেপটোমাইসিন, এগ্রিমাইসিন এক্টিডাওন, ব্লাস্টিসিডিন, কাসুমিন বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক রোগনাশক ।

সমন্বিত রোগ দমন (Integrated Pest Management-IPM)

উদ্ভিদের সবগুলো রোগ দমন পদ্ধতি সমানভাবে কার্যকরী নয় এবং রাসায়নিক পদ্ধতি তাৎক্ষণিক কার্যকর হলেও রোগনাশক পরিবেশ দুষন করে । রোগ প্রতিরোধীজাত উন্নয়ন সময় সাপেক্ষ ও অন্যান্য পদ্ধতি ব্যয় বহুল ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত না করে উদ্ভিদ রোগ দমনের সকল কার্যকর উত্তম পদ্ধতিগুলোর সমন্বয় সাধন করে রোগ দমনের যে পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা তাই সমন্বিত রোগ দমন। সুস্থ সবল রোগ জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহার, পরিচ্ছন্নভাবে জমি তৈরি, আগাছা দমন, সুষম সার প্রয়োগ, রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার, মাঠে রোগ দমনে কার্যকর রোগনাশকের ন্যূনতম ব্যবহার ও উপযুক্ত সময় ফসল উত্তোলন ইত্যাদি ওচগ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দিক।

রোগনাশকের নাম ও প্রয়োগ মাত্রা

বাংলাদেশে ব্যবহার জন্য অনুমোদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত কিছু রোগনাশকের নাম ও প্রয়োগে মাত্রা নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো-

সারণি-১

ক্র নং	সাধারণ নাম	বাণিজ্যিক নাম	যে রোগ দমনের জন্য অনুমোদিত	প্রয়োগ মাত্রা
১	বোর্দোমিকচার+ কুম্রানেল	ম্যাকুপ্রাক্স ৬৫%	চা এর কাণ্ডের মরিচা রোগ, পাতা পচা রোগ	২.২৫ কেজি/হেঃ
২	কপার অক্সিক্লোরাইড	কুপ্রাভিট ৫০ ডবিউপি	কলাপাতার দাগরোগ, লেবুর আগা শুকিয়ে যাওয়া, চা-এর কাণ্ডের মরিচা, । পাতা পঁচা ও বাউন গ্রে রোগ	৩.৪ কেজি/হেঃ
৩	প্রোপিকো নাজল	টিল্ট ২৫০ ইসি	পেয়ারার এন্থ্রাকনাজে, কলার সিগাটোকা, আমের একনাজে ও পাউডারি মিলডিউ, লেবুর ডাই ব্যাক/উইদারটিপ ও স্ক্যাবরোগ, কাঁঠালের ফল পচা	০.৫ মিলি/লিঃ পানি
৪	থায়পেনেট	টপসিন ৭০ ডবিউপি	পেয়ারার এনথ্রাকনোজ	১ গ্রাম/লিঃ পানি
৫	কার্বেনডাজিম	এমকেজি/ব্যাভিস্টিন/ নাউেইন ৫০ ডবিউপি	আম ও পেয়ারার এনথ্রাকনোজ, কলার । সিগাটোকা, আনারসের উইল্ট রোগ	১ গ্রাম/লিঃ পানি
৬	মেনকোজেব	ডাইথেন এম-৪৫	আম ও পেয়ার এনথ্রাকনোজ, কাঁঠালের ফল পঁচা	২.২৫ কেজি/হেঃ
৭	মেটালেকিল+ মেনকোজেব	রিডামেল এম জেড ৭২ ডবিউপি	পেয়ারার ডাই ব্যাক/মড়ক	২৫ কেজি/হেঃ ২ গ্রাম/লিঃ পানি
৮	সালফার	থিয়াভিট ৮০ ডবিউপি	তরমুজের পাউডারী মিলডিউ, লেবু। জাতীয় গাছের পাউডারী মিলভিউ	২.২৫ কেজি/হেঃ ০.২ মিলি/লিঃ পানি
৯	কপার	চ্যাম্পিয়ান ৭৭ ডবিউপি	আমের এনথ্রাকনোজ, কলার লিফ স্পট।	২ গ্রাম/লিঃ পানি
১০	মেটালেক্সিল+ মেনকোজেব	জেলরেন এম	আলু ও টমোটোর মড়ক, শসার ডাউনিমিলডিউ রোগ	২ গ্রাম/লিঃপানি

২০২২

রোগের নাম, ফসলের নাম ও রোগনাশকের নামসহ প্রয়োগ মাত্রা

সারনি-২

ক্র নং	রোগের নাম	ফসলের নাম	রোগের কারন	রোগ নাশকের নাম	প্রয়োগ মাত্রা
১	আগামরা (Die Back)	আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু, লিচু	ছত্রাক	নোইন/ রিডোমিল	২ গ্রাম/লি: পানির সাথে
২	সুটি মোল্ড (Shooty mould)	আম, পেয়ারা, কলা	ছত্রাক	ব্যাভিস্টিন-৫০ এম	১ গ্রাম /লি: পানি
৩	ফোসকা পড়া (Anthracnose)	আম, পেয়ারা, কলা	ছত্রাক	বেনলেট, ডায়থেন এম-৪৫, ব্যাভিস্টিন, টিল্ট২৫০ ইসি, রাভেরাল টপসিন নাইেন/ভালক	৪ গ্রাম/লি: পানি ১ গ্রাম/লি:পানি ০.৫ মিলি/লি: পানি ২-৪ গ্রাম/ লি: পানি
৪	লাল মরিচ (Red Rust)	আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা	ছত্রাক	কুপ্রাভিট -৫০ ডবিরউপি	৫ গ্রাম/লি:পানি বা ৩-৪ কেজি /হে:
৫	পাউডারিমিলডিউ (Powdery mildew)	আম, কুল, পেঁপে	ছত্রাক	ডাইনাক্যোপ টিল্ট ২৫০ ইসি সালফা টক্স (০.২%) ওভিট (০.৩%	মিলি/লি: পানি ১ গ্রা লি: পানি ৫ গ্রাম/লি: পানি
৬	বৃন্ত পচা (Stem end rot)	আম, পেঁপে, কলা	ছত্রাক	ডায়থেন এম ৪৫ ব্যাভিস্টিন ডবিরউপি ৫০	৪ গ্রাম/লি: পানি ১ গ্রাম/লি: পানি
৭	সিগাটোকা (Sigatoka)	কলা	ছত্রাক	এমকোজিম/ ব্যাভিস্টিন / টিল্ট	১ গ্রাম/লি: পানি
৮	পানামা (Panama)	কলা	ছত্রাক		
৯	ফল পঁচা	আম, কলা, পেঁপে	ছত্রাক	ডাইথেন এম -৪৫ পেরেনক্স	৩-৪ গ্রাম/লি: পানি ২.২ গ্রাম/ ৪-৫ লি: পানি
১০	গুচ্ছ মাথা (Bunchy top)	কলা	মাইকোপরা জমা	সেভিন-৮৫ ডবিউপি সুমিথিয়ন/মেটা সিসটক্স	১.৭ কেজি/হে: ১.১২ লি:/হে:

২০২২

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল গাছের রোগ ব্যধিসমূহকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ?

২। রোগ দমন কর্মসূচির মূলনীতি কয়টি ?

৩। কৃষি ক্ষেত্রে শক্তিশালী রোগজীবাণুর আবির্ভাব কিভাবে ঘটে ?

৪। কীভাবে রোগজীবাণু অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কলার প্রধান প্রধান রোগগুলোর নাম লেখ।

২। আমের বৃন্ত পচা রোগ কোথায় দেখা যায় এবং কিভাবে আক্রমণ করে লেখ।

৩। বোর্দো পেষ্ট তৈরির উপাদানের নাম ও অনুপাত লেখ।

৪। বোর্দো মিকচার কোন কোন রোগে ব্যবহৃত হয় ব্যাখ্যা কর।

৫। কুলের পাউডারী মিলডিউ রোগের লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা কর।

৬। ফল ও ফল গাছে রোগ সৃষ্টির কারণগুলো কি কি।

৭। আই পি এম বলতে কী বোঝায় লেখ।

৮। এন্টাগনিস্ট বলতে কী বোঝায় লিখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফলের প্রধান প্রধান ১০টি রোগের নাম, ফসলের নাম ও রোগের কারন লিপিবদ্ধ কর।

২। পেয়ারার ফোসকা ও উইলট রোগ দমনের উপায় লেখ।

৩। সমন্বিত রোগ দমন বলতে কী বাঝায় আলোচনা কর।

৪। কলার পানামা রোগ, পেয়ারার ক্যাংকার ও কুলের পাউডারি মিলডিউ রোগ দমন সম্পর্কে লেখ ।

৫। বোর্দো মিকচারের প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।

২০২২

নবম অধ্যায়

ফল সংগ্রহ ও বাছাইকরণ পদ্ধতি

ফসলের লাভজনক ফলন এবং তার গুণাগুণ শুধু উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না। সাথে সাথে সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ এবং সংগ্রহ প্রণালির ওপর ও তা অনেকটা নির্ভর করে। ফসল সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফলকে উৎপাদন পর্যায় হতে ব্যবহারিক পর্যায় আনা হয়। যত্নের সাথে এ কাজের তদারকি এবং সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহের ফলে আমরা পাই আর্থিক মূল্য সম্পন্ন গুণগতমানের ফসল এবং এর বর্ধিত খাদ্য উপাদান। ফল অক্ষত অবস্থায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য এবং উৎকৃষ্ট মানের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য দ্রব্য তৈরি করার জন্য ফসল যথা সময়ে সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা অনবীকার্য। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের লক্ষ্য অনুযায়ী ফসল যখন নিজ নিজ জাতের সর্বোৎকৃষ্ট আকার, রং, স্বাদ এবং গুণাগুণ অর্জন করে, তখনই ফসল সংগ্রহ করা উচিত। অপরিপক্ক ফল সংগ্রহ করলে যেমন গুণাগুণ বজায় থাকে না তেমনি চাষী ফলের ন্যায্য মূল্য পায়না। আবার বেশি পরিপক্ক হলেও গুণগত মান তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে ফল দ্রবত পচেযায়। যার ফলে বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। ফলের পরিপকৃত এমন একটি অবস্থা যখন ফলের আকার ও আয়তন এবং বয়সের সর্বশেষ অবস্থা, অর্থাৎ এরপর ফলের আকার ও আয়তন আর বৃদ্ধি পায় না। ফল পাকার অর্থ হলো পরিপকৃতার পর ফলের গুণাগুণের এমন পরিবর্তন , যার মাধ্যমে ফল ভক্ষণযোগ্য বা খাবার উপযোগী হয়। ফল পাকার সাথে সাথে ফলের রং, গন্ধ ও বুনটের পরিবর্তন হয়, যার দর"ন ফল ভোক্তার নিকট গ্রহণ যোগ্য হয়।

ফলের পরিপকতা

ফলের পরিপক্কতা এমন একটি অবস্থা যখন ফল আকার, আয়তন এবং বয়সে সর্বশেষ অবস্থায় পৌছে অর্থাৎ এর পর ফল আর আকার ও আয়তনে বৃদ্ধি পায় না। কিছু লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্বতা নিরুপণ করা যায়। এই লক্ষণ গুলো কে ফলের পরিপকৃতার লক্ষণ বা (Maturity Index) বলা হয়। ফল ধারণ থেকে দিবস সংখ্যা, আকার, আকৃতি, রং, বুনট, আপেক্ষিক ঘনত্বের পরিমান, দ্রবনীয় শক্ত পদার্থ, চিনি, অম্লের হার এবং চর্বির পরিমাণ ইত্যাদি পরিপক্বতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ফল সংগ্রহের পূর্বে ফলের পরিপক্কতা দেখে সংগ্রহ করা উচিত। ফল সগ্রহের সময়ের ওপর নির্ভর করে ফলের বাহ্যিক সতেজতা, ফলের স্বাদ, গুণাগুণ, গন্ধ ও আকার ইত্যাদি। ফল বর্ধনের তিনটি ধাপ বিদ্যমান। যেমন—

১। বাড়ন্ত (ফুল হতে গুটি ধারন করে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত)

২। পরিপক্বতা (ফল উপযুক্ত হওয়ার পর সংগ্রহ করার পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত) এবং

৩। পরিপক্কতার পর পেকে উঠা বা ফিজিওলোজিক্যাল ম্যাচুরিটি।

ফল তোলার জন্য ফলের পরিপক্বতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। কারণ ফল পাকা অবস্থাতেই খাওয়ার উপযুক্ত হয়। উদাহরণ- কলা, জাম, আনারস, পেয়ারা, বেল, পিচ, আঙ্গুর, লিচু ইত্যাদি একমাত্র পরিপক্ক অবস্থাতেই খাওয়া যায়। ফলের মধ্যে এমন অনেক ফল আছে যে গুলোর শ্বসন কাজ হল তালোর পর রুদ্ধ হয়ে যায়। শ্বসন কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে তার মধ্যে সঞ্চিত শর্করা বা শ্বেতসার থেকে চিনিতে রূপান্তর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যেমন- আংগুর, লেবু, জাম্বুরা, লিচু, ইত্যাদি।

আবার ফলের মধ্যে এমন অনেক ফল আছে যে গুলার শ্বসন কাজ ফল তোলার পরও চলতে থাকে। এমনকি ফলের পরিপক্কতার সাথে সাথে শ্বসন কাজ বাড়তে থাকে এবং ফলের মধ্যে সঞ্চিত শর্করা বা শ্বেতসার চিনিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে বেল, কামরাঙ্গা, আমড়া, ইত্যাদি। তাই এ জাতীয় ফল পরিপক্ক অবস্থা হতে খাওয়ার উপযোগী বা উপযুক্ত হওয়ার সময়ের মধ্যে পড়তে হবে। এরপর

পরিবহন ও বাজারজাতকরণের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

বিভিন্ন লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্কতা নিরূপণ করা হয়। বিশেষ অবস্থায় ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। যেমন-

ক) বাড়ন্তবস্থায় ফল রোগাক্রান্ত হলে অপরিপক্ক অবস্থায় পরিপক্ক ফলের মত রং ধারণ করে।

খ) জমিতে রস ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকলে অপরিনত বয়সের ফল পরিপক্ক দেখায়।

গ) জমিতে রসের ও পুষ্টি উপাদানের পরিমান বেশি থাকলে এবং তাপমাত্রা কমে গেলে ফলের পরিপক্বতা বিলম্ব হয়।

ঘ) পোকা মাকড়ের আক্রমণ হলে ফল অপরিণত বয়সে পেকে যায়।

ঙ) হঠাৎ অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়ায় পরিণত বয়সেও ফল পরিপক্ব হয় না। ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা যায় দু'ভাবে যথা-

১। বাহ্যিক অবস্থা দেখে ও।

২। অভ্যন্তররীণ পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে

১। বাহ্যিক অবস্থা: ফল ধারণ থেকে দিনের হিসাব, ফলের আকার ও আকৃতি, ফলের রং, ফলের ওজন, ফল শক্ত বা নরম, ফলের ত্বকের গন্ধ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে।

২। অভ্যন্তররীণ: শর্করা বা শ্বেত সারের পরিমাণ, মিষ্টতার পরিমান, ফলের কষ বা রসের ঘনত্ব, বীজের পরিপুষ্টতা, ভক্ষণযোগ্য অংশের ঘনত্ব (শক্ত বা নরম অবস্থা) , আঁশের পরিমাণ, আঁশের দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে।

ছক: বাহ্যিক পরিবর্তন দেখে ফলের পরিপক্কতা নিরুপণ:

ফলের নাম	ফুল ধরা হতে পরিপক্ক অর্থাৎ উপযুক্ত হওয়ার সময় (দিন)	ফলের শরীর তাত্বিক পরিবর্তন/বাহ্যিক পরিবর্তন
(ক) আম	৯০-১২০ দিন	১। ফলের চামড়া ফিকে সবুজ রং ধারণ করে। ২। পরিপক্ক সবুজ আমের বোটা ছিড়লে কষ বের হতে থাকে এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ৩। আম পরিপক্ক অবস্থায় পানিতে ডুবে যায়। ৪। স্বাভাবিক অবস্থায় গাছ থেকে দুএকটা আধাপাকা আম ঝরে পড়ে। ৫। আমের বোটার কষ স্বচ্ছ বিন্দুর মতো দেখায়।
(খ) কলা	৯০-১২০ দিন	১। কলা পরিপুষ্ট হলে শিরাগুলো সমান হয়ে মোটামুটি গোলাকার হয়ে যায়। ২ কলার খোসা মসৃণ হয় ও হালকা সবুজ রং দেখা দেয়। ৩। কলার কাদির গোড়ার দিকের কলায় হলদে রং দেখা দেয়। ৪। কলার পিছনের ফুল শুকিয়ে যায়।
(গ) আমড়া	৬০	১। আমড়া পরিপুষ্ট হলে চামড়া টান টান ও মসৃণ হয়। ২। আমড়ার বোটার চারদিকে সামান্য দূরে ফিকে হলদে ও উজ্জ্বল বর্ণ হয়। ৩। পরিপুষ্ট আমড়ার গায়ে ফোটা ফোটা কালচে চিহ্ন দেখা দেয়।

২০২২

(খ) কামড়াঙ্গা	৬০	১। পরিপুষ্ট ফল সামান্য হলদে হয় ও ফলের ত্বক উজ্জ্বল হয়। ২। শিরাগুলোর মাঝের গভীরতা কমে যায় অর্থাৎ শিরা গুলো নিচের দিকে মোটা হয়ে যায়। ৩। হাতে নিলে ভারি অনুভূত হয়।
(গ) বেল	১ বৎসর	১। পরিপক্ব ফলের গায়ের রং হালকা হলদে ভাব হয়। ২। বোটায় চাপ দিলে বোটা খসে যায় এবং বোটার সংযোগস্থানে সামান্য ঢেউ খেলানো গর্ত হয়ে যায়। ৩। ফলের গায়ে টোকা দিলে টন টন শব্দ করে। ৪। সামান্য জোরে আঘাত করলে ফলের চামড়া ফেটে যায়। ৫। হাতে নিলে হালকা অনুভূত হয়।
(ঘ) পেঁপে	২০	১। পেঁপের রং ঘন সবুজ থেকে হালকা সবুজাভ হলুদ হতে থাকে। ২। পেঁপের কষ স্বচ্ছ পানির মত হতে থাকে। ৩। বোটার চারদিকে হালকা হলুদ রঙের উজ্জ্বল আভা দেখা যায়। ৪। পেঁপের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে কষ বের হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমে যায়।
(ঙ) আনারস	১১০	১। আনারসের চোখগুলো সামান্য হলুদ রং ধারণ করে ২। চোখের মধ্যস্থল চ্যাপ্টা দেখায় এবং চারপাশে সামান্য ফুলে উঠে ৩। আনারসের নিচের দিকে হালকা হলুদ রং ধারণ করে। ৪। চোখের উপরের খোসাগুলো ধীরে ধীরে শুকায়ে যায়।

ফল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি

মানুষের শরীর সুস্থ, সবল ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে ফলের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ফলের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সঠিক সময়ে গাছ থেকে ফল পাড়া অতীব জরুরি। ফলের ভালো ফলন এবং তার গুণাগুণ শুধু উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের ওপর নির্ভর করে না। সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে ফল সংগ্রহ করার উপরও ফলের গুণাগুণ এবং লাভ নির্ভর করে। অনেক সময় অনেক বেশি মূল্যে বিক্রির জন্য কাঁচা ফলই বাজারে উঠায়। এটা মোটেই উচিত নয়। মাঝে মাঝে কঁচা ফলকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পাকা রঙ ধারণ করায়ে বাজারে বিক্রয় করে। এতে অনেকে প্রতারিত হয়। লোকে জানাজানি হলে এ ধরনের ফল আর ক্রয় করতে চায় না। এতে উৎপাদক, বিক্রেতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ফল এমন অবস্থায় পড়তে হবে যাতে পাড়ার পর অতি অল্প সময়ে পাকে এবং কেউ প্রতারিত না হয়।

ফল তরতাজা রাখার জন্য সংগ্রহের সময় বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সংগ্রহের সময় ফল ক্ষতিগ্রস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে বাজার মূল্য ও পুষ্টিমান কমে যায়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আর্থিক ক্ষতি হবে। তবে ফলের মান বজায় রাখার জন্য পরিপুষ্ট অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা উচিত। ফল সংগ্রহের জন্য কিছু উপকরনের প্রয়োজন হয়, যেমন- কঁচি, ছুরি, মই, রশি, ব্যাগ, ধারালো দা ইত্যাদি। ফল সংগ্রহের প্রাককালে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হবে, যেমন-

ক) ফলের পরিপক্কতার উপযুক্ত বয়সে সংগ্রহ করতে হবে।

খ) পরিষ্কার আবহাওয়ার সময় ফল পাড়তে হবে।

গ) ফল পাড়ার সময় সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ফল আঘাত না পায় বা থেতলিয়ে না যায়।

ঘ) সাবধানতার সাথে ফলগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে হবে।

ঙ) ফল জড়ো করার শানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ছায়াযুক্ত হতে হবে।

২০২২

ঙ) ফল পাড়ার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। সাধারণত দু'ভাবে ফল সংগ্রহ করা যায়। যথা-

১। হাত দিয়ে তোলা বা পাড়া এবং

২। মেশিনের সাহায্য পাড়া।

১। হাত দিয়ে তোলা বা পাড়া: উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই বেশির ভাগ ফল সতেজ অবস্থায় বিক্রির জন্য হাত দিয়ে পাড়া হয়। হাত দিয়ে ফল পাড়ার কতগুলো সুবিধা আছে। যেমন-

- অনেক বেশি যত্ন সহকারে ফল পাড়া যায়।
- একসাথে অনেক লোককে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- হাত দিয়ে ফল পাড়তে এক সাথে বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না।
- অপরিপুষ্ট বা যে ফল আরও কিছু সময় গাছে রাখা যাবে সেগুলো বাদ দিয়ে সংগ্রহ করা যায়।
- ফল পাড়ার সময় সহজেই চারদিকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে ফল পাড়া যায়।

চিত্র: হাত দিয়ে ফল পাড়া

হাত দিয়ে পাড়ার অসুবিধাগুলো

- ফল পাড়তে বেশি সময় লাগে।
- জরুরি ভিত্তিতে বেশি লোকে দরকার হলে অনেক সময় চাহিদামত লোক পাওয়া যায় না।
- কোন ফল কোন বয়সে সংগ্রহ করতে হবে সে বিষয়ে সকল শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন হয়।

২। মেশিনের সাহায্যে ফল পাড়া: হাত দিয়ে ফল পাড়া বেশি পছন্দনীয় হলেও অনেক সময় মেশিনের সাহায্যে ফল সংগ্রহ করতে হয়। মেশিনের সাহায্যে ফল সংগ্রহের কতগুলো সুবিধা আছে। যেমন-

সুবিধাগুলো-

- তাড়াতাড়ি ফল সংগ্রহ করা যায় বা পাড়া যায়
- কাজের পরিবেশ আধুনিক ও উন্নত মনে হয়।

১০১১

- কাজে নিয়োজিত লোকদের কাজ তদারকি করা সুবিধা জনক হয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকলে তাড়াতাড়ি ফল পাড়া যায়।

মেশিনে ফল পাড়ার অসুবিধাগুলো:

- ফল পাড়ার সময় গাছের ক্ষতি হতে পারে।
- যন্ত্র বা মেশিনের দাম অনেক বেশি যা সকলের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয় না।
- ছোট বাগান বা অল্প সংখ্যক গাছের জন্য মেশিন দিয়ে ফল সংগ্রহ করা লাভজনক হয় না।
- যেখানে শ্রমিক সহজলভ্য সে এলাকায় মেশিন ব্যবহারের ফলে লোকের কাজ করার সুযোগ কমে যাবে, ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।
- মেশিন ব্যবহারের জন্য বড় বড় বাগান তৈরি করতে হয়।
- মেশিনে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত, ছোট/বড়, উত্তম/খারাপ সব ফলই এক সাথে সংগ্রহ হয়ে যায়।

ফল পাড়ার সময় বা ছিড়ার সময় যে সব ফল আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো কাচি দিয়ে কেটে পাড়া উচিত। যে সব ফল হাতের নাগালের মধ্যে থাকে না সে গুলো গাছে উঠে অথবা জালি বাধা বাঁশের লাঠির সাহায্যে পারা উচিত। তাতে লাঠির মাথার জালির মধ্যে করে আস্তে আস্তে ফল পাড়া যায়। আবার লাঠির মাথায় ছুরি বা কাচি বেধে বোটা কেটে ফল পাড়া যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল যে পাড়তে উঠে তার কাঁধে থলে বা ঝুড়ি ঝুলায়ে রাখলে সুবিধাজনক হয়।

ফল পাড়ার আগে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে ফল কি উদ্দেশ্যে পাড়া হচ্ছে। কেননা আচার বা টক জাতীয় খাদ্য দ্রব্য হিসেবে ফল সংরক্ষণ করতে হলে অপরিপক্ক অবস্থায় অনেক সময় ফল পাড়তে হয়। অন্যদিকে জুস জাতীয় খাদ্য দ্রব্য তৈরি করতে হলে বেশি পাকানোর প্রয়োজন হয়। ফল টাটকা অবস্থায় দূরে পাঠাতে হলে সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট অবস্থায় পড়তে হয়। অনেক সময় বেশি দূরে পাঠাতে হলে ফল পাকার ৪-৫ দিন আগেও পাড়তে হয়। ফল পরিপুষ্ট হলে বিভিন্ন ফলের জাত বিশেষে সর্বোৎকৃষ্ট আকার, রং, স্বাদ, গন্ধ এবং গুণাগুণ অর্জন করে। আর তা ক্রেতার নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হয়

চিত্র: লাঠির আগায় জালির সাহায্যে ফল পাড়া

ফল পাড়ার পূর্বে বিবেচ্য বিষয় বা গাছ থেকে ফল পাড়ার সতর্কতা

১। পুষ্টতা সঠিকভাবে নির্ধারণে করে ফল পাড়ার কাজ শুরু করতে হবে। কারণ অপুষ্ট ফল পাড়লে তা ঠিকমত এবং স্বাদ, রং, সুবাস ইত্যাদির ঠিকমতো উন্নয়ন ঘটে না।

২। ফলের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফল সংগ্রহের কাজে শ্রমিকরা সতর্কতা ও করছে কি না তা নিশ্চিত হতে হবে। এ ছাড়া গাছে ঝাঁকি দিয়ে ফল পাড়া ঠিক নয়।

৩। গাছ মোচড়ানো, ফল মাটিতে ফেলে দেয়া, ফলের গায়ে আঘাত দেয়া, ফলের গায়ে মাটি লাগানো, সংগৃহিত ফলে সূর্যের তাপ লাগানো পরিহার করতে হবে।

৪। ফল বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

৫। গাছ থেকে ফল পাড়ার পর দীর্ঘক্ষণ গাছের নিচে জমা করে রাখা ঠিক নয়। কারণ বাতাসে ভাসমান সে জীবাণু এ সময় আমের বোটায় আক্রমণ করার সুযোগ পায় ও বোটা পচা রোগের সৃষ্টি করে।

৬। সকাল বেলা ফল পাড়া ভালা, কারণ তখন আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে, বৃষ্টি বাদলার দিনে ফল পাড়া পরিহাস, রতে হবে।

৭। কিছু বোটা সহ ফল সংগ্রহ করা ভালো। আমের ক্ষেত্রে ৩-৪ সে.মি. বোটাসহ আম পাড়তে পারলে বোঁটা পচা রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায়। অবশ্য গাছ ছোট হলে এ কাজ সহজ হয়।

৮। ফল পাড়ার জন্য সব সময় ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে। ছোট গাছের ফল পাড়ার জন্য সিকেচোর ব্যবহার। করা সুবিধাজনক।

৯। প্রত্যেক ফলের বোটায় একটি নরম জায়গা থাকে, সেখানে চাপ দিলে বোটা সহজেই ভেঙে যায়।

১০। আম পাড়ার পর কিছুক্ষণ উপুড় করে রাখা ভালো, এতে ফলের আঠা আমের গায়ে লাগতে পারে না।

ফল বাছাইকরণ।

ফল গাছ হতে সংগ্রহ করা সব ফল একই মান ও আকার সম্পন্ন হয় না। একই জাত হওয়া সত্ত্বেও ফল আকার আকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের হয়। এদের মাঝে আবার কতগুলো রোগাক্রান্ত বা পোকায় খাওয়া হতে পারে। উলিখিত সব ধরনের ফল বাজারজাত করার পূর্বে ফলকে বাছাই বা শ্রেণিভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। আকার আকৃতি ও অন্যান্য গুণাগুণ বিবেচনায় বাজারজাত করা হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ফলের দাম নির্ধারন সহজতর হয়। এতে করে ক্রেতা তার পছন্দ মত ফল ক্রয় করে সমতুষ্ট হতে পারে। ফলের উৎপাদিত অঞ্চল হতে দূরবর্তী কোন অঞ্চলে প্রেরণের উদ্দেশ্য থাকলে ফলের পরিপক্কতার মাত্রানুযায়ী বাছাই করে পৃথক পৃথক বাক্সে পাঠানো প্রয়োজন। এতে ফল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ফল সংগ্রহকালীন সময় হতে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কমবেশি ফল বাছাই সম্পন্ন হয়।

পরিপক্ব হওয়ার পর একই গাছ হতে সংগ্রহ করা ফল একইরকম গুণ সম্পন্ন হয় না। কেননা একই গাছের সব ফল এক সাথে বড় হয় না এবং একই আকৃতির হয় না। একই সাথে পরিপুষ্ট হয় না এবং একই সাথে পাকেও না। এমনকি পাকার সময় একই ধরনের রংও ধারন করে না। একই গাছের বা একই জাতভুক্ত গাছের ফল কতগুলো রোগাক্রান্ত, পোকায় খাওয়া বা শারীরিকভাবে বিকৃত হতে পারে। এমন কি একই গাছে ফুল ও ফল হওয়ার সময় যে অংশ রোদ বা আলো বাতাস বেশি পায় সে অংশের ফলের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। আবার গাছের ভিতরের দিকের বা ডালপালার ছায়ায় যে সব ফল হয় সেগুলোর মধ্যে অন্য ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। গাছের যে অংশে রোদ ও আলোবাতাস বেশি পায় সে অংশের ফল সাধারণত রোদ পোড়া, উজ্জ্বল রং বা ফলের ত্বকে ফোটা ফোটা তিলের মত দাগ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ ফলগুলো আগে পাকে এবং বেশি মিষ্টি হয়। গাছের ভিতরে বা ছায়ায় যে ফলগুলো হয় সেগুলো সাধারণত আকারে বড় হয়, ফল ও জাত বিশেষে রং সবজ বা কোমল হয় এবং মিষ্টতা কম হয়।

পাড়ার পর সমস্ত ফল একত্রে মিশানো অবস্থায় না রেখে বড়, ছোট, রোগাক্রান্ত বা পোকায় খাওয়া, অপরিপক্ক, শারীরিকভাবে বিকৃত, রঙ ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে বাছাই করে শ্রেণিবিভক্ত করা উচিত। তাছাড়া ভালো ফলের আকর্ষণীয়তা ফুটে ওঠে না। ফল দেখতে সুন্দর না হলে ক্রেতা যথোপযুক্ত দাম দিতে আগ্রহী হয় না। তাই ফল পাড়ার পর বাজারে পাঠানোর আগে বাছাই করে শ্রেণিবিভক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। খারাপ ফলগুলোকে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা যেতে পারে। ফল বাছাইকরণের সময় উচ্চমান সম্পন্ন ফলের সাথে নিম্নমানের ৫-১০ ভাগ মিশ্রন গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে। সাধারণত আকার, আকৃতি, রং, পরিপক্বতার মাত্রা, রোগাক্রান্ত, পোকা খাওয়া ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ফল বাছাই করা হয়ে থাকে। খারাপ ফলগুলোকে ফলজাত দ্রব্য তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফল বাছাই দু'ভাবে করা যায়। যথাঃ ক) হাতের সাহায্যে এবং খ) মেশিনের সাহায্যে

ক) হাতের সাহায্যে ফল বাছাই করতে হলে ফল হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফলের আকার নির্ণয় করা হয়। চোখে দেখে ফলের আকার ও রং অনুমান করে শ্রেণি করা হয়। অনেক সময় হাতে নিয়ে ফলের ওজন নির্ণয় করা হয়। ফল শক্ত কেমন তা হাতে ধরে অনুমান করা হয়। তবে এ কাজটি ফল ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। গাছ হতে পাড়ার পর সব ফল একই রকম পাওয়া যায় না। কোনটি হালকা হলুদ, কোনটি গাঢ় সবুজ, কোনটি বড়, কোনটি ছোট, কোনটি খুব শক্ত এবং ওজন বেশি আবার কোনটি তেমন শক্ত নয় এবং ওজনে হালকা, কোনটি রোগ ও পোকা মাকড়ে আক্রান্ত কোনটি পাড়ার সময় আঘাতপ্রাপ্ত বা থেতলানো, আবার কোনটি সুস্থ ও সতেজ, কোনটি মিষ্টি ঘ্রাণ যুক্ত, আবার কোনটির কোন ঘ্রাণ নেই ইত্যাদি। হাতের সাহায্যে ফল বাছাই করলে বাছাই কাজটি অনেকাংশেই নিখুঁতি ও ভালো হয়।

খ) মেশিনের সাহায্যে বাছাই করতে হলে ফল বাছাইয়ের আকৃতি নির্ধারণী রিং ব্যবহার করা হয়। ফল ভেদে বিভিন্ন মাপের নির্ধারণী রিং হতে পারে। যেমন- ৬০, ৬৪, ৭০,৭৫, ৮০, ৮৫ সেমি. সাইজের রিং মেশিনে ফল বাছাই ও গ্রেডিং সহজে এবং দ্রুত করা যায়। কিন্তু কোন ফল থেতলানো বা রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত থাকলে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে হাতে আলাদা করে নিতে হয়। এমনকি ফলের গায়ে ময়লা থাকলে তা হাত দিয়ে আলাদা করে নিতে হয়। মেশিনে বাছাই করা ফল কনভেয়ারের মাধ্যমে বিভিন্ন আকারের প্যাকিং বাক্সে স্থানান্তরিত হয়, যা আগে হতে নির্ধারণ করা থাকে।

ফল বাছাইকরণের সুবিধা

১। বিভিন্ন আকারের ফল আলাদা আলাদা করা থাকে, তাই দাম নির্ধারণ করা সহজ হয়।

২। আঘাত প্রাপ্ত, রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফল আলাদা আলাদা থাকে, তাই ফল নষ্ট হয় না।

৩। ফল বাছাই করার জন্য শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪। বিভিন্ন আকারের ফল বিভিন্ন প্যাকিং বাক্সে সর্বোচ্চ সংখ্যায় সাজানো হয়।

৫। প্যাকিং-এর জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজের সংখ্যা দেখে ফলের সংখ্যা নিরুপণ করা হয়।

৬। ফল বাছাইকরণের মাধ্যমে ফলের মান নির্ণয় করা সহজ হয়।

৭। ফলের আকার এবং পরিপক্বতার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে তা দূরে পাঠানো যাবে কিনা। কেননা বড় ফলের সাথে ছোট ফল একত্রে থাকলে বড় ফলের চাপে ছোট ফল নষ্ট হতে পারে।

ফল বাছাইকরণে সর্তকতা ফল বাছাইয়ের পূর্বে বিবেচ্য বিষয় :

১। ফল বাছাইকরণের স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত ও যথেষ্ট বাতাস চলাচল সম্পন্ন। হতে হবে।

২। ফল বাছাইকরণের সময় ভালো ফলের সাথে আঘাত প্রাপ্ত, রোগাক্রান্ত বা পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফল একত্রে রাখলে নষ্ট ফল দ্রুত পচে তা ভালো ফলকে নষ্ট করতে পারে। ভালো ফল এবং নষ্ট ফল পৃথক রাখতে হবে।

৩। বাছাই করার সময় ফল এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় ছুড়ে না ফেলে আস্তে আস্তে রাখতে হবে।

৪। বাছাই করার সময় নিচে চট বা নরম জিনিস বিছায়ে নিয়ে তার উপর ফল নাড়াচাড়া করা উচিত। তাতে ফল কম আঘাত পাবে।

৫। যতদূর সম্ভব কম সংখ্যক ফল একত্রে স্তূপ করা উচিত। কেননা বেশি উঁচু করে ফলের তুপ করা হলে চাপে নিচের ফল নষ্ট হতে পাবে।

৬। বাছাই করার সময় উচ্চমান সম্পন্ন ফলের সাথে নিম্নানের ফলের ৫ থেকে ১০ ভাগের বেশি যেন মিশ্রণ না হয়। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ফলের আকার অনুযায়ী গ্রেডিং

বাছাইয়ের পর ফলের আকার ও মান অনুযায়ী ফল শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। কারণ ভালো আকার ও ভালো মানের। ফল বেশি অর্থায়নে সাহায্য করে। বৃহৎ ও উৎকৃষ্টতর গুণসম্পন্ন ফল প্রায় সর্বদাই ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট ফল অপেক্ষা অধিক অর্থ আনায়ন করে থাকে। সর্ব আকারের ও প্রকারের ফলকে একই সঙ্গে না রেখে ও গুলোকে আকার ও গুণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে নিলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের পক্ষেই সঠিক মূল্য নির্ধারণের সুবিধা হয় এবং তাতে কারারেই ঠকবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং বিক্রয়ের জন্য ফল বাক্সবন্দী করা অথবা স্থানান্তরিতকরণের পূর্বেই সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে নেয়া উত্তম। একই বস্তা, ঝুড়ি বা বাক্সের নিচে ছোট এবং উপরে প্রদর্শনের জন্য বড় আকারের ফল রাখার প্রথাটি একান্তভাবে বর্জনীয়। ফলকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মানে বিভক্তকরণ (Standardization) একটি উত্তম পদ্ধতি।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফলের পরিপক্বতা কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

২। অপরিণত বয়সে ফল পরিপক্ব হওয়ার কারণ কী ?

৩। উচ্চমান ও নিম্নমান ফলের মিশ্রণ কত ভাগ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য ?

৪। পরিপক্ব হওয়ার পর ফল সাধারণত কতভাবে সংগ্রহ করা যায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল বাছাইকরণে কী কী সর্তকতা অবলম্বন করতে হয় লেখ।

২। ফলের পরিপক্বতার লক্ষন কাকে বলে?

৩। ফলের পরিপক্বতার ও পাকার মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। গ্রেডিং কেন করা হয় ?

৫। ফল বাছাইকরণের সুবিধাগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল বর্ধনের ধাপ গুলো কি কি এবং কোন কোন অবস্থায় ফলের পরিপক্বতা নিরুপণ করা হয় লেখ।

২। ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। ফল কীভাবে সংগ্রহ করা যায় এবং ফল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর।

৪। ফলের পরিপক্বতা কীভাবে নিরূপণ করা যায় ? আম, কাঁঠাল ও পেয়ারার পরিপকৃতা পদ্ধতি লেখ।

দশম অধ্যায়

আম, কাঁঠাল ও কুল চাষ

আমের চাষ

আম বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও উপাদেয় ফল। আমকে ফলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই আমের চাষ হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট মানের আম উৎপাদান প্রধানত উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলোতে হয়ে থাকে। যেমন- বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর ও কুষ্টিয়া। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমিতে আমের চাষ হয় এবং মোট উৎপাদন ১ লাখ ৯০ হাজার টন।

জমি ও মাটি নির্বাচন

যে কোন ধরনের মাটিতেই আমের চাষ করা যায়। গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোয়াশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম। উচু ও মাঝারি উঁচু জমি আম চাষের জন্য নির্বাচন করতে হয়। তবে সুনিষ্কাশিত ২.৫-৩.০ মিটার নিচু পানিতল বিশিষ্ট, সামান্য অম্লীয়, উর্বর দোঁআশ মাটি আম চাষের জন্য সর্বোত্তম। অত্যধিক বেলে ও কাদামাটি এবং ক্ষারীয় মাটি আম চাষের জন্য অনুপযুক্ত। আম গাছ যথেষ্ট মাত্রায় জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সব সময় সাতসেঁতে থাকে এরূপ মাটিতে আম ভালো হয় না। জলাবদ মাটিতে গাছের বৃদ্ধি, ফুল ও ফল ধারণ ব্যহত হয়। ৫.৫-৭.৫ অম্লমান (অর্থাৎ পিএইচ) সম্পন্ন মাটিতে আম ভালো হয়। এঁটেল মাটিতে পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকলেও আম চাষ করা যায়। প্রচুর সূর্যের আলো পড়ে, খোলামেলা এমন উঁচু জমি আম চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। শীতকালে প্রয়োজনে সেচ প্রদান করা যায় এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। আবার বর্ষাকালে জমিতে যাতে পানি না দাঁড়াতে পারে সে জন্য পানি নিকাশের নালা থাকতে হবে।

জমি ও গর্ত তৈরি

বাগান আকারে আমের চাষ করতে হলে এপ্রিল-মে মাসে কয়েক পশলা বৃষ্টি হলে প্রথমেই নির্বাচিত জমি লাঙ্গল দ্বারা ৩ থেকে ৪ বার গভীরভাবে চাষ দিয়ে কর্ষণ করে নিতে হবে। আচড়ার সাহায্যে আগাছা পরিস্কার করে মই দ্বারা ঢেলা ভেঙে জমি সমতল করে নিতে হবে এবং জমিতে যেন পানি না দাঁড়ায় তার জন্য যথাযথ সেচনালা তৈরি করতে হবে। বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে ষড়ভুজ বা বর্গাকার অনুসারে নকশা তৈরি করলে ভালো হয়। কলমের চারা হলে দুরত্ব কম দিতে হবে এবং বীজের চারা হলে দূরত্ব বেশি দিতে হবে। আর্দ্র এলাকার উর্বর পলিমাটিতে বড় জাতের গাছ ১২ মি.×১২ মি. দূরত্বে লাগাতে হবে। শুষ্ক এলাকার উর্বর পলি মাটিতে ৯মি.×৯মি. অথবা ১০.৫ মি.×১০.৫ মি. দূরত্ব রাখা ভালো। তবে বেঁটে জাতের ক্ষেত্রে অনেক সময় দূরত্ব আরো কমানো যেতে পারে।

সার প্রয়োগ

চারা রোপণের পূর্বে তৈরি গর্ত ভরাট করার সময় মাটির সাথে প্রতি গর্তে নিম্নোক্ত পরিমাণ সার মিশিয়ে দিতে হবে। গর্তের মাটির সাথে সার মিশানোর সময় রাসায়নিক সার গর্তের উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তের নিচে এবং জৈব সার গর্তের নিচের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তের উপরের অংশে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ
জৈব সার	১৮-২২ কেজি
ইউরিয়া	১০০-২০০ গ্রাম
টিএসপি	৪৫০-৫৫০ গ্রাম
এমপি	২০০-৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-৩০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম

সম্ভব হলে গর্ত প্রতি ২ কেজি পচা নিমের খৈল দিতে হবে। সার মিশানোর অন্তত ১০ দিন পর চারা রোপন করা ভালো। গর্তের মাটি শুকনা থাকলে চারা রোপনের পূর্বে অর্থাৎ সার মিশানোর পরই পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যা

বর্ষার সময় অর্থাৎ মে - জুন মাসে চারা রোপন করা উত্তম। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টি বা বর্ষার সময় চারা রোপণ না করাই ভালো। মেঘাচ্ছন্ন দিনে বিকালে চারা রোপণ করা সবচেয়ে ভালো। চারা রোপণের জন্য তৈরি গর্তের ঠিক মাঝখানে চারটি খাড়াভাবে বসায়ে গোড়ার চারপাশের মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর পরই হালকা সেচ দিতে হবে।

চারায় অতিরিক্ত পাতা থাকলে কিছু পাতা কেটে দেয়া ভালো। এতে গাছ সবল হয় এবং আকৃতিও সুন্দর হতে পারে। রোপণের পর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বুঝে ২-৩ সপ্তাহ প্রতি দিন বা একদিন পর পর ১ বার করে বিকেলে পানি সেচ দিলে ভালো হয়। চারা সবল বা দুর্বল যাই হউক রোপণের পর বাঁশের খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। আম বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এ জন্য মাঝে মাঝে জমি চাষ করা ভালো। চারা রোপণের পর পরবর্তীতে বৃষ্টি না হলে প্রথম ৮ মাস বা দেড় বছর পর্যন্ত শুকনো মৌসুমে ৭ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। এরপর ৫ বছর পর্যন্ত ১৪/১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। কলমের চারা রোপণের বছরই মুকুল দিতে পারে। তবে প্রথম বছর মুকুল জন্মালে তা ভেঙে দিতে হবে। কেননা মুকুল গুলো ভেঙে না দিলে গাছের বৃদিদ্ধ ব্যাহত হয় এবং গাছের কাঠামো শক্ত হতে পারে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ৩-৪ বছর পর্যন্ত মুকুল ভেঙে দেয়া উচিত। গাছ যাতে ভালোভাবে বেড়ে উঠতে পারে সে জন্য সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সারণি -১ বিভিন্ন বয়সে আমের গাছ প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ সারের নাম

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর) হিসাবে সার প্রয়োগের পরিমাণ					
	২ - ৪ বছর	৫ - ৭ বছর	৮ - ১০ বছর	১১ - ১৫ বছর	১৬ - ২৬ বছর	২০ বছর বা তার বেশি
গোবর বা আবর্জনা পচা সার (কেজি)	১০-১৫	১৬-২০	২১-২৫	২৬-৩০	৩০-৪০	৪০-৫০
ইউরিয়া সার (গ্রাম)	২৫০	৫০০	৭৫০	১০০০	১৫০০	২০০০

২০২২

টিএসপি	২৫০	২৫০	৫০০	৫০০	৭৫০	১০০০
এমপি	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪৫০	৫০০
জিপসাম	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিংক সালফেট	১০	১০	১৫	১৫	২০	২৫

গাছ রোপণের বছর ২৫০ গ্রাম ইউরিয়া সমান দুই ভাগ করে একভাগে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ বর্ষার শুরুতে একভাগ অশ্বিণে অর্থাৎ বর্ষার শেষে গাছের চারদিকে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছ গুলো বৃদ্ধির সাথে সাথে জৈব রাসায়নিক সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে যা সারণি-১ এ দেখানো হলো। উলেখিত সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে আশ্বিন মাসের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে সার দেওয়ার পর সেচ দিতে হবে। ছোট গাছের গোড়া থেকে ৪০-৫০ সে.মি., মাঝারি বয়সী গাছে গোড়া থেকে ২-৩ মি. দূরে এবং বড় গাছের বেলায় দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছ বড় হয়ে গেলে মধ্যবর্তী স্থানে সার প্রয়োগ করে টিলার (Power tiller) দিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে সার মিশিয়ে দিতে হবে। জিপসাম ও জিংকসালফেট প্রতি বছর না দিয়ে এক বছর পর পর প্রয়োগ করা ভাল।

মাধ্যমিক পরিচর্যা

আম বাগানে সাধারণত প্রতি বছর দুবার চাষ দেয়া দরকার। প্রথম বার জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং দ্বিতীয় বার আশ্বিন কার্তিক মাসে। গাছের গোড়ার দিকে ১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত কাণ্ডের মধ্যে ডালপালা রাখা উচিত নয়। প্রধান কাণ্ডের ১ মিটার উপরে চারপাশে গজানো ৪/৫ টি মজবুত ডাল রেখে বাকীগুলো কেটে দিতে হবে। ফল পাড়ার সময় যে সকল মুকুল দণ্ডে আম থাকে সেগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে। আম পাড়ার পর মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালা ছেটে দিতে হয়। ইহা গাছের বৃদ্ধির সহায়ক হয়। গাছের ভিতর যেগুলো ফল দেয় না অথচ ছায়াময় ও ঝাপালো হয় সেগুলো কেটে দিলে ভালো হয়। কেননা এগুলো পোকা মাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।

সেচ

গাছে মুকুল হওয়ার আগে সেচ দিলে বা বৃষ্টিপাতে গাছের মারাত্মক ক্ষতি হয়। কেননা সেক্ষেত্রে মুকুল না হয়ে নতুন পাতা গজাতে পারে। নতুন পাতা গজালে সে মৌসুমে আর মুকুল হবে না। আমের গুটি মটরদানার মত হলে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার সেচ দিলে গুটি ঝরা বন্ধ হয় এবং আমের আকার বড় হয়। আম গাছে সেচ দেয়ার ইহাই উত্তম সময়। ঐ সময় বৃষ্টি হলে সেচ দেয়ার প্রয়াজন নেই।

পোকা ও রোগ বালাই দমন

আম বা আম গাছ নানা ধরনের পোকা মাকড় ও রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ লক্ষ করা যায়। আমের বিভিন্ন কিটপতঙ্গের মধ্যে ১। পাতা ও ফল শোষক (Mango-hopper) (২) কাণ্ডের মাজরা পোকা (৩) ডগার মাজরা পোকা (৪) ফলের মাছি পোকা (৫) ফলের ভোমর পোকা এবং (৬) পাতার বিছা পোকা (Mango defoliator) বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

পাতা ও ফল শোষক (Mango hopper): এই পোকা গ্রীষ্ম মৌসুমে এবং ফুলের ঋতুতে অধিক সংখ্যক দেখা যায়। এদের বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক পোকা ফুলের মঞ্জুরীর রস চুষে পান করে। তাতে ফুল ও ছোট ফল ঝরে পড়ে। মুকুলেও রস চোষার সাথে সাথে এ পোকা মলদ্বার দিয়ে প্রচুর পরিমাণ আঁঠালো মধুরস ত্যাগ করে যা মুকুল ও ফল গাছের গাছের পাতায় আটকে যায়। এই আঁঠালো পদার্থে ফুলের পরাগ রেণু আটকে গিয়ে ফুলের পরাগায়ণ ২০২২

ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করে। পাতা ও ফুল আটকানো মধু রসে Shooty mould fungus (শুটি মোল্ড) জন্মায় এবং ফুল ও পাতা কাল বর্ণ ধারণ করে। ফলে সালাকে সংশেষণ প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। এতে আমের ফুল ঝরে পড়ে আমের উৎপাদন ১০০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। জানুয়ারির শুরুতে এবং গাছের পুষ্পিত অবস্থায় অর্থাৎ আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতিলিটার পানির সাথে এক মি:লি: সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/ফিনম/বাসাথ্রিন)১০ ইসি অথবা ডেসিস ২.৫ ইসি অথবা ০.৫ মি.লি. সুমিসাইডিন ২০ ইসি মিশিয়ে আম গাছের কাণ্ড, ডাল, পাতা, ও মুকুল ভালো ভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করলে আমের পাতা ও ফল শোষক পোকা অর্থাৎ আমের হপার দমন করা যায়।

কাণ্ডের মাজরা পোকা

এ পোকার কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে নরম অংশ খেতে থাকে। এতে আক্রান্ত কাণ্ডের উপরের অংশ মারা যেতে পারে। আক্রান্ত শাখা সহজেই ভেঙে যায়। বাঁকানো তার দিয়ে গর্ত থেকে পোকা বের করে মারতে হবে অথবা গর্তে বাইড্রিন/ লোসিড কিংবা আলকাতরা ঢুকিয়ে কাদা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।

ফলের ভোমরা পোকা: উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। কোন কোন সময় প্রায় সমগ্র ফলই আক্রান্ত; হয় ও খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। স্ত্রী পোকা ফলের গায়ে ছিদ্র করে তাতে ডিম পাড়ে। ছিদ্রের ক্ষতর শুকিয়ে যাওয়ার পর ছিদ্র চেনা যায় না। এ পোকা দমনের জন্য বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি. ডায়াজিনন ৫০ ইসি অথবা ৬০ ইসি বা লিবাসিড ৫০ ইসি মার্চের মাঝামাঝি সময় কাণ্ড ও ডালের বাকলে স্প্রে করতে হয়।

আমের রোগ: নিম্নে আমের প্রধান প্রধান রোগের নাম উল্লেখ করা হলো। আমের রোগের মধ্যে

১। ফোস্কা পড়া রোগ ২) পাউডারী মিলডিউ ৩) সুটি মোল্ড ৪) বাকটিপ প্রধান।

ফোস্কা পড়া বা অ্যানথ্রাকনোজ

রোগের আক্রমণে পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল প্রভৃতির উপর বাদামি বা ধূসর বাদামি ফোস্কা পড়ে। এতে ফুল ও গুটি ঝরে যায় এবং ফলের উপর কালো দাগ পড়ায় তার বাজার মূল্য কমে যায়। ফেব্রুয়ারি- এপ্রিল মাসে ২-৩ বার বোর্দো মিশ্রণ (৬:৬:১০০) দ্বারা গাছকে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিয়ে এ রোগ দমন করা যায়।

পাউডারি মিলডিউ

এর আক্রমণে পুষ্প মঞ্জুরী ও শাখা প্রশাখার উপর সাদা গুড়ার মত ছত্রাকের স্পোর বা বীজকণা দেখা যায়। এর ফলে ফুল ও গুটি শুকিয়ে ঝরে পড়ে। ফুল ফোটার পূর্বে, ফুল ফোটার পর ও ফল ধরার পর প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি. টিল্ট বা ২ গ্রাম থিওভিট মিশিয়ে গাছে প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়। এ ছাড়া আমের অন্যান্য রোগ গুলো হলো: ডগামরা, রেডরাস্ট, কালদাগ, পিংক রোগ, ফল পঁচা রোগ ইত্যাদি।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

সাধারণত ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আম গাছে ফুল আসে। ফুল হওয়ার পর থেকে আম পরিপক্ব হতে ৪-৫ মাস সময় লাগে। পাকার লক্ষণ দেখে গাছ হতে আম পাড়তে হয়। যেমন- বোটার নিচের অংশ হলুদাভ রং ধারন, আমের চামড়ার রং হালকা সবুজ হওয়া, আমের বোটা ভাঙলে কষ বিন্দু বিন্দু আকারে জমা হওয়া। আম গাছের সবগুলো ফল এক সাথে পরিপক্ব হয় না। বাগানের আম এবং বাড়ি হতে দুরবর্তী স্থানে অবস্থিত গাছের আম একসাথে পাড়তে হয়। গাছ ঝাঁকি দিয়ে আম পাড়া উচিত নয়। কেননা তাতে আম আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তাড়াতাড়ি পঁচে যায়। তাই যতদূর সম্ভব হাত দিয়ে আম পাড়া উত্তম। উঁচু ডালের আম পাড়তে হলে হালকা, শক্ত ও সাজা ২-৬ মিটার বাঁশের সরু দণ্ড নিতে হয়। বাঁশের সরু দণ্ডের মাথায় একটি চাকের সাথে দড়ির তৈরি

জালি বাঁধতে হবে। বাঁশের সরু দণ্ডের মাথায় একটি চাকের সাথে দড়ির তৈরি জালি বাঁধতে হবে। এরপর জালির চাকের মধ্যে বাধায়ে আমের বোটায় টান দিলে জালে আম আটকাবে। আম পাড়ার পর ছোট, মাঝারি ও বড় আলাদা করে বাছাই করতে হবে। বাঁশের ঝুড়িতে আম পাতা বিছায়ে সারি করে আম সাজিয়ে দূরে অক্ষত ভাবে নেয়া যায়। তবে আমের প্রতি স্তরে পাতা দিতে হবে।

ফল সংরক্ষণ

সাধারণত বেশিরভাগ আম পাকার পর ৭ দিন রাখা যায়। পরিপক্ক আম পেড়ে শক্ত ও সবুজ অবস্থায় বাঁশের ঝুড়ি বা বাস্কেটে ভালভাবে প্যাকিং করে ৭° - ৯° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ৮৫-৯০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ৪-৭ সপ্তাহ ভালোভাবে রাখা যায়। পরিপক্ক আম তরল মামের আবরন দিয়ে ঠান্ডা ঘরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিদিন রাখা যেতে পারে। কাঁচা আম হতে আবার আমসি, আমসত্ত্ব, আঁচার, কাসুন্দি, ইত্যাদি খাদ্য তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়। পাকা আম থেকে জ্যাম, ফুট জুস, ফুট সিরাপ, জেলি, আমসত্ত্ব, প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। শাঁসযুক্ত পাকা আম বাতেল বা টিনে সিরাপের মধ্যে সংরক্ষিত করা যায়। ৫০°-৫২° সে. তাপমাত্রায় গরম পানিতে ১০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে পরে তুলে রাখলে বেশি দিন আম সংরক্ষন করা যায়।

কাঁঠালের চাষ

কাঁঠাল পৃথিবীর বৃহত্তম ফল এবং এটি আমাদের জাতীয় ফল। সাধারন মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ফল। কাঁঠালকে গরিবের খাদ্য বলা হয়। কেননা এত বেশি পুষ্টি উপাদান আর কোন ফলে পাওয়া যায় না। কাঁঠাল পাকা ও কাঁচাউভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। আঁঠাল এমন একটি ফল যার প্রত্যেকটি অংশ ব্যবহৃত হয়। কাঁচা কাঁঠাল সবজি হিসেবে ব্যবহার হয়। কাঁঠাল গাছ বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ বৃক্ষ। এ গাছ ১০-১৫ মি. উচু হয়ে থাকে। স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল একই গাছে পৃথক পৃথক ভাবে ধরে। কাঁঠালের ফল বহু ফলের সমষ্টি এবং সরোসিস নামে পরিচিত। একটি কাঁঠালের মধ্যে অনেক কোয়া থাকে। প্রত্যেকটি কোয়াই একটি ফল। কাঁঠাল গাছের পাতা, কাণ্ড, ফল, বীজ সব কিছুই মূল্যবান এবং বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

মাটি ও জমি নির্বাচন

প্রায় সব ধরনের মাটিতেই কাঁঠালের চাষ করা যায়। পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারি উচু সুনিষ্কাশিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী। দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ, এটেল ও কাকুরে মাটিতেও এর চাষ করা যায়। এটেল দোয়াশ মাটি কাঁঠাল চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম। তবে গভীর সুনিষ্কাশিত পলি দোয়াশ মাটিতে কাঁঠালের ফলন গুলো হয়। কাঁঠাল গাছ বেশি ক্ষার বা অম্ল পছন্দ করে না। তবে সামান্য অম্ল লাল মাটিতে কাঁঠাল ভালবদ্ধতার ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। গাছের গোড়ায় কয়েকদিন দাড়ানো পানি থাকলে গাছ মারা যায়। এইজন্য যে সব স্থান ব্যাকালে বন্যার পানিতে পাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান সেখানে কাঁঠাল গাছ লাগানো উচিত নয়। মাটি বেশি গভীর হলে কাঁঠাল গাছের জন্য ভাল। কেননা এর শিকড় মাটির খুব গভীরে যায়। গাছের শিকড় মাটির নিচে পানির তলের সংস্পর্শে এলে গাছ মারা যেতে পারে। এমন কি বাঁচলেও সহজে ফল ধরতে চায় না। ভূ-গর্ভস্থ মাটির নিচে পানির তল ২ মি: মিটারের বেশি নিচে হলে ভাল। সারা দিন আলো পায় এমন উঁচু জমি কাঁঠালের পছন্দনীয় তবে আংশিক ছায়া তলেও চাষ করা যায়।

চিত্রঃ কাঁঠাল

গাছ জমি ও গর্ত তৈরি

আগাছা পরিষ্কার করে গভীর ভাবে কর্ষন করে কয়েকটি চাষ দিয়ে ভালোভাবে জমি তৈরি করতে হবে। চারা লাগানোর পূর্বে জমিতে নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা লাগানোর জন্য বর্গাকার ও ষড়ভুজ রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করে রোপণের ১০ দিন পূর্বে ১২ মি. দূরে দূরে ১ মিটার দৈর্ঘ্য ১ মিটার গভীর ও ১মিটার প্রস্থ গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের উপরের দুই-তৃতীয়াংশে মাটি আলাদা রাখতে হবে। উপরের এই দুই-তৃতীয়াংশে মাটির সাথে জৈব সার মিশিয়ে গর্তের নিচের দিক এবং গর্তের নিচের অংশের মাটির সাথে রাসায়নিক সার নিম্নোক্ত ছকে দেখানো পরিমাণ মিশিয়ে গর্তের উপরের দিক ভরাট করে ১০-১৫ দিন রাখতে হবে। মাটি শুকনা থাকলে প্রয়োজনে পানি দিয়ে গর্তের মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। তবে গর্তের নিচের অংশের মাটির সাথে রাসায়নিক সার মিশিয়ে মাটির মধ্যে হালকা কোপ দিয়ে ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এম পি সার মিশিয়ে দিতে হবে। এর ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ
গোবর/কম্পোস্ট	২৫-৩৫ কেজি
টিএসপি	১৯০-২১০ গ্রাম
এমপি	১৯০-২১০ গ্রাম

সার প্রয়োগ

বড় কাঁঠাল গাছে সার দেওয়ার প্রচলন কম। তবে সঠিক পরিমাণে সার দিলে ফলন ভালো হয়। বিভিন্ন বয়সের গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো। সারণি ও বিভিন্ন বয়সে গাছে বিভিন্ন সার প্রয়োগের পরিমাণ

সার	৫ বছর পর্যন্ত	৬ - ১০ বছর পর্যন্ত	১০ বছরের উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০
এমপি (গ্রাম)	২৫০	৫০০	১০০০

সম্পূর্ণ গোবর সার ও টি এসপি সার এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার বর্ষার শুরুতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গোড়া থেকে অন্তত ৫০ সে:মি: দূরত্বে গাছের চারিদকে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার বর্ষার শেষে ভাদ্র আশ্বিন একইভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সার ডিবলিং পদ্ধতিতে ও প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের বয়স যতই বাড়বে গাছের গোড়া হতে সার দেয়ার দূরত্ব ততই বাড়াতে হবে। ২০-২৫ বছরের পূর্ণ বয়স্ক কাঁঠালের বাগানে দুটো সারির মাঝখান দিয়ে সার ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়াই উত্তম। তবে মাটিতে তেমন রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। যেন কোন অবস্থাতেই জলাবদ্ধতা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রোপন পরবর্তী পরিচর্যা

কাঁঠালের বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া বছরে দুবার পরিষ্কার করা ভালো। চারা লাগানোর পর ৩-৪ বছর পর্যন্ত গোড়া পরিষ্কার করে গোড়ায় হালকা মাটি দিয়ে চেপে দিতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসে একবার এবং এপ্রিল মাসে একবার এ ব্যবস্থা অনুশীলন করা ভালো। চারার গোড়া হতে ২-৩ মি: বাড়ার পর মাথা কেটে দেয়া যায়। এরপর মাথার চারদিকে ডাল বের হলে তা রেখে দিতে হবে। শুকনো রোগাক্রান্ত এবং নিচের দিকে ঝুলে থাকা ডাল ছেটে দিতে হবে। ফল পাড়ার কিছুদিন পর কাণ্ড সমান করে বোঁটা কেটে ফেলতে হবে। গাছের ভেতরের দিকের ছোট ছোট শাখা প্রশাখা ছেটে দিলে আলো বাতাস সহজে ঢুকতে পারবে এবং গাছ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাবে। তবে ডাল ছাটার পর রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ ঠেকাতে বোর্দোমিক্সার বা ডায়থেন এম -৪৫ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। সাধারণত ৭-৮ বৎসরের গাছে ফল ধরে, গাছ বয়স্ক হলে গুড়িতে ও পরে গোড়ার দিকে ফল ধরে। ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল ধরে এবং মে হতে জুলাই মাসে ফল থাকে। গাছে প্রথম দিকের ফল বড় হয় এবং পরের দিকের ফল ছোট হয়। এক বছর বেশি ফল দিলে পরের বছর ফল কম দেয়। তবে বেশি ফলন পাওয়ার জন্য ফুল আসার সময় ২-৩ বার সেচ দেওয়া যায়। বর্ষার পর গাছের গোড়ার চারপাশের মাটি সরায়ে ৫-৭ দিন খোলা রেখে সার ও সেচ দিলে উপকার হয়। ফল না ধরলে অনেক সময় গাছের নিচে ধোয়া দেয়া হয়। গাছে কখনও ফল ফাটতে দেখা দিলে কিছু মুল ছাটাই করে দেয়া যেতে পারে। এছাড়া দা দ্বারা কাণ্ডের উপর স্থানে স্থানে কোপ দিয়ে কষ বের করে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

পোকা ও রোগ বালাই দমন

কাঁঠালের মুচি ও ফলের মাজরা পোকা প্রধান ক্ষতিকর পোকা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ পোকার আক্রমণে মুচি(ফুল)। ঝরে যায়। সুতরাং মুচি আসার সময় প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মি:লি: সাইপার মেথ্রিন/রিপকর্ড/ সিমবুস ১০ ইসি বা ১ মি: লি: ডেসিস ২.৫ ইসি বা ০.৫ মি:লি: ফেনভ্যালিরেট (সুমিসাইডিন) ২০ ইসি বা ২.০ মি: লি: ফেনট্রোথিয়ন (সুমিথিয়ন) ৫০ ইসি বা ডায়াজিনন ৫০ ইসি স্প্রে করে ফুল বা মুচি ভিজিয়ে দিতে হবে। ১৫ দিন পর পর এক বা দুবার স্প্রে করলেই এ পোকা দমন করা যাবে।

রোগ দমন

ফলা পঁচা রোগ কাঁঠালের একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগের জীবাণু পুরষ ফুল এবং কচি ফলে আক্রমণ করে। এর ফলে ফল ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া ফল ও ফুল সমূহ বাগান থেকে সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এবং রোর্দা মিকচার দিয়ে স্প্রে করে সব ফুল ভিজিয়ে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

গাছে খুব বেশি ফল ধরলে কিছু ফল সবজি খাবার জন্য কেটে নেয়া ভালো এতে বাকি ফলের আকৃতি বৃদ্ধি পায়। গ্রীষ্মের শেষে জুন মাসে ফল পাকে। ফল পুষ্ট হলে গায়ের কাপগুলো গোলাকার হয় এবং খোসার রং সবুজ পীত হয়।

২০২২

পুষ্ট ফল বোটা সমেত পেড়ে ঘরের গরম জায়গায় রেখে দিলে ৪-৭ দিনের মধ্যে পেকে যায়। ফল দ্রুত পাকার জন্য পাড়া ফলের বোটাতে লবণ বা চুন দেয়া হয়। কাঁচা অবস্থায় লাঠি দিয়ে আঘাত করলে ঠন ঠন শব্দ হয়। আর পাকা অবস্থায় ডেব ডেব শব্দ হয়। দূরবর্তী স্থানে পাঠাতে হলে পুষ্ট ফল পেড়ে তখনই গাড়িতে সাজাতে হবে। তবে বড় কাঁঠাল নিচের দিকে এবং ছোট কাঁঠাল উপরের দিকে দিয়ে সাজাতে হয়। এ সময় গাড়িতে খড় বিছিয়ে দিতে হয় অন্যথায় কঁকিতে কাঁঠালের কাঁটায় দাগ পড়ে এবং তাতে কাঁঠালের মান কমে যায়। সাধারণত কাঁঠাল হিমাগারে রাখা হয় না। তবে ১১° -১২° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও শতকরা ৮৫-৯০ ভাগ আপেক্ষিক আদ্রর্তায় ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যেতে পারে। পাকা ফলের কোয়া থেকে রস, সিরাপ, জেলি, ক্যান্ডি তৈরি করে রাখা যায়।

কুল চাষ

স্বাদ ও পুষ্টি মানের বিচারে কুল একটি উৎকৃষ্ট ফল। এদেশের সব শ্রেণির লোকের নিকট এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। পৃথিবীতে উৎপাদিত কুল দুই প্রকার, যথা- ১। চীনা কুল এবং ২। ভারতীয় কুল। চিনা কুল গাছ ক্ষুদ্রাকার, সরল এবং পত্র পতনশীল, বসন্তকালে ফুল ধরে এবং শরৎকালে পাকে। ভারতীয় কুল মাঝারি আকারের ও ছড়ান প্রকৃতির, শরৎকালে ফুল ধরে এবং শীতকালে ও বসন্তের প্রারম্ভে ফল পাকে। এটা কিছু পরিমান পত্র পতনশীল। দীর্ঘাকৃতি ও সুমিষ্ট নারিকেলী কুলকে জিজিফাস যুযুবা এবং অম্লমধুর ও নাম গোত্রহীন কুলকে জিজিফাস ভালগারিস নামে অভিহিত করা হয়। কুলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে।

জমি ও মাটি নির্বাচন

কুল গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিঞ্চ। তাই যে কোন প্রকার মাটিতে ইহা জন্মানো যায়। যদিও এর উপযোগী অম্ল ক্ষারত্বের সীমারেখা দীর্ঘ, তবু নিরপক্ষ কিংবা ক্ষার মাটিতে এটি অপেক্ষাকৃত ভালো জন্মে। ভারী ও সামান্য ক্ষারযুক্ত বেলে দোঁআশ মাটি কুলের জন্য সর্বোত্তম। কুল গাছ লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই সহ্য করতে পারে। তথাপিও পানি নিকাশের ভালো ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। কুল গাছ প্রচণ্ড খরা ও বর্ষা সহ্য করতে পারে। কুল চাষের জন্য তেমন বৃষ্টিপাতের দরকার হয় না। তাই উঁচু জমি ও কম বৃষ্টিপাত এলাকায় সহজেই কুল চাষ করা যেতে পারে। প্রচুর আলো বাতাস পায় এমন স্থান কুল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত।

জমি ও গর্ত তৈরি

জমিতে ৪-৫ বার লাঙল দিয়ে চাষ ও মই দিয়ে আগাছামুক্ত ও সমতল করে নির্দিষ্ট জায়গাতে গর্ত তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে চারা রোপনের নির্ধারিত স্থানে ৬-৭ মিটার দূরে দূরে ১×১×১ মিটার আকারে গর্ত খনন করতে হবে। প্রতিটি গর্তের উপরের অংশের মাটির সাথে রাসায়নিক এবং নিচের অংশের মাটির সাথে জৈব সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ২-৩ সপ্তাহ রাখতে হবে।

ছক: গত প্রতি সারের পরিমাণ সারের নাম

সারের নাম	গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ
পঁচা গোবর	২০-২৫ কেজি
টিএসপি	২০০-২৫০ গ্রাম
এমপি	২৪৫-২৫৫ গ্রাম
ইউরিয়া	২০০-২৫০ গ্রাম

তবে চারা রোপণের এক মাস পূর্বে গর্ত খনন করা উচিত। মাটি খুব উর্বর হলে রাসায়নিক সার না দিলেও চলে।

সার প্রয়োগ

নিয়মিত ভালো ফলন পেতে হলে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে।

ছক: গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছ প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ

গাছের বয়স	গোবর কেজি	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)
১-২ বছর	১০-১২	২৫০-৩০০	২০০-২৫০	২০০-২৫০
৩-৪ বছর	১৫-২০	২৫০-৫০০	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০
৫-৬ বছর	২১-২৫	৫৫০-৭৫০	৫০০-৭০০	৫০০-৭০০
৭-৮ বছর	২৬-৩৫	৮০০-১০০০	৭৫০-৮৫০	৭৫০-৮৫০
৯ বছর ও তদূর্ধ	৩৬-৪৫	১১৫০-১২৫০	৯০০-১০০০	৯০০-১০০০

এ সমস্ত সার একবারে না দিয়ে ২-৩ বারে দিতে হবে। প্রথম বার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এবং দ্বিতীয় বার এপ্রিল-মে মাসে গাছের গোড়ার চারদিকে কুপিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ফল ধরার পর, ফল পাড়ার পর ও বর্ষার পর এই তিন বারেও উল্লিখিত সার দেওয়া যেতে পারে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের গোড়ায় সার দেয়ার দূরত্ব ও বাড়াতে হয়। সার দেয়ার পর শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ দিতে হবে।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

কুলের বাগানে প্রয়োজনমত আগাছা পরিষ্কার, পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়মিত ভালো ফলন পেতে হলে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে। নভেম্বর- ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিলে ফল বড় হয় এবং ফলন বেশি হয়। কুল গাছে ডাল ছাটাই করা খুব প্রয়োজন। ডাল ছাঁটাই এর পর খুব তাড়াতাড়ি নতুন শাখা প্রশাখা গজায়। বছরে দুইবার ডাল ছাঁটাই করা ভালো। ফল পাড়ার পর পরই বেশি করে একবার এবং ফুল আসার আগে হালকা করে আর একবার হেঁটে দিলে ফলন বেশি হয়। কুল গাছ অত্যন্ত কস্ট সহ্য করতে পারে। সে জন্য এতে ভারী ছাঁটাই দরকার হয়। কুল গাছ নতুন ডালে ফুল আসার প্রবণতা বেশি তাই ছাঁটাই করার পর নতুন করে শাখা-প্রশাখা গজায় বিধায় পরবর্তী বছর ফলন বেশি হয়। লক্ষ রাখতে হবে কুল বাগানের আশে পাশে যেনগাছ না থাকে। কেননা জলী গাছ রোগ জীবাণ ও ফলের মাছি পোকার আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে।

ছাঁটাইকরণ

গাছের প্রাথমিক অবস্থায় একটি শক্ত ও মজমুত কাঠামো তৈরি করে নিতে হবে। এ জন্য প্রধান কাণ্ডকে কমপক্ষে ৭৫ সে.মি. লম্বা করে তালোর পর মাথা কেটে দিতে হবে। এরপর চারদিক দিয়ে বহু নতুন শাখা বের হয়ে গাছ ঝোপালো হবে। প্রধান কাণ্ড হতে বের হওয়া ৬-৮ টি ভালো শাখা রেখে বাকিগুলো কেটে দিতে হবে। শাখা কেটে পাতলাকরণের সময় এক শাখা হতে অন্য শাখা ১৫-২০ সে:মি: দূরে রাখতে হবে। তাছাড়া মরা, শুকনা, রোগাক্রান্ত ও সরু হয়ে নুয়ে পড়া শাখাগুলো কেটে দিতে হবে। ফল পাড়ার পর খরার সময় যখন পাতা ঝরে যায় তখন ছাঁটাই করা উচিত। এপ্রিল হতে মে মাসে সাধারণত পাতা ঝরে গাছ শুকনা কাঠির মত হয়। ২০২২

পোকা মড়ক ও রোগ বালাই দমন

ফলের মাছি পোকা ফলে ডিম পাড়ে এবং ফলের ভেতর শুক্রকীটের উপস্থিতি ফলকে খাওয়ার অযোগ্য করে তোলে। কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের সব ফলই আক্রান্ত হয়। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ মি:লি: ডায়াজিনন মিশিয়ে ফল পাকার আগে মাঝে মাঝে সিঞ্চন করলে উপকারে আসে। ফল ছিদ্রকারী পোকা কুলের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর।

বয়স্ক পোকা ফলের বোটার কাছ ডিম পাড়ে এবং শুককীট ফলের ভেতর সুড়ঙ্গ তৈরি করে শাস খেতে খেতে অগ্রসর হয়। এতে ফল খাওয়ার উপযোগী থাকে না। গাছে ফল ধরার পর থেকে কিছু দিন পর পর ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ মি. লি. ডায়াজিনন প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়। কুলের উইভিল ও বিছা পোকা অনেক সময় বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উভয় পোকাই প্রধানত পাতা খায়। যে কোন কীটনাশক প্রয়োগ করে দমনকরা যায়।

ফলের পচন - এ রোগের আক্রমণে ফলের অগ্রান্তে প্রথমে বাদামি রঙের দাগ পড়ে। পরে এ দাগগুলো সমগ্র ফলকে ঘিরে পচিয়ে ফেলে। এ রোগ প্রতিকারের জন্য ৫ চামচ ডাইথেন এম-৪৫ ২.৫ গ্যালন পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন। অন্তর গাছে ছিটানো যেতে পারে।

রোগ বালাই- পাউডারী মিলডিউ ও এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা ও ফলের উপর সাদা পাউডারের মতো একটি বস্তু জমা হয় এবং আক্রান্ত ফল ঝরে পড়ে। ফল ধরার মৌসুমে এ রোগ দেখা যায়। বোর্দোমিশ্রণ অথবা সালফার গুড়া প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজের গাছে ফুল আসতে ৩-৪ বছর সময় লাগে। কিন্তু কলমের গাছ রোপণের ২-৩ বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে ফুল আসে এবং ফল পাকতে ৪-৫ মাস সময় লাগে। জাত ভেদে জানুয়ারি-মার্চ মাসে ফল পাকে। খুব পাকা ফল বা অপব্ব ফল কখনও সংগ্রহ করা উচিত নয়। ফলে হালকা সবুজ বা হলুদ রং ধরতে থাকলেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। শখায় ঝাকানি দিয়ে মাটিতে ফেলে ফল সংগ্রহ করলে অনেক ফল ফেটে গিয়ে দ্রুত নষ্ট হয়। ঝাকানি দেয়া অপরিহার্য হলে নিচে জাল পেতে ফল সংগ্রহ করা যেতে পারে।

তাজা ফল ছায়াযুক্ত ও ঠান্ডা ঘরে সাধারণত এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো ভাবে রাখা যায়। এক ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপমাত্রায় এক থেকে দেড় মাস সংরক্ষন করা যায়। কুলের টক, আচার, জেলি তৈরি করা হয়। পাকা ফল রোদ শুকিয়ে রস কমিয়ে ও কুল সরাসরি রাখা যায়। পরে খাওয়ার জন্য কয়েকদিন কড়া রোদ ছড়িয়ে রাখলে বরই শুকিয়ে যায়। শুকনা বরই দিয়ে ভালো আচার তৈরি করা যায়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কত হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়ে থাকে ?

২। সাধারণত কত অম্লমান সম্পন্ন মাটিতে আম ভালো হয় ?

৩। কাঁঠাল কোন অবস্থায় খাওয়া যায় ?

৪। কাঁঠাল কোন ধরনের ফল ?

৫। কুল সাধারণত কোন ধরনের মাটিতে চাষ করা হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কাঁঠালের চারা রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

২। আম চাষের জন্য কি ধরনের জমি ও মাটির প্রয়োজন ?

৩। আমের চারার জন্য গর্ত তৈরি ও গর্তে ব্যবহৃত সারের নাম ও পরিমাণ লেখ।

৪। নিকৃষ্ট কুল গাছকে মিষ্টি গাছে রূপান্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর।

৫। কাঁঠাল গাছে সার প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৬। কাঁঠাল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমিও মাটির ধরন সম্পর্কে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আম/কাঁঠাল/কুল গাছের জমি তৈরি, গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও অন্তর্বর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

২। কুল চাষের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে লেখ।

৩। কুল গাছ ছাঁটাই সম্বন্ধে বর্ণনা কর।

৪। কাঁঠালের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্বন্ধে লেখ।

৫। আম বাগানে সার প্রয়োগের মাত্রা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৬। আম/কাঁঠালের ফল ও গাছের পোকা ও রোগ বালাই দমনের কৌশল বর্ণনা কর।

২০২২

একাদশ অধ্যায়

কলা, পেঁপে, লেবু এবং পেয়ারা ফলের চাষ

ফলসমূহকে গাছের প্রকৃতি এবং উৎপাদনের পদ্ধতির দিক হতে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা- ১) অবৃক্ষ জাতীয় ফল এবং

২) বৃক্ষ জাতীয় ফল।

অবৃক্ষ জাতীয় ফলের মধ্যে গুল্মজাতীয় (herbaceous) ফুটি, তরমুজ, স্টবেরি, আনারস ইত্যাদি। সিওডোস্টেম বা নকল কাণ্ড বিশিষ্ট কলা এবং রসালো কাণ্ড বিশিষ্ট পেঁপে প্রধান। বৃক্ষ জাতীয় ফলের মধ্যে সাইট্রাস গাত্রের লেবু এবং মায়াটাসী গাত্রের পেয়ারা প্রধান ফল।

কলা চাষ

পৃথিবীতে প্রথম যে কটি ফলের আবাদ শুরু হয় কলা তার মধ্যে অন্যতম। মহামতি আলেকজান্ডার খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে সিন্ধু নদের উপত্যকায় কলার চাষ দেখতে পান। উষ্ণ ও আদ্র অঞ্চলের ফসল হচ্ছে কলা। এশিয়ার উষ্ণ ও আদ্র দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলেই কলার উৎপত্তিস্থল বলে অনেকে মনে করেন। অনেকের মতে আসাম-মিয়ানমার। ইন্দোচীন অঞ্চলই কলার উৎপত্তি স্থল। কলা যে বাংলাদেশের সর্ব প্রধান ফল কেবল তাই নয়, কলা পৃথিবীর সর্ব প্রধান ফল। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪০ হাজার হে. জমিতে কলার চাষ হয়। বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৬ লক্ষ ২৮ হাজার টনের বেশি।

জমি নির্বাচন

প্রচুর রৌদ্রযুক্ত, সুনিষ্কাশিত, জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি কলা চাষের উপযোগী। কাকর, বেলে, ক্ষারীয় বা লবণাক্ত মাটি কলা চাষের অনুপযুক্ত। বাংলাদেশের পলি মাটিতে কলার ফলন সবচেয়ে ভালো হয়। যদিও কলা ফসল আবাদের জন্য অনেক পানির প্রয়োজন হয়, কিন্তু কলা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। কলার শিকড় যেহেতু মাটির ভিতর ৯০ সে. মি. পর্যন্ত প্রবেশ করে বেশীর ভাগ শিকড় মাটির ৪৫ সে:মি:-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই জৈব সার সমদ্ধ এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উঁচ জমি যেখানে বন্যার পানি আসেনা এবং বৃষ্টির পানি জমেনা কলা চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো। ব্যবস্থাপনা ভালো হলে কলা চাষের জন্য মাটি কোন সমস্যা নয়। তবে মাটির পিএইচ ৪.৫ থেকে ৭.৫ এর মধ্যে হওয়া চাই।

গাছ রোপণের জন্য জমি ও গর্ত তৈরিকরণ

কলা আবাদের জন্য বারবার চাষ দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হয়। জমি তৈরির পর ষড়ভুজি রোপণ প্রণালি অনুসরণ করে জাত ভেদে ২×২ মি: বা ২×২.৫ মি: দূরত্বে কাঠি পুতে সাকার রোপণের জায়গা চিহ্নিত করা হয়। কাঠিকে কেন্দ্র করে ১মি.×১মি.×০.৭ মি. আকারের গভীর করে গর্ত খুড়তে হবে। এ সময় গর্তের উপরের মাটি আলাদা রাখতে হবে। ১০-১৫ দিন গর্তটি উন্মুক্ত ফেলে রাখাই ভালো। প্রথমে জৈবসার আলাদা করে রাখা উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তে ফেলতে হবে। এরপর মাটি দিয়ে গর্তটি সম্পূর্ণ ভরে ফেলতে হবে।

চারার সংখ্যা : কলার জাত ভেদে রোপণ দূরত্ব ও হেক্টর প্রতি চারার সংখ্যা দেয়া হলো।

কলার জাত	গাছের উচ্চতা (সে.মি.)	রোপণের দূরত্ব (সে.মি.)	হেক্টর প্রতি চারার সংখ্যা
১. অমৃত সাগর	২১০-২৭০	১৮০x২৪০	২৩১৫
২. সবরী	৩০০-৩৫০	২৪০x২৭০	১৫৪৩
৩. চাপা	২৭০-৩৫০	২৪০x২৭০	১৫৪৩
৪. কবরী	২৪০-৩০০	২৪০x২৭০	১৫৪৩
৫. আনাজী	২৭০-৩৪০	২৪০x২৭০	১৫৪৩
৬. কাবুলী	১৫০-১৮০	১৫০x১৮০	৩৭০৪

চারা নির্বাচন ও রোপণ

কলা গাছের গোড়া থেকে যে তেউড় বের হয় তা দিয়ে এর বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। কলার অসি চারা ও পানি চারা এই দুধরনের তেউড় বা চারা পাওয়া যায়। রোপণের জন্য অসিচারা উত্তম। কারণ এ চারা গাছের গোড়া হতে উঠে এবং পাতা সোজা, সরু ও শক্ত গড়নের হয়। চারার মূল গ্রন্থি সবল এবং মোটা থাকে। রোপণের পর এগুলো কম মরে এবং দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। পানি চারা সাধারণত পুরাতন গাছের গোড়া হতে গজায়। এ চারা শক্ত ও ঘন চারার মাঝ খান দিয়ে গজায়। চারার পাতা চওড়া, ছড়ানো, দুর্বল গড়নের হয়। এ চারার গোড়া চিকন এবং শিকড় দুর্বল প্রকৃতির হয়। জমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি সময় লাগে, এমনকি রোপণের পর মরে যেতে পারে।

তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উভয় প্রকার চারার মধ্যে ব্যবধান থাকে না। কলার চারা অনেক বড় হওয়ার পরও রোপণ করা চলে তবে ছোট আকারের চারা উৎকৃষ্ট। বড় চারা প্রতিষ্ঠিত হতে বেশি সময় নেয় এবং এগুলোতে ফলনও তুলনামূলক কম। ৫-৫০ সে.মি. দীর্ঘ ও পুরু গোড়া বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বর্তমানে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারা উৎপাদিত করে রোপণ করা হচ্ছে। মাতৃগাছ হতে আলাদা করার পর নির্বাচিত চারা দেরী না করেই রোপণ করা উচিত। রোপণের পূর্বে চারার গোড়ার সমস্ত পুরাতন শিকড় ছাঁটাই করে ডাইথেন এম ৪৫(০.২%) সলিউশনে ডুবিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে পারলে খুব ভাল হয়। এরপর কন্দ গুলো মাটির ২০-২৫ সে.মি. গভীরে রোপণ করতে হবে।

অসি চারা

চিত্রঃ পানি চারা (অনুপযুক্ত)

পানি চারা

চিত্রঃ অসি চারা (উপযুক্ত)

চারা রোপণের সময়

সেপ্টেম্বর -অক্টোবর (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ) বা জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি (মাঘ - চৈত্র) কন্দ বা সাকার রোপণের জন্য উত্তম সময়। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে এবং বৃষ্টি নির্ভর হলে মৌসুম বৃষ্টির পর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কলার সাকার বা কন্দ রোপণ করা ভালো। শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে রোপণের পরপরই একটি সেচ খুবই উপকারী।

চারা প্রস্তুত ও রোপণ

চারা লাগানোর আগে গোড়া থেকে পুরাতন শিকড় এবং ১০-১৫ সে.মি. উপরের অংশ কেটে ফেলতে হবে। চারার গোড়ায় মাতৃগাছের সাথে সংযোগকৃত দিকটি দক্ষিণ দিক রেখে রোপণ করতে হবে। এতে করে তার বিপরীত দিকে কলার কাদি হবে এবং সরাসরি কলায় রোদ লাগতে পারবে না। এর ফলে কলার রং বিবর্ণ হওয়ার সুযোগ পাবে না এবং ঝড়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।

চিত্রঃ কলার অসি চারার গোড়ার শিকড় কেটে প্রস্তুতকরণ

কলার চারা মাদায় এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে চারার গোড়া বা মাথোর উপরের অংশ মাটির সমতল বরাবর থাকে এবং বাকি অংশটুকু মাটির নিচে থাকে। চারা সোজা হয়ে উঠার জন্য মাথোর চারদিকে মাটি চেপে দিতে হয়। প্রতি সারি মাদার মাঝখান দিয়ে ৩০ সে.মি. চওড়া ও ২০ সে.মি. গভীর করে নালা তৈরি করে দিতে হয়। নালার মাটি দুই পাশে উঠিয়ে দিলে কলা গাছের সারি বেডের মত হয়। তাতে বৃষ্টি হলে গাছের গোড়ায় পানি দাঁড়াতে পারবে না। এমনকি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি ঐ নালা দিয়ে সহজেই বের হয়ে যেতে পারবে।

সার প্রয়োগ কৌশল

রোপণের ১ মাস পূর্বে গর্তে এবং রোপণের পর সুষম সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সারের হিসাব গাছ প্রতি করাই ভালো। জৈব বা গোবর সার ১২-১৫ কেজি, ইউরিয়া ১২০ গ্রাম টিএসপি ২৫০ গ্রাম এমপি ১২০ গ্রাম, জিপসাম ১১০ গ্রাম এবং জিংক সালফেট ২৫ গ্রাম দেয়ার সুপারিশ করা হয়। জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে গাছ প্রতি হিসাব করে অর্ধেক গোবর সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ২×২ মি. দূরত্বে সাকার রোপণ করলে ২৫০০ গাছের জন্য ৩০ টন গোবর সার প্রয়োজন। এর অর্ধেক জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার এবং সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট চারা রোপণের আগে গর্তের উপরের ২৫ সে.মি. মাটির সাথে মিশাতে হবে। চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে শুরু করে ইউরিয়া ও এমপি সার সমান ছয় কিস্তিতে দু মাস পর পর উপরি
১০২ প্রয়োগ (Top dressing) করতে হয়। এগুলো কলা বাগানে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশাতে হয়। মাটিতে "জো" থাকলেই সার ছিটাতে ও মিশাতে হয়।

নচেৎ সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। বি এ আর সি কর্তৃক প্রণীত সার ম্যানুয়েল অনুযায়ী কলা চাষে নিম্ন সারণি অনুসারে সার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

সারণি: কলার চারা লাগানোর প্রাক্কালে সার প্রয়োগের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি, গ্রাম/গাছ)
১। গোবর/আবর্জনা পচা সার	১৫-২০ কেজি
২। টিএসপি	২৫০-৪০০ গ্রাম
৩। এমপি	২৫০-৩০০ গ্রাম
৪। ইউরিয়া	৫০০-৬৫০ গ্রাম

উলেখিত সারের সুপারিশ অনুসারে ৫০% গোবর বা আবর্জনা পচা সার জমি তৈরির সময় এবং বাকি ৫০ % গর্তে দিতে হবে। এ সময় অর্ধেক টিএসপি গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের দেড় থেকে দুই মাস পর ২৫% ইউরিয়া ৫০% এমপি ও বাকি টিএসপি জমিতে ছিটিয়ে ভালো ভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশায়ে দিতে হবে। এর দুই থেকে আড়াই মাস পর গাছ প্রতি বাকী ৫০% এমপি ও ৫০ % ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ফল আসার সময় অবশিষ্ট ২৫% ইউরিয়া জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

গাছ রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

কলা গাছের জন্য গাছ রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু কলা গাছ লাগালে থেকে কলা পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত অনেক সময় লাগে, সেহেতু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বহুবিধ পরিচর্যার মাধ্যমে ভালো ফলন আশা করা যেতে পারে। রোপণ পরবর্তী পরিচর্যার বিভিন্ন দিক নিচে আলোচনা হলো।

ক) আগাছা পরিষ্কার: কলা বাগান সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। কলার শেকড় মাটির উপরিভাগে ১৫-২০ সে:মি: এলাকায় কেন্দ্রীভূত থাকে। তাই আগাছা দমনের জন্য কোদাল ব্যবহার করলে অগভীর কোপ দিতে হবে। বয়স্ক পাতা শুকিয়ে গেলে কেটে ফেলা উত্তম। কারন এগুলো পাকা মাকড় ও রোগ বিস্তারে সহায়ক।

খ) সেচ ও নিকাশ: শুক মৌসুমে ক্ষেতে ২-৩ বার করে পাবন সেচ দিতে হবে। নতুবা গাছ দুর্বল হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত ফলন কমে আসবে! বর্ষাকালে বাগানে যাতে পানি জমে না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পানি বের করার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে দিতে হবে।

গ) তেউর উৎপাটন: চারা রোপণের কয়েক মাস পরই এর গোড়ার চারি পার্শ্বে তেউড় বের হতে থাকে। এসব চারা কলা গাছে থারে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েকদিন পর পর মাটি বরাবর ৫ সে.মি. উপরে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কেটে দিতে হবে। মুড়ি ফসল উৎপাদন করতে চাইলে ফুল আসার সময় প্রতি গাছে একটি ভাল চারা রেখে বাকি গুলো কেটে দিতে হবে।

ঘ) গাছে ঠেকনা দেয়া: গাছে থাড়ে আসার পরপরই কঁদি যখন বড় হয় তার ভারে অথবা ঝড়ের দরুন মাঝারি ও দীর্ঘকায় জাতের কলা গাছ যাতে পড়ে বা ভেঙ্গে না যায় সেজন্য বাঁশের খুটি দ্বারা বাতাসের বিপরীত মুখে গাছে ঠেস দিতে হয়। ২০২২

ঙ) মাটি তোলা: বর্ষাকালে যখন অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে গাছের গোড়া থেকে মাটি ধুয়ে যায় এবং গোড়ার শিকড় বেরিয়ে পড়ে তখন গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া উচিত। গাছের গোড়ায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে মূল পচে যেতে পারে । এ জন্য সারির দু পাশে নালা তৈরি করে গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হয়।

চ) থোর অপসারণ: কাঁদি ঢাকা ও মোচা থেকে কলা বের হওয়ার পর শেষোক্ত কলার ৪-৫ সে.মি. নিচে থোড় (ফুল/মোচা) কেটে দিতে হবে। সুর্যালোকে, গরম বাতাস, ধুলাবোলি, পাকামাকড়, পাখি ইত্যাদির হাত থেকে কঁদিকে রক্ষা ও কলার রং উজ্জ্বল রাখার জন্য নীল পলিথিন বা অন্য কোন স্বচ্ছ ব্যাগ দ্বারা কঁদি ঢেকে দিতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা

কলার পাতা যখন কঁচি অবস্থায় থাকে তখন এ পোকা কচি পাতা খেয়ে থাকে। তারপর কলার মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে পাতা ছেড়ে কচি কলা আক্রমণ করে এবং কলার খোসা ফেঁছে খায়। এতে কচি কলার গায়ে দাগ পড়ে। কলা বড় হওয়ার সাথে সাথে দাগগুলো আকারে বড় হয় এবং কালচে বাদামি রং ধারণ করে। আক্রান্ত কলা দেখতে কুৎসিত হয় এবং বাজারদর কমে যায়।

কলার বিটল পোকার আক্রমন

কলাকে রক্ষা করতে হলে ছড়িতে কলা বের হওয়ার পূর্বেই ৪২ ইঞ্চি লম্বা ও ৩০ ইঞ্চি প্রস্থের দুমুখ ভালো একটি পলিথিন ব্যাগের এক মুখ মোচার ভেতর ঢুকিয়ে বেধে দিতে হবে। অন্য মুখ খোলা রাখতে হবে। বাতাস চলাচলের জন্য পলিথিন ব্যাগটিতে ২০-৩০টি ২ সে:মি: ব্যাসের ছিদ্র রাখা বাঞ্ছনীয়। ডাইএলড্রিন/এলড্রিন পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করলে ভাল প্রতিকার পাওয়া যায়। রাষ্ট্রিপ এর আক্রমণে ফলের উপর ধুসর লাল বনের বলয় সৃষ্টি হয় এবং ফলের খোল ফেটে যায়। কলার ছড়া পাতলা চট অথবা পলিথিন দ্বারা ঢেকে রাখলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ছড়াতে ১৫ দিন পর পর ডায়াজিনন (২%) সিঞ্চন করলেও উপকার পাওয়া যায়।

পানামা: এটি একটি ছত্রাক জাতীয় মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায় এবং পরে কচি পাতাও হলুদ রং ধারণ করে। পরবর্তীতে পাতা বোটার কাছে ভেঙে গাছের চারি দিকে ঝুলে থাকে এবং মরে যায় কিন্তু সবচেয়ে কচি পাতাটি গাছের মাথায় খাড়া হয়ে দাড়িয়ে থাকে। অবশেষে গাছ মরে যায়। কখনও কখনও গাছ লম্বা লম্বিভাবে ফেটেও যায়। আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উপড়িয়ে মাটি চাপা

দিতে হবে এবং আক্রান্ত জমিতে ৩/৪ বছর কলা চাষ কধ রাখতে হবে।

কলার **বানচি টপ - ভাইরাস** রোগ

ইহা একটি ভাইরাস জাতীয় রোগ এবং কলার জন্য খুবই ক্ষতিকর। এ রোগের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং পাতা গুচ্ছা কারে বের হয়। পাতা আকারে খাটো, অপ্রশস্থ এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনার উপরের দিকে বাঁকানো এবং সামান্য হলুদ রঙের হয়। অনেক সময় পাতার মধ্য শিরা ও বোটায় ঘন সবুজ দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ রোগ বিস্তারের সহায়ক জাব পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক (সেভিন ব্যবহার করতে হবে।

পাতার দাগ বা সিগাটোকা রোগ

এ রোগের আক্রমণে প্রাথমিকভাবে ৩য় ও ৪র্থ পাতায় ছোট ছাট হলুদ দাগ দেখা দেয়। ক্রমশ দাগগুলো বড় হয় ও বাদামি রং ধারণ করে। এভাবে একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং তখন পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বোর্দো মিশ্রণ প্রয়োগ করে দমন করা যায়। জমিতে সুষ্ঠ নিকাশ ব্যবস্থা ও আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। ফল সংগ্রহের পর রোগাক্রান্ত পাতা পুড়ে ফেলতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সবেক্ষণ

কলার জাত, রোপণের সময়, আবহাওয়া ও পরিচর্যার উপর চারা রোপণ হতে কাঁদি কাটা পর্যন্ত সময়ের তারতম্য ঘটে। রোপণের পর থেকে শুরু করে ফুল বের হওয়ার পর কলা আহরণের উপযুক্ত হতে ১০০ থেকে ১৩০ দিন সময় লাগে। কলা পরিপক্ক হলে এর শিরাগুলো সমান হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে সবুজ রং ধারণ করে। কলা পাকার অপেক্ষা করে এ সময়ে কঁদি কেটে নামানাে হয় এবং কলা গাছ কেটে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ফেলে দিতে হয়। এরপর ফলগুলো এক এক করে পৃথক করে ঘরে খড়ের ওপর এক বা দুসারিতে করে সাজিয়ে আবার খড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এতে কলা সমানভাবে পাকে এবং চমৎকার রং হয়। হেক্টর প্রতি সাধারণত ২০-২৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

পেঁপে চাষ

পেঁপে চিরহরিৎ শ্রেণির গাছ এবং সারা বছরই ফুল ও ফল দিয়ে থাকে। পৃথিবীর বহু দেশেই পেঁপের চাষ হয়। বাংলাদেশেও পেঁপে খুবই জনপ্রিয়। পেঁপের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত: এটা স্বল্প মেয়াদি, দ্বিতীয়ত, এটা কেবল ফলই নয় সবজি হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। তৃতীয়ত, পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধি গুণসম্পন্ন। চতুর্থত, বাংলাদেশে যেখানে দীর্ঘমেয়াদী ফল লাগানোরে স্থানের অভাব প্রকট, সেখানে যে কোন কৃষকের পক্ষে দুচারটা পেঁপে গাছ লাগানো সম্ভব।

মাটি ও জমি নির্বাচন

সাধারণত উঁচু বেলে দোঁ-আশ বা দো-আশ মাটিতে পেঁপের ফলন ভালো হয়। পেঁপে চাষের জন্য পানি সেচের ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই। তবে যেখানে পানি দাড়ানোর সম্ভাবনা আছে সে সব জমিতে পেঁপের চাষ করা উচিত নয়। কারণ গাছ কয়েক ঘণ্টা পানি দাড়ানো অবস্থা সহ্য করতে পারে না। মাটির গভীরতা বেশি হলে গাছ দ্রুত বাড়ে তবে অপেক্ষাকৃত অগভীর জমিতেও পেঁপে চাষ করা চলে। অধিক অম্ল বা অধিক ক্ষার মাটিতে পেঁপে ভালো হয় না। মাটির পিএইচ ৭.০ এর কাছাকাছি পেঁপে চাষের জন্য ভালো ।

জমি ও গর্ত তৈরি

উঁচু, খোলামেলা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পন্ন জমি, জো বুঝে ৩/৪ বার চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। আগাছা ভালো করে পরিষ্কার করে মাটি ঝুরঝুরে ও সমতল করতে হবে। গর্ত খনন: ষড়ভুজী রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করে জাত ভেদে ২×২ মি: দূরে ৬০×৬০×৬০ সে. মি. আকারের গর্ত খনন করে গর্তে ২০-২৫ কেজি পচা গোবর, ১ কেজি খৈল, ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হতে। মাদা তৈরি করে পানি দিয়ে ভিজিয়ে ১০-১৫ দিন রাখার পর চারা রোপণ করা উচিত। এতে গর্তের রোগ জীবাণু ও পোকা নষ্ট হয়। এরপর গর্তের মাটির সাথে মৌল সার মিশিয়ে গর্তে প্রয়োগ করা হয়। মাটিতে রস থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে মৌল সারের বিক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। চারা লাগানোর পূর্বে গর্তের মাটি কুপিয়ে জমির সমতল হতে ১৫ সি.মি. উচুঁ করে মাদা তৈরি করতে হয়। তাতে বৃষ্টির পানি সহজে গড়ায়ে যাবে এবং গাছের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে। কেননা পেঁপে গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

বীজের হার

দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে ১ হেক্টর জমিতে ২৫০০ গাছের জন্য ৭৫০০ টি চারার প্রয়োজন হয়। সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১৪০-১৬০ গ্রাম বীজ দিয়ে প্রয়োজনীয় চারা তৈরি করা যায়। পুরাতন বীজ হলে ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজ লাগবে।

চারা তৈরি

বীজ থেকে তৈরি চারা গাছ লাগিয়ে পেঁপে চাষ করা হয়। বীজ তলায় বীজ বুনার দুইমাস পর চারাগুলো ১০ সে:মি: বড় হলে জমিতে রোপণ করা যেতে পারে। পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫×১০ সে:মি: আকারের পলি ব্যাগে সমপরিমাণ বালি, মাটি ও পঁচা গোবর মিশ্রণ ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২ ৩ টি ছিদ্র করতে হবে। তারপর এতে সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১টি এবং পুরাতন বীজ হলে ২-৩ টি বীজ বপণ করতে হবে। একটি ব্যাগে একের অধিক চারা রাখা উচিত নয়। ২০-২৫ দিন বয়সের চারা গাছে ১-২ % ইউরিয়া মিশ্রিত পানি স্প্রে করলে চারার বৃদ্ধি ভালো হয়।

চারা রোপণ পদ্ধতি

দেড় থেকে ২ মাস বয়সের চারা রোপণ করা হয়। ২ মিটার দূরে দূরে ৬০×৬০×৬০ সে.মি. আকারের গর্ত করে রোপণের ১৫ দিন পূর্বে গর্তের মাটিতে সার মিশাতে হবে। পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই সারির মাঝখানে ৫০ সে:মি: নালা রাখতে হবে।

রোপণের সময়

চারা রোপণের জন্য সেচের সুবিধা থাকলে সেপ্টেম্বর- অক্টোবর (আশ্বিন) এবং জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি (মাঘ) উপযুক্ত সময়। নচেৎ মৌসুমী বৃষ্টি শুরু হলে জ্যৈষ্ঠ মাস উত্তম। প্রতিটি গর্তে ৩টি করে চারা ২০ সে.মি. দূরত্বে ত্রিভূজাকারে রোপণ করতে হবে। চারা বিকালে রোপণ করাই ভালো। রোপণের পরপরই সেচ দেয়া ভালো। এরপর যতদিন না চারা লেগে উঠে তত দিন সেচ দেয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর সেচের প্রয়োজন হতে পারে।

২০২২

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রতিটি পেঁপে গাছে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে

সারণি: পেঁপে চাষে সার প্রয়োগের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি, গ্রাম/গাছ)
ইউরিয়া	৪৫০-৫৫০
টি এস পি	৪৫০-৫৫০
এমপি	৪৫০-৫৫০
জিপসাম	২৪৫-২৫০
জিংক সালফেট	১৫-২০
জৈব সার	১২-১৬ কেজি

সূত্র: বিএ আর সি, ডিএই ঢাকা

পেঁপে চাষের জন্য গাছ প্রতি ১০ কেজি জৈব সার, ৪৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৪৫০ গ্রাম এমপি ২৪০ গ্রাম জিপসাম, ৬ গ্রাম জিংক অক্সাইড বা ১৫ গ্রাম জিংক সালফেট এবং বারোক্স বা রোরিক অ্যাসিড ২৫ গ্রাম দেয়া প্রয়োজন। জমি তৈরির শেষ চাষের সময় গাছ প্রতি ৫ কেজি জৈব সার হিসেব করে সম্পূর্ণ জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী গোবর বা জৈব সার এবং সম্পূর্ণটি এসপি, জিপসাম, জিংক অক্সাইড বা জিংক সালফেট ও বরিক অ্যাসিড বা বারাক্স ভিত্তি সার হিসেবে চারা রোপণের পূর্বে গর্তের উপরে ২৫ সে:মি: মাটির মধ্যে কোদাল দিয়ে মিশাতে হবে। চারা লাগানোর পর গাছে নতুন পাতা আসলে ইউরিয়া ও এমপি সার ৫০ গ্রাম করে প্রতি এক মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল আসলে এ মাত্রা দ্বিগুণ করা হয়। শেষ ফল সংগ্রহের এক মাস পূর্বেও সার প্রয়োগ করতে হবে। পচা গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বারোক্স এবং জিংক সালফেট গর্ত তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

পেঁপে খুবই স্পর্শকতার গাছ। রোপণ পরবর্তী নিম্নলিখিত পরিচর্যা গুলি অনুসরণ করলে কাঙ্ক্ষিত ফলন নিশ্চিত করা যায়।

অতিরিক্ত গাছ অপসারণ

চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকেই গাছে ফুল আসা শুরু করে। ফুল দেখে কোনটি স্ত্রী, কোনটি পুরুষ গাছ চেনা যায়। ফুল আসার পর এ সময় প্রতি গর্তে লাগানো ৩টি চারার মধ্যে একটি করে সতেজ, সবল সুস্থ স্ত্রী গাছ রেখে আর সব গাছ সে স্ত্রী হাকে বা পুরুষ হাক উপড়ে তুলে ফেলতে হবে। তবে প্রতি ২০টি গাছের জন্য একটি করে পুরুষ গাছ রাখতে হবে যাতে পরাগায়ণে সুবিধা হয়। পরাগায়ন ছাড়া সব স্ত্রী ফুল ঝরে পড়ে যাবে, ফল ধরবে না।

আগাছা পরিষ্কার

বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি নিড়ানি দিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। আগাছা পরিষ্কারের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কোন সময় গভীরভাবে গাছের মাটি খোড়া না হয়। কারণ পেঁপে গাছের শিকড় মাটির গভীরে যায় না ।

২০২২

সেচ ও নিষ্কাশন

শুষ্ক মৌসুমে বা খরার সময় পানি সেচ দিলে পেঁপের ফলন বৃদ্ধি পায়। শীতকালেও গ্রাষ্মকালে ২০-২৫ দিন পর পর সেচ দেয়া দরকার। প্রত্যেক বার সার দেয়ার পর সেচ দিতে হয়। পেঁপে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। লক্ষ রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে।

ফল পাতলাকরণ

পেঁপে গাছের প্রতি পর্বে ফল আসে। অনেক ক্ষেত্রে প্রতি পর্বে একটির পরিবর্তে এক সাথে বেশ কটি ফল আসে এবং এগুলো যথাযথভাবে বাড়তে পারে না। এসব ক্ষেত্রে ছোট অবস্থাতেই প্রতিপর্বে দু-একটি ফল রেখে আর সব ফল তুলে বা ছিড়ে ফেলতে হয়। এতে ফলের আকার বড় হয় এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

পোকা মাকড় ও রোগ দমন

ফলের মাছি পোকা কচি পেঁপের গায়ে ডিম পাড়ে। ফলে পেঁপে পচে নষ্ট হয়। এক আউন্স ডিটরেক্স ৮০ ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে ৮ দিন পর পর স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

পেঁপের মোজাইক ভাইরাসজনিত রোগ

রোগের আক্রমণে পাতা কুঁকড়ে যায়। পাতায় সাদা হলদেটে দাগ দেখা যায়। ক্লোরপ্লাস্ট নষ্ট হয়ে পাতায় ছিট ছিট হলুদ মোজাইক দাগ পড়ে এবং গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়। গাছ ফল ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রোগের আক্রমণ দেখা মাত্র গাছ ধ্বংস করতে হবে। ১১.৫ মিমিঃ ডায়জিনন ৫০ ইসি, ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভাইরাস বাহক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

গোড়া পচাঃ এ রোগে আক্রান্ত গাছের কাণ্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পচে গিয়ে গাছ মারা যায় ও সেখান থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। মাটিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে এই রোগ হয়। মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা রোগ ঠেকিয়ে রাখার প্রধান উপায়। প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে ডাইথেন এম -৪৫ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফল ধরার ২ মাস পরে সবজি হিসেবে পেঁপে সগ্রহ করা যায়। অর্থাৎ চারা রোপণের ৬-৭ মাস পর কঁচা পেঁপে তালো যায়। তবে পেঁপে গাছের প্রথম ফল ৯-১০ মাসের মধ্যে পাওয়া যায়। পাকা ফলের জন্য চামড়া কিঞ্চিৎ হলুদ হলে সংগ্রহ করা ভালো। ফলের গায়ে আঁচড়া দিলে দুধের মত কষ বের হয়। ফলের ঐ দুগ্ধবত কষ পাতলা ও জলীয় ধারন করলে বুঝতে হবে যে পেঁপে পরিপুষ্ট হয়েছে। প্রতিটি ফল হতে দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে পাড়া সবচেয়ে ভাল। এতে ফলে আঘাত লাগে না। সেংগৃহীত ফল ঠান্ডা স্থানে রাখলে ধীরে ধীরে পাকে। তবে ইথিলিন গ্যাসের সাহায্যে দ্রুত পাকানো যায়। কাচা বা পরিপুষ্ট ফল ৯° থেকে ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও ৮০-৮৫ ভাগ আদ্রতায় ২ সপ্তাহ রাখা যায়। গাছের যথোপযুক্ত পরিচর্যা নেয়া হলে এক গাছ থেকে ২-৩ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। কিন্তু পেঁপে গাছ ৩ বছরের বেশি রাখলে লাভজনক হবে না।

পেয়ারা চাষ

বৃক্ষ শ্রেণির ফলের মধ্যে যে গাছ হতে রোপণের পর ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ফল পাওয়া যায় তা পেয়ারা। পেয়ারা এমন একটি ফল যার মধ্যে একাধিক গুণের বিরল সমন্বয় ঘটেছে যা খুব কম ফলেই লক্ষ করা যায়। এটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং অপেক্ষাকৃত কম যত্নেই যে কোন স্থানে জন্মানো যায়। এটি অত্যন্ত ফলনশীল এবং পুষ্টি মান ও স্বাদের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট।

মাটি ও জমি নির্বাচন

পেয়ারা গাছ বেশ শক্ত। সব রকম মাটিতেই পেয়ারা জন্মাতে পারে। তবে হালকা বেলে দোঁআশ হতে ভারী এটেল মাটি পেয়ারা উৎপাদনের জন্য উত্তম। তবে পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত উর্বর গভীর পলি মাটিও পেয়ারা চাষের জন্য উত্তম। অল্প অম্ল ও অল্প ক্ষারযুক্ত মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে পেয়ারা ভালো হয়।

পেয়ারা গাছ সাধারণত জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তবে পেয়ারা গাছ স্বল্প সময়ের জন্য জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। কিন্তু তাতে ফল ধারণে অসুবিধা হয়। পেয়ার গাছ সাধারণত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না। এ ছাড়া স্যাঁতসেঁতে মাটিতে পেয়ারা ভালোভাবে জন্মাতে পারে না। মাটির পি এইচ ৪.৫ থেকে ৮.২ পর্যন্ত হলেও পেয়ারা আবাদ সফল হতে পারে। পেয়ারা গাছের শিকড় মাটির মাত্র ২০ সে.মি.-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পেয়ারা গাছ অগভীর মূল বিশিষ্ট হওয়ায় ৯০ সে:মি: গভীর মাটিতেও চাষ করা যায়। উঁচু জমি ও খোলামেলা রৌদ্রযুক্ত স্থান পেয়ারা চাষের জন্য উপযাগী। তবে সামান্য রোদ বা আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানেও পেয়ারা ভালো ফলন দিতে পারে। অধিক আদ্র এবং আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মানো ফলের মিষ্টতা কম হয়। পেয়ারা বড় গাছে ৪৫ সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। তবে বেশি তাপমাত্রায় ফল ঝরে যায় আবার খুব শীতে গাছ মারা যায়। সমতল ও পাহাড়ি উভয় এলাকায়ই পেয়ারা ভালো জন্মাতে পারে।

জমি ও গর্ত তৈরি

চারা লাগানোর কমপক্ষে এক মাস পূর্বে জমিতে ২-৩ বার লাঙ্গল দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি আগাছামুক্ত ও সমতল করে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গর্ত খনন করতে হবে। বর্গাকার প্রণালিতে ৪-৫ মিটার দূরে দূরে ৫০×৫০×৫০ সে:মি: আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়

জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে পেয়ারা গাছ এপ্রিল - মে থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর (আশ্বিন - কার্তিক মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বছরের যে কোন সময়ই লাগানো যায়। তবে পেয়ারা গাছ মে - জুলাই (জ্যৈষ্ঠ - শ্রাবণ) মাসে লাগানোই উত্তম। রোপণের পরবর্তীকালে সার প্রয়োগের জন্য আগস্ট - সেপ্টেম্বর মাস উত্তম।

রোপণ পদ্ধতি

গর্তের মাটি আলগা করে গর্তের মাঝখানে চারা বসায়ে চারদিকের মাটি ভালোভাবে চেপে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর কাঠি দিয়ে চারা বেঁধে দিতে হবে, যাতে গাছ সোজা থাকে। পেয়ারা গাছ বর্গাকার, আয়তকার বা ত্রিভুজাকার পদ্ধতিতে লাগানো যায়। চারা রোপণের পর বৃষ্টি না হলে পানি দেয়া অব্যাহত রাখতে হবে। যতদিন পর্যন্ত চারা গাছ লেগে না উঠে তবে সাধারণত গাছ লেগে উঠতে প্রায় একমাস সময় লাগে। চারা রোপণের পর গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সে জন্য গোড়ার মাটি কিছুটা উঁচু করে দিতে হবে।

২০২২

সার প্রয়োগ

পেয়ারা ফসল থেকে উচ্চ ফলন প্রাপ্তি অব্যাহত রাখতে হলে নিয়মিত নিম্নরূপ হারে প্রতি গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	রোপণের সময় গর্তে প্রয়োগ	গাছের					
		১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	৬ষ্ঠ বছর বা তদুর্ব
গোবর সার	১০-১৫কেজি	১০ কেজি	১০ কেজি	১৫ কেজি	২০ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
টি এস পি	২০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
এম পি	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম

সারণিতে উলেখিত সার দুই কিস্তিতে দিতে হবে। বর্ষা শুরুর আগে বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম কিস্তিতে সম্পূর্ণ গোবর সার ও টিএসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার গাছের চারদিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতিতে সার দেয়াই ভালো। দ্বিতীয় কিস্তি সার বর্ষা মৌসুমের শেষে ভাদ্র -আশ্বিনে দিতে হয়। এ সময় বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার দেয়া হয়। নির্ধারিত মাত্রায় যথা সময়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারণি -১ এ বর্ণিত সার ছাড়াও কখনও কখনও জিংক বা সালফার বা মলিবডেনামের অভাব দেখা দিতে পারে। এগুলোর অভাবে গাছের পাতা ছোট হতে পারে, পাতার শিরার মধ্যবর্তী জায়গার সবুজ কমে যেতে পারে। পাতা ও ফলের সংখ্যা কম হতে পারে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে নির্ধারিত মাত্রায় জিংক সালফেট, জিপসাম বা বরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

যদিও পেয়ারা গাছ বেশ খরা সহ্য করতে পারে তথাপি আশানুরূপ ফলন পেতে হলে শুষ্ক মৌসুমে দোআশ মাটিতে ১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে এবং শীতকালে ৩ থেকে ৭ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হবে। তবে ভারী মাটিতে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচের প্রয়াজন হয়। পেয়ারা বাগানে গাছের সারির মাঝখান দিয়ে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা ও ঝরাপাতা মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

সাথী ফসল

পেয়ারা গাছ বড় হয়ে পূর্ণ ফলবান হতে ৭-৮ বছর সময় লাগে। জমির লাভজনক ব্যবহারের জন্য এ সময় পেয়ারা বাগানে বিভিন্ন শাক-সবজি, কন্দাল জাতীয় ফসল, ডালশস্য ইত্যাদি চাষ করা যায়। তবে সাথী বা আন্তঃফসল করা হলে তার জন্য অতিরিক্ত সার দেয়ার প্রয়োজন হবে।

শাখা বিন্যাস ও ছাঁটাইকরণ

গাছ শাখা প্রশাখা ছাড়ার আগে প্রধান কাণ্ড অন্তত এক মিটার লম্বা হতে দিতে হয়। এরপর প্রধান কাণ্ডটির মাথা কেটে দিলে মাথার চারদিকে অনেক কুঁড়ি গজায়। এগুলো থেকে চারটি কুঁড়ি রেখে বাকিগুলো ভেঙে দিয়ে শুধু এ চারটিকে বাড়তে দিতে হবে।

কুঁড়ি চারটি যেন খাড়াভাবে উঠতে না পারে সেজন্য ভার দিয়ে বা রশি বেধে মাটির সমান্তরাল করে দিতে হবে অথবা এই চারটি কুঁড়ি শাখায় রূপান্তর হয়ে যেন সোজা উপরের দিকে না উঠে চারদিকে প্রসারিত হয় সেজন্য অনেক সময় খুঁটি পুঁতে রশি দিয়ে বেধে দিতে হবে। এ শাখাগুলো যখন ৫০ সে.মি. বা এক মিটার লম্বা হবে তখন সে শাখার আবার মাথা কেটে দিতে হবে। এভাবে আর একবার শাখার মাথা কেটে দিয়ে আবার ২টি করে কুঁড়ি বা শাখা রেখে দিতে হবে। এভাবে ১৬টি শাখা হলে আর কাটার প্রয়োজন নাই। তবে গাছের গোড়া থেকে শাখা গজালে তা কেটে দিতে হবে। গাছে মরা ও রোগাক্রান্ত শাখা থাকলে তা কেটে দূরে নিয়ে নষ্ট করে দিতে হবে।

ফলন্ত গাছের পরিচর্যা

পেয়ারা গাছের শাখার অগ্রভাগে ফুল আসে না। এমনকি পুরাতন শাখায়ও ফুল আসে না। সাধারণত নতুন মুকুল বা বিটপের পত্রকক্ষে ফুল হয়। পেয়ারা গাছে বছরে দুবার ফুল আসে। মার্চ - এপ্রিল মাসে প্রথম বার এবং সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার ফুল আসে। ফুলের কুঁড়ি বা মুকুল আসা থেকে ফুল বের হওয়া পর্যন্ত ২০-২২ দিন সময় লাগে। আবার ফুল হতে ফল পাড়ার উপযুক্ত হতে ১৪০ - ১৬০ দিন সময় লাগে। পেয়ারা গাছে বসন্তকালে এবং বর্ষার প্রারম্ভে ফুল হয়। বর্ষার সময়ের ফল বেশি মিষ্টি হয় না। তাই এ সমস্ত ফল বেশি রাখতে না চাইলে ফুল ভেঙে দিতে হবে। বর্ষার পূর্বের ফুল ভেঙে দিলে বর্ষার পরবর্তীতে বেশি করে ফল ধরে।

মার্চ মাস থেকে সেচ বন্ধ করে গাছের গোড়া হতে হালকাভাবে কিছুটা মাটি সরিয়ে দিয়ে মে মাসে আবার মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ মাটি দেয়ার সময় জৈব সার প্রয়োগ করা হলে বর্ষায় ফুল আসবে। এ ফুল হতে যে ফল হবে তা জানুয়ারি মাসে পরিপুষ্ট হবে। এ সমস্ত ফলের আকৃতি ও গুণাগুণ ভালো হয়।

ফল ছাঁটাই: পেয়ারা গাছ প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল দিয়ে থাকে। গাছের পক্ষে সব ফল ধারণ করা সম্ভব হয় না। তাই মার্বেল আকৃতি হলেই ঘন সন্নিবিশিষ্ট কিছু ফল ছাঁটাই করতে হবে।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই দমন

পোকামাকড় দমন: পেয়ারা গাছে মিলিবাগের আক্রমণ সাধারণত বেশি দেখা যায়। পেয়ারা গাছের পাতা ও ফলে এ পোকা দেখা যায়। এগুলো এক জায়গায় একটি লাইনে অনেকগুলো থাকে। নড়াচড়া করে না। এদের গা তুলোট আবরণযুক্ত। এ পোকাগুলো রস চুষে খেয়ে কচি কাণ্ড, পাতা ও ফলের ক্ষতি করে। মিলিবাগ আক্রান্ত পাতা, কচি কাণ্ড এবং ফল থেকে মিলিবাগ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে মারতে হবে। অথবা প্রতি লিটার পানির সাথে নগস বা ডেনকাভাপন ১০০ ইসি ২.০ মি.লি. অথবা ডাইমেক্রন ১০০ এসসিডবিউ, ১.০ মি.লি., হারে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করে মিলিবাগ দমন করা সম্ভব।

রোগ দমন: পেয়ারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে রোগ একটি সমস্যা। বহুধরনের রোগ পেয়ারার ক্ষতি সাধন করতে পারে। নিম্নে ক্ষতিকর কয়েকটি রোগের বর্ণনা ও প্রতিকার ব্যবস্থা দেয়া হলো।

উইল্ট রোগ: এর আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ছোট ডালপালাও শুকিয়ে যেতে থাকে। এমনকি হঠাৎ একদিন গাছটি মরে যায়। এ রোগ দমনের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বাগানের সঠিক পরিচর্যা এ রোগ দমনে সাহায্য করে।

লীফ স্পট রোগঃ এর আক্রমণে পাতা ও ফলে ছোট ছোট বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়। এ দাগ গুলোর মাঝখানে কাল দাগ হয়। এ রোগ গাছের ফলের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। যে কোন কপার ছত্রাক নাশক ১০-১৫ দিন পর পর ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

সারা বছর ফল ফলানোর পর সঠিক সময়ে ও নিয়মে ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সুষ্ঠু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাণিজ্যিক ফল উৎপাদনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোৎকৃষ্ট শ্বাস পেতে হলে পরিপক্কতার সঠিক পর্যায়ে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অতিপক্ব বা অপক্ব ফল কোনটাই ভাল নয়। পেয়ারা ফল পাকার প্রক্রিয়া অতিদ্রুত। এ জন্য ফল পাকার মৌসুমে প্রতিদিনই ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল পুষ্ট হলে ফলের রং সবুজ থেকে ধীরে ধীরে ফিকে সবুজ বা হলুদাভা হতে থাকে। দূরে পাঠাতে হলে একটু ডার্সা বা কঁচা অবস্থায় ফল পাড়তে হয়। ফল পাড়ার সময় বোটায় ২-১ টা পাতাসহ কেটে নেয়া ভালো। পেয়ারা পাড়ার পর সাধারণত ২-৩ দিনের বেশি রাখা যায় না। পেয়ারা পাকার পূর্বে পুষ্ট অবস্থায় পেড়ে কঁচা পাতা দিয়ে ঢেকে ছায়াময় ঠান্ডা স্থানে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভালোভাবে রাখা যায়। পুষ্ট ফলকে ৮৭ হতে ১০° সেলসিয়াসের তাপমাত্রায় এবং ৮৫-৯০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় একমাস পর্যন্ত রাখা যায়। পেয়ারা থেকে জ্যাম, জেলী তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়।

লেবু চাষ

বিশ্বের অবউষ্ণ অঞ্চলে, বিষুবরেখার ৪০° উত্তর এবং ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের যে সমস্ত দেশে সুনির্দিষ্ট শীতকাল রয়েছে যা গাছকে সুপ্ত অবস্থায় যেতে সাহায্য করে সে সমস্ত দেশে লেবুজাতীয় ফলের চাষ সবচেয়ে ভালো হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুতে কমলা, জাম্বুরা, লেবু, কাগজী লেবু ইত্যাদি জনে। কাগজি লেবু শুষ্ক অঞ্চলে যেমন– কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলে ভালো জন্মে। অথচ বীজহীন লেবু সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভালো জন্মে। অধিক বৃষ্টিপাত সম্পন্ন ঢালু জমিতে যেমন– বৃহত্তর সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমলা উৎপাদনের জন্য অধিক উপযোগী। জাম্বুরা উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ভালো জন্মে। পঞ্চগড় জেলায় যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি তিতু পানি জমে থাকে না এবং মাটি কিছুটা এসিডিক আজকাল কমলা লেবু চাষের প্রসার ঘটছে।

মাটি ও জমি নির্বাচন

বেলে, বেলে-দোআশ ও লাল পাহাড়ী মাটিতে লেবুর চাষ করা যায়। মাটির উপরের দিকের স্তর দো আশ ও নিচের দিকের তর এঁটেল মাটি হলে লেবু চাষের জন্য উত্তম। লেবু অম্ল মাটি পছন্দ করে। লবণাক্ত ও ক্ষারীয় মাটিতে লেবু ভালো হয় না। স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে লেবু ভালো হয় না। জমি উঁচু ও পানি নিকাশের ভালো সুবিধাযুক্ত হওয়া আবশ্যক! কাদা ও এটেল মাটিতে গাছ ভাল হলেও মাধ্যমিক পরিচর্যার অসুবিধা হয়। তবে কাদা ও এঁটেল মাটিতে নিকাশ ব্যবস্থা থাকলে বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে লেবু জন্মানো যায়।

জমি ও গর্ত তৈরি

বাংলাদেশের সমতল এলাকায় বা সমভূমিতে মে - জুন মাসে ধৈঞ্চা বা শন পাটের বীজ বপন করতে হবে। এ সবুজ সারের বীজ বপনের ৫-৬ সপ্তাহ পরে গাছ গুলোকে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে সবুজ সার তৈরি হয়। সবুজ সার করে লেবুর চাষ করা হলে সেখানে লেবু ভাল হয়। এদেশের পার্বত্য অঞ্চলে লেবুর চাষ করলে সিড়ি বাঁধ দিয়ে জমির ক্ষয় রোধের ব্যবস্থা করতে হয়। বাঁধগুলো ঢালে আড়াআড়ি ভাবে তৈরি হয়।

২০২২

এ সিঁড়ি বাধের ভিতরের দিকে পাহাড়ের ঢালে ঘুরে ঘুরে গর্ত খনন করে গর্তে সার মিশিয়ে চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে নির্দিষ্ট দূরত্বে ৭৫×৭৫×৭৫ সে.মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে জৈব ও আর্বজনা পচা সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার পর এর উপরের ২০-২৫ সে:মি: মাটির সাথে ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমপি সার হালকা কোপ দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে।

ছক: গর্ত প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ

ক্র নং	সারের নাম	গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ
১	গোবর/আর্বজনা পচা সার	১৫-২০ কেজি
২	পচা খৈল	৩০০ গ্রাম
৩	হাড়ের গুড়া	৫০০ গ্রাম
৪	ছাই	২ কেজি
৫	টিএসপি	২৫০ গ্রাম
৬	এমপি	২৫০ গ্রাম

চারা রোপণের দূরত্ব: লেবু ও কাগজী লেবু ৪×৪ মিটার দূরত্বে রোপণ করা যায়। কিন্তু কমলা ও জাম্বুরা ৬×৬ মিটার দূরত্বে রোপণ করাই উত্তম।

চারা রোপণের সময় ও পদ্ধতি

বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে এপ্রিল - মে মাসে চারা রোপণ করা উত্তম। তবে সেচ সুবিধা থাকলে সেপ্টেম্বর - অক্টোবর (ভাদ্র - আশ্বিন) মাসেও রোপণ করা যায়। এক বছর বয়সের কলমের চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে রোপণ করতে হবে। চারা গাছ সোজা ভাবে বসিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি ভালোভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন গর্তে গাছের গোড়ায় পানি দাড়ানো না থাকে। প্রত্যেক গাছে একটি করে শক্ত কাঠি দিয়ে বেধে দেওয়া দরকার। আম, কাঁঠাল, নারিকেল ইত্যাদি স্থায়ী বাগানে পঞ্চমস্থানে বা ষড়ভুজী পদ্ধতির মাঝখানে পুরক গাছ হিসাবে ও লেবু গাছ লাগানো যায়।

সার প্রয়োগ

লেবু গাছে যে পরিমাণ সার দিতে হবে তা সারণি- ২ তে দেখানো হলো

সারণি- ২ বিভিন্ন বয়সের লেবু জাতীয় ফল গাছে সারের পরিমাণ

ক্র নং	সারের নাম	১-২ বছর বয়স	৩-৫ বছর বয়স	৬ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়স
১	গোবর বা আবর্জনা (কেজি)	১৫	২০	২৫-৪০
২	ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০	৪০০	৫০০
৩	টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০
৪	এমপি(গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০

বর্ষা মৌসুমের শুরুতে জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে সম্পূর্ণ গোবর সার একবারে প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য সার তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ (Top dressing) পদ্ধতিতে আশ্বিন (সেপ্টেম্বর), মাঘ (ফেব্রুয়ারি) এবং বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে

প্রয়োগ করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে গোবর সার গাছের চারদিকে মাটির সাথে কোদাল দিয়ে ভালোভাবে মিশে দিতে হবে। এরপর আগাছা বা আর্বজনা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। যাতে বৃষ্টি হলে ধুয়ে না যায়। অন্যান্ন সার ড্রিবলিং (Dribbling) পদ্ধতিতে দিলেই চলবে।

গাছ রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

সারের উপরি প্রয়োগ চারা রোপণের ৩-৪ মাস পর গাছ প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম করে টিএসপি ও এমপি সার দিতে হবে। চারার ৯ থেকে ১০ মাস বয়সে প্রয়োজনে অতিরিক্ত ২০০ গ্রাম ইউরিয়া সার দিতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমান বাড়িয়ে দিতে হবে।

সেচ: মাটি যদি শুকিয়ে যায় কিংবা মাটিতে রস না থাকে এবং পাতা শুকিয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সেচ দরকার। শীত কালে ফুল আসা থেকে বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। এতে গাছের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ফল আকারে বড় হয় এবং ফলের গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি হলে নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাই: হেঁটে গাছকে সঠিকভাবে বাড়তে দিয়ে সুন্দর ও শক্ত কাঠামো তৈরির জন্য অবাঞ্ছিত শাখা প্রশাখা ছাঁটাই করে দিতে হবে। তাছাড়া সব বয়সের গাছই বর্ষার পর ও আগে বিশেষভাবে ফল আহরণের পরপরই মরা ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ফল ছাঁটাই: গাছে অতিরিক্ত ফল আসলে এগুলোর মধ্য হতে কিছু ফল ছাঁটাই করে দেয়া ভালো। এতে ফল বড় হয়, গাছ নিয়মিত ফল দেয় এই গাছ দীর্ঘজীবী হয়।

পোকামাকড় ও রোগ দমন

পোকামাকড় ও পাতা কুন্দী (Leaf miner) পোকা ও লেবু গাছের একটি মারাত্মক পোকা। এ পোকার শুককীট চারা গাছের এমনকি বড় গাছের নরম পাতা, ডাল তাড়াতাড়ি খেয়ে গাছকে প্রায় পাতা শূণ্য করে ফেলে। আক্রান্ত গাছে রগর/রক্সিয়ন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মি:লি: ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ফলের মাছি পোকা লেবুর ভয়ানক শত্রু। বিষটোপ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ মাছি পোকা দমন করা যায়।

রোগ দমন: লেবু জাতীয় গাছের ডাইব্যাক একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগের আক্রমণে গাছ শীর্ষভাগ হতে মারা যেতে থাকে এবং পরবর্তীতে সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়। রোগ দেখা মাত্র ১০-১২ দিন পরপর বার্দে মিশ্রণ স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়। গামোসিস রোগের আক্রমণে বাকল ফেটে রস পড়তে থাকে এবং আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। এই রোগ দেখামাত্র আক্রান্ত স্থান চেঁছে দিয়ে বার্দে পেস্ট লাগাতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

লেবু ও কাগজী লেবু গাছে জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল ও ফল আসে এবং জুন- জুলাই মাসে এগুলো সংগ্রহ করা যায়। জাম্বুরাতে জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল আসে এবং সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে ফল আহরন করা হয়। কমলার গাছে মার্চে ফুল আসে এবং নভেম্বর - ডিসেম্বর ফল পাকে।

ফল পুস্ট হলে রং বদলাতে শুরু করে। ফল যতই পুস্ট হবে চামড়ার উজ্জ্বলতা ততই বৃদ্ধি পাবে এবং চামড়া টানটান হবে। পুষ্ট লেবু কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত টাটকা থাকে। সংগ্রহের পর ফল পরিষ্কার করে বিক্রয়ের জন্য ছোট বড় গ্রেডিং করতে হয়। পরিণত ফল ১১° সেলসিয়াস তাপমাতায় ও ৮০ - ৯০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় হিমাগারে দুমাস পর্যন্ত তাজা অবস্থায় রাখা যায়।

ফলন ও কাগজী লেবু গাছ প্রতি ২০০০ - ৪০০০টি

লেবু/পাতি লেবু ও ১০০-১০০০টি

জাম্বুরা : ১০০-৩০০টি, কমলা ও ১০০-৫০০ টি

২০২২

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অবৃক্ষ জাতীয় ফলের মধ্যে প্রধান প্রধান ফল কোনটি ?

২। চারা রোপণের কত দিন পূর্বে গর্ত খনন ও সার মিশ্রিত করে ভরাট করতে হয় ?

৩। পেঁপে চারা রোপণের কত দিন পর ফুল ও ফল আসে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কলা গাছের সাকার সম্পর্কে লেখ।

২। আনারসের কয় ধরনের সাকার পাওয়া যায় লেখ।

৩। পেঁপে গাছে সারের উপরি প্রয়োগ সম্পর্কে লেখ ।

৪। পেয়ারার চারা রোপণের দূরত্ব ও সময় সম্পর্কে লেখ।

৫। পেঁপের জাতের নাম লিপিবদ্ধ কর।

৬। কলার চারা রোপণ পদ্ধতি লেখ।

৭। কলার চারা শনাক্তকরণ পদ্ধতি লেখ।

৮। কলার পানামা রোগের কারণ ও লক্ষণ লেখ।

৯। পেয়ারার ক্যাংকার রোগের কারণ ও দমন পদ্ধতি লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কলা চাষের জন্য চারা নির্বাচন, চারা প্রস্তুতকরণ, চারা রোপণ, ও অন্তবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

২। আনারসের জন্য জমি ও মাটি নির্বাচন, চারা রোপণের দূরত্ব, চারা রোপণ পদ্দতি ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

৩। পেঁপে চাষের জন্য জমি তৈরি, গর্ত খনন, চারা রোপণ কৌশল, চারা রোপণের দূরত্ব ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ ।

৪। পেয়ারা চাষের জন্য মাটি ও জমি নির্বাচন, গাছের শাখা বিন্যাসের জন্য ছাঁটাই পদ্ধতি ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

৫। আনারস, কলা, পেঁপে ও পেয়ারার আহরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি লেখ।

৬। পেঁপের পোকামাকড় ও রোগ দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। **টীকা লেখ:** ক) পানি চারা খ) আনারসের সাকার

প্রথম পত্র, নবম শ্রেণি

ব্যবহারিক

অনুশীলনী- ১: ফল শনাক্তকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের প্রচলন ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ফলকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-(ক) প্রধান প্রধান ফল, (খ) অ-প্রধান ফল, (গ) বাংলাদেশের উপযোগী বিদেশি ফল।

(ক) প্রধান প্রধান ফল: আম, কলা, পেঁপে, আনারস, লিচু, নারিকেল, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আতা, শরীফা, তরমুজ, সফেদা, বেল, জাম, জামবুরা, কমলালেবু ইত্যাদি।

(খ) অ-প্রধান ফল: আঙ্গুর, তাল, খেজুর, চালতা, আমড়া, তেঁতুল, আমলকি, জামরুল, করমচা, গোলাপ জাম, কমলালেবু, দেওফল, গাব, কামরাঙ্গা, জলপাই, ডুমুর, লটকন, ডালিম, চুকুর, তুতফল, বেতফল, ডেউয়া, পানিফল, বিলম্বী, সুপারি, অরবরই ইত্যাদি।

(গ) বাংলাদেশের উপযোগী বিদেশি ফল: এ্যাভাকোডো, ফলসা, ল্যাংসাট, ট্রপিক্যালআপেল, স্টার ফুট, স্ট্রবেরি, রামবুটান, ডুরিয়ান, সালাক, ড্রাগন ফ্রুট ইত্যাদি।

ছক-১

ক্রমিক নং	প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ফলের ভাগ	ফলের নাম ও মোট সংখ্যা
১	প্রধান প্রধান ফল	১৬
২	অপ্রধান ফল	২৭
৩	বদেশি ফল	৯
	সর্বমোট:	৫২

$$\text{প্রধান ফলের শতকরা হার} = \frac{\text{প্রধান ফলের সংখ্যা}}{\text{মোট ফলের সংখ্যা}} \times ১০০$$

$$\text{অপ্রধান ফলের শতকরা হার} = \frac{\text{অপ্রধান ফলের সংখ্যা}}{\text{মোট ফলের সংখ্যা}} \times ১০০$$

আবার ফলগাছের জীবনকাল ও ফল দেয়ার সময় কালের ভিত্তিতে ফলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন - ১। দীর্ঘমেয়াদি ২। মধ্যম মেয়াদি ৩। স্বল্প মেয়াদি।

১। দীর্ঘ মেয়াদি-আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু, বেল, তেঁতুল, কামরাঙ্গা, আমড়া ইত্যাদি।

২। মধ্যম মেয়াদি-পেয়ারা, জামবুরা, কুল, সফেদা, আতা, শরীফা, কমলা লেবু, জামরুল, জলপাই, অরবরই, করমচা, আমলকি, এভাকোডো, লটকন, ডালিম ইত্যাদি।

৩। স্বল্প মেয়াদি-কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ, চুকুর ইত্যাদি।

ছক-২

ক্রমিক নং	ফল গাছের জীবন কালের ভিত্তিতে ফলের ভাগ	ফলের নাম ও মোট সংখ্যা
১	দীর্ঘ মেয়াদি ফল	
২	মধ্যম মেয়াদি ফল	
৩	স্বল্প মেয়াদি ফল	
	সর্বমোট	

ছক-৩

ক্রমিক নং	ফলের মৌসুম	ফলের নাম ও সংখ্যা
১	গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমের ফল	
২	শীত মৌসুমের ফল	
৩	সারা বছরের ফল	

প্রয়োজনীয় উপকরণ

(১) বিভিন্ন ধরনের ফল।

(২) প্রাসঙ্গিক তথ্য মোতাবেক ফলভিত্তিক সংখ্যা নিরূপণের তালিকা/ছক।

(৩) চিত্রসহ ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণযুক্ত পুস্তিকা।

(৪) কাগজ, কলম, কেল, রাবার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১। ফল শনাক্তকরণের জন্য ফলের বাগানে বা বাজারে যেতে হবে।

২। ফলের চিত্র সংবলিত তালিকার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করতে হবে।

৩। ছক মোতাবেক ফলের নাম লিখতে হবে।

৪। বিভিন্ন মৌসুমে বাগানে বা বাজারে গিয়ে ছক মোতাবেক কোন কোন ধরনের ফল পাওয়া যায় তা লিখতে হবে এবং সংখ্যা বের করতে হবে।

৫। পূরণকৃত ছক থেকে কোন কোন ফলের উৎপাদন বেশি বা বাজারে কোন ফল বেশি পাওয়া যায় তা নির্ধারণ করা যায়।

৬। ফলের শতকরা হার নিরূপণ করে ফলের অবস্থান নির্ণয় করা যাবে।

অনুশিলনী- ২: ফল চাষের স্থান ও মাটি নির্বাচন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ফল বাগানের জন্য জমির উপযুক্ততা বিবেচনা করতে হবে। কেননা কোন কোন ফল উঁচু জমি এবং কোন কোন নিচু জমি পছন্দ করে। আবার কোন কোন ফল শুষ্ক আবহাওয়া এবং কোন কোন ফল আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে। এছাড়া অনেক ফলের জন্য মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব বিশেষ উপযোগী। তাই ফস্তু বাগানের জন্য এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ফল চাষের জন্য সুপারিশ করা যাবে। ২০২২

তথ্যভিত্তিক উপকরণ

(১) জমির অবস্থানের তথ্য ও যেমন জমির প্রকৃতি (উঁচু বা নিচু বা ব্যবসায়িকভাবে বাগান স্থাপন উপযোগী হবে কিনা, বাগানের স্থানে আলো বাতাস খোলামেলাভাবে লাগে কিনা, রাস্তাঘাটের সুবিধাদি বিদ্যমান অথবা একেবারেই নেই প্রক্রিয়াধীন)

(২) আর্থ সামাজিক তথ্য ও ঋণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, জমির দাম, শ্রমিক সুবিধা, সামাজিক অবস্থা, মানুষের রুচি ও চাহিদা, বাড়ির আঙ্গিনা বা বাঁধের ধারে বাগান করার জন্য জমি প্রাপ্তি।

(৩) কারিগরি তথ্য ও ফল গাছের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপযোগী আবহাওয়া, মাটির বুনট, মাটির গুণাগুণ, পানির উৎস, বীজ/চারা কলম প্রাপ্তির সুবিধা, সেচ সুবিধা ও সেচ যন্ত্রপাতি, সার, বীজ, কীটনাশকের সহজলভ্যতা।

কাজের ধাপ

(১) উঁচু জমিতে বৃষ্টিপাত বেশি হলেও পানি জমার সম্ভাবনা থাকে না। তাই ফল গাছের জন্য উঁচু জমি চিহ্নিত করে কাগজে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(২) নিচু জমি এবং বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় এমন স্থানে যে সকল গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না সেগুলো লাগানো যাবে না।

(৩) ভূ-গর্ভস্থ পানিতল কাছে হলেও যে সকল গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না সে সমতু গাছ লাগানো যাবে না। কেননা সেখানে অল্প বৃষ্টিতেই পানিতল উপরে উঠে আসতে পারে।

(৪) অধিকাংশ ফল গাছই খোলামেলা আলো বাতাস ও সূর্যালোক না পেলে ঠিকমত ফল দিতে পারে না। তাই সূর্যালোক পড়ে এবং আলো বাতাস লাগে তা দিনের বেলায় সূর্য উঠার পরে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর কাগজে এলাকার মাপ লিখে নিতে হবে এবং মাপে কাঠি পুঁতে চিহ্নিত করতে হবে।

(৫) রাস্তাঘাটের ম্যাপ নিতে হবে, যা ফল উৎপাদনকালে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ে ভালো রাস্তা দিয়ে যোগাযোগের পরিকল্পনা প্রণয়নে সুবিধা হবে। এমনকি নার্সারি হতে চারা কলম আনয়ন করাও সহজ হবে।

(৬) সেচের সুবিধা আছে, জমির দাম কম, কাজ করার জন্য শ্রমিক পাওয়া যাবে, বাগানের ফল চুরি হবে না বা গাছ পালা নষ্ট হবে না, উৎপাদিত ফল বিক্রয় করা যাবে এমন বিষয়গুলো জরিপ করে চিহ্নিত করতে হবে ও নিশ্চিত হতে হবে।

(৭) ইটের ভাটা বা ধোয়া নির্গত হয় এমন কারখানার কাছে ফলের বাগান করা যাবেনা।

(৮) বর্ষায় পাবিত হয় এমন স্থান বাগানের জন্য নির্বাচন করা যাবে না। পরবর্তীতে বাগান স্থাপনের জন্য কারিগরি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন-

(ক) মাটি এঁটেল, বেলে বা বেলে দোঁয়াশ তা জেনে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) মাটি কাঁকর যুক্ত, মাটিতে পানি প্রবেশ ক্ষমতা, মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি জানতে হবে।

(গ) মাটির জৈব পদার্থ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে জানতে হবে।

২০২২ (ঘ) মাটির অম্লমান বা ক্ষারমান জেনে এলাকা চিহ্নিত করতে হবে।

এরপর বিভিন্ন ফল চাষের বর্ণনা দেখে জমির ধান ও মাটির অবস্থা জেনে ফল গাছ নির্বাচন করে লাগানো উচিত হবে। তাতে লাভজনকভাবে ফল চাষ বা ফল বাগান করা সম্ভব হবে।

ছক: ফল বাগানের জন্য স্থান নির্বাচনী জরিপ ফরম।

ফলের নাম

বাগানের জন্য প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয়	নির্বাচিত বিষয়
ফুল গাছের পছন্দনীয়: (ক) জমি-উঁচুনিচু (খ) জমি খোলামেলা/ছায়াযুক্ত /অন্ধকারভাব (গ) মাটির অমত্ব ক্ষারত্ব। (ঘ)মাটি-এঁটেল/বেলেদোঁয়াশ পলি দোঁয়াশ/দোঁয়াশ/বেলে কাকরময় যোগাযোগ: (ক) রাস্তাঘাট--আছে/নেই (খ) যানবাহন-গ্রামীণ/আধুনিক (গ) সেচ সুবিধা-আছে/নেই (ঘ) পানিতল-কাছে/গভীর অন্যান্য: (ক) বাজার ব্যবস্থা-আছেনেই (খ) শ্রমিক প্রাপ্তির সুবিধা-আছে/নেই (গ) জমির মূল্য-বেশি/কম (ঘ) উপকরণ প্রাপ্তি-সহজ কঠিন (ঙ) আশেপাশে কলকারখানা-আছে নাই। (চ) অন্য কোন বিবেচ্য বিষয় (যদি থাকে)	

অনুশীলনী- ৩: ফলের চারা লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গাছের প্রায়াজনীয় খাবার সরবরাহ এবং শিকড়ের বৃদ্ধির জন্য গাছ রোপণের আগে গর্ত করা একান্ত প্রায়াজন। এক এক গাছের জন্য এক এক পরিমাণ দূরত্বে ভিন্ন ভিন্ন আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। সাধারণত কোন গাছের জন্য কি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে তা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যথা-

(ক) গাছের আকৃতি (খ) শিকড়ের গভীরতা (গ) শিকড়ের বিস্তৃতি (ঘ) চাষের মেয়াদ কাল (ঙ) গাছের খাবারের চাহিদা ইত্যাদির উপর।

উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

১। কোদাল ২। শাবল/খন্তা ৩। ঝুড়ি ৪। মাপযন্ত্র ও মাপের ফিতা ৫। বাশেঁর কাঠি ৬। দড়ি/সুতলি ৭। পলিথিন সিট ৮। কীটনাশক ও জীবাণুনাশক ঔষধ।

২০২২

কাজের ধাপ

১। গর্ত খননের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে সমতল করে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

২। জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিতে হবে। মাপ দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

৩। নির্দিষ্ট দূরত্বে চিহ্নিত জায়গায় গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের দিকের মাটি একদিকে এবং নিচের দিকের মাটি আর এক দিকে রাখতে হবে।

৪। চারা রোপণের ২০-৩০ দিন আগে গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে পরিমাণমত সার দিয়ে মাটি ভরাট করে দিতে হবে।

৫। যে সব জায়গায় উইপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে সেখানে উইপোকা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

৬। গর্তের মাটি জীবাণুমুক্ত করার জন্য পুরো রোগনাশক দ্রবণটি গর্তের মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে এবং একটি পলিথিন সিট দিয়ে গর্তটি ঢেকে দিয়ে ৪৮ ঘণ্টা রাখতে হবে। এরপর পলিথিন সিট সরিয়ে নিয়ে কোদাল/খুরপি দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে। এ অবস্থায় ৭-১০ দিন রাখতে হবে। এ সময় গ্যাসের গন্ধ চলে যাবে, গর্ত জীবাণুমুক্ত হবে।

৭। গর্তের উপরের মাটির সাথে গোবর পঁচাসহ প্রয়োজনীয় সার মিশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি গর্তের নিচের দিকে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। আর নিচের অংশের আলাদা করে রাখা মাটি গর্তের উপরিভাগে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি বেশি উর্বর।

৮। সার মিশ্রিত মাটি গর্তে দেয়ার পর ভালোভাবে মাটি চেপে দিতে হবে।

৯। গাছের আকৃতি বিবেচনা করে গর্তের ব্যাস ও গভীরতা নির্ণয় করতে হবে।

চিত্রঃ ফলের চারা লাগানোর জন্য গর্ত

গাছের আকৃতি	চারা লাগানোর গর্তের মাপ	একটি চারা থেকে আর একটি চারার দূরত্ব
(ক) বড় বৃক্ষ জাতীয় গাছ (আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, বেল ইত্যাদি)	১ মিটার ব্যাস ১ মিটার গভীরতা বা ৯০×৯০×৯০ সে.মি.	৭-৮ মিটার

২০২২

(খ) মাঝারি গাছ (পেয়ারা, আতা, শরীফা, সফেদা, লেবু ইত্যাদি)	৬০ সে.মি ব্যাস ও ৬০ সে.মি গভীর বা ৭৫×৭৫×৭৫ সে.মি.)	৫ মিটার
(গ) ছোট গাছ (কলা, পেঁপে, সুপারি)	৫০ সে.মি. ব্যাস ও ৫০ সে.মি. গভীর	২ মিটার
(ঘ) খুব ছোট গাছ (আনারস, স্ট্রবেরী ইত্যাদি)	১৫ সে.মি. ব্যাস ও ১৫ সে.মি গভীর)	২ মিটার

অনুশীলনী- ৪ঃ গর্তে চারা রোপণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

মাঠ ফসলের সাথে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের মূল পার্থক্য হলো যে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের ক্ষেত্রে ভালোভাবে চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট আকারের গর্ত খনন করার পর সার প্রয়োগ করে গাছ লাগানো হয়। চারা রোপণের সময় চারার গোড়া পটে বা বেডে যতটুকু গভীরে ছিল ততটুকু গভীরে রাখতে হবে। চারা রোপণের পর ঝড়ো বাতাস ও জীবজন্তু হতে রক্ষার জন্য খুঁটি ও বেড়া এবং আবহাওয়া শুষ্ক ও রৌদ্রজ্জ্বল হলে গাছের উপর ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল

২। খন্তা/শাবল

৩। ঝুড়ি

৪। ঝরণা

৫। বাঁশের কাঠি

৬। বাঁশের খাচা

৭। দড়ি

কাজের ধাপ

১। সার মেশানো মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার এক সপ্তাহ পর গর্তে চারা লাগাতে হবে।

চিত্রঃ পলিথিন পটের চারা বের করার জন্য পট কাটা

চিত্রঃ গর্তে চারা স্থাপন

চিত্রঃ চারা বের করার জন্য পট অপসারণ

চিত্রঃ গর্তে চারা স্থাপন করে মাটি চেপে দেয়া

২। চারা যদি পটে থাকে তবে চারাটি সাবধানে পট থেকে বের করতে হবে। পলিথিন ব্যাগের চারা হলে পলিথিন একপাশ দিয়ে কেটে নিতে হবে। নার্সারি বেডে চারা থাকলে রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে চারাটি খাসি করে নিতে হবে। খাসি করার এক সপ্তাহ পরে নার্সারি বেড হতে চারাটি উঠায়ে পলিথিন ব্যাগ ব পটে স্থাপন করে ৪-৫ দিন ছায়ায় রাখতে হবে।

৩। চারার গোড়ার বলের আকারে মাটি না সরিয়ে গর্ত হতে চারা লাগানোর স্থানের মাটি সরিয়ে নিতে হবে। পট হতে বা পলিথিন কেটে চারা বের করার সময় যাতে বল ভেঙে না যায় সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৪। চারাটির কাণ্ড বাম হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের মধ্যে এবং বলটি ডানহাতের তালুতে নিয়ে চারাটি সোজা করে গর্তে বসানোর পর গর্ত হতে পূর্বে সরানো মাটি দিয়ে বলের চারপাশ ভালো করে চেপে দিতে হবে।

৫। চারা রোপণের পর ঝড় বাতাস হতে রক্ষার জন্য একটি সোজা বাঁশের কাঠি দিয়ে শক্ত করে চারাটি বেঁধে দিতে হবে।

৬। চারা রোপণের পর তাতে ঝরনা দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। গরু ছাগলের হাত থেকে চারা রক্ষা করার জন্য বাঁশের খাঁচা দিতে হবে। চারা বিকালে লাগানো উত্তম এবং রোপণের পর অন্তত এক মাস সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। আবহাওয়া শুকনো এবং রৌদ্রজ্জ্বল থাকলে চারার উপর চাটাই বা নারিকেলের শুকনো ডাল দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুশীলনী- ৫ঃ উপযুক্ত চারা শনাক্তকরণ ও রোপণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গাছের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে চারার বয়স বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন-দীর্ঘমেয়াদি গাছের চারা ২-৩ বছরের নিতে হয়। সেখানে স্বল্পমেয়াদি গাছের চারার ৩-৪ মাসের নিতে হয়। এমন কি স্বল্প মেয়াদী ফলের চারা আরও কম বয়সের নেওয়া যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

(১) দীর্ঘ মেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি ফলের চারা (আম, কাঁঠাল, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা, কলা, আনারস ইত্যাদি)।

(২) গর্ত তৈরির যন্ত্রপাতি (শাবল, খন্তা, কোদাল, খুরপি ইত্যাদি)

(৩) কাঠি ও সুতলি

(৪) পানি ও ঝরণা।

(৫) বাঁশের খাঁচা।

(৬) কীটনাশক ঔষধ

কাজের ধাপ

১। স্থানীয়ভাবে গুণগত মান সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল জাত চিহ্নিত করতে হবে। যেমন- কোন গাছে বা বিশেষ ফল গাছে নিয়মিত ফল ধরে। সাধারণ রোগ ও পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে প্রতিকূল অবস্থায়ও ফল ধারণে তেমন কোন তারতম্য হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে আগাম বা নাবিফল ধরে ইত্যাদি।

২। কলম বা বীজ থেকে চারা তৈরি করার পর ২/৩ বছর নার্সারিতে পালন করার দরকার। কোন কোন ক্ষেত্রে ১ বছর নার্সারীতে পালন করলেও কোন অসুবিধা হয় না।

৩। দুর্বল ও রোগাক্রান্ত চারা বাদ দিয়ে সতেজ চারা নিতে হবে।

চিত্রঃ সবল চারা নির্বাচন

চিত্রঃ দুর্বল চারা বাদ দেওয়া

৪। দীর্ঘমেয়াদি ফলের চারার গোড়ার দিকে এক মিটার কাণ্ড পর্যন্ত কোন ডালপালা গজাতে দেয়া যাবে না।

৫। স্বল্পমেয়াদি ফলের ক্ষেত্রে চারার গোড়ার হতে উপরের দিকে পিরামিড আকৃতির হতে হবে অর্থাৎ গোড়া মজবুত হতে হবে। পাতা চওড়া, ছড়ানো প্রকৃতির এবং চারা দুর্বল লিকলিকে হলে তা বাদ দিতে হবে।

৬। দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি ফলের চারা নির্বাচনে চারার বয়স ফলের জাত ভেদে উপযুক্ত হতে হবে।

৭। চারা রোপণের গর্ত চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ আগে তৈরি করতে হবে।

৮। প্রায় এক সপ্তাহ গর্ত করে খোলা রাখার পর সার মেশানো মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করে এক থেকে দেড় সপ্তাহ রাখতে হবে।

৯। চারার গোড়া হতে পট বা পলিব্যাগ সাবধানে সরাতে হবে। চারা লাগানোর নির্দিষ্ট স্থানে চারার বলের সম পরিমাণ মাটি সরিয়ে সেখানে চারা বসাতে হবে। চারার গোড়ার কাণ্ড যতটুকু পর্যন্ত মাটিতে ঢাকা ছিল ততটুকু পর্যন্ত মাটির গভীরে ঢেকে স্থাপন করতে হবে।

১০। চারার গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য নালার ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা চারার গোড়া উঁচু করে লাগাতে হবে।

১১। বিকেলের দিকে ও মেঘলা দিনে চারায় লাগানো উচিত। তাতে চারা সহজে লেগে যেতে পারে।

১২। আবহাওয়া শুকনা এবং রৌদ্রময় থাকলে চারায় সেচ প্রদান ও চারার উপরে এক থেকে দেড় সপ্তাহ পর্যন্ত ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। চারার পাশে সোজা খুঁটি পুঁতে তার সাথে চারা সোজা করে বেঁধে দিতে হবে।

অনুশীলনী- ৬: ফল গাছে পানি সেচ ও নিষ্কাশন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

চারায় সেচ প্রদান করতে হলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা, চারা রোপণের নকশা এবং গাছের পানির চাহিদা, গাছের বৃদ্ধি পর্যায় ইত্যাদি বিবেচনা করে সেচ প্রদান করতে হয়। সেচের পানি বেশি হলে বা অত্যধিক বৃষ্টি পড়ে পানি জমার সম্ভাবনা থাকলে চারার গোড়া হতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ফলের বাগান

২। সেচ যন্ত্রপাতি (পাওয়ার পাম্প, গভীর বা অগভীর পাম্প, ঝরনা, পানি সরবরাহের পাইপ ইত্যাদি)

৩। মাপ ফিতা

৪। কোদাল, সুতলি, খুঁটি ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১। স্থায়ী বড় ফল বাগানের জন্য দুই সারির মাঝখানে নালা তৈরি করতে হবে।

২। গাছের গোড়ায় থালার মত করে নিয়ে নালার মাঝে সংযোগ তৈরি করে পানি দিতে হবে। এতে পানির অপচয় কম হবে।

৩। ছোট ছোট ফল গাছের জন্য প্রতি দুই সারি পর পর নালা তৈরি করতে হবে। গাছের দু'সারিকে বেডের মত করে বেডের মাঝখান দিয়ে সেচ দিতে হবে। মাঝখানের নালায় পানি ভর্তি করে ২/৩ ঘন্টা রেখে দিলে সমস্ত জমি ভিজে যাবে।

৪। চারা রোপণ উপযোগী হলে আসতে আসতে সেচ কমাতে হবে। এতে চারা রোপণজনিত আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তবে চারা রোপণের পূর্বে নার্সারিতে থাকা অবস্থায় ঝরনার সাহায্যে সেচ দিতে হবে। চারার অবস্থা ভেদে ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে সকাল বিকাল পানি সেচ দিতে হবে।

৫। চারা লাগানোর সময়, গাছের বড় বাড়তি ও ফুল ফোটার সময়, ফল ধরার সময় হতে ফল বড় হওয়ার সময় কালে সেচ দিতে হবে। সেচের সঠিক সময় নিরূপণের জন্য মাঠে গিয়ে গাছের শিকড়ের গভীরতার তিনভাগের দুইভাগ গভীর থেকে মাটি সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত মাটিতে চাপা দিয়ে বল করা না গেলে বা বল করার পর প্রায় ১ মিটার উপর হতে নিচে ফেলে দিলে সহজেই ভেঙে গেলে সেচ দিতে হবে।

৬। বিকালে পানি দিতে হবে। তাতে বাস্পীভবন কম হবে এবং পানির অপচয় কম হবে।

৭। পানির প্রবাহ বা নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য জমির উঁচু দিক থেকে ঢালের দিকে নালা করতে হবে। প্রয়োজনে এর সাথে গাছের গোড়ায় ছোট ছোট বেসিন বা থালাগুলো এবং নিচু ও অসমতল স্থানের সাথে নালা যুক্ত করা যেতে পারে।

৮। বাগানে গাছের আকৃতি ছোট হলে ঝোয়ারা পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে।

৯। গাছে ফুল অবস্থায় ঝোয়ারা সেচ দিলে পরাগায়নের অসুবিধা হতে পারে। ফুল অবস্থায় ঝোয়ারা সেচ দেয়া যাবে না।

১০। বৃষ্টির পানি যাতে গাছের গোড়ায় দাঁড়াতে না পারে সেজন্য নিকাশ নালা তৈরি করতে হবে।

চিত্রঃ গাছের গোড়ায় ঝাঁঝরি পদ্ধতিতে সেচ প্রদান

চিত্রঃ দুই সারির মাঝখান দিয়ে সেচ নালা তৈরি

অনুশীলনী- ৭ঃ ফল গাছের বংশ বিস্তার

প্রাথমিক তথ্য

দু'ভাবে ফলের চারা করা হয়। বীজ থেকে এবং ফলগাছের অঙ্গ থেকে। বীজের চারা সহজেই করা যায় এবং খরচও কম। বীজ থেকে গজানো চারা বড় ও শক্ত হয় এবং ফল বেশি দেয়। নারিকেল ও তালের মত কিছু ফলের চারা কেবল বীজ থেকে করা হয়। তবে আধুনিক প্রযুক্তি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এসব গাছের চারা বীজ ছাড়াও করা যেতে পারে। বীজের চারার প্রধান অসুবিধা হলো মাতৃ গাছের গুণ বদলে যায় এবং গাছ দেরিতে ফল ধরে। কলা ও আনারসের মত কিছু ফলের গাছ বীজ থেকে করা যায় না। কলম বা অঙ্গজ পদ্ধতিতে মাতৃগাছের সকল গুণ থাকে এবং কম সময়ে ফল পাওয়া যায়। কলমের সাহায্যে একই গাছে বিভিন্ন জাতের ফল ফলানো যায় এবং ইচ্ছে করলে মূল গাছের জাত বদলে দেয়া যায়। কলমের অসুবিধা হলো এর খরচ তুলনামূলকভাবে বীজের চারা থেকে বেশি। ক) জোড় কলম তৈরি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গাছের আদি জোড়া ও উপজোড়া পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যখন একটি একক গাছ হিসাবে বৃদ্ধি লাভ করে তখন তাকে গ্রাফট জোড় কলম বলে এবং এ জোড়া লাগানো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় গ্রাফটিং বা জোড় কলম। যে গাছের ওপর কাঙ্ক্ষিত গাছের ছোট একটি অংশ জোড়া লাগানো হয় তাকে আদিজোড়া (rootstock) এবং কাঙ্খিত গাছের এ অংশটিকে উপজোড় (scion) বলে। সহজভাবে বলা যায় জোড় কলমের জোড়স্থানের নিচের অংশ হলো আদিজোড় ও উপরের অংশ হলো উপজোড়।

জোড় কলম প্রধানত দু'ভাবে করা হয়ে থাকে। প্রথমত উপজোড়কে মাতৃগাছে সংযুক্ত অবস্থায় রেখে জোড়া লাগানো হয়। একে সংযুক্ত জোড় কলম বলে এবং দ্বিতীয়ত উপজোড়কে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আদি জোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হয়, একে বিযুক্ত জোড় কলম বলে।

ক) সংযুক্ত বা সংস্পর্শ জোড় কলম পদ্ধতি অনুশীলন

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসমূহ:

১। আদিজোড়
২। উপজোড়
৩। সিকেচার
৪। ধারালো চাকু
৫। নাইলন স্ট্রিপ
৬। পলিথিন ব্যাগ
৭। রশি

কাজের ধাপ

১। পলিব্যাগে বীজ থেকে চারা তৈরি করতে হবে। এই চারা আদি জোড় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

২। কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছের উপজোড় নির্বাচন করতে হবে।

৩। নির্বাচিত উপজোড় ৫ থেকে ৭ সে.মি. স্থান লম্বালম্বিভাবে কাঠ সহ বাকল তুলে ফেলতে হবে। চিত্রে দেখানো হয়েছে। কর্তনের উভয় প্রান্ত আড়াআড়িভাবে এবং মধ্যাংশে একটু গভীর করে কাটতে হবে এবং কর্তিত স্থানটি মসৃণ করতে হবে।

৪। নির্বাচিত আদিজোড়ে সুবিধামত স্থানে উপজোড়ের অনুরূপ কর্তন দিয়ে আদিজোড় তৈরি করতে হবে।

৫। আদি জোড় ও উপজোড় একসাথে আলাদা ভাবে লাগিয়ে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে।

৬। মাস দুই পর জোড়া স্থানের ৫ সে. মি. নিচে মাতৃগাছ থেকে উপজোড় বিচ্ছিন্ন করে কলমটিকে নিচে নামিয়ে এনে নার্সারিতে লাগাতে হবে।

৭। কলমটিতে উপজোড়ের বৃদ্ধি শুরু হলে জোড়াস্থানের ৫ সে. মি. উপরে আদি জোড়কে কেটে ফেলতে হবে।

চিত্র: সংস্পর্শ জোড় কলম

সতর্কতা

১। আদিজোড় ও উপজোড়ের কর্তিত স্থান মসৃণ হতে হবে।

২। আদিজোড় ও উপজোড় একসাথে বাঁধার পর মাঝখানে যেন কোনো ফাক না থাকে।

খ) ভিনিয়ার জোড় কলম পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ ভিনিয়ার জোড় কলম এক ধরনের পার্শ্ব জোড় কলম। এ পদ্ধতিতে আদিজোড়ের এক পার্শ্বে উপজোড়ের নিম্ন প্রান্ত স্থাপন করা হয়। উপজোড়কে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আদি জোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হয়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসমূহ

- আদিজোড়
- উপজোড়
- সিকেচার ও ধারালো চাকু
- নাইলন স্ট্রিপ ও পলিথিন ব্যাগ
- রশি

কাজের ধাপ

- নার্সারি বেড় বা টবে বীজ থেকে চারা গাছ উৎপাদন করতে হবে। ৯ মাস থেকে শুরু করে ১৮ মাস পর্যন্ত বয়সের চারা গাছকে আদিজোড় হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
- নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে উপজোড় সংগ্রহ করতে হবে। উপজোড় পাতার বোটা ১ সে.মি. রেখে পাতাগুলো কেটে ফেলতে হবে।
- মাটি থেকে ২৫ থেকে ৩০ সে.মি উপরে আদিজোড়ের উপর লম্বালম্বিভাবে ৫-৬ সে.মি, তেরছাভাবে কাটুন। উক্ত কর্তনের নিম্নপ্রান্তে ছোট তেরছা কর্তনের মাধ্যমে কর্তিত কাঠ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- উপজোড়ার নিম্নাংশে আদিজোড়ের অনুরূপ কর্তন (চিত্র দ্রষ্টব্য) দিয়ে উপজোড়টি তৈরি করতে হবে।
- আদি জোড় ও উপজোড় একত্রে ভালোভাবে বসিয়ে নাইলন স্ট্রিপ দ্বারা শক্ত করে বাঁধতে হবে।
- পলিথিন ব্যাগ দ্বারা উপজোড়টি আবৃত করে আদিজোড়ের সাথে বেঁধে রাখতে হবে। আদি জোড় ও উপজোড় ভালোভাবে জোড়া লাগার পর (৫০-৬০ দিন পর) জোড়স্থানের ২-৩ সে.মি. উপরে আদিজোড়টি কেটে ফেলতে হবে।

২০২২

চিত্র: ভিনিয়ার জোড় কলম

সতর্কতা

- দুই তিন দিন পর পর পলিব্যাগ খুলে ভেতরে জমাকৃত পানি ফেলে দিতে হবে।
- আদিজোড় ও উপজোড় একসাথে বাঁধার পর মাঝখানে যেন কোনো ফাঁকা না থাকে।
- জোড়াস্থানের নিচে আদিজোড়ে কোন শাখা প্রশাখা জন্মতে দেয়া যাবে না।

গ) চক্ষু কলম (বাডিং) পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাডিং এমন এক প্রকারের জোড় কলম যাতে শাখার পরিবর্তে পল্লবের কুঁড়ি বা চোখ (ফ) উপজোড়রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একে চোখ কলম বলে। শীতের শেষে, বসন্তে যখন গাছ বেশ সক্রিয় সম্পূর্ণ ও বর্ধনশীল হয়ে উঠে সে সময় অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাস চোখ কলমের জন্য খুবই উপযোগী। তবে ঐ সময় খুব গরম থাকলে চোখ শুকিয়ে যেতে চায়। চোখ কলমের জন্য প্রায় এক বছর বয়স্ক আদিজোড় নিলে ভাল হয়। বিবিধ প্রকার চোখ কলমের মধ্যে টি চোখ কলম, তালি চোখ কলম, চক্র চোখ কলম ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

ঘ) টি চোখ কলম পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

এ কলম এক প্রকার চোখ কলম বা বাডিং। এ পদ্ধতিতে উন্নত জাতের একটি মাত্র চোখ ব্যবহার করে নতুন গাছ উৎপাদন করা যায়। আদি জোড়ের গায়ে টি- কেটে সেখানে বর্ম আকৃতির বা চোখ আকৃতির কুঁড়ি স্থাপন করা হয় বলে এ পদ্ধতির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি

- আদিজোড় ও উপজোড়
- বাডিং ছুরি
- দ্বিফলক বিশিষ্ট ছুরি
- নাইলন স্ট্রিপ/পলিথিন ফিতা

কাজের ধাপ

- নির্বাচিত আদিজোড়ে মাটি থেকে ২০-২৫ সে.মি. উপরে কাণ্ডের ওপর আড়াআড়িভাবে ১.৩ সে.মি পরিমাণ লম্বা কর্তন দিতে হবে। একটা দাগের মাঝখান থেকে নিচের দিকে ৪-৫ সে.মি. পরিমাণ আরেকটি লম্বালম্বি কর্তন দিতে হবে।
- লম্বালম্বি দাগ বরাবর চাকু দ্বারা কাঠ থেকে বাকলকে আলগা করতে হবে।
- কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ থেকে সুপ্ত কুঁড়িসহ একটি বাকল কেটে নিতে হবে। বাকলটিকে ঢালের মত করে তৈরি করতে হবে।
- কুঁড়ি সহ বাকলটি আদিজোড়ের কর্তিত অংশে ঢুকিয়ে দিতে হবে।
- কুঁড়িটিকে বাইরে রেখে পলিথিন ফিতা দ্বারা বাকলটি আদিজোড়ার সাথে ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে।

৩। সতর্কতাঃ ● বাঁধার সময় কুঁড়িটি যেন ঢাকা না পড়ে ● প্রস্ফুটিত কুঁড়ি ব্যবহার করা যাবে না

১ পৃথককৃত কুঁড়ি

২ পৃথককৃত কুঁড়িটি 'T' আকৃতিতে কাটা বাকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নাইলন স্ট্রিপ দিয়ে বাধা হয়েছে

৩ মূল আদিজোড়ে 'T' আকৃতিতে বাকল কাটা হয়েছে

৪ মূল আদিজোড় প্রস্তুত করা হয়েছে

৫ কচি ডগা থেকে কুঁড়ি পৃথক করা হচ্ছে

চিত্রঃ টি চোখ কলম

অনুশীলনী- ৮: ফুল ধরার আগে পরিচর্যা পদ্ধতি (ট্রেনিং ও প্রুনিং পদ্ধতি অনুশীলন)

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ফল গাছ বিভিন্ন সময় ও উদ্দেশে ছাঁটাই করা হয়। সময় ও উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে গাছ ছাঁটাইকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-ট্রেনিং ও প্রুনিং। ফল গাছ থেকে সঠিক ফলন ও মানসম্মত ফল পেতে হলে গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় ট্রেনিং এবং গাছ ফল ধারনের তরে পৌছানারে পর প্রুনিং করা প্রয়োজন। ট্রেনিং ও প্রনিং করার জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কারণ যথাযথ অভিজ্ঞতা না থাকলে অতিরিক্ত ট্রেনিং ও প্রুনিং করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

ক) ট্রেনিং পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গাছে ফল ধারনের পূর্বে একটি সবল ও সুন্দর কাঠামো তৈরির জন্য ছাঁটাই করা হয়। এ কাজটি প্রধানত প্রধান কাণ্ডকে কেন্দ্র করে করা হয় বলে এ ধরনের ছাঁটাইকে ট্রেনিং বলা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

- ট্রেনিংয়ের জন্য গাছের চারা বা ছোট গাছ
- ছুরি
- কাঁচি
- সিকেচার
- প্রুনিং করাত
- ডাল কাটার দা
- বড় গাছের ডাল কাটার কাঁচি
- বোর্দোপেষ্ট বা ছত্রাকনাশক
- গরম মোমে
- পলিথিন

কাজের ধাপ

১। ট্রেনিং এর প্রয়োজনীয় উপকরণ (চারাগাছ, সিকেচার, টেপ) সংগ্রহ করতে হবে।

২। চারা গাছে ট্রেনিং করতে হবে। ঝোপালো গাছ, যেমন- পেয়ারা, বাতাবীলেবু, শরিফা ইত্যাদি গাছে মুক্ত ও নাতি উচ্চকেন্দ্র পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। দীর্ঘ বৃহদাকার গাছ, গাছের জন্য উচ্চকেন্দ্র ট্রেনিং অনুসরণ করতে হবে।

৩। ট্রেনিং পদ্ধতির প্রয়োগ: ট্রেনিং পদ্ধতির দুইটি ব্যবস্থা নিম্নের ক) ও খ) অংশে বর্ণনা করা হলো -

ক) উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি

- নার্সারিতে ১ থেকে দেড় বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে।
- নির্বাচিত চারার উচ্চতা ১ মিটার হলে ভালো হয়।
- চারাটির নিচের দিকে পাশে গজানো শাখাগুলো এমনভাবে কাটতে হবে, যেন কাটা চিহ্ন মাটির সাথে লম্বা থাকে।

২০২২

- শাখার যেখানে কাটা হবে তা যেন প্রধান কাণ্ড হতে কম পক্ষে ২-৬ সে.মি দূরে হয়।
- শাখার যেখানে কাটা হবে তা যেন পর্ব সলিং বা শিরার ওপর না হয়।
- প্রধান কাণ্ডের সাথে গজাননা বা সংযুক্ত শাখা চিকন হলে প্রুনিং চাকু এবং শাখা মোটা হলে সিকেচার বা প্রুনিং করাত দিয়ে কাটতে হবে।
- সংযুক্ত শাখার কাটা স্থানে বোর্দোপেস্ট বা ছত্রাকনাশক লাগাতে হবে।
- ট্রেনিং এর কাজটি পরিষ্কার ও রৌদ্রজ্জল দিনে করতে হবে। খুব সকালে বা একেবারে বিকালে শাখা ছাটাই করা উচিত হবে না।

চিত্রঃ উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতি

খ) নাতি উচ্চ কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি

- এ পদ্ধতিতে কাজের জন্য নার্সারীতে ১ থেকে ২ বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে।
- চারাটির প্রধান কাণ্ড ১ মিটার উঁচু হওয়া পর্যনত পাশের শাখাগুলো কেটে দিতে হবে। তবে এ সময় প্রধান কান্ডের মাথা কাটা যাবেনা।
- এর পর প্রধান কান্ডের উপরের দিকে ৫-৬ টি শাখা রেখে বাড়তে দিতে হবে।
- এ সমস্ত শাখাগুলো বাড়ার সাথে সাথে প্রধান কাণ্ডটি ১.৫-২.০ মিটার উঁচু হলে প্রধান কান্ডের মাথা কেটে দিতে হবে।
- প্রধান কাণ্ড ও পার্শ্ব শাখাগুলো কাটার পর পরই কাটা স্থানে বোর্দোপেষ্ট বা ছত্রাকনাশক লাগাতে হবে।

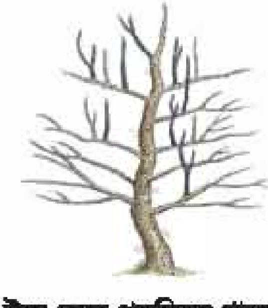

চিত্রঃ নাতি উচ্চ কেন্দ্র পদ্ধতিতে গাছের ট্রেনিং করা

গ) মুক্ত কেন্দ্র ট্রেনিং পদ্ধতি

- এ পদ্ধতিতে কাজের জন্য নার্সারীতে ১ বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে।
- চারাটির প্রধান কাণ্ড ০.৫ থেকে ১.০ মিটার উঁচু হলে মাথা বা শীর্ষ কুঁড়ি কেটে দিতে হবে।
- এর পাশের শাখাগুলো বাড়তে দিতে হবে।
- গাছ ঝোপালো করার প্রয়োজন হলে পাশের শাখা গুলো কিছুটা বড় হতে দিতে হবে। এরপর শাখাগুলোর মাথা কেটে দিতে হবে।
- তবে পাশে গজালো শাখা বেশি ঘন হলে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে কিছু কিছু শাখা কেটে দিতে হবে।
- এ কাজ সম্পন্ন করে গাছের কাঠামো ঠিক করতে ২-৩ বছর সময় লাগবে।
- প্রতিবারই শাখার বা কাণ্ডের কাটাস্থানে বোর্দোপেস্ট বা ছত্রাকনাশক লাগাতে হবে।

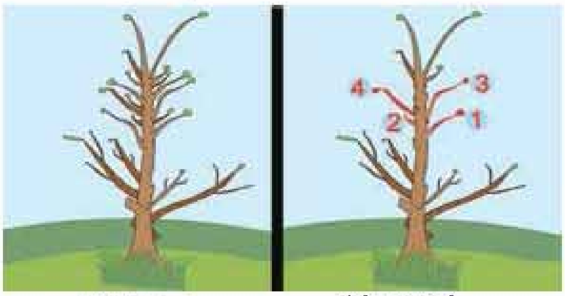

ট্রেনিং এর পরে   ট্রেনিং এর পূর্বে

চিত্র: মুক্ত কেন্দ্র পদ্ধতি গাছের ট্রেনিং করা

সতর্কতা

১। ছাঁটাই করতে সিকেচার ব্যবহার করুন এবং থেঁতলানো বা কেটে যাওয়া পরিহার করতে হবে।

২। ক্ষতস্থানে পাস্টার এবং আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া ভালো।

ঘ) গাছ ছাঁটাই এর জন্য প্রুনিং পদ্ধতি অনুশীলন

ফল গাছ সাধারণত দুটো পদ্ধতিতে প্রুনিং করা হয়। যথা-

১। অগ্রভাগ ছেদন ও

২। পাতলাকরণ

এ পদ্ধতিতে গাছের উৎপাদন ক্ষমতা ও গুণগত মাণ বৃদ্ধি, পুষ্প মঞ্জুরীর অধিক প্রকুয়ন, গাছের পূর্ণ বিকাশ, ফলের আকার আকৃতি, রঙ ও ফল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গাছের কোন অংশ কেটে অপসারণ করা হয়।

প্রুনিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

- গাছ (চারা বা বয়স্ক)
- সিকেচার
- প্রুনিং করাত
- প্রুনিং কাঁচি

● ডাল কাটার কাঁচি

● বড় গাছের ডাল কাটা কাঁচি বা পালে প্রনার

● আলকাতরা

● ব্রাশ

কাজের ধাপ

১। প্রনিং-এর প্রয়োজনে বয়স্ক ও চারাগাছ ছাঁটাই করতে হবে। ঝোপালো গাছ (পেয়ারা, লেবু, শরীফা) মুক্ত রাখার জন্য অগ্রভাগ ছেদন বা হেডিং ব্যাক প্রণালি প্রয়োজন হয় না। বরং কুল গাছের ফলনের জন্য হেডিং ব্যাক বা অগ্রভাগ ছেদন করা প্রয়োজন হয়। ঝোপালো গাছ ও অতি পুরাতন গাছকে উদ্দীপ্ত করতে থিনিং আউট/পাতলাকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

২। প্রুনিং অনুশীলনের জন্য নিচের পদ্ধতি দুটি অনুশীলন করতে হবে।

ক) হেডিং ব্যাক বা শাখার অগ্রভাগ ছেদন পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে কান্ডের বা শাখার অগ্রভাগ থেকে কিছু কেটে বাদ দিতে হবে। কর্তিত স্থানে ব্রাশ দিয়ে পরাষ্টার এবং আলকাতরার প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। ছোট ছোট কান্ড সিকেচার ও বড় কাণ্ডসমূহ করাত দিয়ে কেটে দিতে হবে। এ পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফল পাড়ার পর ৫-৬ বছর বয়স্ক কুল গাছ নির্বাচন করতে হবে।

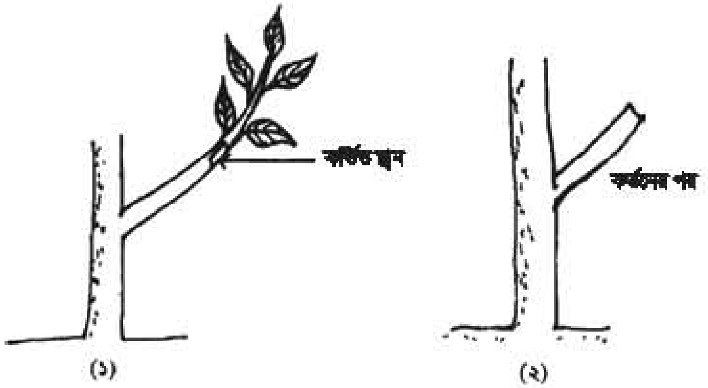

চিত্রঃ শাখা ছেদন (হেডিং ব্যাক) পদ্ধতি

খ) থিনিং আউট (পাতলাকরণ) বা শাখা অপসারণ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে কাণ্ড বা শাখাকে সম্পূর্ণরূপে কেটে বাদ দিতে হবে। কর্তিত স্থানে ব্রাশ দিয়ে পরাষ্টার এবং আলকাতরা লাগিয়ে দিতে হবে। ছোট ছোট শাখা সিকেচার দিয়ে ও বড় শাখাসমূহ করাত দিয়ে কাটতে হবে। ঝোপাল গাছ এভাবে ছাঁটাই করতে হবে। এ পদ্ধতি অনুশীলনের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণের পর ৪-৫ বছর বয়স্ক লেবু গাছ নির্বাচন করে কাজটি করতে হবে।

সতর্কতা

১। সুচিন্তিতভাবে ছাঁটাই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

২। গাছ, জাত ও সময় ভেদে ছাঁটাই এর সময় বিভিন্ন হবে। পত্র পতনশীল গাছ শীতকালে এবং চির সবুজ গাছ গ্রীষ্মকালে (ফল সংগ্রহের পর) ছাঁটাই করা উচিত।

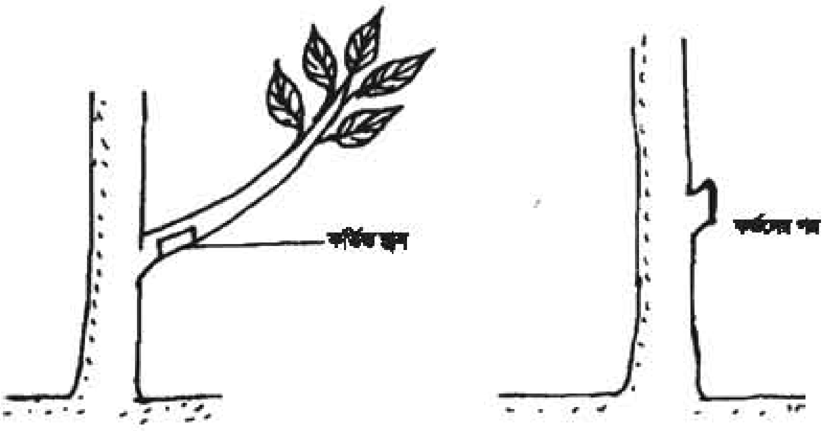

(১) (২)

চিত্রঃ শাখা অপসারন (থিনিং আউট) পদ্ধতি

অনুশীলনী- ৯ঃ আমের চাষ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

আমের বংশ বিস্তার দু'ভাবে হয়ে থাকে। যেমন-

ক) বীজ দ্বারা ও খ) কলমের সাহায্যে

বীজ দ্বারা বংশবিস্তার করা হলে তাতে মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। তাই আমের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য কলমের সাহায্যে অর্থাৎ অঙ্গজ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে চাষাবাদ করা উত্তম। ভালো জাতের চারা নির্বাচন-আমাদের উপ-মহাদেশে প্রায় এক হাজার জাতের আম চাষ করা হয়। তন্মধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি ভালো জাতের আমের নাম উল্লেখ করা হলো। ল্যাংড়া, গোপালভোগ, খিরসাপাত, মহানন্দা, কিষাণভোগ, মিসরীভোগ, কোহিতুর, হিমসাগর, আম্রপালি ইত্যাদি আগাম জাত। ফজলী, আশ্বিনা, চৌসা, কুয়াপাহাড়ী ইত্যাদি নাবীজাত। এছাড়া প্রত্যেক এলাকার কিছু স্থানীয় ভালো জাতের আম পাওয়া যায়।

উপকরণ

১। বীজ বা কলম ২। সার (জৈব+রাসায়নিক) ৩। ছত্রাক নাশক ৪। কীটনাশক ৫। স্প্রেয়ার ৬ লাঙ্গল ও জোয়াল ৭। কোদাল ৮। মই ও মুগুর ৯। খুরপি ১০। পলিথিন ফিতা ১১। সিকেচার ১২। ঝুড়ি ১৩। রশি, ১৪। খুঁটি ১৫। প্রুনিং 'স' ১৬। খাঁচা ১৭। বাঝারি ১৮। সিরিঞ্জ ১৯। তুলা ২০। আলকাতরা/কেরসিন ২১। বদনি ২২। নিড়ানি।

কাজের ধাপ

১। স্থানীয় আবহাওয়ার উপযোগী আমের উন্নত জাত নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনীয় কলম বা চারা সংগ্রহ করতে হবে। প্রতি একরে ৩৫ টি কলম/চারা লাগবে (বর্গাকার পদ্ধতি, দূরত্ব ১২ মিটার)

২। আম চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত গভীর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

৩। উন্নত জাতের সায়ন গাছ হতে ভিনিয়ার কলমের মাধ্যমে কলম তৈরি করতে হবে বা সংগ্রহ করতে হবে। কলম তৈরির জন্য তত্ত্বীয় অংশ অনুসরণ করতে হবে।

৪। জমি লাঙল দিয়ে ৩-৪ টি চাষ দিতে হবে। মুগুর দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙে দিতে হবে। আগাছা বাছতে হবে।

৫। জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে ১২ মি. দূরত্ব (কলমের চারার জন্য) কোদাল দিয়ে ৭৫ সে. মি.×১ মি.×১ মি. গভীর ৩৫ টি গর্ত করতে হবে। গর্ত ১ সপ্তাহ খোলা রাখার পর তত্ত্বীয় অংশে বর্ণিত পরিমাণ সার দিতে হবে। গর্ত ভরাটের সময় উপরের মাটি নিচে ও নিচের মাটি উপরে দিতে হবে। এর ১০-১৫ দিন পর বিকেল বেলা কলম চারা রোপণ করতে হবে।

৬। যদি টবে উৎপাদিত কলমের চারা রোপণের প্রয়োজন হয় তবে প্রথমে টবের চারধারে ও নিচে আস্তে আস্তে আঘাত করতে হবে। টবটিকে চারা সমেত উল্টো করে চারার গোড়া দু আঙ্গুলের ফাঁকে চারাটিকে আটকিয়ে নিতে হবে। তারপর টবের কিনারা কোন খুঁটির সাথে আস্তে আস্তে আঘাত করতে হবে যেন চারাসহ সম্পূর্ণ মাটির বল খুলে আসে। এই প্রক্রিয়াকে “ডি পটিং” বলে। সাবধানে চারা বের করে চারাটি টবে যে পরিমাণ মাটির নিচে ছিলো ঠিক ততটুকুই চারার গর্তে পুঁতে দিতে হবে। তারপর চারধারে হাতে চেপে মাটি বসিয়ে, খুঁটি পুঁতে ও খাচা দিয়ে চারাকে ঘিরে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। রোপণের পর ৫-৭ দিন ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দিতে হবে।

৭। গাছের গোড়ায় আগাছা হলে নিড়িয়ে দিতে হবে। সেচের পর জো এলে চটা ভেঙে মাটি আলগা ও নরম রাখতে হবে। বয়স্ক গাছে বর্ষার আগে ও পরে গোড়ার মাটি কুপিয়ে বা লাঙল দিয়ে আলগা করতে হবে।

৮। চারা রোপণের পর সার প্রয়োগ করতে হবে। সারের মাত্রা তত্ত্বীয় অংশের বর্ণনা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

৯। সার প্রয়োগের নিয়ম হলো; ঠিক দুপুরের বেলা যে পরিমাণ স্থানে গাছের ছায়া পড়ে সে অংশ পর্যন্ত কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে সার প্রয়াগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের গোড়ার চারদিকে (৩০-১০০ সে.মি. জাত ভেদে) কিছু জায়গা বাদ রেখে সার প্রয়োগ করতে হয়। ১০। গাছে বেসিন বা থালা পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে। চারা গাছে প্রথম বছর শুকনো মৌসুমে ৮-১০ দিন পর পর এবং দ্বিতীয় বছর থেকে পঞ্চম বছরে ২-৩ সপ্তাহ পর পর সেচ দিতে হবে। তবে গাছে মুকুল আসার আগে সেচ দেয়া যাবেনা। এতে করে মুকুল না এসে নতুন পাতা বের হয়ে যাবে। গাছের ফল মটর দানার আকৃতি হলে ৮-১০ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। বর্ষায় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১১। কলমের চারা রোপণের পর ৩-৫ বৎসর পর্যন্ত মুকুল এলে ছিড়ে ফেলতে হবে। এতে গাছের বৃদ্ধি পরিপূর্ণ হবে এবং পরবর্তীতে ফলন ভাল হবে। গাছের গোড়া থেকে ২ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সকল শাখা প্রশাখা ছেটে ফেলতে হবে এবং ৪-৫ টি সতেজ ও চারদিকে প্রসারিত শাখা রেখে বাকীগুলো প্রুনিং করতে হবে। মরা ও রোগাক্রান্ত ডাল ও কলমের জোড়ের নিচ থেকে বের হওয়া ডালপালা সিকেচার দিয়ে প্রুনিং করতে হবে।

১২। গাছে পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমনে তত্ত্বীয় অংশে বর্ণিত ব্যবস্থাবলি গ্রহন করতে হবে।

১৩। আম সংগ্রহ করতে বাঁশের আগায় জালি বেঁধে পরিপক্ক আম পেড়ে আনতে হবে। আম পাড়ার পর আঘাতপ্রাপ্ত, কাটা, পোকাধরা, পচাফল বাছাই করতে হবে। আকার অনুসারে বড়, মাঝারি ও ছোট ফল গ্রেডিং করতে হবে। দূরে

পাঠাতে বা বাজারজাতের জন্য কেবল মাত্র ফলের গায়ে রং এসেছে এরূপ আম সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত আম বাঁশের খাচা বা কাঠের বাক্সে খড়ের মধ্যে প্যাকিং করে প্রেরন করতে হবে।

সতর্কতা

১। শীতের প্রথমভাগে সেচ দিলে ফুল না গজিয়ে, গাছে পাতা গজাতে পারে।

২। গাছে ফুল ফোটা থেকে শুরু করে মটর দানার মত গুটি হওয়ার সময়সীমার মধ্যে সেচ দেওয়া যাবেনা।

৩। ফল করা বন্ধ করতে সেচ দিয়ে এবং পানাফিক্স হরমোন (২-৩ মিলি ১০ লিঃ পানিতে) ১-৩ সপ্তাহ পর পর স্প্রে করে উপকার পাওয়া যায়।

অনুশীলনী- ১০ঃ কাঁঠালের চাষ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

কাঁঠাল বহু বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। স্ত্রী ফুল ও পুরুষ ফুল একই গাছে পৃথকভাবে ধরে। কাঁঠাল পরপরাগায়িত ফসল, বংশবিস্তার সাধারণত বীজ দ্বারা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি গাছই একটি আলাদা জাত। টব বা পলিথিন ব্যাগে বীজ বপন করে তা থেকে আঙ্কুরিত চারার বয়স ১-২ বছর হলে রোপণের জন্য ব্যবহার করা হয়। জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও ভালো জাত সম্পন্ন ফল পেতে হলে ৮-১০ দিন বয়ক চারার ভালো কোন জাতের অঙ্কুর জোড় করে চারা উৎপাদন করা যায়।

উপকরণ

(১) বীজ/কাটিং (২) সার (জৈব ও রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) পলিথিন ফিতা (১৩) সিকেচার (১৪) ঝুড়ি (১৫) খুঁটি (১৬) রশি (১৭) করাত (১৮) খাঁচা (১৯) টিন (২০) ঝাঝরি (২১) বালি (২২) বাশ (২৩) সিরিঞ্জ (২৪) তুলা (২৫) আলকাতরা/কেরোসিন (২৬) কোদাল।

কাজের ধাপ

১। কাঁঠালের উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় চারা (৩৫টি/একরে) সংগ্রহ করুন।

২। কাঁঠাল চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং উর্বর সুনিষকাশিত গভীর পেঁআশ এঁটেল দোআশ মাটি নির্বাচন করুন।

৩। উন্নত জাতের গাছ থেকে ভিনিয়ার কলম করে চারা তৈরি করুন।

৪। কাঁঠালের জমি ভালভাবে লাঙল দিয়ে ৪/৫টি চাষ ও মই দিন। মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে দিন। আগাছা হাতে বেছে সমতল করুন।

৫। জমিতে গর্ত খননের জন্য (কাঁঠালের কলমের চারা ৩৫) ১২ মিঃ দুরত্বে কোদাল দিয়ে ১×১ মি. গভীরী চওড়া মাপের ৫টি গর্ত তৈরি করুন। গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর গর্তের মাটির সাথে জৈব সার বা গোবর ২৫ কেজি এবং ৩০০ গ্রাম টিএসপি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিন । গা ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন এবং ১০/১৫ দিনপর বিকালের দিকে চারা লাগান।

৬। চারা রোপণের জন্য টব থেকে চারা বের করে (আম দ্রষ্টব্য) নিন। চারা গর্তে বসিয়ে চারদিকে হাতে মাটি চেপে দিন। খুঁটি পুতে রশি দিয়ে চারা শক্ত করে বেঁধে দিন। রোপণের পরপর ঝাঝরি দিয়ে পানি দিন। ৫-৬ দিন সেচ ও ছায়া দিন। প্রতিটি চারাগাছ খাঁচা দিয়ে ঘিরে শক্ত করে খুঁটিসহ খাঁচা বেধে দিন।

২০২২

৭। চারা গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে দিন। মাটি আলগা করুন। সেচের পর জমিতে জো এলে চেপে থাকা মাটি ভেঙে আলগা করে দিন। বয়স্ক গাছে বর্ষার আগে ও পরে গোড়ার মাটি কোদাল দিয়ে লাঙল দিয়ে আলগা করে দিন এবং সব সময় আগাছামুক্ত করে রাখুন।

৮। কাঁঠাল গাছে সার দুই দফায় বর্ষার পরে ও আগে উপরি প্রয়োগ করুন।

৯। চারা রোপণের পরে গাছ প্রতি ১০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি ও ৩০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করুন। দশ বছর বয়স্ক গাছে ৮০ কেজি জৈব সার, ইউরিয়া ১ কেজি, টিএসপি ১.৫ কেজি ও এমপি১.৫ কেজি প্রয়োগ করুন। এসব সার দুই দফায় (৮নং এ বর্ণিত নিয়মে) প্রয়োগ করুন।

১০। গাছের গোড়ার চারদিকের কিছু জায়গা প্রকার ভেদে ৩০-১০০ সে.মি বাদ রেখে দুপুরে যতটুকু স্থানে ছায়া পড়ে সে অংশের মাটি কোদাল বা লাঙল দিয়ে আলগা করে সার প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিন।

১১। সার প্রয়োগের পর গাছে থালা পদ্ধতিতে সেচ দিন। চারা গাছে বর্ষাকাল বাদে প্রয়োজনে ৭-১০ দিন পর পর এবং বয়স্ক গাছে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দিন।

১২। কাঁঠাল গঠনের জন্য বয়স্ক কাঁঠাল গাছের গোড়ায় ৪-৫ মি. এর মধ্যে ডালপালা গজালে ছেটে ফেলুন। মরা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেটে দিন। বয়স্ক গাছে ফল সংগ্রহের পর কাণ্ডে গজানো ছোট শাখা ও ফলের বোটার অবশিষ্টাংশ ঘেঁটে দিন।

১৩। কুঁড়ির কীড়া ও ফলের মাজরা পোকা দমনের জন্য প্রতি ১০ লি. পানিতে ৪-৫ চা চামচ ডায়াজিনন-৬০ তরল কীটনাশন গুলে ফল, কুঁড়ি ও পাতায় ভালোভাবে স্প্রে করুন ।

১৪। কাণ্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য--(১) চিকন বক্র তার ঢুকিয়ে কীড়া বের করে এনে মেরে ফেলুন (২) গর্তে সিরিঞ্জ দিয়ে কেরোসিন/আলকাতরা ঢুকিয়ে (১ সিসি) দিন, (৩) আলকাতরা ভেজানো তুলা বা কাদা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিন।

১৫। পাতায় দাগ পড়া ও পঁচা রোগের আক্রমণে প্রতি ১০লি, পানিতে ৪০-৫০ গ্রাম ডাইথেন-এম-৪৫ পাউডার গুলে পক্ষকাল পরপর পাতা, মুচি, ফল এবং ডগায় স্প্রে করুন।

১৬। গাছে ফুল আসার ৫-৬ মাস পর ফল সংগ্রহ করতে পারেন। পরিপুষ্ট ফল সাবধানে পেড়ে এনে খারাপ ভাল বাছাই করে নিন। দূরে চালান দিতে হলে একটু শক্ত কাঁঠাল পেড়ে পাঠান।

সতর্কতা

১। কাঁঠাল গাছ জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই নিকাশের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে। এবারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন।

অনুশীলনী- ১১: কলা চাষ

প্রসঙ্গিক তথ্য

সাধারণত কলার যৌন পদ্ধতিতে বা বীজ হতে বংশবিস্তার করা হয় না। কলা গাছের গোড়া থেকে যে তেউর (সাকার বের হয় তা দিয়ে এর বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। কলার অসি চারা ও পানি চারা এই দু'ধরনের তেউড় বা চারা পাওয়া যায়। রোপণের জন্য অসি চারা উত্তম। কারণ রোপণের পর এগুলো কম মরে এবং দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উভয় প্রকার চারার মধ্যে ব্যবধান থাকে না। কলার চারা অনেক বড় হওয়ার পরও রোপণ করা চলে তবে ছোট আকারের চারা উৎকৃষ্ট। ৩৫-৫০ সে.মি. দীর্ঘ ও পুরু গোড়া বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।

উপকরণ

(১) চারা (২) সার (জৈব ও রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) কোদাল (১৩) ছুরি (১৪) পলিথিন (১৫) খুঁটি (১৬) রশি (১৭) ঝুড়ি (১৮) ঝাঝরি।

কাজের ধাপ

১। কলার উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় চারা (৫৩৮-১২১০ টি/একরে) সংগ্রহ করুন।

২। কলা চাষের জন্য বন্যামুক্ত উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর পেঁআশ/এঁটেল দোআশ মাটি নির্বাচন করুন।

৩। সংগৃহীত চারা থেকে কীট/রোগাক্রান্ত বা খারাপ চারা বেছে ফেলে ৫০-৬০ সি.মি লম্বা ও ১.৫-২.৫ কেজি রাইজোম যুক্ত ভাল চারা নির্বাচন করুন। সম্ভব হলে শুধু অসি চারা নির্বাচন করুন। নির্বাচিত চারার সমস্ত শিকড় ছুরি দিয়ে কেটে চারা রোপণের জন্য প্রস্তুত করুন।

৪। কলার জমি উত্তমরূপে লাঙল দিয়ে ৫/৬টি চাষ ও মই দিন মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে দিন ও হাতে আগাছা বেছে ফেলুন এবং মাটি সমতল করে তৈরি করুন।

৫। কলার জন্য ২-৩ মি. দূরত্বে ৭৫ সে.মি চওড়া এবং ৬০ সে.মি গভীর করে কোদাল দিয়ে) একর প্রতি জাত অনুসারে (৫৩৮-১২১০টি গর্ত তৈরি করুন। গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর গর্তের মাটির সাথে ১৫ কেজি জৈব সার, খৈল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখুন। গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন।

৬। গর্তে সার প্রয়োগের পর ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিন। মাটি উলট-পালট করে দিন। রোপণের দুই দিন পূর্বে পুনরায় মাটি উলট-পালট করে দিন। প্রতি গর্তে একটি করে চারা রোপণ করুন। রোপণকৃত চারার রাইজোম ১০-১৫ সে.মি, মাটির গভীরে স্থাপন করুন এবং উপ-কাণ্ড মাটির বরাবর বা সামাণ্য (১.৫-২.০ সে.মি) নিচে রাখুন।

৭। চারা রোপণের পর মাটি ভালভাবে চেপে দিন। বয়স্ক গাছে বছরে ৪-৬ বার আগাছা বেছে দিন। সেচের পর জমিতে জো এলে চটা ভেঙে দিন এবং মাটি আলগা রাখুন। এরপর প্রতিটি সারির মাঝে ৩০ সে.মি চওড়া ও ২০ সে.মি গভীর নালা (কোদাল দিয়ে তৈরি করুন। এসব নালার মাটি তুলে গাছের সারি বরাবর বেড তৈরি করে দিন। এভাবে সেচ ও নিকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন।

৮। জমিতে চারা রোপণের ২ মাস পর গাছ প্রতি ৮০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৬০ গ্রাম এমপি সার উপরি প্রয়োগ করুন এবং ৪-৫ মাসপর ১৬০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১৬০ গ্রাম এমপি পুনরায় প্রয়োগ করুন। গাছের ৩০ সে.মি জায়গায় মাটি গোলাকার (বেড) করে খুরপি । কোদাল দিয়ে আলগা করুন। সার ছিটিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। রসের অভাব থাকলে সেচ দিন। চারা অবস্থায় ঝাঝরি দিয়ে এবং বড় গাছে ড্রেন পূর্ণ করে পানি দিয়েই সেচের কাজ চালাতে পারেন। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করুন।

৯। চারা জমিতে রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকেই সাকার বের হতে থাকে। এসব সাকার বের হওয়ার সাথে সাথে মাটি বরাবর (ছুরি/কাস্তে দিয়ে কেটে দিন। গাছে ফল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত এভাবে সাকার কাটতে থাকুন। মুড়ি ফসল করতে চাইলে গাছে ফুল আসার পর একটি অসি চারা রেখে দিন (চিত্র দ্রষ্টব্য)। গাছে কাঁদি বের হলে প্রতিটি গাছে খুঁটি পুতে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিন।

১০। গাছের পচা, রোগাক্রান্ত পাতা কেটে ফেলে বাগান পরিষ্কার রাখুন। কাঁদি বের হওয়ার পর (পুরুষ ফুলসহ) ঝুলন্ত মোচাটি কেটে ফেলুন।

২০২৫

১১। বিটল পোকা দমনের জন্য (১) বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪-৫ চা চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ তরল ডায়াজিনন-৬০ তরল কীটনাশক গুলে ১০-১৫ দিন পর পর (পাতা ও ফলে) ভালোভাবে স্প্রে করুন, (৩) ২-৩ বছর শস্য পর্যায় করুন। (৪) কাদি ব্যাগিং করুন।

১২। ঘোড়া পোকা ও জাব পোকা দমনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

১৩। রাস্ট এবং থ্রিপস দমনের জন্য-(১) রঙিন পলিথিন ব্যাগে কঁদি ঢেকে দিন, (২) পক্ষকাল পরপর তামাক চূর্ণ ছিটাতে পারেন এবং (৩) ১১ (২) এর অনুরূপ ব্যবস্থা নিন।

১৪। কাণ্ড/গুড়ির উইভিল পোকা দমনের জন্য (১) আক্রান্ত গাছের খালে, কাণ্ড, গুড়ি তুলে এনে ধ্বংস করুন, (২) ২-৩ বছর (অমৃত সাগর/চাঁপা কলার চাষ না করা), শস্য পর্যায় করুন, (৩) ১১ (২) এর অনুরূপ ব্যবস্থা নিন।

১৫। পানামা রোগ দমন-(১) আস্ত গাছ, পাতা, চারা, কাণ্ড তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। গর্তের মাটি পাড়ান, (২) ৩-৪ বছরের জন্য (সাগর, মেহের সাগর, সবরী , চাপা কলার চাষ না করা) শস্য পর্যায় অবলম্বন করুন।

১৬। গুচ্ছমাথা রোগ (বানচীটপ) দমনে-(১) আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন, (২) ১১ (২) এর অনুরূপ ব্যবস্থা নিন।

১৭। সিগাটোগা (পাতার দাগ) দমনে- (১) আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলুন, (২) আধুনিক উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করুন (আগাছা বালাইনিকাশের ব্যবস্থাসহ) , (৩) জৈব সার অধিক ব্যবহার করুন , (৪) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০-৪৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ গুলে গাছে ভালভাবে স্প্রে করে দিন।

১৮। প্রধান কাণ্ড পচা রোগ দমনে-প্রতি ১০ লিটার বার্গান্ডি মিকচার প্রে মেশিনে ভরে (৯৬ গ্রাম তুঁতে, ১২০ গ্রাম কাপড় ধোয়ার সোডা ও ১৯ লিটার পানি) পক্ষকাল পরপর ছিটান।

১৯। রোপণের ১০-১৪ মাস সময়ের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করতে পারেন। ফল যখন পুষ্ট, গোলাকার (কিনারাবিহীন হয়) ও পুষ্প শুকিয়ে যায় তখন কলার কাদি কেটে সংগ্রহ করুন। সংগ্রহের পর পচা, কীট ও রোগে আক্রান্ত এবং অপুষ্ট কলা বাছাই করে ফেলুন। দূরে পাঠাতে অর্ধ পক্ব এবং কাছে পাঠাতে বাছাই করুন। পরিপক্ক কলা খোলা ও ঠান্ডা স্থানে (কাচা কলা) কাদি ঝুলিয়ে, কাদির গোড়ায় মোমের প্রলেপ দিয়ে বা হিমাগারে (১১ সে, তাপে) কয়েকদিন সংরক্ষণ করতে পারেন।

সতর্কতা

১। কীট ও রোগবিহীন বাগান থেকে (অসি) চারা সংগ্রহ করতে হবে।

২। যে সমস্ত এলাকায় শীতের তীব্রতা বেশি সেখানে শীতের পূর্বে চারা লাগালে ফুল/ফুল আসতে ২-৩ মাস দেরি হতে পারে।

৩। কলার জন্য নিকাশের ভাল ব্যবস্থা এবং নিড়ানীকালে যাতে শেকড় না কাটে সেদিক দৃষ্টি রাখতে হবে। এবারে কাজের ধাপ অনুসরণ করে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন।

অনুশীলনী-১২: আনারস চাষ

প্রাসঙ্গিক তথ্য: আনারস দ্বিবর্ষজীবী এবং একটি গাছ একবার মাত্র একটি ফুল দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে ৩ জাতের আনারস চাষ হয়।

যথা- (ক) হানিকুইন (খ) জায়েন্ট কিউ ও (গ) ঘোড়াশাল।

ভালোজাতের চারা নির্বাচন: আনারস অঙ্গজ পদ্ধতিতেই বংশ বিস্তার করে থাকে। এর চারাকে সাকার বলে। ২০২২

আনারসের ৫ ধরনের সাকার হয়। যথা-১) ক্রাউন সাকার বা কিরিট ২) স্লিপ সাকার বা বোঁটার চারা ৩) কাণ্ড সাকার বা কাণ্ডের কেকড়ী ৪) গ্রাউন্ড/সাকার বা গোড়ার কেকড়ী ৫) স্টাম্প সাকার বা গাড়া

উপকরণ

(১) চারা (২) সার (জৈব + রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) কোদাল (১৩) ছুরি (১৪) ঝুড়ি।

আনারস চাষ করার জন্য নিম্নের কাজ/ধাপ অনুসরণ করতে হবে:

১। আনারসের উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় চারা (প্রায় ১৬-১৮ হাজার/একরে) সংগ্রহ করুন।

২। আনারস চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর দোআশ মাটি নির্বাচন করুন।

৩। সংগৃহীত চারা থেকে বেছে নিরোগ পার্শ্ব চারা নির্বাচন করুন। নির্বাচিত চারার নিচের দিক থেকে কয়েকটি পাতা (৫-৭টি) খুলে ফেলুন। চারাগুলো ১-২ সপ্তাহ রোদ শুকিয়ে নিন। এছাড়াও প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২.০-২.৫ চা চামচ এরাটন-৬ ছত্রাকনাশক জলে চারার গোড়া শোধন করে নিন। এভাবে চারা প্রস্তুত করে জমিতে লাগান।

৪। আনারসের জমি উত্তমরূপে লাঙল দিয়ে ৪/৫টি চাষ ও মই দিন। মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে ফেলুন। আগাছা হাতে বেছে ফেলুন। জমি সমতল করে তৈরি করুন। শেষ চাষের সময় একর প্রতি ৮ টন গোবর ও ৮০-১০০ কেজি টিএসপি জমিতে প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিন।

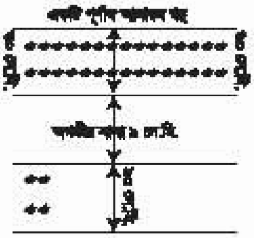

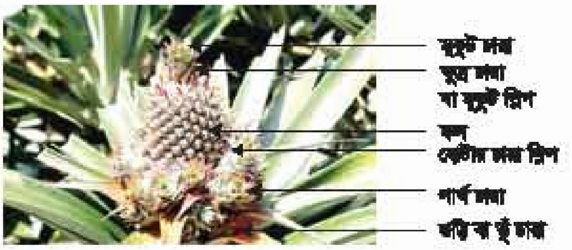

চিত্রঃ আনারসের বিভিন্ন চারা ও রোপন পদ্ধতি

৫। আনারসের জন্য প্রথমে বেড তৈরি করে নিন। ৯০ সে.মি. (৩") পরপর ৯০ সে.মি (৩") বেড তৈরি করুন। দুটি পাশাপাশি বেডের মাঝে ৯০ সে.মি (৩) চওড়া ও (১০/১৫ সে.মি (৪"/৬") গভীর নালা তৈরি করুন। নালার মাটি কোদাল দিয়ে তুলে দিন এবং বেড তৈরি করুন। এবারে জোড়া সারি পদ্ধতিতে প্রতি বেডে ৬০ সে.মি (২") পরপর সারি করে ২৫-৩০ সে.মি (১০"-১২") দূরে দূরে চারা রোপণ করুন।

৬। এরপর প্রতিটি গর্তে একটি করে শোধন করা সতেজ চারা রোপণ করুন। চারা এমনভাবে রোপণ করুন যাতে ভেতরের কচি অংশ ২-৩ সে.মি মাটির উপরে থাকে। চারা লাগিয়ে গোড়ার মাটি হাতে ভালোভাবে চেপে শক্ত করে দিন।

৭। গাছ সবল হয়ে উঠলে প্রয়োজনে সেচ দিয়ে নিড়িয়ে আগাছা বেছে দিন এবং মাটি নরম ও আলগা রাখুন। সেচের পর জো এলে জমির চটা ভেঙে দিন। এছাড়াও মাঝে মাঝে নিড়িয়ে আগাছা তুলে ফেলুন। মাটি আলগা এবং ঝুরঝুরে রাখুন যাতে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে।

৮। বর্ষার পূর্বে ও পরে দুই দফায় সার উপরি প্রয়োগ করুন। প্রতিবার হেক্টর প্রতি ২৫০-৩০০ কেজি ইউরিয়া ও ৩০০-৩৫০ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করুন। চারার ১০-১৫ সে.মি দূর দিয়ে মাটি নিড়িয়ে মাটি আলগা করে সার ভালভাবে মিশিয়ে দিন। নালা ভরে পানি রেখে সেচ দিন। শুকনো মৌসুমে ২০ দিন পরপর সেচ দিন। বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করুন।

৯। আনারসের একাধিক চারা জন্মায়। প্রতি গাছে দুটি চারা রেখে বাকীগুলো কেটে দিন।

১০। ছাতরা পোকা দমনে প্রতি ১০ লিটার পানিতে চা চামচের ৪-৫ চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ তরল কীটনাশক গুলে গাছে ভালভাবে স্প্রে করে দিন।

১১। কাণ্ড পচা (হার্টরট) রোগ দমনে- (১) গাছের গোড়ায় পানি জমতে দিবেন না, (২) চারা রোপণের পূর্বে শাধেন করে রোপণ করুন, (৩) প্রতি লিটার পানিতে ৩৫-৪০ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড-৫০ পাউডার গুলে গাছে ভালভাবে স্প্রে করে দিন।

১২। রোপণের ১৭/১৮-২৪ মাসের মধ্যে ফল পাকে। ফল যখন পরিপক্ক হয় (কিছু হলুদ রং এর হয়) তখন কেটে সংগ্রহ করুন। সংগ্রহের পর ছোট-বড়, ভালো-খারাপ বাছাই করে ফেলুন। দূরে চালান দিতে হলে একটু অধপক্ক ফল সংগ্রহ করুন। ফ্রিজে পাকা ফলকে ৪°-১০° সে. (৪০/৫০° ফা.) তাপে এক মাস সংরক্ষণ করতে পারেন। আনারস থেকে জুস, কোয়াস, জেলি, ভিনিগার তৈরি করেও সংরক্ষণ করতে পারেন। এ ছাড়াও লবণ/চিনি যোগে টিনজাত করেও রাখতে পারেন।

সতর্কতা

১। ভারী মাটিতে আনারসের আকার বড় হয় কিন্তু হালকা মাটিতে ফলন ভালো হয়ে থাকে।

২। বর্ষায় নিকাশের ভাল ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩। পরিচর্যা কালে যাতে গাছের পাতা না ভাঙে তারদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪। ফলে আঘাত লাগলে সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, তাই সাবধানে পরিবহণ করতে হয়।

অনুশীলনী- ১৩: পেঁপে চাষ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পেঁপের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে থাকে। পেঁপে পরপরাগায়িত এবং বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করে থাকে বলে অসংখ্য প্রকার পেঁপে দেখা যায়। বিশেষ কোন পেঁপের জাত আবাদ ও সংরক্ষণ করতে হলে নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করা উচিত। ভালো জাতের চারা নির্বাচন-পেঁপের চারা তিন ভাবে উৎপাদন করা যায়। যথা- বেডে, পটে ও সরাসরি জমিতে। আদর্শ পেঁপে গাছের কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। যথা- গাছ বেটে জাতের হতে হবে। তাড়াতাড়ি ফল ধরতে হবে। একটি কক্ষে একটি করে ফল থাকবে। গাছে সমান ভাবে ফল হবে।

২০২১

বাংলাদেশে কয়েকটি অনুমোদিত বিদেশি পেঁপের জাত পাওয়া যায়। যেমন-(ক) বেঁটে-ওয়াশিংটন থাইডোয়ার্ফ হানিডিউ, রাচি, পুষা, শিমলা ইত্যাদি। (খ) লম্বা জাত- সেলো, বাংলাদেশে পেঁপের একটি মাত্র জাত আছে যার নাম শাহী পেঁপে।

উপকরণ

(১) বীজ (২) সার (জৈব-রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙ্গল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) ছুরি (১৪) ঝুড়ি (১৫) কলার খোল (১৬) রশি (১৭) বেড়া (১৮) কাতে ।

পেঁপে চাষ করার জন্য নিম্নের কাজ/ধাপ অনুসরণ করতে হবে।

১। পেঁপের উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় বীজ (৭০-৮০ গ্রাম/একরে) সংগ্রহ করুন।

২। পেঁপে চাষের জন্য উচু স্থান এবং সুনিস্কাশিত দোঁআশ মাটি নির্বাচন করুন।

৩। সংগৃহীত চারা থেকে বেছে নিরোগ এবং সুস্থ সবল চারা নির্বাচন করুন। চারা তৈরির জন্য প্রথমে বীজকে কাপড়ের পুটুলিতে বেঁধে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিন। ১×৩ মি. মাপে (৩-৪ টি) বীজতলা তৈরি করুন। প্রতি বীজতলায় ২০-২৫ গ্রাম বীজ বুনে দিন। বীজ বপনের পূর্বে বীজকে শোধন করে নিন। বীজ বপনের পর বীজ তলা গুড়া মাটি বা জৈব সার ও খড়-কুটা দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিন। বীজ গজালে খড়কুটা সরিয়ে ফেলুন।

৪। বীজ গজানোর পর মাঝে মাঝে সেচ (৩-৪ দিন পর পর বিকেলে) দিন। আগাছা হাতে তুলে ফেলুন। বীজতলায় মাটি নিড়িয়ে ঝরঝরে ও নরম রাখুন। এভাবে ৬-৭ সপ্তাহ পর্যন্ত চারাকে যত্ন করে বড় (২০-২৫ সে.মি) করুন। এছাড়াও ভাল জাতের পুরানো গাছ থেকে মাউন্ড দাবা কলম করেও চারা সংগ্রহ করতে পারেন।

৫। পেঁপে জমি লাঙ্গল দিয়ে ভালভাবে ৫/৬টি চাষ ও মই দিন। আগাছা বেছে ফেলুন। মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে ফেলুন। জমি সমতল করুন।

৬। জমি তৈরির পর ২.৫ মি. দূরত্বে কোদাল দিয়ে ৯০ সে.মি চওড়া ও ৬০ সে.মি গভীর করে (৭৭৪টি) গর্ত তৈরি করুন। গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর প্রতি গর্তে ২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম খৈল, ৪০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমপি সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে মাদা তৈরি করে রাখুন। গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে নিন। এর ১০-১৫ দিন পর গর্তে চারা রোপণ করুন।
৭। বীজতলা থেকে সুস্থ সবল ও বেশি পাতাযুক্ত চারাগুলো সাবধানে মাটি/শিকড়সহ তুলে আনুন। প্রতি মাদায় ২০ ২৫ সে.মি ব্যবধানে (ত্রিভুজাকারে) ৩টি চারা রোপণ করুন। চারা বীজতলায় যতটুকু মাটির নিচে ছিল ঠিক ততটুকুই পুঁতে দিন। চারার পাশের মাটি হাতে হালকাভাবে চেপে বসিয়ে দিন। প্রতিটি চারা ছোট কাঠি পুতে রশি দিয়ে (আলাদা ভাবে) বেঁধে দিন। ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিন। চারার গোড়ার দিকে কিছু পাতা ছেটে ফেলুন। ৩-৪ দিন পর্যনত কলার খালে দিয়ে ছায়া ও সকাল বিকাল ঝাঝরি দিয়ে হালকা সেচ দিন। এরপর ৭ দিন বিকেলে সেচ দিন।

৮। চারার আশেপাশে আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। জমির মাটি নরম ও আলগা রাখুন। সেচের পর জো এলে চটা ভেঙে দিন। বয়স্ক গাছ নিড়িয়ে আগাছা মুক্ত রাখুন। প্রতি দুইটি সারির মাঝে কোদাল দিয়ে ৩০ সে.মি চওড়া ও ২০ সে.মি গভীর করে নালা তৈরি করে মাটি দুই দিকে তুলে দিন। গাছে ফুল দেখা দিলে প্রতি মাদায় একটি করে সতেজ উভয় লিঙ্গ/স্ত্রী গাছ রেখে বাকি দুটি চারা গাছ মাটি বরাবর কেটে ফেলুন। তবে প্রতি ২০-২৫ টি গাছের জন্য একটি করে পুরুষ গাছ রাখুন ।

৯। সার উপরি প্রয়োগ দু'দফায় করুন। প্রথমবার চারা রোপণের ৪-৫ সপ্তাহ পর এবং দ্বিতীয়বার গাছে ফুল ধরা (৩ মাস) শুরু করলে প্রয়োগ করুন। প্রতিবারে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫০ গ্রাম এমপি প্রয়োগ করুন।

১০। সার প্রয়োগের জন্য চারার গোড়ার (৩০ সে.মি দূরে) চারদিকে দুপুরে যতদূর ছায়া পড়ে সে অংশের মাটি নিড়িয়ে আলগা করুন। সার ছিটিয়ে ভালোভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিন। রস কম থাকলে সেচ দিন। নালা ভরে পানি দিয়ে সেচের কাজ সমাধা করতে পারেন। বর্ষায় অতিরিক্ত পানি নিকাশের দিকে খেয়াল রাখুন।

১১। পেঁপে গাছে অনেক ফল ধরে। কিছু কিছু ফল ছিড়ে পাতলা করে দিন। বর্ষাকাল শুরুর সাথে সাথে গাছের গোড়ায় কোদাল দিয়ে মাটি তুলে দিন।

১২। ফলের মাছি দমনে- (১) আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ গ্রাম ডিপটেরেক্স -৮০ গুলে ৮-১০ দিন পরপর ফলে স্প্রে করুন।

১৩। কাণ্ড/গোড়া পচা রোগ দমনে- (১) পানি নিকাশের ব্যবস্থা করুন, (২) উঁচু জমিতে চাষ করুন, (৩) আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করে ফেলুন, ৪) সুস্থ গাছে ও রোগের প্রাথমিক দিকে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০-৩৫ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড-৫০ পাউডার গুলে পক্ষকাল পরপর গাছে স্প্রে করুন, (৫) বীজ শোধন করে বপন করুন।

১৪। পাতা ও ফল পর্চা রোগ দমনে-(১) ফল ও কাণ্ড রোদ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। মরচে ধরা রোগ দমনে-(২) রোগাক্রান্ত ফল পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

১৫। পাতার দাগ পড়া দমনে কপার অক্সিক্লোরাইড স্প্রে করুন।

১৬। পেঁপে মোজাইক (ভাইরাস) দমনে-(১) আক্রান্ত গাছ উপড়ে পুড়ে ফেলুন, (২) ভাইরাসমুক্ত বীজ সংগ্রহ করুন। দীর্ঘ শস্য পর্যায় অবলম্বন করুন।

১৭। গাছে থাকা অবস্থায় পেঁপে হলুদ রং ধরলে (বা আঠা ঘন ভাব ধরলে ফল পেড়ে নিন । রোপনের ১০-১২ মাস পর সংগ্রহ করতে পারেন। সংগ্রহের পর পঁচা, ভাল, খারাপ, ছোট-বড় বেছে নিন। ঝুড়িতে খড়/পাতা বিছিয়ে সাবধানে পেঁপে বাজারে পাঠান বা দূরে চালান দিন। হালুয়া, মোরব্বা, জ্যাম, জেলি তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারেন। চিত্র ফুল/ফল ও রোপণ পদ্ধতি দ্রষ্টব্য।

সতর্কতা

১। শীতের সময় বীজ গজাতে ৪/৫ সপ্তাহ লাগতে পারে। সদ্য সংগৃহীত বীজ থেকে গজানোর হার দ্রুততর ও গজানোর সংখ্যা বেশি হয়।

২। উত্তম নিকাশের ব্যবস্থা উত্তম ফল দানে সহায়ক।

৩। কলমের চারা/এফ-১ (হাইব্রিড) (উভয়লিঙ্গ) প্রতি গর্তে একটি চারা দেওয়া চলে।

৪। ইউরিয়া সার বেশি প্রয়োগ ভাল নয়। লাল মাটিতে ২৫০ গ্রাম/গর্তে চুন দেয়া ভাল।

অনুশীলনী- ১৪: পেয়ারা চাষ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পেয়ারা এমন একটি ফল যার মধ্যে একাধিক গুণের বিরল সমন্বয় ঘটেছে যা খুব কম ফলেই লক্ষ করা যায়। ইহা দ্রুত বর্ধনশীল এবং অপেক্ষাকৃত কম যত্নেই যে কোন স্থানে জন্মানো যায়। সাধারণত বীজ ও কলম দিয়ে বংশ বিস্তার করা হয়। বীজের গাছের ফলের গুণগত মাণ ঠিক থাকে না, বিধায় কলমের চারাই উত্তম। গুটি কলম, জোড় কলম, চোখ কলম দিয়ে বাগান করাই উত্তম।

উপকরণ

(১) বীজ/চারা (২) সার (জৈব ও রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫)স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) ছুরি (১৩) পলিথিন (১৪) সিকেচার (১৫) খুঁটি (১৬) রশি (১৭) করাত (১৮) ঘেরা ও খাচা (১৯) টিন (২০) ঝাঝরি (২১) বালি ২২) বাঁশ (২৩) ঝুড়ি (২৪) সিরিঞ্জ (২৫) তুলা (২৬) জাল (২৭) আলকাতরা/কেরোসিন (২৮) কোদাল।

পেয়ারা চাষ করার জন্য নিম্নের কাজ। ধাপ অনুসরণ করতে হবে

১। পেয়ারার উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় বীজ/চারা (কলমের চারা ১৯৪টি/একরে) সংগ্রহ করুন।

২। পেয়ারা চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং উর্বর সুনিষ্কাশিত গভীর বেলে-দোঁআশ মাটি নির্বাচন করুন।

৩। উন্নত জাতের গাছ থেকে থাকলে গুটি কলম করে চারা তৈরি করুন।

৪। পেয়ারার জমি ভালভাবে লাঙল দিয়ে ৪/৫টি চাষ ও মই দিন। মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে ফেলুন। হাতে আগাছা বেছে ফেলুন। জমি সমতল করুন।

৫। কলমের চারা ৫মি. (১৫) দূরত্বে রোপণ করুন। জমিতে ৫ মি. দূরত্বে ৬০ সে.মি চওড়া ও ৬০ সে.মি গভীর করে (১৯৪টি গর্ত তৈরি করুন ও গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর গর্তে জৈব সার ১০ কেজি, খৈল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৫০০ গ্রাম, ছাই ৪ কেজি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখুন। গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন। এর ১০-১৫ দিনপর গর্তে চারা রোপণ করুন।

৬। চারা রোপণের জন্য মাটির বলটি আস্ত রেখে সাবধানে টব থেকে চারা বের করুন। চারা পূর্বে যতটুকু মাটির নিচে ছিল ঠিক ততটুকুই পুঁতে দিন। চার পাশে হাতে চেপে মাটি বসিয়ে দিন। ঘেরা ও বেড়া দিয়ে বেঁধে দিন।

৭। চারা গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। গোড়ার মাটি আলগা রাখুন। সেচের পর জো এলে চটা ভেঙে দিন। বয়স্ক গাছের ক্ষেত্রে বর্ষার আগে ও পরে কোদাল/লাঙল দিয়ে মাটি আলগা করে দিন। এছাড়াও মাঝে মাঝে নিড়িয়ে মাটি নরম ও আলগা রাখুন।

৮। পেয়ারা গাছে সার উপরি প্রয়োগ দু'দফায় করুন। অর্ধেক সার বসন্তকালে ও বাকি অর্ধেক শরৎকালে প্রয়োগ করুন।

৯। চারা রোপণের পরের বছর গাছ প্রতি গোবর ১০ কেজি, ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম ও এমপি ২০০ গ্রাম প্রয়োগ করুন। এরপর প্রতি বছর গোবর ২০ কেজি, ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৪৫০ গ্রাম ও এমপি ৩৫০ গ্রাম প্রয়োগ করুন। পাঁচ বছর পর বা তদূর্ধ বয়ক গাছে গোবর ৪০ কেজি, ইউরিয়া ১.৫ কেজি, টিএসপি ১ কেজি ও এমপি ১ কেজি প্রয়োগ করুন। এসব সার দু' দফায় (৮ নং বর্ণিত নিয়েমে) প্রয়োগ করুন।

১০। গাছের গোড়ার (৩০-৪০ সে.মি) কিছু দূর থেকে শুরু করে দুপুরে যতটুকু ছায়া পড়ে সে অংশের মাটি কোদাল/লাঙল দিয়ে আলগা করুন। সার ছিটিয়ে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিন। সার মাটি চাপা দিন।

১১। সার প্রয়োগের পর গাছে থালা পদ্ধতিতে সেচ দিন। চারা গাছে সপ্তাহে ২ বার, বয়স্ক গাছে বর্ষাকাল বাদে ১৫ দিন পরপর এবং ফল আসার সময় ৮/১০ দিন পর সেচ দিন। বর্ষায় পানি নিকাশের ব্যবস্থা করুন।

১২। গাছের কাঠামো গঠনের জন্য গোড়ার ১ মি. এর মধ্যে কোন ডালপালা গজালে হেঁটে ফেলুন। এরপর চারিদিকে প্রসারিত ৩/৪ টি ডালপালা রেখে বাকিগুলো হেঁটে দিন। এছাড়াও গাছের ফেকরি, শুকনো, মরা, রোগাক্রান্ত ডালপালা হেঁটে দিন। ডালসহ ফল সংগ্রহ করতে পারেন।

২০২২ ১৩। কাণ্ডের মাজরা পোকা দমন-লিচুর বর্ণিত উপায়ে দমন করুন।

১৪। ফলের মাছি দমনের জন্য- (১) আক্রানত ফল এবং ফলের গায়ে লেগে থাকা ডিম ধ্বংস করুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ গ্রাম ডিপটেরেক্স-৮০ গুলে ৮-১০ দিন পর পর ফলে স্প্রে করুন।

১৫। শোষক ও জাব পোকা দমন-প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪/৫ চা চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ কাটনাশক গুলে গাছে স্প্রে করুন।

১৬। ফলের ক্ষত ও ফোস্কা (এনথ্রাকনাসে) রোগ দমন-(১) আক্রান্ত ফল ধ্বংস করে ফেলুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০/৫০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ পাউডার গুলে পক্ষ কাল পরপর ফলে/ঘাতে প্রে করুন।

১৭। গাছের মড়ক (উইল্ট) দমন-(১) আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করুন, (২) বেশি করে জৈব সার প্রয়োগ করুন, (৩) নিকাশের ভালো ব্যবস্থা করুন, (৪) আক্রমণের প্রাথমিক স্তরে ডাইথেন এম-৪৫ স্প্রে করুন (১৬ নং বর্ণিত উপায়)। ১৮। ফল পরিপক্ব হওয়ার পর (হালকা হলুদ বা ফিকে সবুজ রং ধরার পর) ছিড়ে সংগ্রহ করুন। সংগ্রহ করে ভালো খারাপ বাছাই করুন ঝুড়িতে খড়/পাতা বিছিয়ে পেয়ারা স্তরে স্তরে সাজান। প্রতি সতরের মাঝে খড় বিছিয়ে দিন এবং ঝুড়িতে ভরে বাজারজাত করুন। জ্যাম, জালি তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারেন।

সতর্কতা

১। পেয়ারা শুষ্কতা সহ্য করতে পারে কিন্তু জলাবদ্ধতা সহ্য করে না।

২। ফল বৃদ্ধি হওয়ার সময় জমিতে রসের অভাব ফল বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৩। গাছের বয়স ২৩ বছর হলে, নতুন গাছ লাগানোই উত্তম।

অনুশীলনী- ১৫: কুল চাষ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে অসংখ্য জাতের কুল পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ জাতই নিকৃষ্ট মানের খুব কম সংখ্যক কুলের ভালো জাত পাওয়া যায়। সুপরিচিত উন্নত জাতের মধ্যে রয়েছে- নারিকেলী, কুমিলা, আপেল ও বাউকুল। বীজ, অঙ্গ সংযোজন ও কুঁড়ি সংযোজনের মাধ্যমে কুলের বংশ বিস্তার করা যায়। বীজের গাছের গুণাগুণ অনিশ্চিত বলে কখনো তা লাগানো উচিত নয়। কুড়ি সংযাজনই কুলের বংশ বিস্তারের সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি।

উপকরণ

(১) বীজ/চারা (২) সার (জৈব+রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) স্প্রে যন্ত্র (৬) পানি (৭) লাঙল (৮) জোয়াল (৯) মই (১০) মুগুর (১১) খুরপি (১২) কোদাল (১৩) করাত (১৪) চাকু (১৫) পলিথিন (১৬) টব (১৭) সিকেচার (১৮) ঝুড়ি (১৯) ঘেরা ও বেড়া।

কুল চাষ করার জন্য নিম্নের কাজধাপ অনুসরণ করতে হবে।

১। কুলের উন্নত জাত নির্বাচন করুন। প্রয়োজনীয় বীজ/চারা (১৭০ টি/ হেক্টরে) সংগ্রহ করতে হবে।

২। কুল চাষের জন্য উঁচু স্থান এবং উর্বর দোআশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

৩। সংগৃহীত বীজ/চারা, নার্সারি বেডটবে রোপিত বীজ/চারার ১০/১২ মাস বয়স হলে (মাঘ-ফালগুনে) মাটি বরাবর কেটে দিন। কাটার পর গাছ থেকে বেশ কিছু ডাল গজাবে তা থেকে সতেজ দুটি ডাল রেখে বাকিগুলো কেটে দিন। এরপর গজানো ডাল ২৫-৩০ সে.মি লম্বা হলে মাঝামাঝি অংশে তালি কলম করে নিতে হবে। ৪। তারপর ঐ ডাল দুটিতে ১-১.৫ সে.মি চওড়া ও ২-২.৫ সে.মি লম্বা করে ছাল বাকল কেটে উঠিয়ে নিন। এবার একই মাপের কুঁড়িসহ উন্নত গাছের ছাল কেটে এনে ঐস্থানে বসিয়ে দিন। কুঁড়ির মুখটি খোলা রেখে

পলিথিন ফিতা দিয়ে বেধে দিন। ৮/১০ দিনপর কুঁড়িটি বড় হওয়া শুর করলে জোড়ার ২/৩ সেমি উপরে (স্টক) ডাল দুটির আগা সিকেচার দিয়ে কেটে ফেলুন। এভাবে চারা তৈরি করে নিন। ২/১ মাস পরেই গাছটি জমিতে রোপণ করতে পারবেন। জোড়ার নিচ থেকে কোন ডাল বের হলে কেটে দিতে হবে।

৫। কুলের জমি ভালভাবে লাঙল দিয়ে ৩/৪টি চাষ ও মই দিন। হাতে আগাছা বেছে ফেলুন। জমি সমতল করতে হবে।

৬। কুলের চারা ৮ মি. (২৫) দূরত্বে রোপণ করুন। জমিতে ৮ মি. দূরত্বে ৯০ সি.মি চওড়া ও ৯০ সে.মি গভীর করে কোদাল দিয়ে গর্ত তৈরি করুন। গর্ত সপ্তাহকাল খোলা অবস্থায় রেখে দিন। এরপর প্রতি গর্তে জৈব সার ১০ কেজি, খৈল ২৫০ গ্রাম, টিএসপি ১৫০ গ্রাম, ছাই ৫ কেজি মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখুন। গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন। এর ১০-১৫ দিনপর প্রতি গর্তে চারা রোপণ করতে হবে।

৭। মাটির বলটি না ভেঙে টব থেকে সাবধানে চারা বের করে রোপণ করুন। চারা পাশে হাতে চেপে মাটি বসিয়ে দিন। একটি খুঁটি পুঁতে চারাটি বেঁধে দিন। ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিন। চারাটি বেড়া দিয়ে ঘিরে দিন। চারা মাটির সাথে না লাগা পর্যন্ত ৪/৫ দিন মাঝে মধ্যে সেচ দিতে হবে।

৮। চারা গাছের গোড়ায় আগাছা হলে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। গোড়ার মাটি আলগা রাখুন। সেচের বৃষ্টির পর মাটিতে দিন। সপ্তাহে একবার নিড়ান। বয়স্ক গাছ মাঝে মধ্যে নিভিয়ে দিন। বর্ষার আগে ও পরে কোদাল (লাঙ্গল দিয়ে জমির মাটি আগলা করে দিতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। কুলের চারা রোপণের পরের বছর গাছ প্রতি ১০ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া ২০৫ গ্রাম, টিএসপি ২৫০ ও এমপি ২৫০ গ্রাম প্রয়োগ করুন। পাঁচ বছর পর বা বয়স্ক গাছে জৈব সার ৩০ কেজি ইউরিয়া ১ কেজি, টিএসপি ১.৫ কেজি ও এমপি ১ কেজি প্রয়োগ করুন। এসব সার প্রতি বছর বর্ষার আগে অর্ধেক ও বর্ষার পরে অর্ধেক পরিমাণ প্রয়োগ করতে হবে।

১০। গাছের গোড়া থেকে (চারিদিকে ৩০-৬০ সে.মি বাদ রেখে যতদূর পর্যন্ত দুপুরে রৌদ্রের ছায়া পড়ে সে অংশের মাটি কোদাল /লাঙল দিয়ে আলগা করুন। সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

১১। সার প্রয়োগের পর গাছে থালা পদ্ধতিতে সেচ দিন। চারা গাছ সপ্তাহে ১ বার, বয়স্ক গাছে ফুল/ফল ধরার সময়ে ১৫/২০ দিন পরপর সেচ দিন। বর্ষায় নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। কলমের গাছের জোড়ার নিচের অংশ থেকে যত ডাল পালা গজাবে তা হেঁটে দিন। চার পাঁচটি প্রসারিত ডালপালা রেখে বাকিগুলো হেঁটে দিন। ফল সংগ্রহের পর বসন্তকালে) ২ সে.মি ব্যাসযুক্ত ডালপালা হেঁটে দিন। এছাড়াও শুকনো, মরা, রোগাক্রান্ত ডালপালা হেঁটে দিতে হবে।

১৩। কুলের ছিদ্রকারী পোকা, উইভিল, মিলিবাগ ও বিছা পোকা দমনের জন্য প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪/৫ চা চামচ ডায়াজিনন-৬০ তরল/মেটাসিসটকস-২৫ তরল কীটনাশক গুলে গাছে, ফলে ও পাতায় ভালোভাবে (১০/১২ দিন পরপর ২/১ দফায়) স্প্রে করতে হবে।

১৪। পাউডারী মিলডিউ দমনের জন্যপ্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩৫/৪০ গ্রাম থিওভিট-৮০ পাউডার গুলে পক্ষকাল পরপর ফলে ও গাছে স্প্রে করতে হবে।

১৫। শোষক ও জাব পোকা দমন- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪/৫ চা চামচ ম্যালাথিয়ন-৫৭ কীটনাশক গুলে গাছে স্প্রে করতে হবে।

২০২২

১৬। ফল পরিপক্ক হওয়ার পর (হালকা হলুদ রং ধরার পর) পেড়ে সংগ্রহ করুন। সংগ্রহের পর পোকা ধরা, পঁচা, খারাপ, ফল বাছাই করুন। ঝুড়িতে খড় বিছিয়ে সাবধানে ফল বাজারে বা দূরে চালান দিন। ফল থেকে আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারেন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় (২৫°- ৩০° সে.) সপ্তাহ কাল এবং হিমাগারে (৪° সে.) ৩৪ সপ্তাহ কাল সংরক্ষণ করতে পারেন।

সতর্কতা

১। ফুল ও ফলন বাড়াতে অতিরিক্ত ডাল ছাঁটাই, সার প্রয়োগ ও সেচ অবশ্য করণীয়।

২। উন্নত জাতে পাউডারি মিলডিউ এর উপদ্রব বেশি তাই সতর্ক থাকতে হবে এবং নিরোধমূলক স্প্রে করতে হবে।

অনুশীলনী- ১৬: নারিকেল চাষ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

নারিকেল একটি বহুবর্ষজীবী, একবীজ পত্রী, এক কাণ্ড বিশিষ্ট গুচ্ছমূল উদ্ভিদ। নারিকেলের জাত গুলোকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা-(১) টিপিকা জাত (লম্বা শ্রেণি) (২) জাভানিকা জাত (মাঝারী লম্বা শ্রেণি) এবং (৩) বামন বা নানা জাত (খাটো শ্রেণি)। নারিকেলের বংশ বিস্তারের জন্য উৎকৃষ্ট গুণাবলি সম্পন্ন মাতৃগাছ নির্বাচন করা উচিত। নারিকেলের বংশ বৃদ্ধি বীজ দ্বারা হয়ে থাকে। নারিকেলের বীজ থেকে উন্নতমানের চারা উৎপাদন করে বাগানে রোপণ করতে হয়।

উপকরণ

(১) বীজ (২) সার (জৈব ও রাসায়নিক) (৩) কীটনাশক (৪) ছত্রাকনাশক (৫) প্রে যমত্র (৬) পানি (৭) ঝাঝরি (৮) লাঙল (৯) জোয়াল (১০) মই (১১) মুগুর (১২) খুরপি (১৩) কোদাল (১৪) ঝুড়ি (১৫) দা (১৬) রশি (১৭) বস্তা (১৮) বেড়া।

নারিকেল চাষ করার জন্য নিম্নের কাজ/ধাপ অনুসরণ করতে হবে।

১। নারিকেলের উন্নত জাত নির্বাচন করুন। নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে সতেজ, সুপক্ক, খোসাসহ, শাস পুরু, বড়, যথেষ্ট পানি আছে, কীট/রোগ মুক্ত এমন ফল (১৫০টি/হেক্টরে) সংগ্রহ করুন।

২। নারিকেলের জন্য উঁচু স্থান এবং সুনিষ্কাশিত উর্বর দোঁআশ/এঁটেল দোআশ/বেলে দোআশ মাটি নির্বাচন করুন।

৩। চারা তৈরির জন্য সেচ নিকাশের সুবিধাযুক্ত স্থানে বেলে দোঁআশ ধরনের মাটিতে গভীরভাবে চাষ করে ২মি. (৬) প্রস্থ ও ৩ মি. (১০) লম্বা ও ১৫-১২ সেমি. উঁচু করে (২/৩টি) বীজতলা তৈরি করুন। প্রতি বীজতলায় ৭৫/৯০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০-১২০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করে ভালভাবে মিশিয়ে দিন। সংগৃহীত বীজ এক মাসের মধ্যেই রোপণ করুন। বীজের মুখের খোসাটি খুলে ফেলুন। প্রতি বীজতলায় ৩০ সে.মি দূরত্বে সারি টেনে ৩০ সে.মি পরপর পার্শ্ব ভাবে চিত্র (দ্রষ্টব্য) বীজ বপন (৪০/৫০ টি) করুন। বীজ সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে না ঢেকে পিঠের সামাণ্য খোলা রাখুন। বীজ বপনের পর বীজতলা খড়কুটা/নারিকেলের পাতা/ছোবড়া দ্বারা ঢেকে দিন। বৃষ্টি না হলে একদিন পরপর ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিন। বীজতলায় আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। এভাবে যত্ন করে ৩/৪ মাসের মধ্যে চারা না গজালে তা বাতিল করে তুলে ফেলুন। ৯-১২ মাস বয়ক সুস্থ সবল চারা জমিতে রোপণের জন্য বাছাই করুন।

৪। নারিকেলের জমি লাঙল দিয়ে ভালভাবে ৩/৪ টি চাষ ও মই দিন। মুগুর দিয়ে ঢেলা ভেঙে দিন। আগাছা বেছে ফেলুন। জমি সমতল করে নিন।। ৫। জমিতে ৯ মি. (২৭) দূরত্বে কোদাল দিয়ে ১ মি. চওড়া ও ১ মি. গভীর করে গর্ত তৈরি করুন। গর্ত সপ্তাহকাল খোলা রেখে দিন। গর্তের তলায় ১০/১৫ সে.মি পুরু করে নারিকেলের ছোবড়া/তুষ বিছিয়ে দিন। এরপর প্রতি গর্তে ১৫ কেজি জৈব সার, ৪৫০ গ্রাম টিএসপি, ৩০ গ্রাম এমপি ও ৫ কেজি ছাই মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখুন। গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিন। এর ১০/১৫ দিন পর চারা রোপণ করে দিন।

৬। রোপণের জন্য বীজতলা থেকে সুস্থ ও সতেজ, পাতা গাঢ় সবুজ, বোটা খাট ও প্রশস্ত এমন অঙ্কুরিত চারা নির্বাচন করুন। বীজতলা থেকে দুহাতে ধরে চারা সাবধানে তুলে আনুন। প্রতি গর্তের মাঝখানে বীজের পিঠের কিছু অংশ খোলা রেখে চারা পুতে দিন। চারা স্থানান্তরের জন্য ঝুড়ি ব্যবহার করুন। হাতে চেপে মাটি বসিয়ে দিন। একটি চারা পুঁতে রশি দিয়ে বেঁধে দিন। চারা বেড়া দিয়ে ঘিরে দিন। চারা লেগে না উঠা পর্যন্ত রসের অভাব হলে সপ্তাহে ঝাঝরি দিয়ে ২/১ টি সেচ দিন। রোপণের পর ছায়া দানের ব্যবস্থা করুন।

৭। চারা গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে নিড়িয়ে তুলে ফেলুন। চারা বাড়ার সাথে নিড়ানি এলাকার পরিসরও বাড়ান। সেচের পর মাটিতে জো এলে মাটির চটা ভেঙে দিন। মাটি আলগা রাখুন। বয়স্ক গাছ মাঝে মাঝে নিড়িয়ে আগাছা মুক্ত করুন।

৮। নারিকেলের চারা রোপণের পর প্রতি বছর ৫ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করুন। ৫ বছর ও তদুর্ধ বয়স্ক গাছে ১০ কেজি জৈব সার, ইউরিয়া ৮৭০ গ্রাম, টিএসপি ৩২৫ গ্রাম ও এমপি ১.১৪ কেজি প্রয়োগ করুন।

৯। এসব সার বছরে দুই দফায় অর্ধেক বর্ষার আগে ও অর্ধেক বর্ষার পরে গাছে প্রয়োগ করুন। গাছের গোড়া (৪০-৬০ সে.মি বাদ রেখে) থেকে ১.০-১.৫ মি দূর পর্যন্ত (দুপুরে যতটুকু স্থানে রৌদ্রের ছায়া পড়ে) মাটি লাঙ্গাল/কোদাল দিয়ে আলগা করে সারগুলি ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। সার প্রয়োগের পর গাছে পাবন/থালা সেচ দিন। চারা গাছে সপ্তাহে ঝাঝরি দিয়ে ২/১ টি সেচ দিন এবং বয়স্ক গাছে বর্ষার পরে ১০/১৫ দিন পরপর পাবন/থালা পদ্ধতিতে সেচ দিন। বর্ষায় নিকাশের ব্যবস্থা করুন।

১০। মরা, রাগাক্রান্ত, ভেঙে যাওয়া ডালপালা কেটে ফেলুন। হলুদ হয়ে শুকিয়ে যাওয়া ডাল কেটে ফেলুন। বছরে ২/১ বার গাছ খুব সাবধানে পরিষ্কার করে দিন। শুষ্ক মৌসুমে মাটির রস সংরক্ষণ ও পরিবেশ ঠান্ডা রাখার জন্য গাছের গোড়ার চারদিকে যতদূর ছায়া পড়ে ততটুকু কচুরিপানা/নারিকেলের পাতা বা ছোবড়া দিয়ে ঢেকে দিন। বর্ষাকালে কোদাল দিয়ে গাছের গোড়ায় কিছু মাটি তুলে উঁচু করে দিন।

১১। গন্ডার পোকা দমনে পোকার গর্তে তার ঢুকিয়ে দিয়ে পোকা বের করে এনে মেরে ফেলুন। (২) আক্রান্ত মরা গাছ ধ্বংস করুন। (৩) সিরিঞ্জ দিয়ে (১ সিসি) কীটনাশক (ডায়জিনন/মেটাসিসটক্স) গর্তে ঢুকিয়ে পোকা মারুন। (৪) আলকাতরা/তারপিন তেল/কেরোসিন তেল গর্তে ঢুকিয়ে দিন। কাদা দ্বারা গর্তের মুখ বন্ধ করে রাখুন। (৫) বাগানে গোবর/আবর্জনা জমতে দিবেন না।

১২। লাল পোকা উইভিল দমনে পঁচা খৈলের ফাদ পেতে পোকা ধরে মারার জন্য একটি খোলা পাত্রে পচা খৈল গর্তের মুখের কাছে রেখে দিন। পোকা বের হয়ে আসলে ধরে মেরে ফেলুন। ২/২০ গ্রাম সেভিন পাউডার ১ লিটার পানিতে গুলে সিরিঞ্জ দিয়ে গর্তে ঢুকিয়ে দিয়ে পোকা মেরে ফেলুন।

১৩। কালোমাথা শুয়া পোকা দমনে-(১) আক্রান্ত পাতা ধ্বংস করুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ চা চামচ ডায়াজিনন-৬০ তরল কীটনাশক গুলে গাছের পাতায় ভালোভাবে স্প্রে করে দিন।

১৪। উইপোকা দমনে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪/৫ চা চামচ ডায়াজিনন-৬০ তরল গুলে মাটি আলগা করে গাছের গোড়াসহ মাটিতে ভালোভাবে স্প্রে করে দিন।

১৫। ইদুর দমনে- (১) আশে-পাশে গর্ত থেকে ইঁদুর বের করে মেরে ফেলুন, (২) টিনের তৈরি প্রতিবন্ধক তৈরি করে গাছের কাণ্ডে লাগিয়ে ইদুরের গাছে উঠা বন্ধ করে দিন।

১৬। কুঁড়ি পচা রোগ দমনে-(১) আক্রান্ত মরা গাছ ধ্বংস করে ফেলুন, (২) প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০/৪৫ গ্রাম ডাইথেন-এম-৪৫/কুপ্রাভিট পাউডার গুলে নিয়ে গাছ, পাতা, কুঁড়িতে ভালোভাবে স্প্রে করে দিন।

১৭। ফল পচা ও ভূয়া নারিকেল দমনে-(১)প্রতি বছর নিয়মিত সার ব্যবহার করুন, (২) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পানোফিক্স গুলে গাছে ভালোভাবে স্প্রে করে দিন।

১৮। পাতায় দাগ দমনে-১৬ (২) নং অনুরূপ ব্যবস্থা নিন।

১৯। ছোট পাতা রোগ দমনে-নিয়মিত ও পরিমিত সেচ সার প্রয়োগ করুন।

২০। কাণ্ডের রস ঝরা রোগ দমনে-ক্ষতস্থান বেছে পরিষ্কার করে আলকাতরা/বোর্দোপেষ্ট লাগিয়ে দিন।

২১। শিকড় পচা রোগ দমনে (১) নিয়মিত ও পরিমিত সেচ সার প্রয়োগ করুন এবং নিকাশের ব্যবস্থা নিন, (২) গাছের গোড়া থেকে কিছু মাটি সরিয়ে ১৬ (২) এর অনুরূপভাবে প্রে করুন।

২২। ডাব হিসেবে ব্যবহারের জন্য কচি ফল আরোলা দা দিয়ে কেটে সংগ্রহ করুন। এছাড়া সম্পূর্ণ পরিপক্ক ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করুন। সংগৃহীত ফল ভাল-মন্দ, ছাট-বড় বাছাই করে নিন। নারিকেল তৈল/কাপরা করে সংরক্ষণ করতে পারেন। এছাড়া ঝুনা নারিকেল ঘরে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন বহুদিন।

সতর্কতা

১। বীজের মুখের খোসাটি সরিয়ে ফেলা কর্তব্য। তাতে গজানো সহজ হয়।

২। পাঁচ মাস পরে না গজানো চারা বাতিল করে নতুন বীজ লাগানো ভালো।

৩। রোপণের এক বছর পর যদি কোন চারা না বাড়ে তবে তা তুলে ফেলে নতুন চারা রোপণ করা উচিত।

৪। অন্য সব পরিচর্যা ঠিক থাকলেও (সেচ/সার।কীট ও রোগ দমন শুধু পরাগায়ণের অভাবেও ফল ঝরে পড়তে পারে।

৫। গন্ডার ও লাল পোকা থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

অনুশীলনী- ১৭: ফলের রোগের নমুনা সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ফসলের নানাবিধ রোগের লক্ষণ প্রতিদিনই আমাদের দৃষ্টিগাচের হয়। এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় গাছ ও রোগ উৎপাদকের মধ্যে অবিরাম মিথস্ক্রিয়ার ফলে যতক্ষণ রোগে গাছটি মরে না যায় বা গাছের প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগ উৎপাদক নিষ্ক্রিয় না হয়ে পড়ে ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া চলতে থাকে এবং রোগের বিভিন্ন লক্ষণ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

আক্রান্ত ফল গাছ ও ফল, ভাসকুলাম, মাটি খোড়ার যন্ত্র , ডালপালা ছাঁটাই এর কাঁচি, চোষ কাগজ বা খবরের কাগজ, ছোট করাত, হালকা প্রেস, হারবেরিয়াম শিট, ছোট আকারের কাগজের বাক্স, আঠা, গামটেপ, লেবেল, নোটবুক, স্টেলোপেন, পেনসিল, পারমানেন্ট কালি, নমুনা সংরক্ষণের বিভিন্ন আধার, রোগ শনাক্তকরণের বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, চার্ট ইত্যাদি ।

কাজের ধাপ

১ । নমুনার জন্য সর্বদা সদ্য আক্রান্ত বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গাছ বা তার অংশ বিশেষ ও যফল সংগ্রহ করতে হবে ।

২ । রোগ বৃদির অবস্থায় রোগের লক্ষণ কেমন হয় তা দেখার জন্য রোগের বিভিন্ন অবস্থার একাধিক নমুনা সংগ্রহ করতে হবে ।

৩ । গাছের পাতা, শিকড়, কান্ড প্রভৃতির নমুনা সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে চোষ কাগজ বা খবরের কাগজের মধ্যে নিয়ে হালকা প্রেসের মধ্যে চাপ দিয়ে রাখতে হবে ।

৪ । নমুনা বড় হলে তা সংগ্রহ করে ভেজা কাপড় বা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে ভাসকুলামে রাখতে হবে ।

৫ । ফল সংগ্রহ করে সেলাফেন ব্যাগে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে ।

৬ । বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসতে হবে ।

৭ । ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে রোগ শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন পুস্তক, ম্যানুয়াল, আলোকচিত্র ও ছবি এবং হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ও ভেজা নমুনার লক্ষণ মিলিয়ে রোগ সনাক্ত করতে হবে ।

৮ । সংগ্রহের পরপরই রোগ শনাক্ত করতে না পারলে নমুনাকে ফ্রিজে বা অন্য কোন ঠান্ডাস্থানে রেখে দিয়ে এবং সময় ও সুবিধা মতো শনাক্ত করার চেষ্টা করতে হবে ।

৯ । বিভিন্ন পুস্তক, ছবি, হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করতে না পারলে নমুনার রোগাগ্রত অংশ হতে প্যাথজেন বা রোগের জন্য দায়ী জীবাণুকে পৃথক করে বা আবাদ মাধ্যমে চাষ করে মাণক্রোস্কোপে দেখে জীবাণু সনাক্ত করতে হবে ।

১০ । পুস্তক, ছবি, হারবেরিয়াম শিট ও কাচের আধারে রক্ষিত নমুনার বৈশিষ্ট্য ও জীবাণুর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করতে হবে ।

১১ । ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য শনাক্তকৃত রোগের নমুনা সমূহ তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শুকিয়ে হারবেরিয়াম শিটে অথবা ভিজা অবস্থায় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের দ্রবনে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে ।

অনুশীলনী- ১৮: ফলের বিভিন্ন রোগের এলবাম হারবেরিয়াম তৈরি

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য সংরক্ষিত নমুনা অত্যান্ত কাজে লাগে । এ কারণে বিশ্বের বহু দেশে গাছ গাছড়া ও রোগাক্রান্ত গাছের নমুনার জাদুঘর (Plant desease her barium) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । ফলের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ সনাক্তকরণের একটি সহজ উপায় হলো হারবেরিয়াম তৈরিকরণ । হারবেরিয়ামে ফলের বিভিন্ন রোগের শুষ্ক নমুনা সংগৃহীত থাকে এবং তারপাশে রোগের লক্ষণসহ শনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য দেয়া থাকে । এতে বিভিন্ন ফলের রোগের নাম জানা, চেনা ও শনাক্তকরণ অতি সহজে এবং অল্প সময়ে সম্ভব হয় ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। রোগাক্রান্ত গাছ, ফুল ও ফলের নমুনা

২। একটি ভারি ও মজবুত প্রেস অথবা চোষ কাগজ বা খবরের কাগজ

৩। হারবেরিয়াম শিট বা নমুনা স্থাপনের কাগজ

৪। কাগজের ছোটবাক্স, আঠা, গামটেপ, তুঁতে বা মারকিউরিক ক্লোরাইড

৫। লেবেল, কলম, সুতা ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১। বাগান হতে রোগাক্রান্ত নমুনা ডাটা ও পাতাসহ ফুল সিকেচার বা চাকু দ্বারা কেটে সংগ্রহ করতে হবে।

২। সংগৃহীত নমুনাগুলো প্রথমে একটি চোষ কাগজে রেখে তার উপর আর একটি চোষ কাগজ রাখতে হবে। এ কাগজের ওপর আবার একটি নমুনা রেখে আগের মত তার উপর একটি কাগজ থাপন করতে হবে। এভাবে পর রাখতে রাখতে একটি নমুনার গাদা তৈরি হবে। এখন গাদাটিকে একটি ভারি প্রেসের দুডালার মধ্যে রেখে যথাসম্ভব জোরে চাপ দিয়ে ফিতা আটকিয়ে রাখতে হবে। প্রেস না থাকলে বিছানার তোষকের নিচে সমাণ স্থানে রাখতে হবে। ৩। প্রেসের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা রাখার পর নমুনাগুলো বের করে শুকাতে হবে। আবার বিছানার তোষেকের নিচে তুলে কয়েক দিন রেখে নমুনাগুলো শুকাতে হবে।

৪। নমুনা গুলো শুকানোর কয়েক দিন পর চোষ কাগজ বা খবরের কাগজের মধ্য হতে বের করে নিতে হবে।

৫। এরপর নমুনাগুলো সংগ্রহ করে (শুকানোর পর) হারবেরিয়াম সিটে স্থাপন করতে হবে।

৬। নমুনা স্থাপনের জন্য ২৯০৪২ সে.মি. সাইজের হারবেরিয়াম সিট ব্যবহার করতে হবে। সিটে নমুনা আটকানোর জন্য আঠা, গামটেপ, সূতা প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। আঠা লাগানোর জন্য প্রথমে একটি গাস শিটের উপর পাতলা করে আঠা লাগান এবং তার উপর নমুনাকে কিছু উপর থেকে হালকাভাবে ফেলতে হবে। এর ফলে নমুনার নিচের দিকে আঁঠা লেগে যাবে ও পরে হারবেরিয়াম সিটে রাখলে আটকে যাবে। আঠা লাগানো অবস্থায় সিটে স্থাপন করার পর নমুনা কখনও নড়াচড়া করানো যাবে না। কারণ, তাতে নমুনার নিচের আঁঠা সিটের বিভিন্ন স্থানে লেগে সিটকে নষ্ট করে ফেলবে।

নমুনা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সকলের অবগতির জন্য তার পাশে সিটের এক কোনায় নমুনার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ একটি লেবেল নিম্লোক্তভাবে লিখতে হবে।

সংগ্রহ নম্বর-

প্রতিষ্ঠান-

রোগের নাম-

পোষাকের নাম-

পরজীবী--

প্রাপ্তিস্থান-

স্থানীয় অবস্থা-

অনুসন্ধানকারী-

তারিখ-

২০২২

অনুশীলনী- ১৯: বালাইনাশক প্রয়োগে যন্ত্র বা স্প্রে মেশিন সিঞ্চনযন্ত্র ব্যবহারের কৌশল

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১। যে ফসলের ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে সে ফসল অনুযায়ী স্প্রে মেশিন নির্বাচন করতে হবে। যেমন মাঠ ফসলের জন্য হ্যান্ড প্রেয়ার, শক্তি চালিত ন্যাপসেক স্প্রেয়ার, ব্লোয়ার এবং বৃক্ষজাতীয় ফসল বা ফল বাগানের জন্য ফুট পাম্প ইত্যাদি।

২। আক্রমণকারী পোকার ধরন ও ফসল ক্ষেতের আকার ও ফসলের প্রকৃতি অন্যায়ী প্রেমেশিন নির্বাচন করতে হবে। ছোট বাগান হলে পদপৃষ্ঠ স্প্রেয়ার (Foot pump) বড় বাগান হলে ব্লোয়ার ফুট পাম্প ইত্যাদি।

৩। কীটনাশকের গঠনের ওপর ভিত্তি করেও সিঞ্চন যন্ত্র নির্বাচন করতে হবে।

যেমন-পাউডার জাতীয় কীটনাশকের জন্য ডাষ্টার এবং তরল কীটনাশকের জন্য হ্যান্ড প্রেয়ার, পাওয়ার প্রেয়ার, বোয়ার ফুট পাম্প ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। হ্যান্ড স্পেয়ার/পাওয়ার প্রেয়ার/পদ পৃষ্ঠপ্রেয়ার

২। কীটনাশক

৩। নাড়ন কাঠি

৪। কীটনাশক প্রতিরোধক পাষোক

৫। ফসলের ক্ষেত্র (শস্য মাঠফল/বাগান)

৬। সাদা কাগজ, পেনসিল, রাবার ইত্যাদি

কাজের ধারা

১। ব্যবহারের জন্য নির্বাচিত সিঞ্চন যন্ত্রটি ব্যবহারের উপযোগী আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রধানত: নিম্নলিখিত বিষয় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে।

(ক) পাম্প করলে যন্ত্রে বাতাস আটকে থাকে কিনা

(খ) নজেল দিয়ে পানি সঠিকভাবে নির্গমন হয় কিনা

২। এখন ব্যবহার উপযোগী সিঞ্চন যত্রটির চারভাগের একভাগ পরিষ্কার পানি দ্বারা ভর্তি করতে হবে।

৩। তারপর সিঞ্চন যন্ত্রে একবারে যতটুকু নির্বাচিত কীটনাশক প্রয়োজন তার চারভাগের একভাগ সিঞ্চন যনেত্রর পানির মধ্যে ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশাতে হবে।

৪। এরপর আবার চার ভাগের একভাগ পানি ও পূর্বের সমপরিমাণ কীটনাশক মেশিনে ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা নাড়াচাড়া করে ভালোভাবে মিশাতে হবে।

২০২২

৫। এবার সিঞ্চন যনেত্র নির্ধারিত দাগ পর্যন্ত সর্বশেষ পানিটুকু ও কীটনাশকটুকু ঢালতে হবে এবং নাড়ন কাঠি দ্বারা ভালোভাবে মিশাতে হবে।

৬। অতঃপর কীটনাশক ঢালার পথ অর্থাৎ সিঞ্চন যন্ত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে।

৭। এখন হাতলের সাহায্যে পিস্টনের উঠানামা করিয়ে প্রয়োজন মাফিক পাম্প করতে হবে/ফুট পাম্পের ক্ষেত্রে পায়ের সাহায্যে চাপ দিয়ে পাম্প করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পাম্প করতে খুব জোর না লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত পাম্প করতে হবে।

৮। এবার কীটনাশক প্রতিরোধক পোকাক পরিধান করতে হবে এবং সিঞ্চন যন্ত্রটি কাঁধে তুলে নিতে হবে।

৯। যে জমিতে কীটনাশক ছিটাতে হবে সে জমির একপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ঘাসের টুকরো, পাতা উড়িয়ে বা ধুয়ার সাহায্যে বায়ু প্রবাহের দিক জেনে নিতে হবে।

১০। এখন সিঞ্চন যন্ত্রের ট্রিগারে চাপ দিয়ে বাতাসের অনুকূলে সমগতিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং স্প্রে করতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে যাতে কীটনাশক গায়ে না পড়ে।

১১। এভাবে জমি/বাগানের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পৌছানারে পর প্রথম বার স্প্রে কৃত স্থান বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাস মোতাবেক দূরত্ব নিয়ে আবার জমির পূর্বের প্রান্তের দিকে ফিরে আসতে হবে। এভাবে জমিতে প্রে শেষ করতে হবে। সিঞ্চন যন্ত্রের মিশ্রণ শেষ হয়ে গেলে পূর্বের ন্যায় পুনরায় মিশ্রণ তৈরি করে যন্ত্রটি ভরে নিতে হবে এবং পূর্বের পদ্ধতিতে জমিতে স্প্রে করা শেষ করতে হবে।

১২। পাতার আক্রমণকারী পোকার জন্য গাছের উপর এবং কাণ্ডে বা নিচের দিকে আক্রমণকারী পোকার জন্য পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে।

১৩। ফলের বাগানে/উচু বৃক্ষের ক্ষেত্রে পদপৃষ্ঠ প্রেয়ার ব্যবহারের সময় প্রয়োজনীয় কীটনাশক ও পানি অনুমোদিত মাত্রায় পৃথক কন্টেইনার বালতিতে মিশিয়ে নিতে হবে এবং প্রেয়ারের সাকসন পাইপের নিম্ন প্রান্ত কনটেইনার বা বালতির ভেতর মিশ্রিত কীটনাশকে ডুবিয়ে প্রের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

সাবধানতা

১। সিঞ্চন যন্ত্র ব্যবহারের কলাকৌশল অনুশীলন কালে কোনরূপ ধূমপান করা যাবে না বা অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।

২। কলাকৌশল অনুশীলনের পর হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৩। স্প্রে কার্যক্রম শেষে পরিধেয় সকল কাপড় এবং স্প্রে মেশিন ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের ফল চাষের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ ধরনের ফল জন্মে। বহুল প্রচলিত ফলের মধ্যে কলা, আম, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, পেঁপে, লেবু, বাতাবিলেবু, লিচু, কুল এবং নারিকেল উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে কামরাঙ্গা, লটকন, সাতকরা, তৈকর, আতা, শরিফা, জলপাই, আমড়া, কদবেল, আমলকি, জাম, ডালিম, সফেদা, জামরুল, গোলাপজাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অপ্রচলিত ফল। বাংলাদেশে বহু রকম ফল উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও মাথাপিছু দৈনিক ফলের প্রাপ্যতা ৩০-৩৫ গ্রাম যা পুষ্টিবিজ্ঞানীদের সুপারিশকৃত ন্যূনতম চাহিদা মাত্রার ৮৫ গ্রাম থেকে ও কম। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার হিসাব মতে এক জন মানুষের গড়ে ১০০-১২০ গ্রাম ফল খাওয়া উচিত। বর্তমানে (২০০৬-০৭) বাংলাদেশে ১ লাখ ৪৪ হাজার ২ শত ষাট হেক্টর জমি থেকে ৪১ লাখ ৩১ হাজার ১ শত ৩০ টন ফল উৎপাদন হয়। অথচ দৈহিক ১১৫ গ্রাম হারে দরকার ৬২.৯৬ লাখ টল। ফলের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় ২১.৫ লাখ টন কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফল প্রাপ্তির পরিমাণও বাড়াতে হবে। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশে ১৪৪.২৬ হাজার হেক্টর জমিতে ফল চাষ করা হয়। এই জমির পরিমাণ উক্ত সময়ের মোট আবাদি জমির শতকরা মাত্র ০.৭৫ ভাগ। এতে প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে ফল চাষের জমির পরিমাণ খুবই নগণ্য। ফল চাষের জমির পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ছে। তবে এই বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম। ১৯৭১-৭২ সালে ১৩০ হাজার হেক্টর, ১৯৯০-৯১ সালে ১৬৭.৭১, হাজার হেক্টর, ১৯৯৪-৯৫ সালে এই জমির পরিমাণ ১৭৬.৫১ হাজার হেক্টর এবং ২০০৬-০৭ সালে ১৪৪.২৬ হাজার হেক্টের। তবে এ সময় জমির পরিমাণ কমলেও হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ আবাদি জমিতে মূলত দানাজাতীয় শস্যের আবাদ বেশি। সেই সাথে আলু, আম ও পাটের আবাদ লক্ষণীয়। এরপরও ফলের আবাদি এলাকা যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ১৫-১৬ বছরে দানা জাতীয় শস্য এবং ফল উৎপাদনের জমির পরিমাণের তুলনামূলক একটি পরিসংখ্যান সারণি -১ এ দেয়া হলো:

সারণি -১ বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির পরিমাণ ও বিভিন্ন ফলের বিপরীতে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ

জমির পরিমাণ ০০০ হেক্টর

জমি ব্যবহারের ধরন	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
মোট আবাদি জমি	১৩৭০৬.৮৮	১৩৪৮৭.৮৫	১৩৫২৭.৫৩	১৯৭০৩.০০	১৯২৮৯.০০	১৯২৬৬
প্রধান প্রধান দানা জাতীয় ফসলী জমি	১০৯২১.৮৬	১০৬৯৭.৯৭	১০৬৬৯.৩২	১৩০৯৮.০০	১১৩১৫০০	১১৪০৩৫
ফল চাষের আওতায় মোট জমি (আম, কাঁঠাল, কলা, আনারস, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা, তরমুজ, কুল, বাতাবী লেবু ইত্যাদি	১৭১.২৫	১৭৩.৬৮	১৭৬.৫১	১৩৯.২৭	১৩৯.০৭	১৪৪.২৬
দানা জাতীয় ফসলী জমির শতকরা হার	৭৯.৬৮	৭৯.৩১	৭৮.৮০	৬৬.৪৮	৫৮.৬৬	৫১.১৯
ফল জাতীয় ফসলী জমির শতকরা হার	১.২৪	১.২৮	১.৩০	০.৭১	০.৭২	০.৭৫

২০২২

বিবিএস ১৯৯৫/২০০৭

উপরোক্ত তালিকাতে হতে দেখা যায় যে, মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ এবং দানাজাতীয় ফসলের জমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমেছে এবং ধীরে ধীরে ফল চাষের জমির পরিমাণ বাড়ছে। ফল চাষের জমির পরিমাণ ২০০৬-০৭ সালে শতকরা হারে দাঁড়িয়েছে শতকরা ০.৭৫ ভাগ যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। অথচ এই সময়েই দানাজাতীয় ফসলের আওতায় জমির পরিমাণ শতকরা হার ছিল ৫৯.১৯ ভাগ। ইতিমধ্যে ফলের চাহিদা বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক হেক্টর প্রতি উৎপাদন হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তথাপি ফল উৎপাদনের এলাকা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ফলের আওতায় জমির পরিমাণ

বাংলাদেশে ফল চাষের আওতায় জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা খুবই কঠিন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে দুএকটি প্রধান ফসল ছাড়া অধিকাংশ ফলই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিকল্পিত বাগান আকারে বেশি পরিমাণ জমিতে চাষ করা হয় না। তাছাড়া ক্ষেতের বিভিন্ন আইল, রাস্তাঘাট, অফিস আদালত প্রাঙ্গনে ও বসত বাড়ির আশে পাশে জন্মানো বিভিন্ন ফল গাছের সংখ্যা, জমির পরিমাণ ও মোট উৎপাদন সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবুও বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি বছর অনুমানের উপর ভিত্তিতে করে বিভিন্ন ফলের অধিনস্থ জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস এর তথ্য অনুযায়ী ২০০০ ২০০১ - ২০০৬-০৭ পর্যন্ত ফল চাষের আওতায় মোট জমির পরিমাণ, উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন সারনি ২ এ দেয়া হলো।

সারণি:- ২ বাংলাদেশে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ, মোট উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন।

সন	মোট জুমির পরিমাণ (হাজার হে:)	মোট উৎপাদন হাজারটন)	ফলন (টন হে:)
২০০০-০১	১৯১.৬৬	১৪৮৪.৩১	৭.৭৪
২০০১-০২	১৯৪.৯৭	১৪৫৭.৪৪	৭.৯৯
২০০২-০৩	১৮১.৯৫	১৬২৮.৯৮	৮.০৪
২০০৩-০৪	২১৭.৫৩	১৭১৭.৪০	৮.১৬
২০০৪-০৫	১৩৯.৫৩	৪৭৩৪.১৪	৩৩.৯৩
২০০৫-০৬	১৩৯.০৬	৩৭৭৬.১৯	২৬.৮৬
২০০৬-০৭	১৪৪.২৬	৪১৩১.১৩	২৮.৬৩

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৫ ও ২০০৭

সারণি- ৩ বিভিন্ন ফলের আওতায় জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও ফলন (২০০৬-০৭)

ফলের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	ফলন (টন/হে:)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)		মোট ফলন
			বাগান	বাগান বহির্ভূত	
কলা	৫৮.৮২	১৭.০৮	১০০৪.৫২	-	১০০৪.৫২
আম	২৯.১১	৮.৯০	২৫৯.১২	৫০৭.৮১	৭৬৬.৯৩
আনারস	১৬.১৮	১৪.০৪	২৩৮.৩৬	-	২৩৮.৩৬
কাঁঠাল	৯.৯৮	২৫.৪২	২৫৩.৬৯	৬৭২.৮৮	৯২৫.৬৭
অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল	৩০.৩৮	৪.৮৯	১.৮৪	১৫.৫৬	১৭.৪০

২০২২

পেঁপে (পাকা)	১.১১	৩০.৫৯	৩৩.৮৬	৬১.৯৩	৯৫.৭৯
তরমুজ	৯.৮১	১১.২৪	১০৫.৮৩	-	১০৫.৮৩
লিচু	১.৭৪	৭.৬০	১৩.১৯	৩০.৩৭	৪৩.৫৬
লেবু	১.৯৬	৭.০৭	১৩.৮৪	২৩.৯৪	৩৭.৭৮
কুল	০.৪৩	৫.৫৮	২.৪১	৬১.৪৩	৬৩.৮৪
কমলা	০.১৭	৩.৩৮	০.৫৭	০.৩০	০.৮৭
পেয়ারা	৫.৫৭	১১.৫৩	৬৪.১৮	৮৭.৬২	১৫১.৮০
বাতাবী লেবু	০.৬১	১২.১৯	৭.৫	৪৬.৭৪	৫৪.১৯
কামরাঙ্গা	০.০৮	৩.৬৫	০.২৮	৬.৭২	৭.০
আমড়া	০.১৯	১৯.৭০	৩.৬৭	২৩.০৬	২৬.৭৩
কাঙ্গি	৪.৬৩	৯.২৬	৪২.৮২	-	৪২.৮২
তেঁতুল	০.১৩	৬.১৮	০.৮২	৮.৩৯	৯.২১
জামরবল	০.১৫	৬.৯৪	১.০৬	১১.৩৪	১২.৪০
নারিকেল(সবুজ)	১.৯৩	৪২.২৫	৮১.৪২	৩৫৫.৪৩	৪৩৬.৮৫
অন্যান্য ফল	০.৩০	৫.৬০	১.৬৫	১০.২৫	১১.৯০
জলপাই	০১৫	৭.৬১	১.২৬	৮.২৬	৯.৪২
বেল	০.১৬	৮.১৯	২.১৬	২৮.১৭	৩৪.৩৩
কালজাম	০২০	১৩.৪১	২.৬৫	৩৫.০০	৩৭.৬৯
মোট	১৪৪.২৬	-	২১৩৬.৫১	১৯৯৪.৬২	৪১৩১.১৩

উৎস: বিবিএস/০৭

উপরোক্ত সারনি হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বর্তমান ফল চাষের আওতায় মোট জমির পরিমাণ ১৪৪.২৬ হাজার হে: , মোট ফল উৎপাদনের পরিমাণ ৪১৩১.১৩ হাজার টন। ফল চাষের অন্তর্ভুক্ত উক্ত জমি মোট চাষাবাদ যোগ্য জমির মাত্র শতকরা ০.৭৫ ভাগ। এ হতে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশে ফল চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে। তবে এ হ্রাস বৃদ্ধির হার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ২০০০-০১ সনে মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৯১,৬৬ হাজার হে: যা কমে ২০০৬-০৭ সনে হয়েছে ১৪৪.২৬ হাজার হে: এবং ফলের মোট উৎপাদন ১৪৮৪,৩১ হাজার টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪১৩১.১৩ হাজার টন। মোট জমির পরিমাণ কমলেও উৎপাদিত ফলের পরিমাণ বেড়েছে। দুঃখের বিষয় হেক্টর প্রতি ফলন বাড়লেও জমির পরিমাণ কমে গেছে। ২০০০-০১ সনে যেখানে ফলন ছিলো ৭.৭৪ টন/হে: সেখানে ২০০৬-০৭ সনে উৎপাদন পাওয়া গেছে ২৮.৬৩ টন/হে: । এই সারণি-১ হতে বুঝা যায় ফল চাষে কৃষকের তেমন আগ্রহ নেই। উপযুক্ত পরিচর্যা, উন্নত প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহারে হেক্টর প্রতি ফলের উৎপাদন বাড়লেও বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ , কৃষকের দরিদ্রতা, কৃষি ঋণের অভাব, উপকরনের দুর্মূল্য, পরিবহনের সুযোগের অভাব, বাজার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে ফল চাষের আওতায় জমি কমে যাচ্ছে।

অঞ্চলভিত্তিক ফল চাষের জমির পরিমাণ

এলাকাভিত্তিক পছন্দ - অপছন্দ, পরিবেশ, জলবায়ু এবং আবহাওয়াগত পার্থক্যের কারণে ঐতিহ্যগতভাবে এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের ফল ফলাদি উৎপাদন বা চাষাবাদ হয়ে থাকে । সব রকমের ফল সকল অঞ্চলে সমভাবে চাষ হয় না । যেমন- উত্তর বঙ্গে উৎপাদিত আম বা লিচু বরিশাল অঞ্চলে চাষাবাদ হয় না । অপরদিকে ঢাকা অঞ্চলের কাঁঠাল অন্য অঞ্চলে সমভাবে সমমাণ সম্পন্ন হয় না । একইভাবে নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা বরিশাল এবং খুলনা অঞ্চলে যেমন চাষ হয় অন্য অঞ্চলে তেমন হয় না । বাংলাদেশের এটা সার্বিক চিত্র । তারপরও গবেষণা এবং উন্নতর প্রযুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে এক অঞ্চলের ফল অন্য অঞ্চলেও প্রসার লাভ করছে । যেমন- সিলেট অঞ্চলের কমলার চাষ পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করছে । উল্লেখ্য যে, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অঞ্চলভিত্তিক ফল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সারা দেশে ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ফল চাষ সম্প্রসারণ এবং অনেক বেসরকারি নার্সারি উন্নত জাতের চারা কলম উৎপাদনের মাধ্যমে ফল চাষের এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । বর্তমানে বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগে ফল চাষের আওতায় জমির পরিমাণ, উৎপাদন ও ফলন সারণি - ৪ এ দেয়া হলো ।

সারণি- ৪ বিভাগ ওয়ারী ফলের চাষের জমির পরিমাণ ও মোট উৎপাদন

(জমির পরিমাণ ০০০ হে: এবং ফলন ৩০০ টনে)

সাল	২০০০-২০০১		২০০১-২০০২		২০০২-২০০৩		২০০৩-২০০৪		২০০৪-২০০৫	
বিভাগ	জমির পরিমাণ	উৎপদন	জমির পরিমাণ	উৎপদন	জমির পরিমাণ	উৎপদন	জমির পরিমাণ	উৎপদন	জমির পরিমাণ	উৎপদন
ঢাকা	৯২.৮৪	৩২৩,৪৩	৯৬.৩১	৩৩৪.৯৭	১০০.০৮	৩৫০.২৫	১০৭.৪০	৩৮১.৪১	৬৮.৭৩	১০১৭.৮৪
চট্টগ্রাম	৯৮.৫২	৩৪৬.৭৩	১০৩.৫৪	৩৫৭.৯৯	১০৭.৫০	৩৭৪.৪৪	১১৫.৩৬	৪০৮.০২	৭৪.১৮	১০৮৮.৮২
রাজশাহী	৯৭.৬	২৯৫.৬৭	৯৮,৭২	৩১১.৬০	১০২.৫০	৩২৫.৬০	১১০.০৯	৩৫৫.০	৭০.৭৩	৯৪৬.৮০
খুলনা	৯১.৩৩	২৬৯.২৫	৯১.৫৮	২৮০.৪৪	৯৫.০২	২৯৩.১৪	১০২.২২	৩১৯.৫০	৬৫.৫১	৮৫২.১২
বরিশাল	৬২.১০	১৪৪.৭২	৬২.৫০	১৫৫.৭০	৬৫.০৯	১৬২.৬৬	৬৯.৯৪	১৭৭.৫০	৪৮.৮০	৪৭৩.৪০
সিলেট	৩১.০৩	১০৪.৫১	২৮.৯২	১১৬.৭৭	৩০.১৮	১২২.২০	৩২.২৮	১৩৩.০৫	২০,৭০	৩৫৫.১৭
মোট	৪৭৩.৪২	১৪৮৪.৩১	৪৮১.৫৭	১৫৫৭.৪৭	৫০০.৩৭	১৬২৮.৯৯	৫৩৭.২৯	১৭৭৪.৪৮	৩৪৪.৬৫	৪৭৩৪.১৫

উপরের সারণি হতে দেখা যায় বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগের মধ্যে ঢাকা,চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা বিভাগে ফল চাষের অন্তর্ভুক্ত জমি ও উৎপাদনের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই । তাছাড়া ঐ বিভাগগুলোতে বিগত কয়েক বছর ফলের জমি ও উৎপাদন মাটামুটিভাবে একই অবস্থানে আছে । আরও লক্ষণীয় যে, ফলের জমির দিক থেকে চট্টগ্রাম বিভাগ বরারই প্রথম স্থানে ও সিলেট বিভাগ সর্বনিম্নে অবস্থান করছে । অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বাধিক জমিতে ও সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম জমিতে ফল উৎপাদন হয় ।

ফল চাষ বৃদ্ধিতে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়ন

বাংলাদেশে ফল চাষ, ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও ফলের মানান্নেয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে । দেশের খাদ্য চাহিদা পুরণে ও পুষ্টি সমস্যা সমাধানে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম । খণ্ড খণ্ড পতিত ও অব্যবহৃত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে বেশি বেশি উৎপাদন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এবং শিল্পের বিকাশ ঘটাতে ফল চাষ সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে । আমাদের দেশে জনসংখ্যার চাপে চাষযোগ্য জমি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে । চাষের নিবিড়তা বাড়িয়ে অল্প জমি থেকে বেশি বেশি পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব ।

কোন ফলের চাষ করে একই পরিমাণ জমি হতে নির্দিষ্ট সময়ে বেশি পরিমাণ পুষ্টিকর ফল পাওয়া যায় তা নির্ণয় করা দরকার। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে বাংলাদেশের সর্বত্র কম বেশি কলার চাষ হয় এবং এটি উচ্চ ফলনশীল ফসল হিসেবে সুপরিচিত। কলার চাষ করে প্রতি হেক্টরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্যান্য অনেক ফসলের চেয়ে বেশি পরিমাণে ফলন ও পুষ্টি উপাদান পাওয়া সম্ভব। একই ভাবে পেঁপে এবং পেয়ারা চাষ করেও অল্প সময়ে বেশি লাভবান হওয়া যায়। আমাদের দেশে ফলের বার্ষিক চাহিদা (জনসংখ্যা ১৫ কোটি ও ফলের চাহিদা দৈনিক ১১৫ গ্রাম ধরে) ৬২,৯৬ লাখ মে: টন। অথচ বর্তমানে বার্ষিক উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ৪১.৩১ লাখ মে:টন। এ জন্য ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে হলেও আমাদের ফল উৎপাদন আরও ২১,৬৫ লাখ টন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ চাহিদা ক্রমান্বয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া প্রতিদিন প্রায় ২০২ হেক্টর জমি চাষের আওতা বহির্ভূত হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ভূমির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল বিন্যাস, উন্নত চাষাবাদ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, এলাকাভিত্তিক ফসল বিন্যাস, এলাকাভিত্তিক উৎপাদন পরিস্থিতি ও চাহিদা নির্ণয় এবং প্যাকেজিং ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা, কো-অপারেটিভ পদ্ধতি, সরকারী নীতি প্রণয়ন করে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ময়মনসিংহের গারো পাহাড়, সিলেট, চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা, বৃহত্তর দিনাজপুরের উঁচু ভূমি, সড়ক ও রেলপথের পাশে, অফিস আদালত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আশেপাশের অব্যবহৃত স্থানসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফলের চাষ করা সম্ভব। রংপুর, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়ার চর এলাকা এবং খোলা চরাভূমিতে আরও দ্রুত বর্ধনশীল ফলের চাষ সম্ভব।

ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে সামগ্রিকভাবে দেশের কি উপকার হতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো

ক) খাদ্য ঘাটতি পূরণ ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ

বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছরই সচরাচর ১৫-২৫ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি বিরাজ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কারণে এ ঘাটতি আরও বেশি হতে পারে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার সাধারনত শতকরা প্রায় ১.৮ ভাগ। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় শতকরা ২.১৭ ভাগ। মাথাপিছু জমির স্বল্পতা এবং আবাদযোগ্য জমি কমে যাওয়া, সেচ সুবিধার অভাব এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা, কারিগরি জ্ঞানের অভাব ও উপকরনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা, দানাজাতীয় শস্যের হেক্টর প্রতি ফলন কম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি কারণে কেবল দানা জাতীয় শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করে খাদ্য এবং পুষ্টি ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়।

মাণব দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন। গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ প্রধান। পুষ্টি উপাদানের সবচেয়ে সহজ ও সস্তা উৎস হলো ফল। বাংলাদেশে ফলের ঘাটতি আছে। অপরদিকে পুষ্টিহীনতা বিরাট সমস্যা। তাই ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব।

(খ) কৃষকের আয় বৃদ্ধি

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শস্য জাতীয় ফসল আবাদের চেয়ে ফল চাষ বেশী লাভজনক। যেমন- এক হেক্টর জমিতে কলা। চাষ করে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব। উন্নত জাতের কুলের একটি গাছ হতে (৬ মিটার× ৬ মিটার জমিতে) বছরে ১০০০/- টাকা পর্যন্ত কুল বিক্রি করা যায়। এক হেক্টর জমিতে পেঁপে চাষ করে বছরে ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা উপার্জন করা সম্ভব। অনুরূপভাবে তরমুজ, বাঙ্গি বা ফুটি, পেয়ারা ইত্যাদি চাষ

২০২৪

করে অধিক আয় করা সম্ভব। দানাজাতীয় শস্য চাষ করে এত বেশি লাভ করা সম্ভব নয়। নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো।

সারণি -৫ দানা শস্য ও ফল চাষের আনুপাতিক আয় (ফলন টনে, লাভ টাকায়)

ফল	গড় ফলন	নিট লাভ	আয় ও ব্যয় অনুপাত	ধানের চেয়ে আনুপাতিক বেশি আয়
কলা	১৬.০৬	৬২২৩২	২.৯১:১	৩.৬%
আম	৫.০	৪৮৩৬৭	৫.২:১	২.৮%
পেঁপে	২৪.৯৫	৫৪৪২১	২.১:১	৩.২%
কাঁঠাল	১৮.৪৪	৫৮৫৬০	৬.৩:১	২.৮%

২.৮% উৎস: বেনসন এটেলজ/৯৮

(গ) কর্মসংস্থান: দ্রুত বর্ধনশীল ফলের চাষে শ্রমিক বেশি লাগে। ফল চাষে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। যেমন সাকারকাটা, ফল পাতলা করা, অঙ্গ ছাটাই, গর্ত তৈরি ইত্যাদি। জমি তৈরি হতে শুরু করে সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, ফলের চারা ও কলম উৎপাদন, দীর্ঘ সময় ধরে ফল সংগ্রহ, প্যাকিং, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

(ঘ) শিল্পের বিকাশ: অধিকাংশ ফলের উৎপাদন মৌসুম ভিত্তিক। এ জন্য এক এক মৌসুমে এক এক ফল সীমিত সময়ের মধ্যে পেকে যায় এবং অন্য সময় তা পাওয়া যায় না। এ অবস্থা বিবেচনায় পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহ হিমাগার প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রক্রিয়াজাত করে ফল সংরক্ষণের জন্য শিল্প গড়ে তুলেছে। ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে এর বহুবিধ ব্যবহার এবং সংরক্ষণের জন্য আমাদের দেশেও শিল্প গড়ে তালোর সুযোগ আর ফল সংগ্রহাত্তের গ্রেডিং ও প্যাকিং, ফলের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য তৈরি করা ইত্যাদি। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় - নারিকেল ও বাদাম হতে তেল তৈরির কারখানা, নারিকেলের ছোবরা হতে দড়ি ও গদি তৈরি এবং ছাবেরা নার্সারিতে ব্যবহার করা যায়। এ ছাড়াও পেয়ারা, আনারস, আম, কমলা, চালকুমড়া ইত্যাদি ফল দ্বারা জ্যাম, জেলী, জুস, মারব্বা, শরবত ইত্যাদি পুষ্টিকর এবং উপাদেয় দ্রব্যদি তৈরির কারখানা স্থাপন করা যায়।

(ঙ) বৈদেশিক মুদ্রা আয়: সঞ্চয় ও বিদেশে টাটকা ও প্রক্রিয়াজাত করা ফলের যথেষ্ট চাহিদা আছে। আমদানিকারক দেশের চাহিদা অন্যায়ী উৎপাদন ও গ্রেডিং করা ফল পরিষ্কারকরণ, প্যাকেজিং ও টাটকা অবস্থায় পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফল বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদেশের চাহিদা মোতাবেক দেশীয় প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফলসমূহের চাষ বৃদ্ধি করে আমদানীর পরিমাণ কমিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। এতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে এবং বাড়তি আয়ও করা যাবে।

(চ) জমির সদ্ব্যবহার: জমির আইলে তাল, খেজুর, সুপারি গাছ লাগানো যায়। এতে প্রধান ফসলের ক্ষতি ছাড়াই বাড়তি ফসল পাওয়া সম্ভব। এছাড়াও আমাদের দেশে অনেক পতিত জমি আছে, যেখানে ধান বা অন্য কোন দানাজাতীয়, তৈলজাতীয় বা অন্য কোন ফসল করা সম্ভব হয় না। অথচ এসব পতিত জমি অঞ্চল ভেদে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ফল চাষের মাধ্যমে পতিত জমি ব্যবহার উপযোগী করা যায় এবং সেই সাথে ফলের উৎপাদন ও বৃদ্ধি করা সম্ভব। ২০২২

(ছ) ঔষধ হিসেবে ব্যবহার: আমলকি, বেল, হরিতকি, পেঁপে, কমলালেবু, ডালিম, বেদানা, পেয়ারা, আম ইত্যাদি ফল ঔষধ হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য ফলের রস অপরিহার্য। পেটের পীড়ার জন্য বেল ও পেঁপে, চক্ষু প্রদাহের জন্য কঁচা আম, যকৃতের জন্য পাকা আম, অজীর্নতা ও কার্ভি রোগের জন্য আমড়া; বলকারক টনিক তৈরিতে আমলকি, হরিকতি ও বয়রা; ডায়ারিয়ার জন্য ডাব ইত্যাদি কাজ করে। এছাড়া অনেক ফল গাছের পাতা, ছাল, শিকড় ইত্যাদি অনেক রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(জ) পরিবেশের উন্নয়ন: প্রচুর পরিমাণে ফল গাছ লাগানো হলে পরিবেশের উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হবে। যেমন পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়বে, ভূমিক্ষয় কমে যাবে, পাখির আবাসস্থল বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পাখি ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ফসল ও পরিবেশের উপকার করে।

(ঝ) সৌন্দর্যবর্ধক: কিছু কিছু ফল গাছ আছে যেগুলো দেখতে সুন্দর। আবার অনেক গাছের ফল নানা আকারের ও নানা রংয়ের হয়ে থাকে। যেমন- করমচা, জামরুল, ডালিম, আঙ্গুর , লিচু ইত্যাদি।

ফল চাষ বৃদ্ধির কৌশল

ফলের চাষ বৃদ্ধি করতে হলে প্রধানত: তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন-

ক) বর্তমানে যেসব গাছ রয়েছে সেগুলোর পরিচর্যার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করা।

খ) নতুন করে ফলগাছ লাগানো এবং

গ) জাত উন্নয়ন করা।

ক) যে সব গাছ বর্তমানে ফল উৎপাদনশীল রয়েছে সেগুলোর পুষ্টির অভাব দূরীকরণ, পরগাছার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ, মৃত বা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাটাই করা, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধ, সেচ, নিকাশ এবং সার প্রয়োগ ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় না। এসব কারণে অধিকাংশ গাছ উপযুক্ত পরিমাণে ফলন দিতে পারে না। নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা অনেকাংশে সম্ভব।

(খ) নতুন করে ফল গাছ রোপণের ব্যাপারে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। যেমন-

(১) যে সব এলাকায় অনাবাদি জমি রয়েছে সেখানে বাগান আকারে ফলের চাষ করতে হবে। ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় ফল চাষের উপযাগী প্রচুর জমি রয়েছে । এসব এলাকায় আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আনারস, লিচু, লেবু, কলা জাতীয় ফল, কাজু বাদাম, আমড়া, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল গাছের চাষ করা যেতে পারে। এসব এলাকার কৃষকদেরকে শর্ত সাপেক্ষে পাহাড়ি জমি বন্দোবস্ত দেয়া এবং ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে সহযোগিতা দেয়া যেতে পারে।

(২) বসতবাড়ির আশেপাশে পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য ফল গাছ লাগানো হয়। এ ব্যাপারে উপযুক্ত ফল গাছ। নির্বাচন করা দরকার। বিভিন্ন ফল গাছ এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে পরিবারের খাওয়ার জন্য সারা বছর ফল পাওয়া যায়। স্বল্পমেয়াদি ফল গাছ এজন্য সবচেয়ে উপযোগী। যেমন- কলা, পেঁপে, আঙ্গুর , তরমুজ। পারিবারিক বাগানের জন্য বাড়ির পাশে এ ধরনের ৫-৬ টি ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি গাছ লাগানোর সুযোগ থাকলে বিভিন্ন ধরনের ফলের সমম্বয় করে যথা আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল, সফেদা, ডালিম, জলপাই ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। কেউ যদি একই জাতীয় ফল ২-৩ টি লাগাতে চায় তাহলে আমের যেমন আগাম হিসেবে গুটির আম, মধ্যম হিসেবে ফজলি এবং নাবি হিসেবে আশ্বিনা লাগাতে পারে। অনুরূপভাবে অন্যান্য ফলের বেলায়ও আগাম , মধ্যম ও নাবি জাত নির্বাচন করে লাগাতে পারে।

(৩) মাঠ ফসল বা সবজির চেয়ে ফল চাষে বেশি সময় লাগে। বাগান আকারে দীর্ঘমেয়াদি ফলের চাষ করতে চাইলে সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। জমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাড়তি আয়ের জন্য ফল গাছের মাঝে স্বল্প মেয়াদি ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে।

(৪) ফলের জাত ও ফসল নির্বাচন, লাগানো ফসলের পরিচর্যা, আন্তফসল উৎপাদন এবং বাগান ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে তারা সঠিকভাবে ফুল চাষ করে লাভবান হতে পারে।

(৫) বাংলাদেশের আবহাওয়াতে জন্মানো সম্ভব এমন সব ফলের চারা কৃষকের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করা অসম্ভব নাও হতে পারে। এগুলোর চারা সরকারিভাবে উৎপাদন করে আগ্রহী কৃষকদের জন্য সহজলভা করা যেতে পারে।

(৬) ফল বাজারজাতকরণের জন্য বাজার সৃষ্টি এবং ফল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় খামার যন্ত্রপাতি কৃষকদের সহজলভ্য করার লক্ষে অঞ্চলভিত্তিক কৃষক সমবায় কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। এ সুযোগ সৃষ্টি করা হলে ফল বিক্রির জন্য কৃষকরা দালাল বা ফড়িয়াদের হয়রানির হাত থেকে অব্যহতি পাবে এবং সহজে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে পারবে।

(গ) উন্নত জাতের গাছ নির্বাচন করে নতুনভাবে লাগাতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবন ও শনাক্ত করতে হবে। সেগুলোর চারা ও কলম তৈরি করে দ্রবত কৃষকদের কাছে সহজলভ্য করতে হবে।

ফল চাষ বৃদ্ধিতে করণীয়

বাংলাদেশে মাথাপিছু ফলের উৎপাদন অত্যন্ত কম। তাই মাথাপিছু ফলের উৎপাদন বাড়াতে, পুষ্টির যাগোন দিতে, পতিত জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। যা ফল চাষ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। যেমন

১। জমির উচ্চতা নিরূপণ করে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ফল চাষের জন্য এলাকা চিহ্নিতকরণ।

২। অঞ্চলভেদে ফলের জাত নির্বাচন ও চাষের জন্য সুপারিশ করা।

৩। ফলের উন্নত জাত উদ্ভাবন।

৪। সুস্থ চারা কলম উৎপাদন এবং সকল এলাকায় সহজে পাওয়ার ব্যবস্থাকরন

৫। ফলের গুরুত্ব এবং পুষ্টিমাণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ।

৬। উন্নত প্রথায় ফল চাষের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

৭। ফল উৎপাদনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কৃষকদের বীমার ব্যবস্থাকরণ।

৮। ফল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের সুষ্ঠ ব্যবস্থাকরণ।

৯। ফলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থাকরণ।

১০। সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থাকরণ।

১১। ফল উৎপাদনের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান।

১২। যে সব গাছ ফল দেয় না সেগুলোর পরিচর্যা করা।

১৩। ভাল ফল উৎপাদনকারীকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাকরণ। ২০২২

১। জমির উচ্চতা নিরূপন করে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ফল চাষের জন্য এলাকা চিহ্নিতকরণ উচু জমি, বৃষ্টিপাত কম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় লিচু ভালো জন্মে। পানির কাছে এবং লবণাক্ত পানি এলাকায় নারিকেল ভালো জন্মে। পানিতল কাছে অথচ জলাবদ্ধতা হয় না এবং বাতাসে আর্দ্রতা বেশি সেখানে পেয়ারা, দেওফল, ডুমুর ভালো জন্মে। জমি উঁচু , মাটি লালচে এবং বৃষ্টিপাত বেশি অথচ পানি দাঁড়ায় না সেখানে সুপারি, আনারস, কাঁঠাল জাম ইত্যাদি ভাল জন্মে। তাই এভাবে বিভিন্ন ফল ভিত্তিক এলাকা চিহ্নিত করে ফল চাষের জন্য সুপারিশ করতে হবে।

২। **ফলের জাত বাছাই:** যে সব জাতে ফল তাড়াতাড়ি ধরে এবং বেশি পরিমাণে হয় সেগুলো বাছাই করে চাষ করা উচিত! যেমন

ফলের	জাত উন্নত জাত
আম	ফজলি, আম্রপালী, লক্ষৌ, ল্যাংড়া, হিমসাগর, মল্লিকা , গোপালভোগ, তাসমিরা
পেয়ারা	কাজী, স্বরুপকাঠি, আঙ্গুর , পেয়ারা
লিচু	চায়না-৩, বোম্বাই, মোজাফরপুরী, বেদানা
কলা	মেহের সাগর, সবরী , করবী
আনারস	ক্যালেন্ডার (জায়েন্ট কিউ), হানিকুইন, ঘোড়াশাল
নারিকেল	টিপিকা সবুজ, টিপিকা বাদামি ও পেয়ার্ক (ভিয়েতনাম)

৩। **ফলের উন্নত জাত উদ্ভাবন:** গবেষণার মাধ্যমে ছোট গাছে বেশি ফল ধরে, প্রতি বছর প্রচুর ফল দিতে পারে বা বছরে একের অধিক বা ফল দিতে পারে, ফলের পুষ্টিমাণ বেশি, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে ইত্যাদি গুণাগুণ সম্পন্ন জাত উদ্ভাবন করা ।

৪। **সুস্থ চারা কলম উৎপাদন এবং সকল এলাকায় সহজে পাওয়ার ব্যবস্থাকরণ:** সাধারণত কৃষকরা গুণগত চারা উৎপাদন করতে পারে না। তাই বিভিন্ন এলাকায় অভিজ্ঞ লাকে দ্বারা চারা কলম উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। নার্সারি স্থাপনকারীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য জমি বন্দোবস্ত ও ঋণ সুবিধা দেওয়া উচিত। এ সুবিধা সৃষ্টি করা হলে কৃষকরা নিজ এলাকায় সহজে উন্নতজাতের চারা/কলম পাবে এবং ফল চাষে আগ্রহী হবে। চারার। চেয়ে কলমের গাছে তাড়াতাড়ি ফল ধরে এবং ফল সংগ্রহ ও অন্যান্য পরিচর্যা করা সহজ হয়। এর ফলে কৃষকরা উৎসাহিত হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা সহজ হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়াতে জন্মাতে পারে এমন বিদেশি অপ্রধান ফলের চারা কৃষকদের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সরকারি ভাবে চারা সংগ্রহ করে আগ্রহী কৃষকদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

৫। **ফলের গুরুত্ব এবং পুষ্টিমান সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ:** বাংলাদেশে পুষ্টি সমস্যা খুব বেশি। এদেশে প্রাটেনের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। প্রাটেনের অভাবে শতকরা ৫০ ভাগ শিশু স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পাঁচ বছরের বয়সের নিচের শিশুদের শতকরা ৭৫ ভাগই অপুষ্টির শিকার। শতকরা ৭৬ ভাগ পরিবার ক্যালরি এবং শতকরা ৯০ ভাগ পরিবার ভিটামিন "এ"- এর অভাবে ভুগছে। শতকরা ৭৫ ভাগ মহিলা ও শিশু রক্তশূন্যতায় ভুগছে এবং ১০ লক্ষ লাক গলাফোলা রোগে আক্রান্ত। ভিটামিন "সি" রাইবাফ্লোবিন এবং ফলিক এসিডের ঘাটতিও খুব বেশি। এদেশে অপুষ্টিজনিত মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি। ফল চাষ বৃদ্ধি করা হলে ও বেশি করে ফল খাওয়ার অভ্যাস করা হলে অপুষ্টিজনিত সমস্যা সহজে দুর করা সম্ভব।

৬। উন্নত প্রথায় ফুল চাষের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ: সফলভাবে ফল চাষ করার জন্য উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। যাতে তারা নিজ এলাকায় তা বাস্তবায়ন করতে পারে।যেমন- উন্নত জাত নির্বাচন, চারা তৈরি, গর্ত খনন, চারা রোপণের পূর্বে এবং পরে সার প্রয়োগ , সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের আন্ত পরিচর্যা, ফল পাড়া, বাছাই, সংরক্ষণ ইত্যাদি। সময়মত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এলাকার উপযোগী কলাকৌশলের প্রশিক্ষণ দেয়া হলে কৃষকরা ফল চাষ বৃদ্ধিতে উৎসাহ পাবে। বেশি সময় ধরে ফল পাওয়ার জন্য আমের আগাম হিসেবে গুটি আম, মধ্যম হিসেবে ফজলি, নাবি হিসেবে আশ্বিনা আম। চাষ করা যেতে পারে। রসা বা গালা কাঁঠাল আগে পাকে, আধা রসা বা আধাগলা কাঁঠাল কিছুটা পরে পাকে এবং চাউলা কাঁঠাল দেরিতে পাকে। আগাম, মধ্যম ও নাবিতে পাকে এভাবে ফল নির্বাচন করে চাষ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কুল, জাম, লেবু ইত্যাদিও চাষ করা যেতে পারে।

৭। ফল উৎপাদনের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কৃষকদের ঝুঁকি বীমার ব্যবস্থাকরণ: কৃষকদেরকে ফল উৎপাদনকালে নানাবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ঝড়ঝঞ্জা, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ, বন্যা বা খরা, বাজারজাতকরণ সমস্যা ইত্যাদি। এ অবস্থায় কৃষকরা যাতে ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সে জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হলে তারা বেশি করে ফল চাষে আগ্রহী হবে।

৮। ফল সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা: আমাদের দেশের অধিকাংশ ফলই মৌসুমী ফল। তাই নির্দিষ্ট মৌসুমে নির্দিষ্ট ফল একসাথে পাকে। যার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় করতে হয়।কোন কারণে বিলম্ব হলে প্রচুর ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। সরকারিভাবে বা প্রতিটি ফল উৎপাদন এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দ্বারা বা ফল চাষীদের দ্বারা ফল চাষী সমবায় করা যায়। এর মাধ্যমে মৌসুমে অতিরিক্ত ফল সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হলে কৃষকরা ফল চাষে আগ্রহী হবে। অনুরূপভাবে ফল চাষীদের উৎপাদিত ফল বিক্রয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হলেও তারা বেশী করে ফল চাষ করবে।

৯। কৃষকদের ফলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ: প্রায়শই দেখা যায় যে ফড়িয়া বা দালাল দ্বারা ফল উৎপাদনকারী কৃষকগণ প্রতারিত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটি এবং এলাকাভিত্তিক ফলের ক্রয়কেন্দ্র না থাকায় কৃষকরা অনেক সময় ফল উৎপাদন করে বিপাকে পড়ে। যার ফলে কম দামে ফল বিক্রি করতে হয়। তাই ফল বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হলে কৃষকরা তার পন্যের উপযুক্ত মূল্য পাবে এবং ফল চাষ বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হবে।

১০। কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থাকরণ: ফলচাষ করতে বেশি টাকার প্রয়োজন হয়। এছাড়াও ফলের বাগানে আন্ত পরিচর্যার যাঁর জন্য দামি যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। যা আমাদের দেশের গরীব কৃষকদের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব না। বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদি ফলের বাগান হতে ১০ হতে ১২ বছর পর উৎপাদন পাওয়া যায়। আমাদের দেশের গরিব কৃষকদের পক্ষে ১০ হতে ১২ বছর জমি ফেলে রাখা অসম্ভব। তাই এসব ক্ষেত্রে উৎপাদন শুরু না হওয়া পর্যন্ত সুদবিহীন ঋণ দেয়া উচিত। এতে কৃষকরা বেশি করে ফল চাষে আগ্রহী হবে।

১১। কৃষকদেরকে ফল উৎপাদনের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান: মাঝে মাঝে ফল বাগানের মাটিতে সেচের পানিতে নানাবিধ সমস্যা হয়। এমনকি নানাবিধ রোগ, পোকামাকড়েরও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপযুক্ত পরামর্শ দেয়া প্রয়োজন।ফলের গাছের পরিচর্যার জন্য ভাড়া ভিত্তিতে মেশিনারী সরবরাহের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে, যা ফল চাষীদের আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এমনকি এগুলো হাতে কলমে করে দেখানো হলে তা দেখে অন্যান্য কৃষকরা উৎসাহিত হবে।

১২। যে সব প্রাপ্ত বয়স্ক গাছ বিভিন্ন কারণে ফল দেয় না সেগুলোর পরিচর্যা করা: গাছের পুষ্টির অভাব থাকলে সার প্রয়োগ করা দরকার। গাছে পরগাছা, অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ও রোগ পোকামাকড়ের আক্রমণ থাকলে তা কেটে হেঁটে পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিচর্যার মাধ্যমে ফল উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

২০২২

১৩। ভালো ফল উৎপদানকারীকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাকরণ বিভিন্ন সময়ে ফল প্রদর্শনীর আয়াজেন করে বা কমিটির মাধ্যমে ভালো ফল চাষীদের নির্বাচন করে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে চাষীরা উৎসাহ পাবে এবং ফল চাষে আগ্রহী হবে।

ফল চাষের সার্বিক অবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমানে(২০০৬-০৭) ১৪৪.২৬ হাজার হেক্টর জমিতে ফলের চাষ করা হয়ে থাকে। হিসাব অনুযায়ী এ জমির পরিমাণ মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র শতকরা ০.৭৫ ভাগ। বিগত দশ/এগার বছরে ফলের জমি কমেছে ১১৪.৭৪ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন সে তুলনায় খুব সামাণ্যই বেড়েছে। নিচের সারনিতে (সারণি-৮) উলেখিত তথ্য মোতাবেক দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে দ্রুত বর্ধনশীল ফলই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ উৎপন্ন হয়। দ্রুত বর্ধনশীল ফলের মধ্যে কলা, পেঁপে, আনারস ও তরমুজই প্রধান। ২০০৬-০৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের মোট উৎপাদিত ফলের প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হচ্ছে দ্রত বর্ধনশীল ফল। আবার দ্রুত বর্ধনশীল ফলের শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে কলা।

দেশে ৪১৩১.১৩ হাজার মেট্রিক টন ফল উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মোট চাহিদা হচ্ছে ৬২৯৬.২৫ হাজার মেট্রিক টন। সে মোতাবেক ফলের উৎপাদন কমপক্ষে ২/৩ গুণ বৃদ্ধি করা প্রয়াজন।

পেঁপে, লিচু, লেবু জাতীয় ফল, কুল, পেয়ারা, তাল ও অন্যান্য ফলের আওতায় জমির পরিমাণ খুবই কম। আবার লিচু, কুল, পেয়ারা, নারিকেল ও লেবু জাতীয় ফলের গড় ফলন অত্যন্ত কম। উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এদেশে ফলের উৎপাদন বাড়ানোর এখনো যথেষ্ট সুযাগ আছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটি ফল চাষের জন্য অনুকুল থাকায় ফলের উৎপাদন বাড়ানার বেশ সুযোগ রয়েছে। অনেক বিদেশি ফল যেমন রাম্বুটান, ম্যাঙ্গাস্টিন, আঙ্গর, স্টবেরি, এভাকেডো, কাজুবাদাম প্রভৃতি ফল এদেশে জন্মানো সম্ভব। উত্তরাঞ্চলে অনেক পতিত জমি, চট্টগ্রাম, ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশ কিছু পাহাড়িয়া অঞ্চল, বড় বাস্তার ধারে, পুকুর পাড়, বিভিন্ন অফিস সংলগ্ন মাঠ, আদালত প্রাঙ্গণ, রেললাইনের পাশ, বতসবাড়ির আশেপাশে এবং অনুরূপ আরও অনেক জমিতে অধিক সংখ্যায় ফল গাছ লাগিয়ে ফল উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ ও সম্ভাবনা এদেশে এখনও বিদ্যমান আছে।

তাছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইতিপূর্বে রোপিত ফল গাছ সমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফলের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬০-৭০ টন। সেখানে আমাদের দেশে তা মাত্র ৭ টনের মত। এ থেকে অনুমাণ করা যায় যে আমাদের দেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা কত বেশি।

ফল চাষীদের সমস্যাও কিন্তু কম নয়। জমির স্বল্পতা ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন উপকরণের দুষপ্রাপ্যতা ও দুমূল্য, লাগসই প্রযুক্তির অভাব, কৃষকের শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের অভাব, দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা, প্রাকৃতিক দুযোর্গ, আর্থিক ঝুঁকির আশংকা, ফল সংরক্ষনে অসুবিধা, পরিবহন সমস্যা, প্রক্রিয়াজাতকরন শিল্পের অভাব, বিপনন সমস্যা, শস্যবীমার অনুপস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণ কৃষকের ফল চাষে আগ্রহ কমিয়ে দিচ্ছে।

ফল চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি অঙ্গীকার ও সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জনগণের সচেতনতা ও সদিচ্ছা ফলের উৎপাদন বাড়াতে পালন করতে পারে।

সারণি-৩ হতে দেখা যায় স্বল্প মেয়াদি ফল সমূহ যেমন , কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজ ইত্যাদি ফলই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয় । দীর্ঘমেয়াদি ফলের মধ্যে আম চাষে অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি । তাছাড়া কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদি ফলের আওতায়ও বেশ কিছু পরিমাণ জমি আছে । ফল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান উপলদ্ধি করার জন্য বিশ্বের অন্যান্য কয়েকটি দেশের তুলনামূলক গড় উৎপাদন সারনি-৮ তুলে ধরা হলো ।

সারণি-৬ বাংলাদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলের তুলনামূলক উৎপাদন(০০০টন)

ফলের নাম	বাংলাদেশ	ভারত	পাকিস্তান	ইন্দনোশিয়া	মিশর	চীন	আফ্রিকা	জাপান	যুক্তরাজ্য	অস্ট্রেলিয়া	মালোয়েশিয়া
কলা	৬২৮	৯৯৩৫	৮৪	৪৭৬৮	৫৮৫	৩১৪১	৭১৭৮	১	৬	২৪১	৫৩০
আম	১৮৭	১২০০০	৯১৪	১২২৮	২১৫	২১৪৮	-	-	৩	৩০	২৯
পেঁপে	৩৯	৫০০	৮	৫০০	-	১৪৩	৫০২৪	-	১৯	-	৫১
কমলা লেবু	৯	২০৮০	১৪১০	২৭০	১৩৭০	২৩০৮	-	১৩১	১১৬৩৬	৫৪৪	১১
আপেল	-	১২০০	৬০০	-	৪২৫	১৮৪১০	৫০৪	৯৮২	৪৬৩৯	২৮০	-
ফরাস	-	৫৬	৮০	-	৫৩	২৭০৪	১৬৬	১৩৬	৮০২	৩১	-
লেবুজাতীয় ফল	১২	৯৮০	৮২	-	৩৫০	২০৭	৬২৪	-	৭৭৯	৩৫	৩
আনারস	১৪৮	১১০০	-	৫৩৮	১৫	-	৮৯৯	-	২৯৪	১২৫	১৬৩
আঙ্গুর	-	৭০০	৭৫	-	৮৫০	২১৫৪	-	২৫১	৬২০২	৬৩৫	-

উৎস: এফএও উৎপাদন বর্ষ পুঞ্জি/৯৭

সারণি-৭ বাংলাদেশ সহ এশিয়ার তিনটি দেশের প্রধান কয়েকটি ফলের হে: প্রতি উৎপাদনের তুলনামুলক চিত্র

ফলের নাম	হেক্টর প্রতি উৎপাদন/মে:টন			
	বাংলাদেশ	ভারত	ইন্দোনেশিয়া	থাইল্যান্ড
আম	৩.৭	১২.০	৫.০	১০.০
কলা	১৪.৩	৩১.৩	১২.৫	১২.৮
পেঁপে	৭.০	১১.৩	১২.৯	১১.০
আনারস	১০.৬	১৭.৩	৭.৯	২৩.৬

উৎস: এফএও ২০০১

সারণি - ৮ বাংলাদেশের কয়েকটি ফলের আবাদি জমি ও উৎপাদন (২০০৩-২০০৪)

ফলের নাম	আবাদকৃত জমির পরিমাণ (০০০ হেক্টর)	ফলন (টন/ হেক্টর)
১। আম	৫১.০১	৪.৭৬
২। কাঁঠাল	২৭.৭০	১০.১১
৩। লিচু	৫.৭০	২.৫৫
৪। পেয়ারা	১৬.৯০	৪.৭৮
৫। তরমুজ	১০.৮০	৮.২১
৬। কলা	৪৯.৩০	১৪.৩৪
৭। পেঁপে	৭.৭০	৬.৬৫
৮। আনারস	১৬.৮০	১২.৬৬

উৎস: কৃষি পরিসংখ্যান পুস্তিকা-ডিসেম্বর/২০০৫/কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আমাদের দেশে মাথাপিছু দৈনিক ফলের প্রাপ্যতা কত ?

২। দেশের মোট আবাদি জমির কতটুকু জমিতে ফল চাষ করা হয় ?

৩। বাংলাদেশে প্রতিদিন কত জমি চাষের আওতা বহির্ভূত হয়ে যাচ্ছে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে ফল চাষের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর।

২। বাংলাদেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ?

৩। বাংলাদেশে ফল চাষ বৃদ্ধির কৌশল ব্যাখ্যা কর।

৪। বাংলাদেশে ফল চাষের মাধ্যমে কৃষকের আয় কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় আলোচনা কর।

৫। বাংলাদেশে ফলের আওতায় মোট জমির পরিমাণ ও মোট ফল উৎপাদন লিপিবদ্ধ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে ফল চাষের আওতায় জমির পরিমাণ অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। বাংলাদেশে বিভিন্ন ফলের উৎপাদন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা কর।

৩। বাংলাদেশে বিভিন্ন ফলের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন সম্বন্ধে বর্ণনা কর।

৪। বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে ফল চাষের আওতায় জমির পরিমাণ ও উৎপাদন সম্পর্কে বিবরণ দাও।

৫। বাংলাদেশে ফল চাষের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। বাংলাদেশে ফল চাষের সর্বাধিক অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

২০২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু খাদ্য হিসেবে নয়। মানব দেহের পুষ্টি সাধনে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে , চিকিৎসা শাস্ত্রে ইত্যাদিতে ফল বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে। ফল চাষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নানান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটিতে বর্তমানে প্রায় ৭০ ধরনের ফল উৎপাদন হয়ে থাকে। একটু যত্ন নিলে ও কিছু কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলোর ফলন বাড়ানো সম্ভব। এছাড়া গবেষণার মাধ্যমে জাত নির্বাচন করে আরও কিছু নতুন নতুন ফল প্রবর্তন বা চালু করা যেতে পারে। যেমন- ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান চেরী, গেছো টমেটো, স্টার আপেল, নাশপাতি, পার্সিমন ইত্যাদি।

মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে বর্তমানে টাটকা ও প্রক্রিয়াজাত করা ফলের ভালো বাজার আছে। সুপরিকল্পিতভাবে এলাকা নির্ধারণ করে উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ, আমদানি কারক দেশের সাথে অগ্রিম চুক্তি, সংরক্ষণ, উন্নত ও দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার পদক্ষেপ নেওয়া হলে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অনায়াসে অর্জন করা সম্ভব। প্রতিবছর বিদেশ থেকে আপেল, আঙ্গুর, খেজুর, কমলালেবু ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমাণে আমদানি করা হয়। দেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে আমদানির পরিমাণ কমে যাবে এবং এতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাবে।

জাতীয় অর্থনীতিতে ফলের অবদান

জাতীয় অর্থনীতিতে দানাজাতীয় শস্য তথা খাদ্য শস্যের অবদানের চেয়ে ফলজাতীয় শস্যের অবদান তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ফলের আওতায় রয়েছে মোট চাষভুক্ত জমির শতকরা ০.৭৫ ভাগ। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ফসলভিত্তিক আয়ের আনুমানিক প্রায় শতকরা ১০ ভাগ আসে ফল হতে। প্রতিবেশী দেশ ভারতেও অন্যান্য ফসলের তুলনায় ফলজাতীয় ফসলের আয় তুলনামূলকভাবে বেশি। ফলের বাজারমূল্য সব সময় বেশি থাকে বিধায়, ফলের গড় আয় অন্যান্য ফসলের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের জিডিপিতে কৃষি সেক্টরের অবদান যেখানে শতকরা ৩৩ ভাগ সেখানে ফল ও ফলজাত দ্রব্যের অবদান প্রায় শতকরা ২.৩ ভাগ। পৃথিবীর অনেক দেশেই উপযুক্ত জলবায়ুর অভাবে ফল চাষ সম্ভব হয় না। সে সব দেশে ফল রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তাছাড়া বাংলাদেশে চাষাবাদ সম্ভব এমন ফল যেমন আঙ্গুর, অ্যাভাক্যোডো, রামবুটান, কাজুবাদাম ইত্যাদি চাষ করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো সম্ভব।

কোন কোন ফল চাষে লাভ বেশি

বাংলাদেশে অনেক রকমের ফলের চাষ করা হয়। তবে যে সব ফল ব্যাপকভাবে বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় সেগুলো হলো আম, লিচু, কাঁঠাল, কলা, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, নারিকেল, কুল, লেবুজাতীয় ফল, আমড়া ইত্যাদি। এদের মধ্যে কলা, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি স্বল্প মেয়াদী অবৃক্ষজাতীয় ফল। কারণ খুব অল্প সময়েই অর্থাৎ গাছ লাগানার এক বা দুই বছরের মধ্যেই এগুলো ফল দিয়ে থাকে এবং এগুলো খুব দীর্ঘস্থায়ী বা দীর্ঘজীবী নয়। এদেশে মোট উৎপাদিত ফলের অর্ধেকের বেশি ফল স্বল্পমেয়াদি অবৃক্ষজাতীয় গাছ হতে উৎপন্ন হয়।

২০২২

আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, নারিকেল, কুল, লেবু, আমড়া, জাম, সফেদা ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদি বৃক্ষজাতীয় ফল। এসব গাছ থেকে ফল পেতে ৪-৭ বছর সময় লেগে যায়।

কলা, পেঁপে, আনারস উচ্চফলনশীল ফল হিসেবে সুপরিচিত। অন্যান্য অনেক ফল মাঠ ফসলের চেয়ে স্বল্প সময়ে, স্বল্প পরিসরে প্রতি হেক্টরে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণ ফলন ও পুষ্টি উপাদান পাওয়া সম্ভব। এদের হেক্টর প্রতি ফলন ও বিক্রি মূল্য এবং নীট আয়ও অন্যান্য বৃক্ষজাতীয় ফলের তুলনায় বেশি।

কলা, পেঁপে, আনারস

কলা, পেঁপে ও আনারস দ্রুতবর্ধনশীল ফল। কলা ও পেঁপে উৎপাদনে প্রায় এক বৎসর এবং আনারসের বেলায় প্রায় দুই বৎসর সময় লাগে। এখানে যে হিসাবটি উপস্থাপন করা হল, তাতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হবে যে, এই সব ফলের উৎপাদন প্রকৃতই অন্যান্য বৃক্ষজাতীয় ফল ফসলের তুলনায় লাভজনক।

সারণি- ১ কলা, পেঁপে ও আনারসের আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (শত টাকা, হেক্টরপ্রতি)

আইটেম	কলা	পেঁপে	আনারস	আইটেম	কলা	পেঁপে	আনারস
শ্রম	২৭০	৩০০	৫৫০	মোট আয়	৩০৮০	৩০০০	৪২৫০
গরু/হাল	৩৬	৩৬	১৮	নিট আয়	১৬৪৩	১৬০৭	১০৪২
বীজ/চারা	১২১	১৮০	৪০০	দিন প্রতি লাভ	৪.১	৪.৪	২.৮
সার	৪৫৮	৪২০	৪২০	উৎপাদিন দিন	৪০০	৩৬৫	৭৩০
সেচ	৩৬	৩৬	৩৬	আয়-ব্যয়	২.১৪	২.১৫	১.৯২
খুটি	২৪০	১৫০	১০০	ফলন-টন	২২	২৫	৫০
জমি	১২০	১২০	২৪০	কেজি প্রতি টাকা	১৪	১২	৮.৫
সুদ	১৫৬	১৫১	৪৪৪	আনারসের বেলায় ২৪ মাস হিসাব			
মোট ব্যায়	১৪৩৭	১৩৯৩	২২০৮	কলার বেলায় ১৩ মাস হিসাব			

কলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যয়, শ্রম, সার ও খুটি বাবদ। পেঁপের প্রধান ব্যয় শ্রম ও সারজনিত। আনারসের ক্ষেত্রে শ্রম, বীজ, চারা জমিজনিত ব্যয় সর্বাধিক।

আম ও অন্যান্য বৃক্ষজাতীয় ফল

বাংলাদেশের প্রধান বৃক্ষ জাতীয় ফল আম ও অন্যান্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে এক বা দুই বৎসরের পরিবর্তে অন্তত ৮-১০ বৎসরের হিসাব ধরা আবশ্যক। আম গাছে বিক্রয় উপযোগী ফল ধরতে রোপণের পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। অন্যান্য বহু ফলের বেলাও প্রথম কয়েক বৎসর যাবৎ কেবল বায়ের পালা। কিন্তু একবার ভালোভাবে ফল ধরা শুরু হলে ব্যয় অনুপাতে অনেক বেশী আয় হতে থাকে। এখানে তালিকায় আম উৎপাদনের একটি আনুপাতিক হিসাব দেয়া হলো। এটা হতে অন্যান্য বৃক্ষ জাতীয় ফলের আয়-ব্যয় হিসাব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

একদিকে ক্রম- বর্ধিষ্ণু ব্যয় ধরে অপরদিকে ক্রমবর্ধিত আয় ধরা হয়েছে। তাতে আমের বেলায় লাভ আসতে প্রায় নয় বৎসর লেগে যায়। এখানে প্রথমে গাছের পারস্পরিক দূরত্বের অর্ধেক তথা ২০ ফুট দূরত্বে ১২৫ টি

গাছের সংকুলান দেখানো যাচ্ছে। পনেরো বিশ বছর পরে যখন গাছসমূহ একে অন্যের গায়ে চড়াও হয়ে যাবে, তখন একান্তর গাছসমূহ কেটে ফেলতে হবে। দশম বৎসরে মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করে প্রায় একলাখ দশ হাজার টাকা মুনাফা হবে। এরপর বৎসরের পর বৎসর ধরে এ আয় চলতে থাকবে। কেবল তাই নয়, এমন কি এ আয় বাড়বে, এরূপ আশা করা যেতে পারে। আমের এই উদাহরণটি মোটামুটি ভাবে লিচু, কাঁঠাল, লেবু, সফেদা, পেয়ারা ইত্যাদির বেলায়ও অনেকটা প্রযোজ্য।

সারণি- ২ আম উৎপাদনের প্রথম ১০ বৎসরের আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব (শতটাকা, হেক্টর)

আইটেম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
শ্রম	১৫০	৩০	৩০	৩০	৩০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০
গোবর/খল	১০	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২	১২
সার	২৫	৩৭	৫০	৬২	৭৫	৮৭	১০০	১১০	১১	১১৩৭
কলম	১২৫	২০	১০	-	-	-	-	-	-	-
সেচ	১৮	১৮	১৮	৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
খুটিবেড়া	১০০	৪০	৪০	৪০	২০	-	-	-	-	-
ঔষধ	৯	৯	৯	১২	১২	১৮	১৮	২৪	২৪	-
জমি	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০
সুদ	২৫	২৫	৩০	৪০	৫০	-	৪০	৫০	৪২	১০
মোট ব্যয়	৫৩৫	২১৩	২৩৩	২২৫	২২৫	২২৫	২৫৫	২৫৫৫		
ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যয়	৫৩৫	৭৬৬	১০০০	১২২০	১৫০১	১৭৩৫	২০০১	২২৯২	২২৯২	২৯৬৩
মোট আয়					২০০	৩০০	১১০০	২০০০	৩০০০	৪১০০
ক্রমবর্ধিষ্ণু ব্যয়					২০০	৫০০	১১০০	২০০০	৩০০০	৪১০০
লাভ									৩৮৫	১১৩৭

সারণি-৩ বৃক্ষজাতীয় ফল চাষের সাথে দ্রুত বর্ধনশীল ও অবৃক্ষজাতীয় ফল চাষের লাভজনক অবস্থা তুলনা

ফসলের নাম	রোপণ হতে ফলন্ত হতে সংসক্ষণ	হে:প্রতি ফলন মে:টন	নীট লাভ (অনুপাতিক)	ফসলের নাম	হে: প্রতি ফলন মে:টন	নীট আয় (আনুমানিক)	রোপণ হতে ফলন্ত হতে সংসক্ষণ
ফসলের নাম	১১-১৪ মাস	১৫.৮৪-৩০.৪	৬২২৩২.০০	আম	৫.০-১৪.০	৪৮৩৬৭.০	কলম ৪-৫ বছর বীজের চারা ৭-৮বছর
ফসলের নাম	৯-১০ মাস	৭-৩০	৫৪৪৮১.০	কাঁঠাল	১০-২৫	১৮৫৬০.০	কলম ৩-৪ বছর বীজ চারা ৫-৭বছর
ফসলের নাম	১২-১৬ মাস	১০-২০	৪৯০০০	লিচু	২.৫-৭.৬	১২০০০	কলম ৪-৫ বছর বীজ চারা ৭-১২বছর

উলেখিত সারণি হতে দেখা যায় যে, দ্রবত বর্ধনশীল অবৃক্ষ জাতীয় ফল কলা, পেঁপে, আনারস চাষ অধিকতর লাভজনক।

২০২২

বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষের কৌশল

বাংলাদেশের জলবায়ু, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে উৎপাদিত ফল জন্মানোর উপযোগী। বর্তমানে অধিকাংশ ফলই সমভূমি এলাকায় জন্মে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকায় সমতল ভূমি আছে। যেখানে বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষ করা অত্যন্ত সহজ। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও বৃহত্তর দিনাজপুর এলাকায় উঁচু টিলা ও পাহাড়ি জমিতেও বানিজ্যিক ভাবে বিভিন্ন প্রকার ফল চাষ করা যেতে পারে। এমনকি এ সমস্ত এলাকাতে আনারস, নারিকেল, পেয়ারা, আক্তার, কাঁঠাল, লিচু, কামরাংগা ইত্যাদি ফল চাষের জোন হিসেবে গড়ে তালো সম্ভব। বর্তমানে দেখা যায় যে, এ সমস্ত এলাকার পাহাড়ি ও টিলা ভূমিগুলো প্রায়ই অনাবাদি ও পতিত থাকে।

রাজশাহীর বিস্তীর্ণ পদ্মার চরাঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উন্নত জাতের কুল, স্ট্রবেরী ও আমের চাষ সম্প্রসারণ করা যায়। দক্ষিণ অঞ্চলের ভালো, পটুয়াখালী ও বরগুনার চরাঞ্চলে উন্নত জাতের তরমুজ ও কলার বাণিজ্যিকভাবে বাগান তৈরি করে ফল চাষ সম্প্রসারণ করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে মাথা পিছু জমির পরিমাণ দিন দিন যার ফলে সব ধরনের আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। তাই শুধু ফল চাষের জন্য মাঠ আকারে বড় বড় বাগান তৈরি করে জমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। তবে অন্য ভাবে ফলের আওতায় জমির পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে। যেমন-অফিস-আদালত, রাস্তার পাশে, রেল লাইনের পাশে, জমির আইলে, বাড়ির আনাচে কানাচে পরিকল্পিতভাবে উন্নত জাতের ফল গাছ লাগিয়ে ফলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

এদেশে কিছু কিছু ফল আছে যা স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প পরিসরে জন্মানো যায়। যেমন পেঁপে, তরমুজ, ফুটি বা বাংগি, কলা, আনারস ইত্যাদি। বীজ হতে চারা বা গাছ উৎপাদন করে ফল ধরার উপযোগী হতে অনেক সময় লাগে। তাই অনেক ফল আছে যেগুলো কলমের মাধ্যমে তৈরি করে স্বাভাবিক সময়ের চাইতে কম সময়ে ফল উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন- কুল, লেবু, পেয়ারা, লিচু, আম, জামরুল ইত্যাদি।

কোন কোন ফল রোপণের সময় হতে উৎপাদনে আসতে সময় বেশি লাগে। তবে এ সময়কালের মধ্যে জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়। যেমন- দীর্ঘমেয়াদি ফলের সাথে স্বল্পমেয়াদি ফল চাষ করা। এভাবে ফল চাষে মুলধন বেশি লাগে। কিনতু ফলের হেক্টর প্রতি ফলন ও বিক্রয় মূল্য বেশি পাওয়া যায়। ফল সহজে বাজার জাত করা যায় এবং সহজে খাওয়া যায় বলে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। আবার অনেক ফলের ভেষজ (ঔষধ) ব্যবহার আছে যেমন লেবু, আমলকি, হরিতকি, ডাব, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি।

এদেশে আগে লাকেজন সখের বসে যেমন ফল গাছের চারা রোপণ করেছেন তেমনি অনেকে গড়ে তুলেছেন বাণিজ্যিক ফল বাগান। এই সকল বাগানে দীর্ঘ মেয়াদি ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি পরিকল্পিতভাবে বাগানের মধ্যে স্বল্প মেয়াদি ফল, শাকসবজি ও মসলাজাতীয় ফসল চাষ করা হয়। এর মাধ্যমে অনেকেই ফল চাষকে বাণিজ্যিক উৎপাদন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় থেকে দিঘিনালা পর্যন্ত অসংখ্য এক একর বা দুই একর বাগান যেমন হয়েছে, তেমনি সেখানে ২৫ একরের বেশি জায়গা নিয়েও বাণিজ্যিকভাবে ফলের বাগান গড়ে উঠেছে। অসংখ্য ফল বাগান আছে যা বানিজ্যিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এসব বাগানে লাগানো হয়েছে আম্রপালি জাতের আম, লিচু, জলপাই ইত্যাদি। অনেকে এর সাথে লেবুও লাগিয়েছেন। বছরে এসব বাগান থেকে ১ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকার আম বিক্রি হচ্ছে আবার অনেকে বাগানের মধ্যে হলুদের চাষ করেছেন। এসবের ফলে উক্ত এলাকার প্রান্তিক জনগাষ্ঠির জীবন। যাত্রার মানও উন্নত হয়েছে।

২০২২

রাজশাহী বিভাগে প্রায় সবগুলো জেলায় ফলের বাগান গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ এলাকায় সাম্প্রসারিত হয়েছে কুলের বাগান। বাউ কুল, থাইকুল, আপেলকুল, তাইওয়ানসহ অসংখ্য ধরনের কুল চাষ হচ্ছে এ এলাকায়। উক্ত বিভাগে কেবল ২০০৮-২০০৯ সালেই ১২ থেকে ১৫ লাখ কুলের চারা লাগানো হয়েছে।

চাপাইনবাবগঞ্জে আম বাগানের মধ্যে কুল বাগান করা হয়েছে। যেহেতু আম বাগানের মধ্যে অনেক জায়গা খালি থাকে সেখানে কুল চাষ করা সম্ভব। আবার কুল বাগানের মাঝে নানা রকম শাক-সবজি ও মসলার চাষ করা হয়েছে। এতে যেখানে কেবল আম ছাড়া কিছু হতোনা, সে জমিতে এখন একই সাথে আম, কুল এবং শাক-সবজি ও মসলার চাষ হচ্ছে। জমির এই বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রগতিশীল কৃষকরা ও বাগান মালিকরা লাভবান হচ্ছে।

অন্যান্য শস্যের সাথে ফল চাষের লাভজনক অবস্থা

বাংলাদেশে কৃষি কার্যক্রম প্রধানত ধানভিত্তিক। ফল চাষের জন্য আমাদের জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। দানাজাতীয় ফসল যেমন- ধান, গম, সরিষা, ভুটা ইত্যাদির গড় ফলন হেক্টরে ৪ থেকে ৬ টন। অথচ অধিকাংশ ফল যেমন--কলা, পেঁপে, আনারস, তরমুজের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১৫ থেকে ৫০ বা ১০০ টন পর্যন্ত হতে পারে। ধান, গম, সরিষা, ভুট্টা অপেক্ষা ফলের মূল্য বেশি। বাজারের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকে বিধায় সব সময়ই ফলের দাম বেশি থাকে। তাই ফল চাষ করে কৃষকরা অন্যান্য ফসলের তুলনায় বেশি লাভবান হতে পারে। অনেক ফল আছে যেমন নারিকেল, সুপারি, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি বহুদিন ধরে আয় দিতে পারে। পরিকল্পিত ভাবে ফল চাষ করে ফলচাষী প্রতি মাসেই নগদ টাকা ঘরে আনতে পারেন এবং এ আয়ের পরিমাণ যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি তা কৃষকের দৈনন্দিন জীবন যাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বাড়ির আশে পাশে পতিত জায়গা বা প্রান্তিক জমিতে যেখানে মাঠ ফসল চাষ করা সম্ভব নয়; সেখানে পরিকল্পিতভাবে ফল চাষ করে অনেক টাকা আয় করা সম্ভব। রেল লাইন ও সড়কের ধারে, পুকুর, ডাবো ও খালের পাড়ে, ধর্মীয় উপাসনালয়ের আশে পাশে, অফিস আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশে পাশে, পাহাড়ের ঢালে, বিভিন্ন ধরনের বাধে, জমির আইলে অর্থাৎ বিভিন্ন পতিত স্থানে নারিকেল, সুপারি, খেজুর, তাল ইত্যাদি ফুল গাছ লাগিয়ে প্রচুর অর্থ আয় করা যায়। দানাজাতীয় ফসল যেমন- ধান, গম ইত্যাদি চাষ করে হেক্টর প্রতি ২৫০০/- থেকে ৩০,০০০/- আয় করা যায়। অন্যদিকে ফল চাষ করে হেক্টর প্রতি ২-২.৫ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করা যায়। এছাড়াও যফল বাগানের মধ্যে অন্যান্য ফসল যেমন আদা, হলুদ, মিষ্টি আলুর লতা ইত্যাদি চাষ করে আয়ের পরিমাণ আরো বাড়ানো সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শস্য জাতীয় ফসল আবাদের চেয়ে ফল চাষ বেশি লাভজনক। যেমন- এক হেক্টর জমিতে কলা চাষ করে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব। উন্নত জাতের কুলের একটি মাত্র গাছ হতে (৬ মিটার ঢ ৬ মিটার জমিতে বছরে ১০০০ টাকা পর্যন্ত কুল বিক্রি করা যায়। এক হেক্টর জমিতে পেঁপে চাষ করে বছরে ৭০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা উপার্জন করা সম্ভব। অনুরূপভাবে তরমুজ, পেয়ারা ইত্যাদি ফল চাষ করে অধিক আয় করা যেতে পারে। অথচ দানাজাতীয় শস্য চাষ করে এত বেশি লাভ করা সম্ভব নয়। (সারণি-৩)

বাংলাদেশের মত ঘন বসতিপূর্ণ দেশে গড় খামারের আকার অত্যন্ত ছোট। তাই একমাত্র ফুল চাষের মাধ্যমে অল্প জমি হতে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। দানা শস্য বা অন্যান্য অনেক ফসল অপেক্ষা ফলের হেক্টর প্রতি ফলন বেশি এবং বাজার মূল্যও অনেক বেশি। সারণি: ৪ হতে দেখা যাচ্ছে যে, হেক্টর প্রতি দানা শস্য অপেক্ষা ফলের উৎপাদন অনেক বেশি।

ফলের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল ফল হলো কলা, পেঁপে, তরমুজ ও ফুটি। এদের ফলন তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ফল অপেক্ষা আরো অনেক বেশি। দ্রুতবর্ধনশীল ফলের মধ্যে ৭০ ভাগই হচ্ছে কলা। ২০০৬-০৭ সালে মোট আবাদি জমি ১৯২৬৬ হে: এর

২০২২

মধ্যে প্রধান প্রধান ফল চাষের জমির পরিমাণ হচ্ছে ১৪৪২৬ হেক্টর এবং দানা শস্যের জমির পরিমাণ হচ্ছে ১১৪০৩.৫০ হেক্টর (সারণি-৫) এই তথ্য গুলো থেকে অনুমান করা যায় যে বাংলাদেশে ফল চাষের জমির পরিমাণ কম অথচ দানা শস্যের চাইতে হেক্টর প্রতি ফলন অনেক বেশি ।

তথ্য সারণি- ১ হতে দেখা যায় যে, মোট জমির মাত্র ০.৭৫ ভাগ জমিতে ফল চাষ হচ্ছে । এ থেকে আমরা দৈনিক মাথা পিছু ফল পাই মাত্র গড়ে ৩০-৬০ গ্রাম । যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম । কেননা খাদ্য বিজ্ঞানীদের মতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক গড়ে অন্তত ১১৫ থেকে ১২০ গ্রাম ফল খাওয়া উচিত । যদিও উন্নত বিশ্বের লাকেজন গড়ে ২০০ গ্রামের ও বেশি ফল খায় । ফলের আওতায় জমি বৃদ্ধি এবং উন্নত জাতের আবাদ করে ইউনিট প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করে ফলের চাহিদার এ ঘাটতি পূরণ করা যায় ।

সারণি- ৪ বাংলাদেশে বিভিন্ন ফলের তুলনামূলক ফলন

ফল	ফলন (টন/হে:)	দানা ফসল	ফলন (টন/হে)
কলা	১৫.৮৪	ধান	৩.৫-৬.০
কাঁঠাল	১০.৪	ভুট্টা	৩.৫-৬.০
তরমুজ	১৫	গম	৩.৫-৩.৫
পেঁপে	৭.০	মাসকলাই	১.৪-৬.০
আনারস	১০-১২	খেসারি	০.৮১-২.০
ফল	৫.০	মসুর	১.৫-১.৮
আম	৪.০-৫.০	ছালো	১.৩-২.০
লিচু	২.৫-২.৭	আখ	৮০.০-১০০.০
বাতাবী লেবু	২.৫-৩.০	সরিষা	০.৮১-২.৫
কুল	৩.৫	পাট	১.২-১.৫০

উৎস: বিএআর আই - কৃষি প্রযুক্তি হাত বই/২০০৪

সারণি-৫ আবাদি জমি, দানা জাতীয় ও ফল জাতীয় জমির পরিমাণ ও উৎপাদন । (জমি ০০০ হে: ফলন ০০০ মে: টনে)

উৎপাদন	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		০৫-০৬		০৮-০৭	
	জমির পরিমাণ	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	উৎপাদন	জমির পরিমাণ	উৎপাদন
১ । মোট অবদি জমি	১৩৭০৬৮৮		১৩৪৮৭৮৫		১৩৫২৭৫৩		১৯২৮৯		১৯২৬৬	
২ । র্সবমোট দানা জাতীয় ফল	১০৯২১.৮৬	১৯৫৯০	১০৬৯.৯৭	১৯২৪৫	১০৬৮০.৬২	১৮১৪৮	১১৪৩৪.৫	২৮৫৬৬.৪	১১৪০.৩৪	২৯৭১৪
৩ । র্সবমোট জাতীয় ফল	১৭১.২৫	১৪৪৮	১৭৩.৬৮	১৪৬০	১৭৬.৫১	১৪৬৭	১৩৯.০৭	৩৭৬.১৯	১৪৪.২৬	৪৩১.১৩

বিবিএস- ১৯৯৫/২০০৭

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটিতে বর্তমানে কত ধরনের ফল উৎপাদন হয় ?

২। বাংলাদেশের জিডিপিতে ফল ও ফলজাত দ্রব্যের অবদান কত ?

৩। দ্রুত বর্ধনশীল ফলের মধ্যে কলার অবদান কত ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কোন কোন ফল চাষে কৃষক সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

২। বাণিজ্যিক ভাবে ফল চাষের কৌশল বলতে কী বোঝায় ?

৩। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ফলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কেমন বর্ণনা কর।

৪। অর্থনৈতিক বিবেচনায় কোন কোন ফল বাংলাদেশে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষিতে কোন কোন ফল চাষ সবচেয়ে লাভজনক তার বিবরণ দাও।

২। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষ বৃদ্ধির কৌশল ব্যাখ্যা কর।

৩। বাংলাদেশে উৎপাদিত অন্যান্য ফসলের সাথে ফল চাষের লাভজনক অবস্থা ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

২০২২

তৃতীয় অধ্যায়
পুষ্টির চাহিদা পূরণে ফলের অবদান

আমরা জীবনধারণের জন্য যা খাই তাই খাদ্য । যে সব দ্রব্য ভক্ষণ করলে শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, তাপ উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাকেই খাদ্য বলে । খাদ্য গ্রহনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখা । শরীরের সুস্থতা নির্ভর করে দেহের পুষ্টি সাধন প্রক্রিয়ার উপর । মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি উল্লেখ যোগ্য স্থান দখল করে আছে । ফলে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল পুষ্টি উপাদানই পাওয়া যায় । বিশেষত বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সহজ ও সস্তা উৎস হলো ফল । ফল রান্না ছাড়া পাকা বা কাঁচা অবস্থায় সরাসরি খাওয়া যায় । ফলের পুষ্টি উপাদান সহজে শরীর গ্রহণ করতে পারে ।

ফলের বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার খনিজ উপাদান যেমন-ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি শরীরে বিপাকে সহায়তা করে । এছাড়াও ফল শরীরের অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান যেমন- আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, পানি ইত্যাদি সরবরাহ করে শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে । ফল খাদ্য হিসাবে পুষ্টির অন্যতম বাহক ।

বিভিন্ন ফলের পুষ্টিমান

নিচের সারণিতে আমাদের দেশে প্রচলিত ও অপ্রচলিত বিভিন্ন ফলে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো ।

সারণি: বিভিন্ন ফলের ভিটামিন ও খনিজ মানের পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রাম)

ফলের নাম	ক্যালসিয়াম মি.গ্রাম	ফসফরাস মি.গ্রাম	লৌহ মি.গ্রাম	ক্যারেটিন মি.গ্রাম	থায়মিন মি.গ্রাম	রিবেফ্লাবিন মি.গ্রাম	নয়সিন মি.গ্রাম	ভিটামিন সি মি.গ্রাম
আঙ্গুর	২০	২৩	০.৫	৩	০.০৪	০.০৩	০.২	১
আতা	১০	১০	০.৬	৬৭	-	০.০৭	০.৬	৫
আনারস	২০	৯	১.২	১৮	০.২০	০.১২	০.১	৯
আম(পাকা)	১৪	১৬	১.৩	২৭৪৩	০.০৮	০.০৯	০.০৯	১৬
আমড়া	৩৬	১১	৩.৯	২৭০	০.০২	০.০২	০.৩	১১
আপেল	১০	১৪	১.০	০	-	-	০	১
আমলকী	৫০	২০	১.২	৯	০.০৩	০.০৩	০.২	৬০০
কমলালেব	২৬	২০	০.৩	১১০৪	-	-	-	৩০
কলা	১৭	৩৬	০.৯	৭৮	০.০৫	০.০৮	০.৫	৭
কাগজিলেবু	৯০	২০	০.৩	১৫	০.০২	০.০৩	০.১	৬৩
কাঁঠাল	২০	৪১	০.৫	১১৭৫	০.৩	০.১৩	০.৪	৭
কুল	৪	৯	১.৮	২১	০.০২	০.০৫	০.৭	৭৬
খেজুর (শুক)	১২০	৫০	৭.৩	২৬	০.০১	০.০২	০.৯	-
গোলাপজাম	১০	৩০	০.৫	১৪৯	০.০১	০.০৫	০.৪	৩

তরমুজ	১১	১২	৭.৯	০	০.০২	০.০৪	০.১	১
নাশপাতি	৮	১৫	০.৫	২৮	০.০৬	০.০৩	০.২	০
লিচু	১৫	৪১	২.৪	০	০.০২	০.০৩	০.৫	৬
পেয়ারা	১০	২৮	১.৪	০	০.০৩	০.০৩	০.৪	২১২
পেঁপে (পাকা)	১৭	১৩	০.৫	.৬৬৬	০.০৪	০.২৫	০.২	৫৭
ফুটি	৩২	১৪	১.৪	১৬৯	০.১১	০.০৮	০.৩	২৬
বাতাবিলেবু	৩০	৩০	০.৩	১২০	০.০৩	০.০৩	০.২	২০
বেদানা	১০	৫০	০.৩	০	০.০৬	০.১০	০.৩	১৬
বেল	৮৫	৭০	০.৬	৪৫	.০১৩	১.১৯	০.১	৮
লিচ	১০	৩৫	০.৭	০	০.০২	০.০৬	০.৪	৩১
লেবু	৭০	১০	২.৩	০	০.০২	০.০১	০.১	৩৯
সফেদা	২৮	২৭	২.০	৯৭	০.০২	০.০৩	০.২	৬
শরীফা	১৭	৪৭	১.৫	০	০.০৭	০.১৭	০.৩	৩৭

উৎস: গোপালন, শাস্ত্রী ও বালসুব্রামানিয়াম

পুষ্টির চাহিদা পূরণে প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফলের অবদান

মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। ফল দেখতে আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু এবং পুষ্টি মূল্যের জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকলেও ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সহজ, সস্তা, সমৃদ্ধ এবং সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হল ফল। ফল রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় বলে পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ কর্তৃক গৃহীত হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক ১১৫ গ্রাম ফল খাওয়া উচিত অথচ আমরা দৈনিক মাত্র ৩৫ গ্রাম ফল খেয়ে থাকি। মানব দেহে পুষ্টি সাধনে ফল কিভাবে অবদান রাখতে পারে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

আমিষ/প্রোটিন সরবরাহে ফলের অবদান

দেহের নতুন মাংসপেশি গঠন, বর্ধন এবং সংরক্ষণ আমিষের কাজ। ফল আমিষের প্রধান উৎস না হলেও বিভিন্ন ফলে কিছু না কিছু আমিষ থাকে। ফলে বিদ্যমান আমিষ অন্যান্য উদ্ভিদ উৎস হতে পাওয়া আমিষের আত্তীকরন। বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য উৎস হতে যে আমিষ পাওয়া যায় তাতে সব ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড নেই বিধায়, ফল ভক্ষণ করলে ঘাটতি এমাইনো এসিডের অভাব দূর হয় এবং শরীরে চাহিদা মোতাবেক সুষম আমিষ প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। কাঁঠাল, কলা, কিসমিস, খেজুর, ডুমুর, কাজু বাদাম, বেল ইত্যাদি আমিষের উৎস হিসেবে বেশ সমৃদ্ধ।

শর্করা: দেহের শক্তির প্রধান উৎস হলো শর্করা। পুষ্টি বিধানে জরুরি উপাদান শর্করা সরবরাহে ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ফল দানাজাতীয় শর্করার পরিপূরক উৎস হিসেবে গণ্য হতে পারে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এর মতে শরীরের চাহিদার শতকরা পাঁচভাগ ক্যালরি সবজি ও ফল থেকে আসা উচিত। কিসমিস, খেজুর, করমচা, কলা, বেল ইত্যাদি শর্করা প্রধান ফল।

চর্বি: চর্বি জাতীয় খাদ্য দেহে সঞ্চিত শক্তি হিসেবে কাজ করে। মোট চাহিদার অন্তত দশভাগ খাদ্য শক্তি স্নেহজাতীয় খাদ্য হতে আসা উচিত। অন্যথায় স্নেহ দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ যেমন-ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে এর শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কাজুবাদাম, এভাকেডো, করমচা, বাদাম, নারিকেল, কাঁঠাল বীজ, কদবেল ইত্যাদি ফল চর্বি সমৃদ্ধ।

ভিটামিন: শারিরিক পুষ্টির জন্য ভিটামিনের অবদান অনস্বীকার্য। আর এ ভিটামিনের প্রধান উৎসই হলো শাকসবজি ও ফলমূল। মানবদেহের চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০-৯৫ ভাগ ভিটামিন 'সি', ৬০-৮০ ভাগ ভিটামিন 'এ' এবং ২০-৩০ ভাগ ভিটামিন 'বি' সবজি ও ফল হতে আসে। বিভিন্ন ভিটামিন সরবরাহে ফলের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো

ভিটামিন 'এ': শরীরের পুষ্টি সাধনে এবং দৃষ্টিশক্তি অক্ষুন্ন রাখতে ভিটামিন এর প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এর অভাবে রাতকানা রোগ হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। হলুদ শাঁসবিশিষ্ট ফল যেমনঃ আম, পেঁপে, আমড়া, কাঁঠাল, ফুটি, বিলিম্বি, আলুচা, কমলা, বাতাবিলেবু, বেল, কাজুবাদাম, ডুমুর প্রভৃতি ফলে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ‘এ’ বিদ্যমান রয়েছে।

ভিটামিন বি ১ (Thiamine): শ্বেতসার বিপাক প্রক্রিয়া এবং স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণে ভিটামিন বি ১ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এর অভাবে ক্ষুধা কমে যায়, বেরিবেরি রোগ দেখা দেয়, চর্মের অনুভব ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে। কাজুবাদাম, আখরোট, বাদাম, খোবানী, কলা, লিচু, কমলা, আঙ্গুর, কিসমিস ইত্যাদি ফলে অধিক পরিমাণে ভিটামিন বি ১ রয়েছে।

ভিটামিন বি ২ (Riboflavin): ভিটামিন বি ২ চর্মের মসৃণতা ও ক্ষুধা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এর অভাবে ক্ষুধা হ্রাস, গলায় ঘা, দেহের ওজন হ্রাস, নাক ফুলা ইত্যাদি শারিরীক জটিলতা দেখা দিতে পারে। বেল, কাজুবাদাম, পেঁপে, লিচু, আনারস, বেদানা, কদবেল প্রভৃতি ভিটামিন বি ২ এর ভাল উৎস।

ভিটামিন বি ৩ বা নায়াসিন (Niacine): এ ভিটামিন হজম শক্তি এবং চামড়ার মসৃণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ভিটাবিন সি: ভিটামিন 'সি' শরীরের বৃদ্ধি সাধন, রোগ প্রতিরোদ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং লৌহ ও ক্যালসিয়াম বিপাকে সাহায্য করে। এর অভাবে স্কার্ভি রোগ, দাঁতের মাড়ি ফুল ও দাঁত ক্ষয়, শরীরের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা, হাত পা ফুলা, বাতব্যাধির লক্ষণ ইত্যাদি দেখা যায়। আমলকি, পেয়ারা, কমলা, লিচু, আনারস, স্ট্রবেরী, পেঁপে, সুপারি ইত্যাদি ফলে প্রচুর ভিটামিন সি বিদ্যমান।

খনিজ পদার্থ ও শরীরের সুষ্ঠু গড়নের জন্য খনিজ পদার্থ অপরিহার্য । বিভিন্ন ধরনের প্রধান খনিজ পদার্থগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম, লৌহ, পটাসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সোডিয়াম, ফসরাস, সালফার, আয়োডিন ইত্যাদি । এদের মধ্যে কোন কোন গুলো শরীরে হাড়, রক্ত বা হরমোন তৈরির কাজে, খনিজ পদার্থ দেহের অম্ল- ক্ষারত্ব এবং বিভিন্ন অঙ্গে জলীয় অংশের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে । বিভিন্ন এনজাইমের সুষ্ঠ কার্যাবলি সম্পাদনেও খনিজ পদার্থ সাহায্য করে । ক্যালসিয়ামের দিক হতে বাদাম, লিচু, করমচা, কদবেল, আখরোট, কিসমিস, আমলকি, বেল, কাজুবাদাম, খেজুর, ডুমুর, লেবু, কাগজীলেবু, কমলা প্রভৃতি ফসফরাসের দিক হতে বাদাম, কাজুবাদাম, কদবেল, এভোকেডো, কলা, বেল, সুপারি, খেজুর, ডুরিয়ান, করমচা, বেদানা, কিসমিস ইত্যাদি এবং লৌহের দিক হতে করমচা, খেজুর, কাজুবাদাম, আখরোট, কিসমিস, কাঁচা আম, বাদাম, স্ট্রবেরী, সুপারি, আপেল, আমলকি, ডুমুর, লিচু, পেয়ারা, শরীফা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

পানি সরবরাহে ফলের অবদান

শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পানি । পানি রক্তকে তরল রাখে, ভুক্ত খাদ্য দ্রব্য পরিপাকে সাহায্য করে এবং শরীরের দুষিত পদার্থ বের করে দিতে সহায়তা করে । বিভিন্ন ফল শরীরে পানির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে । কচি নারিকেল (ডাব), আম, আনারস, পেঁপে, কমলা, কাঁঠাল, লিচু, লেবুজাতীয় ফল, পেয়ারা, তরমুজ, জামরুল ইত্যাদি ফলে প্রচুর পরিমানে পানি থাকে ।

অন্যান্য উপাদান

উপরোক্ত উপাদানসমূহ ছাড়াও এমন কিছু জৈব এসিড ও এনজাইম আছে যা আমাদের হজমে সহায়তা করে । যেমনঃ লেবু জাতীয় ফলে সাইট্রিক অ্যাসিড, আঙ্গুর ও তেতঁলে টারটারিক এসিড রয়েছে । এই সব জৈব অ্যাসিড ক্ষুধার উদ্দীপক ও হজমে সহায়তা করে । পেঁপে তে পেপাইন নামক হজমকারী এনজাইম রয়েছে । ফলে প্রচুর আঁশ থাকে যা পাকস্থলী ও অন্ত্রকে সর্বদা উত্তেজিত ও কর্মক্ষম রাখে এবং পাচনতনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে । ফলের আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে ।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। খাদ্য গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য কী ?

২। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক কত গ্রাম ফল খাওয়া উচিত ?

৩। ফল খাদ্য হিসাবে পুষ্টির অন্যতম বাহক এ কথার অর্থ কী ?

৪। ফলের পুষ্টিগত গুরুত্ব বলতে কি বোঝায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফলের পুষ্টিগত গুরুত্ব বলতে কী বোঝায় ?

২। ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ পাঁচটি ফলের বাংল ইংরেজি ও উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নাম লেখ।

৩। আয়রন সমৃদ্ধ পাঁচটি ফলের বাংলা ইংরেজি ও উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নাম লেখ।

৪। ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ পাঁচটি ফলের বাংলা, ইংরেজী ও উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নাম লেখ।

৫। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পাঁচটি ফলের বাংলা ইংরেজি ও উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মানব দেহে পুষ্টি সরবরাহে ফল কীভাবে অবদান রাখে লেখ।

২। বাংলাদেশে পুষ্টি চাহিদা পূরণে প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফল গুলোর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩। বিভিন্ন ফলে বিদ্যমান ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ উল্লেখ করে তালিকা তৈরি কর।

২০২২

চতুর্থ অধ্যায়

ফল উৎপাদন সমস্যাসমূহ ও সম্ভাব্য সমাধান

বাংলাদেশে ফল উৎপাদনের চলমান সমস্যা বহুবিধ। অন্যান্য ফসল উৎপাদনের সমস্যার চেয়ে বাংলাদেশে ফল উৎপাদনের সমস্যা জটিল ও বহুবিধ। তবে অধিকাংশ সমস্যাই কৃষি বিষয়ক অন্যান্য সমস্যার সাথে ওতপ্রোতেভাবে জড়িত। আদিকাল হতে এ সমস্যা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ঘটলেও বাংলাদেশে এসব সমস্যা সমাধানের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এসব কারনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফলের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ যে হারে বাড়ানো উচিত ছিল আজ পর্যন্ত সে হারে বাড়েনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অব্যাহত চাপের মুখে তাই বাড়তি জনগণের চাহিদা পূরণ ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূরীকরণে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাষের কৌশল বের করা জরুরি হয়ে পড়েছে। চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সাথে যুক্ত হচ্ছে আরো নতুন নতুন সমস্যা। তবে সমস্যাগুলোকে সম্মিলিত ভাবে সমাধান করে এদেশের ফলের উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

ফল চাষের সমসাসমূহ

ফল চাষের সমস্যাগুলোকে সম্মিলিত ভাবে বিবেচনায় রেখে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। আর্থ সামাজিক সমস্যা

২। আর্থিক ও কারিগরি সমস্যা

৩। আইনগত সমস্যা

উপরোক্ত সমস্যাগুলোকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১। আর্থ-সামাজিক সমস্যাঃ দেশের প্রচলিত চাষাবাদ ব্যবস্থা বিবেচনায় আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে নিয়ে বর্ণিত শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন-

ক) জমির স্বল্পতা

খ) কৃষকের দারিদ্রতা বা অর্থের অভাব

গ) আর্থিক ঝুঁকির আশঙ্কা

ঘ) পরিবহন সমস্যা

ঙ) বিপণন বা বাজারজাতকরণ সমস্যা

চ) উৎপাদন উপকরণের ও যন্ত্রপাতির মূল্য বেশি

ছ) গতানুগতিক প্রথায় চাষাবাদ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা

২। আর্থিক ও কারিগরি সমস্যাঃ এলাকা ভেদে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক অবস্থা, জমির প্রকৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। বিষয় বিবেচনা করে এ সমস্যা টিকে নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন- ক) নিম্ন উৎপাদনশীলতা

খ) জমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা কম

গ) জমির উপযুক্ততা কম(স্থান, পরিবেশ)

ঘ) উৎপাদনের উপকরণের অভাব (ফল বাগানের জন্য যন্ত্রপাতি, চারা কলম উৎপাদনের দ্রব্যাদি, প্রয়োজনীয় জৈব ও রাসায়নিক সার এর দুষপ্রপ্যতা ইত্যাদি)

ঙ) ফল সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব

ছ) প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অভাব

জ) ফলের গুণাগুণ বিচার করা হয় না

ঝ) প্রাকৃতিক দুযোর্গ (বন্যা, অতিবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, কুয়াশা ইত্যাদি)

ঞ) জলাবদ্ধতা ও জমিতে লবণাক্ততা

ট) ব্যাংক ঋণের অভাব/মূলধনের অভাব

৩। **আইনগত:** উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আইনগত দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইনগত দিক প্রণয়ন ও গ্রহনে নিম্ন বর্নিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যথা-

ক) কৃষি অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ওপর ভিত্তি করে ফল চাষে বাধ্যকরণ

খ) ফল উৎপাদনে ও ফল পাকানোর কাজে নিষিদ্ধ ঔষধ ব্যবহার ও ঔষধের অপপ্রয়োগ রোধ করা

গ) রফতানি নীতি প্রনয়ন

ঘ) রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মঘট পরিহার

ঙ) ফল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মধ্যবর্তী কালে ফড়িয়া-দালালদের দৌরাত্ম্য রোধ

ফল চাষের প্রধান প্রধান সমস্যা

বাংলাদেশের ফল চাষের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ফল চাষ করতে গিয়ে অনেক ধরনের বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যাগুলোর কিছু কিছু উতরানো সম্ভব হলেও এমন কিছু সমস্যা আছে যা খুবই জটিল এবং সমাধান সময় সাপেক্ষ। ফল চাষের প্রধান প্রধান সমস্যা নিম্নলিখিত ভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন-

১। জমির স্বল্পতা ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা

২। ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্পের অভাব

৩। উৎপাদন উপকরণের দুষপ্রাপ্যতা ও দুমূল্য এবং কৃষকের দারিদ্রতা

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আর্থিক ঝুঁকির সম্ভাবনা

৫। ফল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অভাব

৬। ফল পরিবহন ও বিপণন সমস্যা

৭। বাজার ব্যবস্থার অপ্রতুলতা

১। জমির স্বল্পতা ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা।

ফল চাষের জন্য তুলনামূলক ভাবে উঁচু জমি দরকার। চাষাবাদ যোগ্য সব জমিতেই ফল চাষ করা যায় না। ফল চাষের জন্য এটি একটি মারাত্মক সমস্যা। কলা, পেঁপে, আনারস, কাঁঠাল, লেবু, লিচু, আঙ্গুর, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি ফল চাষের জন্য বেশ উর্দ্ধ জমির দরকার। বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এরুপ উচু জমির পরিমাণ এমনিতেই কম। যার কারনে ইচ্ছা থাকলেও নিচু এলকায় সার্থক ভাবে ফল চাষ করা যায় না। জনসংখ্যার ক্রমাগত চাপে জমি বিভক্ত হয়ে জমির আকার ছোট হয়ে আসছে ফলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণও কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চাষাবাদযোগ্য মোট জমির শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে ফল চাষ করা হয়। এর প্রধান কারন

হলো বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ঘাটতি মিটানো ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য দানা জাতীয় খাদ্যশস্য বেশি করে চাষ করা। এ ছাড়াও বর্তমানে জমিতে বেশ কিছু খাদ্য উপাদান বিশেষত গৌণ খাদ্য উপাদানের যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ও প্রয়োজনের তুলনায় কম। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা কমে ফল উৎপাদনের হার কমে গেছে।

আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফল চাষ হয় না বিধায়, উৎপাদন খুব কম। বাংলাদেশে ফলের গড় ফলন ৭.৮ টন/হেঃ। যেখানে বিশ্ব উৎপাদন ৩০ টন মাত্রায় টন/হেঃ। ফল বাগানে সঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ সার ব্যবহার না করা, উপযুক্ত সময় ও মাত্রায় কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়োগ না করা, বাগানে ঘঁটাইসহ সঠিক আন্তঃ পরিচর্যা না করার কারণে ফলের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়।

(২) ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষার অভাব

আমাদের দেশে যারা ফল চাষের সাথে জড়িত তারা প্রায় নিরক্ষর ও কৃষি শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ। ফল চাষের ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে তারা একেবারেই অজ্ঞ। পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ খাইয়ে নতুন প্রযুক্তি উ দ্ভাবন যেমন তাদের পক্ষে সম্বব হয় না ঠিক তেমনি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের আবিস্কৃত ব্যবহারিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহনে তাদের অনীহা দেখা যায় অথবা তারা এ ব্যাপারে তেমন সাড়া প্রদান করেন না। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন বারমাসী আমের নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাপান, থাইল্যান্ড ও পাকিস্তান উন্নত ও মিষ্টি জাতের আঙ্গুর উদ্ভাবন করেছে। থাইল্যান্ড ভাইরাস প্রতিরোধক এবং ১০০ ভাগ স্ত্রী গাছ উৎপাদক পেঁপে বীজ শনাক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এই ব্যাপারে এখনও পিছিয়ে। গবেষণার মাধ্যমে জাত উদ্ভাবনে তেমন কোন অগ্রগতির হয়নি। বিজ্ঞান ভিত্তিক ও বাস্তবমুখী ব্যবহারিক জ্ঞান এবং কলাকৌশলের অভাব, গতানুগতিক ভাবে চাষের পরিবর্তে নতুন জাত ও চাষ কৌশল তেমন উদ্ভাবন করা হয় নাই। ফল চাষে কোন সময় বাগানের কি পরিচর্যা দরকার জ্ঞানের অভাবে ভাল উৎপাদন হয় না। কৃষকরা গতানুগতিক পন্থায় ফল চাষ করার ফলে উৎপাদান অনেক কম হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য ব্যবহারিক জ্ঞান, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক শিক্ষার বিস্তার দরকার।

(৩) উৎপাদন উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য এবং কৃষকের দারিদ্রতা

আমাদের দেশে ফল উৎপাদনের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্য এবং কৃষকের দারিদ্রতা। উৎপাদন উপকরন বলতে বীজ, সার, সেচ যন্ত্রপাতি, কীটনাশক, চারা/কলম ও পরিচর্যারজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বুঝায়। বাংলাদেশে ফল চাষের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে অধিকাংশ মান সম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বীজ বা চারা কলম পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। ফল চাষে প্রাথমিক ভাবে অনেক মূলধন লাগে যা অধিকাংশ কৃষকের নেই। ফল চাষীরা প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক ফলের বীজ, চারা ও কলম পায় না অথবা পেলেও উন্নত মানের হয়না অথবা এদের দাম ও এত বেশি যে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে এগুলো নগদ মুল্যে কেনা সম্ভব হয় না। ফল চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, সার ঔষধ ইত্যাদির মুল্যের উর্ধগতি কৃষককে ফল চাষে নিরুৎসাহিত করে।

(৪) উচ্চফলনশীল জাতের অপ্রতুলতা এবং উন্নতগুণ সম্পন্ন চারা কলমের অভাব

বাংলাদেশে ফলোৎপাদনের অন্যতম সমস্যা হচ্ছে উন্নত জাতের অপ্রতুলতা। প্রধান ফলের স্বল্প সংখ্যক উন্নত জাত উদ্ভাবিত হলেও অধিকাংশ অপ্রধান ফলের কোন উন্নত জাত নেই। এতে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গুনগত মান সম্পন্ন ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। উন্নত গুনাগুন সম্পন্ন চারা/কলম বলতে অধিক উৎপাদনশীল উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত সুস্থ, সবল ও সঠিক বয়সের চারা বুঝায়। চারা/কলম উৎপাদনের সাথে সংশিষ্ট লোকজনের প্রযুক্তি গত জ্ঞানের অভাব ও উদাসিনতার কারণে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন চারা/কলম উৎপাদন করা যাচ্ছে না।

সে জন্য কৃষকরা সুস্থ সবল চারা/কলম প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে উন্নতমানের ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে।

(৫) অপরিকল্পিত ফল বাগান সৃজন ও ফল গাছের সঠিক পরিচর্যার অভাব

কৃষকরা বসতবাড়ির আঙিনা অন্যান্য বনজ বৃক্ষের ছায়ায় ঘন করে ফল গাছ লাগিয়ে থাকে। ফল গাছ আলোর অভাবে লিকলিকে হয়ে বাড়তে থাকে এবং ফলন কম দিয়ে থাকে। কখনও কখনও কৃষকরা বাগানেও ঘন করে ফল গাছ রোপন করে। নির্দিষ্ট দূরত্বে না লাগানোর ফলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি কমে যায়। নানাবিধ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়ে এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়। এছাড়াও অঞ্চলভিত্তিক সঠিক প্রজাতি ও জাত নির্বাচন না করায় আশানুরূপ ফলন হচ্ছে না।

কৃষকেরা সাধারণত ফল গাছের পরিচর্যা করে না। ফল গাছের পরিচর্যা করলে এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়েও তারা বুঝতে চায় না। এর ফলে গাছে পুষ্টি উপাদানের অভাব দেখা যায় এবং রাগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণে বেড়ে যায়। গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গাছের আয়ু কমে যায়। কখনও কখনও বিধিসম্মতভাবে পরিচর্যা না করার দরুন গাছের ক্ষতি হয় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আর্থিক ঝুঁকির আশংকা

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দেশ। প্রতি বছরই বন্যা, ঝড়, জলাচ্ছ্বাস, সাইক্লোন , অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ, পোকামাকড় অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আবির্ভাব হয়। এতে ফলের ব্যাপক ধ্বংস লীলা সাধিত হয়। যেমন- অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা বন্যায় পেঁপে, কলা, পেয়ারা, লেবু জাতীয় ফল, জামরুল ইত্যাদি ফল সাংঘাতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। শিলাবৃষ্টি ও সাইক্লোন বা প্রবল ঝড়ে আম, কলা, পেঁপে, কুল, লিচু ইত্যাদি ফলের গাছ ভেঙে যায় এবং ফল ছিড়ে পড়ে প্রচুর ক্ষতি হয়। এছাড়া রোগ ও পোকামাকড় এবং তাপমাত্রার তারতম্যের কারনে ফলের প্রচুর ক্ষতি হয়। তা ছাড়া এদেশের দরিদ্র কৃষকের পক্ষে ফল চাষের জন্য কয়েক বছর মুলধন বিনিয়াগে করে লাভের আশায় অপেক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই কৃষক ঝুঁকি নিয়ে নিবিড় মূলধনভিত্তিক ফল চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

(৭) ফল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অভাব

ফল খুবই দ্রুত পচনশীল বলে একে সাধারণভাবে খুব বেশি সময় সংরক্ষন করা যায় না। এ পচনশীল ফলকে পচনের হাত হতে রক্ষা করার কোন উন্নত কলা কৌশল বা হিমাগারে ফল সংরণের কোন ব্যবস্থা এবং কোন। প্রক্রিয়াজাতকরন শিল্প আজ পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। অধিকাংশ ফল প্রায় একই সময়ে পাকার কারণে ফলের দাম খুব। কম হয় এবং উৎপাদিত ফলের অধিকাংশ পচে নষ্ট হয়। ফলে কৃষকরা নাম মাত্র মূল্যে ফড়িয়াদের কাছে ফল বিক্রি। করতে বাধ্য হয়। ফলে আর্থিকভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আনারস, আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, তরমুজ ইত্যাদি ফলের প্রক্রিয়াজাতকরন ব্যবস্থা থাকলে অমৌসুমে বাজারজাত করা যেতাে। এছাড়া বিদেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদিশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হতো। এতে চাষীদের মধ্যে ফল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হতো।

(৮) পরিবহন ও বিপণন সমস্যা

আমাদের দেশের অধিকাংশ ফল গ্রামের দুর্গম এলাকায় উৎপাদিত হয়। এ সব উৎপাদন এলাকার সাথে বিপণন এলাকা তথা শহরের ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা পড়ে উঠেনি। এ কারনে উৎপাদন এলাকা হতে শহরাঞ্চলে ফল পৌঁছতে অনেক সময় লাগে। খরচও বেশি পড়ে যায়। তাছাড়া ফলের গুনগত মান কমে যায় এবং অনেক সময় ফল পঁচে যায়। অনেক সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হরতাল ও পরিবহন ধর্মঘটের ফলে ফল উৎপাদনকারীগন যথাসময় উৎপাদিত ফল বাজারজাত করতে পারে না। রফতানিকৃত দ্রব্য রেলস্টশনে,

সমুদ্র বন্দরে, ট্রাক স্ট্যান্ডে, লঞ্চ বা নৌকা ঘাটে, বিমান বন্দরে দীর্ঘ সময় আটকা পড়ে থেকে নষ্ট হয় যায়। এতে অনেক সময় রাস্তা ঘাটের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ফল বিক্রয় করতে হয় বলে ফলের পচন ত্বরান্বিত হয়, ফলের অপচয় হয় এবং কৃষকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফল বিপণনের সাথে জড়িত রয়েছে সম্পূর্ণ ফড়িয়া ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগি সুবিধাবাদি গোষ্ঠি। ফল চাষের লভ্যাংশ এই সব ফড়িয়াদের হাতে চলে যায়। কৃষকের নাম মাত্র মুল্যে ফল বিক্রির করতে হয় বলে মূলধন অনেক সময় উঠেনা। তাই কৃষকও ফল চাষে তেমন গুরুত্ব দেয় না।

উপরোক্ত সমস্যাবলী ছাড়াও ভালো জাতের অভাব, ঋন সংক্রান্ত সমস্যা সেচ সুবিধার অভাব, কৃষি সমবায়ের অনুপস্থিতি, কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ কৃষি বাজার ব্যবস্থা, ফড়িয়া দালালদের দৌরাত্ম, শস্য বীমার অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে ফলোৎপাদন ব্যাবত হচ্ছে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে ফলের গড় ফলন কত ?

২। কোন দেশে ভাইরাস প্রতিরোধক ১০০ ভাগ স্ত্রী গাছ উৎপাদক পেঁপে বীজ শনাক্ত করতে পেরেছে ?

৩। ফল চাষের জন্য সাধারণত কি ধরনের জমি দরকার ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল চাষের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর তালিকা তৈরি কর।

২। ফল চাষে জমির অভাব ও নিম্ন উৎপাদনশীলতা সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৩। উৎপাদন উপকরের দুর্মূল্য ও দুষপ্রাপ্যতা সম্পর্কে লেখ।

৪। ফল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করন সমস্যা বর্ণনা কর।

৫। ফল চাষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আর্থিক ঝুঁকি ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল উৎপাদনের সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো লিপিবদ্ধ কর।

২। বাংলাদেশে ফল চাষের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর বিবরন দাও।

৩। ফল পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সমস্যা বর্ণনা কর।

৪। মানসম্পন্ন চারা ও উচ্চফলন শীল জাতের অভাব এবং অপরিকল্পিত বাগান ও ফল বাগানের সঠিক পরিচর্যা জ্ঞানের অভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

২০২২

পঞ্চম অধ্যায়

ফল চাষের বংশ বিস্তার পদ্ধতি

বংশ বিস্তারের ধারণা কোন একটি উদ্ভিদ প্রজাতির টিকে থাকা ও সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে ঐ উদ্ভিদের বংশবিস্তার বলা যায় । ফল গাছ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বংশ বিস্তার করে থাকে । কোন কোন ফল গাছ শুধু বীজের মাধ্যমে আবার কোন কোন ফল গাছ বীজ ও অঙ্গজ উভয় পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে থাকে । কিছু কিছু ফল গাছে অজ চারা উৎপাদন প্রায় অসম্ভব কিংবা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল । যেমন– নারিকেল, তাল, এসব ক্ষেত্রে চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ব্যবহার করাই শ্রেয় । বীজ থেকে গজানো চারা বড় ও শক্ত হয় এবং ফল বেশি দেয় । যে সব ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই সমান ভাবে প্রযোজ্য সেখানে অঙ্গজ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করাই শ্রেয় ।

বীজের মাধ্যমে কোন কোন ফল বংশবিস্তার করে

কোন একটি উদ্ভিদ প্রজাতির প্রকৃতিতে টিকে থাকাও তার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে ঐ উদ্ভিদের বংশ বিস্তার বলা যায় । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বংশ রক্ষার্থে নির্দিষ্ট কোন একটি গাছ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌনকোষের সাহায্যে বা অঙ্গজ উপায়ে তার সমতুল্য নতুন একটি গাছের জন্ম দিয়ে থাকে সে প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদের বংশ বিস্তার বলে ।

উদ্ভিদসমূহ প্রধানত দুটো পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে থাকে । যথা- যৌন পদ্ধতি ও অযৌন পদ্ধতি বা অঙ্গজ পদ্ধতি বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার পদ্ধতি বা যৌন পদ্ধতি (Sexual propagation) এ পদ্ধতিতে বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয় । উদাহরণ- আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল, তাল ইত্যাদির বীজ দ্বারা গাছ তৈরি করা যায় ।

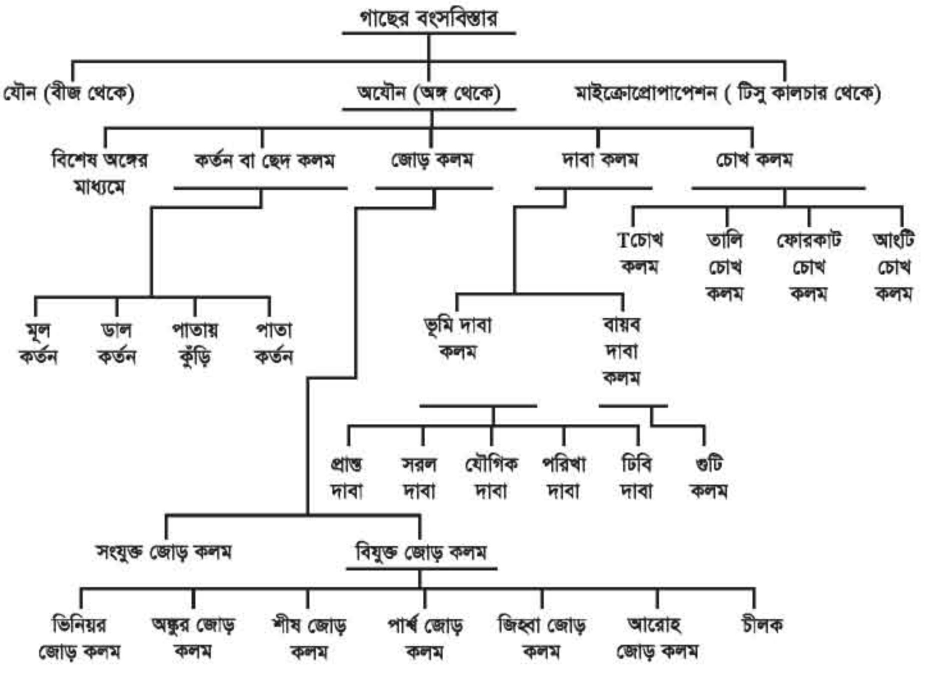

অঙ্গজ বা অযৌন বংশবিস্তার (Asexual vegetative propagation)

এ পদ্ধতিতে যৌনকোষ বা বীজ ছাড়া মাতৃগাছের অন্যান্য কোষ দ্বারা মাতৃগাছের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন গাছ তৈরি হয়। গাছের প্রতি কোষই মাতৃগাছ বা নতুন গাছ সৃষ্টির কৌলতাত্ত্বিক উপাদানসমূহ ধারন করে। এ জন্য প্রতিটি কোষ হতে একটি নতুন গাছ জন্ম হতে পারে। অযৌন বা অঙ্গজ বংশবিস্তারের পদ্ধতিগুলোর তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

ফল চাষের বংশ বিস্তার পদ্ধতি

১। অ্যাপোমিকটিক পদ্ধতি (Apomictic):উদাহরণ- সাইট্রাস, আম ইত্যাদি।

২। পৃথকীকরণ পদ্ধতি (Separation): উদাহরণ- পেঁয়াজ, টিউলিপ ইত্যাদি।

৩। কন্দর মাধ্যমে বংশবিস্তার (Bulb): উদাহরণ- পেঁয়াজ, টিউলিপ ইত্যাদি।

৪। গুড়ি কন্দের মাধ্যমে বংশবিস্তার (Com): উদাহরণ- ওল, মুখীকচু, গরাডিওলাস ইত্যাদি।

৫। বিভাজন পদ্ধতি (Division): উদাহরণ- আলু।

৬। স্থূল কন্দের মাধ্যমে বংশবিস্তার (Tuber): উদাহরণ- আলু।

৭। মুলের মাধ্যমে বংশবিস্তার (Tuberous root): উদাহরণ- মিষ্টি আলু, ডালিয়া।

৮। রাইজোমের মাধ্যমে বংশবিস্তর (Rhizome): উদাহরণ- কলা, আদা, হলুদ।

৯। খর্ব ধাবকের মাধ্যমে বংশবিস্তার (Offsets/off roots): উদাহরণ- আনারস, খেজুর।

১০। মুকুটের মাধ্যমে বংশবিস্তার (runner): উদাহরণ- থানকুনি, আমরুল।

১১। ধাবকের সাহায্যে বংশবিস্তার (Propagation by cutting)

১২। দাবা কলমের সাহায্যে বংশবিস্তার (Lay ering): উদাহরণ- পেয়ারা, লেবু, হাসানা হেনা, জবা।

১৩। জোড় কলমের সাহায্যে বংশবিস্তার (Grafting)

১৪। কুঁড়ি সংযোজন বা চোখ কলমের সাহায্যে বংশবিস্তার (Budding): উদাহরণ- কুল, গোলাপ

১৫। কোষ বা কলা কালচার পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে (Tissue culture)

অঙ্গজ বংশবিস্তার ও বীজের মাধ্যমে ফল চাষের পার্থক্য

উদ্ভিদসমূহ প্রধানত দুটো পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে থাকে যথা- যৌন পদ্ধতি ও অযৌন বা অঙ্গজ পদ্ধতি। ফল চাষের ক্ষেত্রে এ দুই পদ্ধতির পার্থক্য নিম্নে দেখানো হলো।

ছক- ১ বীজের মাধ্যমে বা যৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের সুবিধা ও অঙ্গজ বা অযৌন পদ্ধতির অসুবিধা

বীজের মাধ্যমে বা যৌন পদ্ধতিতে	অঙ্গজ বা অযৌন পদ্ধতিতে
১। যে সব ফল গাছ সাধারনত আজ উপায়ে বংশ সজীব বিস্তার করতে পারে না সেসব ফলগাছের বংশ বিস্তারের জন্য যৌন পদ্ধতি একমাত্র উপায়।	১। কতিপয় ফলগাছ যেমন-কলা, আনারস ইত্যাদি ও প্রকৃত বীজ উৎপাদন করে না। তাই এসব গাছের বংশ টিকিয়ে রাখার জন্য অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।
২। বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ সাধারনত অধিক কষ্ট সহিষ্ণু হয় ও বেশিদিন বাঁচে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– ঝড়, বৃষ্টি, খরা বা যে কোন প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম।	২। বীজ থেকে উৎপন্ন চারায় মাতৃগাছের গুণাগুণবজায় থাকে না। তাই মাতৃগুণ সম্পন্ন গাছ পেতে হলে অযৌন পদ্ধতিই একমাত্র উপায়।
৩। সংকরায়ণের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির আর কোন বিকল্প নেই।	৩। ফল গাছের এমন কতগুলো জাত আছে যারা উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন ফল প্রদান করে এবং উচ্চ ফলনশীল। কিন্তু জলাবদ্ধতা, খরা, লবণাক্ততা, রোগ, পোকামাকড় ইত্যাদির প্রতি অধিক সংবেদনশীল। এসব গাছকে বীজ থেকে না জন্মিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সংগে খাপ খায় এমন আদিজোড় এর সাথে কলম করে প্রতিকূল পরিবেশে টিকিয়ে রাখা যায়।
৪। যৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের জন্য তেমন কোন কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার দরকার হয় না।	৪। অযৌন পদ্ধতিতে জন্মানো গাছ কম বিস্তারশীল হওয়ায় এসব গাছের ফল সগ্রহ ও পরিচর্যা সহজতর হয়। অপরদিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় অধিক সংখ্যক গাছ। লাগিয়ে মোট ফলন বাড়ানো যায়।
৫। অপেক্ষাকৃত সহজ ও সস্তায় এবং কম পরিশ্রমে চারা পাওয়া যায়।	৫। অপেক্ষাকৃত কম সময়ে উচ্চ গুণসম্পন্ন চারা পাওয়া যায়।

ছক-২ অঙ্গজ বা অযৌন পদ্ধতির সুবিধা বীজের মাধ্যমে বা যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের অসুবিধা

অঙ্গজ বা অযৌন পদ্ধতিতে	বীজের মাধ্যমে বা যৌন পদ্ধতিতে
১। এ পদ্ধতিতে নতুন কোন জাত সৃষ্টি করা যায় না।	১। বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে কখনো মাতৃগাছের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে না।
২। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌন পদ্ধতির চেয়ে অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের খরচ বেশি লাগে।	২। গাছ লম্বা, উঁচু ও বড় হওয়ায় ফল সংগ্রহ কষ্টকর হয়।
৩। এ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞান, দরাতা ও অনুশীলনের দরকার হয়।	৩। এ প্রক্রিয়ায় জন্মানো গাছে ফুল ফল আসতে সময় বেশি লাগে।
৪। অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তারকারী গাছসমূহ সাধারণত অল্প দিন বাঁচে।	৪। গাছ বড় আকারের হওয়ায় নির্দিষ্ট পরিমান জমিতে কমসংখ্যক গাছ লাগাতে হয়।
৫। এ পদ্ধতিতে কিছু কলমের অস্থানিক মূল সৃষ্টি হওয়ায় তা মাটিতে শক্তভাবে আটকে থাকতে পারে না। ফলে ঝড় বৃষ্টিতে গাছ পড়ে যায়।	৫। আঙ্গিক বৃদ্ধি বেশি হওয়ায় ঝড় তুফানে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

২০২২

৬। এ কাজে দর মালি পেতে কষ্ট হয়।	৬। মানসম্মত বীজ পেতে অসুবিধা।
৭। পরিবহনে অল্প সংখ্যক চারার জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন হয়।	৭। বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদনের জন্য কারিগরি দক্ষতার অভাব।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল গাছের বংশ বিস্তার কীভাবে ঘটে থাকে ?

২। বীজের মাধ্যমে কোন কোন ফলের বংশ বিস্তার হয় ?

৩। অঙ্গজ বংশ বিস্তারের সুবিধা কী ?

৪। আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদী ফল কোনগুলো?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বীজের মাধ্যমে কোন কোন ফল বংশ বিস্তার করে ?

২। অঙ্গজ বংশবিস্তারের ফলের নামের তালিকা তৈরি কর।

৩। অঙ্গজ বংশবিস্তার ও বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী?

৪। উদ্ভিদের বংশবিস্তার বলতে কি বাঝায় ?

৫। ভিনিয়ার ও সংস্পর্শ জোড় কলমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী ?

৬। গাছের পাঁচটি অংশের নাম লেখ যার মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অঙ্গজ ও যৌন বংশ বিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিপিবদ্ধ কর

২। অঙ্গজ বংশ বিস্তার ও বীজের মাধ্যমে ফল চাষের পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

৩। অযৌন বংশবিস্তার বলতে কী বাঝায় ? গাছের বংশবিস্তার কয় ভাগে করা যায় উদারহণসহ লেখ।

৪। অযৌন বংশ বিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

৫। ভিনিয়ার জোড় কলম করার পদ্ধতি চিত্র অঙ্কনসহ বর্ণনা কর।

৬। টীকা লেখ: ক) গুটি কলম খ) শাখা কলম গ) চোখ কলম ঘ) জোড় কলম।

২০২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফল বাগানের পরিকল্পনা ও নকশা (লে-আউট) তৈরি

ফল বাগান স্থাপনের আগে বাগান পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। কারণ ফলের বাগান তৈরির সময় কতিপয় মৌলিক নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে অনুসরণ না করলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন হয় না এবং পরবর্তীতে ফল বাগান ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ সমস্যা দেখা যায়। দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক ফল বাগানের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অধিকাংশ ফলের গাছই বহুবর্ষী হওয়ায় ফলের বাগান তৈরির সময় কোন ভুলত্রুটি থাকলে পরবর্তীকালে সেগুলো সংশোধন করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাড়ায়।

ফল বাগান পরিকল্পনার সাধারণ নীতিমালা

(১) ফল বাগান স্থাপন এবং কোন নির্দিষ্ট ফল ভালোভাবে চাষের জন্য তার উপযোগী আবহাওয়া, জমির উচ্চতা, মাটির প্রকারভেদ, ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, পরিবহন ও বিপণনের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(২) পতিত জমিতে বাগান করতে হলে সেখানে পুরাতন গাছ বা গাছের গোড়া থাকলে তা পরিষ্কার করে গভীরভাবে চাষ করতে হবে। পাহাড়ী এলাকা হলে কন্টুর এবং সিড়িবাধ তৈরি করে কিছুদূর পর্যন্ত সমতল করে নিতে হবে।

(৩) বাগান তৈরিতে রাস্তা, সেচ ও নিষ্কাশন নালা, বাগানের গুদামঘর ইত্যাদি কাজের জন্য কোনক্রমেই মোট জমির শতকরা দশভাগের বেশি ব্যবহার করা সমিচিন হবে না।

(৪) বাগানে সেচ সুবিধার জন্য কাছাকাছি পানির ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৫) চিরসবুজ গাছগুলো বাগানের সামনে এবং ভিতরে লাগাতে হবে। পাতা ঝরে যায় এমন গাছ যেমন- বেল, আমড়া, বরই ইত্যাদি পিছনে এবং বাইরে লাগাতে হবে।

(৬) সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় এমন গাছ পানির উৎসের কাছাকাছি এবং বৃষ্টিনির্ভর গাছ পানির উৎস হতে দুরে লাগাতে হবে।

(৭) ছোট আকারের গাছ বাগানের সামনে এবং লম্বা ধরণের গাছ পিছনের দিকে লাগাতে হবে, তাতে বাগান তত্ত্বাবধানে সুবিধা হবে।

(৮) বর্ষার শুরুতে সঠিক দূরত্বে গর্ত করে পরিমাণ মত সার দিয়ে চারাগাছ লাগাতে হবে।

(৯) গাছের সঠিক বৃদ্ধির জন্য পরিমাণমত জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

(১০) ফলের বাগানে আন্তঃফসলের চাষাবাদ করলে গাছের দূরত্বের সর্বোচ্চ দূরত্বে এবং তা না করলে সর্বনিম্ন দূরত্বে গাছ লাগাতে হবে।

(১১) বাগানের চারিদিকে প্রয়োজনে বেড়া দিতে হবে। প্রবল বাতাস থেকে গাছ রক্ষার জন্য উত্তর পশ্চিম দিকে বায়ুরোধকারী বৃক্ষ ঘন সারি করে লাগাতে হবে। বেড়া গাছ গ্রীষ্মের গরম বাতাস এবং শীতের শুস্ক ও ঠান্ডা বাতাস থেকে বাগানের ফল গাছকে রক্ষা করবে। বেড়ার চারদিকে কাটা ওয়ালা পাতি, কাগজি ও গন্ধরাজ লেবুর গাছ ও করমচা গাছ লাগানো যেতে পারে। এতে বেড়ার কাজ হবে এবং ফল ও পাওয়া যাবে। তবে বেড়ার জন্য লাগালে এসব গাছ ছাটা ঠিক হবে না।

(১২) উর্বর জমিতে লাভজনকভাবে ফল চাষের জন্য যে সমস্ত ফল গাছ মোটামুটি একই সময়ে ফল দেয় সে সমত ফল গাছগুলোকে পাশাপাশি লাগাতে হবে।

(১৩) বাগানের নক্সা তৈরির আগে গাছের আকার, জমির পরিমাণ ও জমির আকৃতি, গাছ রোপণ প্রণালী ঠিক করে নিতে হবে।

(১৪) ফলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বাঁশের ঝুড়ি, চটের ব্যাগ, কাঠের বা পিচবোর্ডের বাক্সে প্যাকিং করে বাজারে পাঠাতে হবে। তাই বাগান এলাকার আশেপাশে এ সমস্ত উপকরণসমূহের সহজলভ্যতা থাকতে হবে।

(১৫) ফল চাষ করে সহজে এবং কম খরচে যাতে বাজারে বা চিহ্নিত স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়টি খেয়াল করতে হবে।

(১৬) বাগানের পরিচর্যার জন্য যন্ত্রপাতি যথা- কোদাল, নিড়ানি, ঝাঝরি, ফর্ক, রেফ, দা, প্রুনিং 'স', কাঁচি, বাডিং ছুরি, স্পেয়ার, একচাকার ঠেলাগাড়ি প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ফল বাগানের পরিকল্পনা তৈরি

অধিকাংশ ফলের বাগান দীর্ঘমেয়াদি হওয়ায় বাগান প্রতিষ্ঠার আগে সঠিক পরিকল্পনা ও নকশা তৈরি করা উচিত। কোন জায়গায় বাগান প্রতিষ্ঠার আগে সে জায়গার জমি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, জলবায়ু, মাটির গুণাগুণ, জনগণের চাহিদা, শ্রমিক প্রাপ্যতা, বাজার ব্যবস্থা, উন্নত জাত ও প্রযুক্তি প্রাপ্তি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বাগানের পরিকল্পনা করতে হয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা না করা হলে অযথা অর্থ ব্যয় হবে ও ফল চাষের ক্ষতি হবে। পূর্বেই সতর্ক হতে হবে যেন কোন ভুলত্রুটি না থাকে। ফল বাগানে গাছ নকশা করে লাগাতে হবে। বাগান নকশা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের বৃদ্ধি ব্যহত না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক সংখ্যক গাছ লাগানো যায় এবং বাগানে আন্ত-পরিচর্যা সুচারুভাবে করা যায় ও বাগান দেখতে সুন্দর হয়।

ফল বাগানের জন্য সব সময় উচ, খোলামেলা, পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত এবং জলাবদ্ধতা হয় না এমন স্থান নির্বাচন করতে হয়। বিভিন্ন জাতের ফল গাছ বিভিন্ন আবহাওয়া ও মাটিতে ভালোভাবে জন্মাতে পারে। মাটির গুণাগুণ অনেক ক্ষেত্রে পরিচর্যার মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তন করা যায় না। ফলের গাছ স্বল্প মেয়াদী, মধ্যম, মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে থাকে। দীর্ঘমেয়াদী ফল গাছ ৩০-৪০ বছর থেকে ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত ভালোভাবে ফল দিয়ে থাকে। মধ্যমেয়াদী ফল গাছ ১৫-২০ বছর ভালোভাবে ফল দিয়ে থাকে। স্বল্প মেয়াদী ফল গাছ ১-৩ বছর পর্যন্ত ফল দিয়ে থাকে। দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি ফল গাছ রোপনের সময় স্থান নির্বাচন, নকশা তৈরি, রোপণের দূরত্ব নির্ধারণ জাত বাছাই ইত্যাদিতে যদি ভুল হয়, আর তা যদি বাগান স্থাপনের কয়েক বছর পর জানা যায়। তাহলে তা সারিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না। বাগান লাভজনক করতে হলে দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী বাগানে আন্ত ফসলের চাষ করা যেতে পারে। যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি ফল গাছ ৮-১০ বছরের আগে ভালো ভাবে ফল দেয় না। সেজন্য এ সময় পেঁপে, কলা, আনারস, জামরুল, আতা, সরিফা, কুল লাগিয়ে খরচ পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আন্তফসল হিসাবে আলু, পিয়াজ, মরিচ, ডাল জাতীয় ফসল বা শাক সবজী চাষের চিন্তা করা যেতে পারে। ফল বাগান স্থাপন কল্পে পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াবলি অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

- যে স্থানে বাগান স্থাপন করা হবে সেই স্থানের জমি, মাটি ও জলবায়ু অবশ্যই পরিকল্পিত ফল চাষের জন্য উৎকৃষ্ট হতে হবে ।
- পতিত জমিতে বাগান স্থাপন করার সময় সেখানের অপ্রয়োজনীয় গাছ পালা পরিস্কার করতে হবে । জমি যদি পাহাড়ি ধরনের হয় তা হলে বিভিন্ন উচ্চতায় জমি কেটে বা পাহাড় কেটে সমতল করে নিতে হবে ।
- বাগানের অফিস, রাস্তাঘাট, নালা নর্দমা ইত্যাদি স্থায়ী স্থাপনা তৈরি করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এগুলোর জন্য যতটুকু সম্ভব কম জমি ব্যবহার করা হয় এবং তা যেন কোন ক্রমেই বাগানের জমির ১০% এর বেশি না হয় ।
- বাগানের প্রধান অফিস এবং ফল বা অন্যান্য জিনিস বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র যথাস্থানে হতে হবে ।
- খাটো জাতের ফল গাছ সমূহ বাগানের সামনে এবং লম্বা জাতের গাছসমূহ বাগানের পিছনের দিকে লাগাতে হবে
- বাগান পরিকল্পনা এমন ভাবে করতে হবে যেন এর বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা যেমন- আন্তপরিচর্যা, সেচ প্রদান পানি নিষ্কাশন, যাতায়াত ইত্যাদি সহজতর হয় ।
- যে সব গাছে এক সঙ্গে ফল ধরে ও ফল পাকে সে সব গাছ বাগানে পাশাপাশি জমিতে লাগাতে হবে ।
- বাগানে আন্ত ফসলের চাষ করলে গাছের দূরত্ব বেশি এবং আন্ত ফসলের চাষ না করলে নিয়মানুযায়ী সর্বনিম্ন রাখা উচিত ।
- ফল বাগানের চার পাশে বেড়া এবং ঝাড়োে বায়ুরোধক গাছ লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এসব গাছ ফল গাছের সাথে পানি, আললা বা খাদ্য উপাদানের জন্য প্রতিযোগিতায় না আসে ।
- জলবায়ু ও মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপযুক্ত জাত নির্বাচন করা
- ফল বাগানের জন্য সব চাইতে উত্তম ফলের জাত, বীজ, কলম বা চারা সংগ্রহ করতে হবে ।

ফল গাছের নকশার প্রকারভেদ গুলি বর্ণনা

বিজ্ঞানভিত্তিক ফল বাগান তৈরি করতে গেলে বাগানে গাছ লাগানোর নকশা ঠিক রাখা দরকার । একটি গাছ হতে অপরটির সঠিক দূরত্ব রাখলে স্বাভাবিকভাবে ফল ধারণ করে। নকশা করে গাছ লাগালে গাছ রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম পড়ে, সেচ ব্যবস্থা সহজ হয় এবং কম জায়গায় সর্বোচ্চ সংখ্যক গাছ বসানো যায় । বাগানের নকশা রোপণ প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল । ফল বাগানে ছয়টি পদ্ধতিতে নকশা করে গাছ লাগানোর হয় । এগুলো হলো (১) আয়তাকার পদ্ধতি (২) বর্গাকার পদ্ধতি (৩) কুইনকাংশ পদ্ধতি (৪) ত্রিভুজাকার পদ্ধতি ৫) ষড়ভুজী পদ্ধতি (৬) সময়াল ও সিঁড়ি বাঁধ পদ্ধতি ।

ফল বাগানে গাছ লাগানোর বিভিন্ন নকশার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো

উন্নত পদ্ধতিতে এবং লাভজনক ফল বাগান করতে হলে বাগানে গাছ লাগানোর জন্য নকশা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন । বাগান তৈরির আগে প্রথমে কাগজে নকশা তৈরি করে ভুলত্রুটি দেখে নিতে হবে । বাগানের নকশা তৈরি করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাগানের অফিসঘর, গুদামঘর, গার্ডশেড, পানির পাম্পের স্থান, ভিতরের রাস্তা, সেচ ও নিকাশ নালা নির্দিষ্ট ফল গাছের জন্য নির্বাচিত স্থান, বেড়ার গাছ যথাস্থানে আছে বা করা যাবে কিন নিতে হয় । জমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জমির অপচয় রোধে প্রত্যেকটি কাজের জন্য জমি চিহ্নিত করে ফল গাছের রোপণ পদ্ধতি অনুযায়ী রোপণ দূরত্ব ঠিক করে, সেচ পদ্ধতি, পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয় বাগানের নকশায় উল্লেখ করতে হবে । বাগানের নকশা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা ও অবস্থান দেখে সর্বাধিক সংখ্যক গাছ ।

২০২১

লাগানো যায়। তাতে প্রতিটি গাছ সুন্দরভাবে আলোবাতাস পেয়ে বড় হতে পারে। পরিকল্পনা মোতাবেক গাছ লাগালে পরস্পরে জড়িয়ে যায় না এবং একটি অন্যটির বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে না। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফুল বাগানের নকশা বা পরিকল্পনা করা হয়।

এ পদ্ধতিগুলো যথা-

১। আয়তকার
২। বর্গাকার
৩। পঞ্চম সংস্থান বা তারকাকৃতি বা কুইনকাংশ
৪। ত্রিকোণী বা ত্রিভুজাকার
৫। ষড়ভুজী
৬। কন্টুর বা সিঁড়িবাধ

উলিখিত ছয় প্রকার গাছ রোপণ পদ্ধতির প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো। তবে রোপণ পদ্ধতি নির্ধারন করার সময় কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করা উচিত । যথা-

(ক) নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কত বেশি সংখ্যক গাছ রোপণ করা যাবে।

(খ) জমি চাষ, পানি সেচ ও নিকাশ, গাছের পরিচর্যা কত সহজে ও সুষ্ঠুভাবে করা যাবে।

(গ) চারা রোপণের পদ্ধতির কারণে যেন গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত না হয়

(ঘ) এমনভাবে গাছ লাগাতে হবে যাতে বাগান দেখতে সুন্দর দেখায়।

চারা রোপণের জন্য নকশা প্রণয়নে করণীয় কাজসমূহ। যথা-

১। মূলরেখা চিহ্নিতকরণ: প্রতিটি জমিতে চারা রোপণের আগে জমির কিনারা বা আইল দিয়ে সীমানা রেখা টানতে হবে। এরপর একটি মূলরেখা টেনে নিতে হয়। সাধারণত প্রতিটি জমিতে গাছের প্রথম সারিটি মূল রেখা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এ সারিটি জমিতে সারি থেকে সারির যে দূরত্বে গাছ লাগানো হবে মূলরেখাটি জমির কিনারা বা আইল হতে তার অর্ধেক দূর দিয়ে নিতে হবে। এ সারিকে মুল সারি বা ভিত্তি সারি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর উপর গাছ হতে গাছের দূরত্ব চিহ্নিত করে অপরাপর সারিগুলো এমনভাবে টানতে হবে যেন একটি আরেকটির সাথে পরস্পর সমান্তরালভাবে থাকে।

২। জমিতে লম্বরেখা গঠন: জমির এক কোণে দাঁড়িয়ে বা মূল সারির এক প্রান্তে দাড়িয়ে যথাযথ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি রশি ধরে ৩:৪:৫ অনুপাতে বা ১২, ১৩, ২০ মিটার হিসেবে জমির দুই দিকের আইল বরাবর রশি ধরে চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ কৌণিক স্থান হতে উভয় দিকের আইল বরাবর দুইদিকে রেখা টেনে একটিতে ১২ মিটার এবং অপরটিতে ১৬ মিটার দূরত্ব চিহ্নিত করতে হবে। এই চিহ্নতি ঘন দুইটি সোজাসুজি সংযোগ করা হলে সংযোজিত রেখাটি যদি ২০ মিটার হয় তাহলে সংযোগস্থলে ৯০ ডিগ্রী কোণ তৈরি হবে। এরপর উভয়দিকের রেখা সরল রেখা হিসেবে প্রসারিত করা হলে একটি অপরটির উপর লম্বরেখা হিসেবে অঙ্কিত হবে। এর একটিকে মুলরেখা ধরে সমান্তরাল রেখা টানতে হবে। তবে মুল রেখাটি জমির কিনারা বা আইলে না ধরে সারি হতে সারির অর্ধেক দূরত্বে ধরতে হয়।

৩। মুকুরেখা প্রস্তুতকরণ: জমিতে আইল বরাবর লম্ব রেখা টেনে তারপর মুলরেখা তৈরি করা হয়। এ মুলরেখার উপর গাছ রোপণের চিহ্নিত স্থান হতে পরবর্তী রেখার বা সমান্তরাল রেখার চিহ্নিত স্থানে লম্ব রেখার উপর হতে মূল রেখার সমান্তরাল রেখা সংযোগ করা হলে মুক্ত রেখা তৈরি হয়। এ ভাবে মূলরেখার ওপর গাছের দূরত্ব অনুসারে প্রতিটি সারিতে সারি হতে সারির অঙ্কিত রেখায় যতগুলো সম্ভব স্থান চিহ্নিত করে সংযোগ করতে হবে। তবে মূলরেখার উপর এক দিক হতে বা উভয়দিক হতে গাছ রোপনের জন্য নির্ধারিত দূরত্বের অর্ধেক দূরত্ব হতে গাছ রোপণের জন্য উলিখিত রেখাগুলি তৈরির করতে চিহ্নিত করণ দণ্ড বা গোজ, দূরত্ব মাপার ফিতা,

রশি এবং গাছের স্থান চিহ্নিত করে রাখার জন্য চিকন কাঠির প্রয়োজন। ফল গাছ রোপণের পদ্ধতিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো -

(১) আয়তকার পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক সমান্তরাল সারির মধ্যে মূল সারিতে গাছের স্থান চিহ্নিত করতে হবে। এরপর মুল রেখার চিহ্নিত স্থান হতে পরবর্তী সারিগুলোকে লম্বরেখায় চিহ্নতি করে মুক্ত রেখা চিহ্নিত করতে হবে। এর ফলে পাশাপাশি দু'সারির মধ্যে চারটি গাছের সমন্বয়ে একটি আয়তক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। সাধারণত আয়তকার পদ্ধতিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব গাছ থেকে গাছের দূরত্বের চেয়ে বেশি থাকে। এ পদ্ধতিতে লাগানো ফল বাগানে আন্তঃপরিচর্যা যেমন- চাষ, পানি সেচ, মাটি কোপানো ইত্যাদি কাজ সুবিধাজনক হয়। বাগানের জন্য রোপিত গাছ বড় হওয়ার আগে এর মাঝে শাক, আলু, তরমুজ, ফুটি, হলুদ, কচু ইত্যাদি ফসল কয়েক বছর করা যায়। এর ফলে বাড়তি আয় করা সম্ভব হয়।

হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি (আয়তকার বা বর্গাকার পদ্ধতি)

এক হেক্টর জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = এক হেক্টর জমি = ১০০০০ বর্গমিটার

সারি থেকে সারির দূরত্ব (ব:মি:)×গাছ থেকে গাছের দূরত্ব(ব:মি:)

বা সারির সংখ্যা×প্রতি সারিতে গাছের সংখ্যা

উদাহরণ: পেঁপে বাগানে ৫মিটার দূরত্বে সারি করে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে এক হেক্টর জমিতে কতটি চারা রোপণ করা যাবে।

$$\text{মোট পেঁপে গাছের সংখ্যা} = \frac{\text{১০,০০০ বর্গ মিটার}}{\text{১০ মি:×২ মি:}} = \frac{\text{১০০০০ বর্গমিটার}}{\text{১০ বর্গমিটার}} = \text{১০০০ টি}$$

(২) বর্গাকার পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুই সারির গাছগুলোকে এমনভাবে রোপণ করা হয়, যাতে সারি হতে সারি এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব পরস্পর সমান থাকে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুই সারির চারটি গাছ মিলে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে। বর্গক্ষেত্রের চারকোণার স্থান গুলোতে গাছ রোপণ করা হয়। আম, কাঁঠাল, লিচু, সফেদা, জাম, জামরুল, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি ফল গাছের চারা এ পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়। এ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং মাঠে সহজে নকশা প্রণয়ন করা যায়।

জমিতে মূলরেখা তৈরি করার পর নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুসারে সম্পূর্ণ মুল রেখায় কাঠি বা গোজ পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে। মূলরেখার সঙ্গে লরেখা টেনে সারি হতে সারির দূরত্ব চিহ্নিত স্থান হতে মুল রেখার সমান্তরাল রেখা টানতে হবে। এরপর প্রথম সারি বা মূলরেখার চিহ্নিত স্থান হতে লরেখা টেনে নিলে পরবর্তী সারিগুলোতে যেখানে অতিক্রম করবে সে স্থানগুলোতে কাঠি বা গোঁজ পুঁতে দিতে হবে। প্রত্যেকটি চিহ্নিত স্থানে গাছ রোপণ করা হলে প্রতি চারটি গাছ মিলে এক একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করবে। এ পদ্ধতিটি বেশি প্রচলিত এবং দেখতে সুন্দর দেখায়। এখানে উল্লেখ্য যে মূলরেখাটি জমির আইল হতে সারি হতে সারির দূরত্ব বাদ দিয়ে প্রথম গাছের স্থান চিহ্নিত করা হয়। বর্গাকার পদ্ধতিতে মোট গাছের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য আয়তকার পদ্ধতির অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

২০২১

উদাহরণ: একটি আম বাগান করার জন্য ১০ মিটার দুরে দুরে সারি ও ১০ মিটার দূরে দূরে চারা/কলম রোপণ করা হলে এক হেক্টর জমিতে মোট কতটি চারার প্রয়োজন হবে।

এক হেক্টর জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = এক হেক্টর জমি = ১০০০০ বর্গমিটার

সারি থেকে সারির দূরত্ব (ব:মি:)×গাছ থেকে গাছের দূরত্ব (ব:মি:)

বা সারির সংখ্যা×প্রতি সারিতে গাছের সংখ্যা

= ১০০০০ ব:মি: = ১০০ টি

১০০ ব:মি: ।

অর্থাৎ এক হেক্টরে ১০০টি চারা বা কলম রোপণ করা যাবে ।

(১) কুইনকাংশ বা পঞ্চম সংস্থান বা তারকাকৃতি পদ্ধতি: এ পদ্ধতিটি বর্গাকার পদ্ধতির একটি বিশেষ রূপ । বর্গাকার পদ্ধতির প্রতি চার কোণের চিহ্নিত স্থান হতে মূল রেখার উপর বা পরবর্তী সারিগুলোতে দুই গাছের চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে । অনুরূপভাবে মুক্ত রেখাগুলোর উপর প্রতি দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে । এখন মূল রেখা বা পরবর্তী সারিগুলোর মধ্যবর্তী স্থান এবং মুক্ত রেখার মধ্যবর্তী স্থানে চিহ্নিত করতে হবে । এখন মূল রেখা বা পরবর্তী সারিগুলোর মধ্যবর্তী স্থান এবং মুক্ত রেখার মধ্যবর্তী স্থান হতে সামনা সামনি দিকে রেখা টানলে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হবে । এই কেন্দ্র বিন্দু হলো পঞ্চম সংস্থান । কেন্দ্র বিন্দুর সংশ্যানকৃত গাছটিকে ফিলার বা পুরক বলে । বর্গাকার পদ্ধতিতে চারকোণে মধ্যমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি গাছ লাগানো হয় এবং পুরক গাছটি স্বল্পমেয়াদি হিসেবে লাগানো হয় । যেমন- দীর্ঘমেয়াদি গাছ হলো আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, কামরাঙ্গা, তেঁতুল এবং স্বল্পমেয়াদি গাছ হলো লেবু, ডালিম, পেয়ারা, আতা, শরীফা, জাম্বুরা, কলা, জামরুল, করমচা, অরবরই ইত্যাদি । পূরক গাছগুলো যখন মধ্যম মেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী গাছের সাথে আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান, পানি ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতায় যাবে তখন পূরক গাছগুলো কেটে ফেলতে হবে । স্থায়ী গাছের দূরত্ব কমপক্ষে ৭ মিটার না হলে এ পদ্ধতি তেমন ফলপ্রসূ হিসেবে অনুশীলন করা যাবে না ।

কুইনকাংশ বা পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয় -

জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = (সারির সংখ্যা×সারিতে গাছের সংখ্যা) + পুরক গাছ

পূরক গাছ = (প্রধান সারিতে গাছের সংখ্যা -১)×(সারির সংখ্যা -১)

উদাহরণ: কোন জমিতে ১২টি সারি তৈরি করে প্রতিটি সারিতে ১০টি করে চারা রোপণ করা হলে ঐ জমিতে পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতিতে কতটি চারা রোপণ করা যাবে ।

জমিতে গাছের সংখ্যা = (সারির সংখ্যা×সারিতে গাছের সংখ্যা) + পূরক গাছ

= (১২×১০) + পুরক গাছ

= (১২×১০) + ৯৯

= ১২০ + ৯৯

= ২১৯ টি

অর্থাৎ মোট ২১৯ টি চারা রোপণ করা যাবে ।

আমরা জানি,

পুরক গাছ = (সারির গাছের সংখ্যা-১)×(সারির সংখ্যা-১)

= (১০-১)×(১২-১)

= ৯×১১

= ৯৯ টি

৪) ত্রিকোণী বা ত্রিভুজাকার পদ্ধতি: মূলরেখা তৈরি করে মূল রেখার উপর বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় গাছের দূরত্ব চিহ্নিত করতে হবে । এরপর দ্বিতীয় সারিতে জমির কিনারা হতে গাছের দূরত্বের পূর্ণ দূরত্বে চিহ্নিত করতে হবে ।

এইভাবে পরবর্তী চিহ্নগুলো গাছের পূর্ণ দূরত্বে করতে হবে। এতে মূলরেখায় গাছের নির্ধারিত দুটি গাছের চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দ্বিতীয় সারিতে গাছের চিহ্ন পড়বে। এ পদ্ধতিতে প্রতি একান্তর বা জোড়া সারিতে প্রথম সারির দুই গাছের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ লাগানো হয়। এরপর প্রতি বেজোড় সারিতে বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় গাছ লাগানো হয়। এতে প্রথম বা মূলরেখার দুটি এবং একান্তর সারির একটি গাছের চিহ্ন যাগে করা হলে মাত্র একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি করে। অনুরুপভাবে একান্তর বা জোড় সারির একটি গাছ তৃতীয় বা বেজোড় সারির দুটি গাছের চিহের সাথে যাগে করা হলে ত্রিভুজের সৃষ্টি করে। ত্রিভুজগুলো সমবাহু ত্রিভুজ হয়। ১ম, ৩য়, ৫ম বা বেজোড় সংখ্যক লাইনে বর্গাকার প্রণালিতে গাছ লাগানো হয় এবং ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ বা জোড় সংখ্যক লাইনে বেজোড় লাইনের দুটি গাছের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ লাগানো হয়। এ পদ্ধতিতে সারি হতে সারির দূরত্ব গাছ হতে গাছের দূরত্ব অপেক্ষা বেশি রাখা হয়। প্রতি এক সারি পর পর বা একান্তর সারিতে একটি করে গাছ কম হয়। এতে করে মোট জমিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কমে যায়।

ত্রিভুজাকার পদ্ধতিতে জমিতে মোট গাছের সংখ্যা নির্ণয় :

জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা ঢ মোট সারির সংখ্যা)- একান্তর ক্রমিক (জোড়) সারির সংখ্যা

উদাহরণ: একটি জমির দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার। এ জমিতে ১০ মিটার দুরে দুরে সারি করে একই দূরত্বে গাছ রোপণ করা হলে মোট কতটি গাছ রোপণ করা যাবে।

আমরা জানি,

$$\text{প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা} = \frac{\text{জমির প্রস্থ}}{\text{চারার দূরত্ব}} = \frac{৩০}{১০} = ৩ \text{ টি}$$

$$\text{সারির সংখ্যা} = \frac{\text{জমির দৈর্ঘ্য}}{\text{সারির দূরত}} = \frac{৫০}{১০} = ৫\text{টি}$$

একান্তর ক্রমিক বা জোড় সারি সংখ্যা

মোট গাছের সংখ্যা = (৩×৫) - ২ = ১৫-২
= ১৩ টি

অর্থাৎ মোট ১৩টি গাছ রোপণ করা যাবে।

৫। ষড়ভুজী পদ্ধতি: ষড়ভুজি পদ্ধতি একটি সমবাহু ত্রিভুজাকার পদ্ধতি। এখানে পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ মিলে একটি সমবাহু ত্রিভুজ তৈরি করে। পাশাপাশি তিন সারির ছয়টি গাছ মিলে একটি ষড়ভুজ তৈরি করে। এর কেন্দ্রস্থলে একটি গাছ থাকে। গাছের দূরত্ব নির্দিষ্ট রাখতে হলে সারি হতে সারির দূরত্ব কমিয়ে দিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে ষড়ভুজ তৈরির সময় কিছুটা জটিল মনে হলেও গাছ লাগানো হলে দেখতে সুন্দর দেখায়। যে কোন দিক হতে তাকালে লাগানো গাছগুলো একটি সরল রেখায় দেখা যায়। একগাছ থেকে অপর গাছের দূরত্ব সমান থাকে। ফলে আলো, বাতাস, খাদ্য উপাদান, পানি ইত্যাদি সকল গাছ সমানভাবে পায়। আম, কলা, আপেল, পিচ, লেবু, পেয়ারা, নারিকেল কাজুবাদাম প্রভৃতি ফল গাছের চারা এই পদ্ধতিতে লাগানো হয়।

ষড়ভুজী পদ্ধতিতে জমিতে চারা সংখ্যা নির্ণয়

জমিতে মোট চারার সংখ্যা = (মোট সারির সংখ্যা×প্রধান বা প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা) - জোড় বা একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা।

উদাহরণ ও এক খণ্ড জমির দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৪০ মিটার । ৫ মিটার দূরে দূরে সারি এবং ৮ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করা হলে ঐ জমিতে মোট কতটি চারা রোপণ করা যাবে ।

(৬) কন্টুর বা ঢাল এবং সিড়িবাঁধ পদ্ধতি পার্বত্য অঞ্চলে ঢাল এবং সিড়িবাঁধ নির্মাণ করে ঢালের আড়াআড়িভাবে ফলের চারা রোপণ করা হয় । জমিতে ঢাল ৩ শতাংশের বেশি এবং ১০ শতাংশের কম থাকলে সেখানে কন্টুর বা টাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় । এ পদ্ধতিতে জমির ঢাল অনুযায়ী সমান স্থানগুলোকে একই রেখা দ্বারা সংযোগ করে দেয়া হয় । যেখানে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে এবং সেচ দেয়া অসুবিধাজনক সেখানে এ পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয় । এখানে স্বাভাবিকভাবে লাগানো গাছের পারস্পরিক দূরত্ব কখনও সমান রাখা সম্ভব না ।

পাহাড়ের ঢাল ১০ শতাংশের বেশি হলে পাহাড় কেটে সমতল সিঁড়িবাধ তৈরি করা হয় এবং ঢালের সাথে আড়াআড়িভাবে সারি করে গাছ লাগানো হয় । এখানে প্রথম সারির দুটি গাছের মধ্যবর্তী স্থানে পরবর্তী সারিতে গাছ লাগিয়ে জমির ক্ষয়রোধ করা হয় । এর ফলে সিড়ি বাধ পদ্ধতিতে পানিসেচ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ঠিকমত করা যায় ও ভূমিক্ষয় রোধ করা যায় । এ কাজের জন্য ঢালের নিচের দিকে কিছুটা উচু করে আইল বা বাঁধ দিতে হয় ।

সকল প্রকার পদ্ধতিতেই গাছ লাগানোর স্থানে কাঠি বা গেজ দিয়ে চিহ্ করতে হয় । গোজ তুলে দিয়ে ফল গাছের আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন আকারের গর্ত খুড়ে পরিমাণ মত সার দিয়ে গর্ত পূরণ করতে হয় । সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করে অন্তত ৩-৪ সপ্তাহ পরে ঐ গর্তে ফলের চারা রোপণ করতে হয় ।

ফল গাছ রোপনের জন্য নকশা বা রোপনের জন্য সঠিক দূরত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কেননা অপর্যাপ্ত পরিসরে গাছ ভালোভাবে বাড়তে পারে না । ফল কম ধরে ও নিম্নানের হয় । গাছ কাছাকাছি হলে রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ সহজে বিস্তার লাভ করতে পারে । অন্যদিকে অধিক পরিসরে গাছ লাগালে মূল্যবান জমির অপচয় হয়, জমিতে বেশি আগাছা হওয়ার সুযোগ পায়, জমি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় ও ভূমির ক্ষয় হয় ।

ফল গাছ লাগানোর নকশার সুবিধা ও অসুবিধাসমুহ

বর্গাকার পদ্ধতি

সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে সহজ । কেননা মাঠে নকশা প্রণয়নে কোন ঝামেলা হয় না ।

(২) বর্গক্ষেত্রের প্রতি কোণায় একটি করে গাছ লাগানো হয় । তাই প্রতিটি গাছ সমান দূরত্ব পায় এবং সহজে বেড়ে উঠতে পারে ।

(৩) স্বল্পমেয়াদি ও দ্রুতবর্ধনশীল ফল গাছের জন্য এ পদ্ধতি উপযোগী ।

অসুবিধা

(১) সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি এবং বর্ধনশীল ফসলসমূহ এ পদ্ধতিতে লাগানো বিশেষ উপযোগী নয় ।

(২) ফল গাছ লাগানোর কিছু কিছু নকশায় বেশি গাছ লাগানো যায় কিন্তু এ পদ্ধতিতে কম সংখ্যক গাছ লাগানো যায় ।

(৩) গাছ গোলাকার ভাবে চতুর্দিকে বাড়ে ফলে বর্গক্ষেত্রের চার কোণায় লাগানো গাছ হতে বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্র বিন্দু বা মাঝখানের জায়গা অব্যবহৃত থাকে ।

২০২২

আয়তকার পদ্ধতি সুবিধা ও অসুবিধা বর্গাকার পদ্ধতির অনুরূপ

পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতি

সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট জমিতে বর্গাকার বা আয়তকার পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি সংখ্যক গাছ লাগানো যায় ।

(২) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় ।

(৩) এ পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদি গাছের সাথে স্বল্পমেয়াদি গাছের সমস্বয় করা যায় ।

(৪) ফিলার গাছ কেটে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় ।

অসুবিধা

(১) দীর্ঘমেয়াদি গাছের সাথে স্বল্পমেয়াদি গাছের সমস্বয় করে না লাগানো হলে বাগান লাভজনক হয় না ।

(২) পঞ্চম স্থানের ও চার কোণার গাছের ফল বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করতে হয় ।

(৩) এক জাতীয় রোগ ও পোকামাকড় অন্য জাতীয় গাছে পরজীবী হতে পারে ।

ত্রিকোণী বা ত্রিভুজ পদ্ধতি

সুবিধা

(১) তিনদিক থেকে গাছের আন্ত পরিচর্যা সহজে করা যায় ।

(২) বাগান দেখতে সুন্দর দেখায় ।

অসুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয় ।

(২) নকশা করা কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ ।

(৩) জমির অপচয় হয় ।

ষড়ভুজী পদ্ধতি সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে এক গাছ হতে অন্য গাছের দূরত্ব সমান থাকে ।

(২) তিন দিক থেকে বাগানের গাছে আন্ত পরিচর্যা করা যায় ।

(৩) বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা ১৫ % গাছ বেশি লাগানো যায় ।

(৪) এ পদ্ধতিতে লাগানো বাগান দেখতে সুন্দর দেখায় ।

অসুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে অন্যা পদ্ধতি (ভাকার বাদে) অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয় ।

(২) নকশা তৈরি কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ ।

(৩) জমির অপচয় হয় ।

ঢাল বা সিড়ি বাধ পদ্ধতি

সুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে সুষ্ঠ নকশা প্রণয়ন করে গাছ লাগিয়ে ভূমির ক্ষয় কমানো যায়।

(২) এ পদ্ধতিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা দ্বিগুণ গাছ লাগানো যায়।

(৩) গাছ লাগানোর জন্য রেখা তৈরির ফলে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে বিভিন্ন দিকে চলাফেরা করা যায়।

(৪) উচু দিক হতে পাইপ দ্বারা নিচের দিকে সহজে সেচের পানি প্রবাহিত করা যায়।

অসুবিধা

(১) এ পদ্ধতিতে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা গাছের সংখ্যা কম হয়।

(২) নকশা তৈরি কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ।

একক ও মিশ্র ফল বাগান তৈরির পরিকল্পনা

বাংলাদেশে বর্তমানে ৮২.৯০ লাখ হেক্টর জমি থেকে খাবার আসছে প্রায় ১৫ কোটির অধিক জনগাষ্ঠীর। গত ত্রিশ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়েনি। বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করছে গড়ে ৯২৬ জন মানুষ। ফলে মাথা পিছু জমির পরিমাণ একদিকে যেমন কমে যাচ্ছে সেই সাথে কমছে চাষযাগ্য জমির পরিমাণও। অন্যদিকে মোট খাদ্য শস্যের চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সে জন্য অতিরিক্ত খাদ্য ঘাটতি মেটাতে নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশি খাদ্য আমদানি এবং দাতা গোষ্ঠির সাহায্যের ওপর। অন্যদিকে আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ৮০% নানান ভাবে পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদির মত দামি খাবার এই দরিদ্র জনগাষ্ঠীর নাগালের বাইরে। তাই বেশি পরিমান ফল উৎপদান করে পুষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব। একজন মানুষের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থতার জন্য প্রতিদিন ৮৫ গ্রাম করে ফল খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা খাই মান ৫-৩৮ গ্রাম, যা প্রয়োজনরে তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের ফলের প্রজাতি রয়েছে। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম উৎস। মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য ভিটামিন বা খাদ্য প্রান ও খনিজ লবণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশের ফল মৌসুমভিত্তিক। অধিকাংশ ফলই যেমন আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, আনারস এসব বৈশাখ জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ় মাসে পরিপক্ক হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই এদের প্রাপ্যতা শেষ হয়ে যায়।

দেশীয় অনেক অপ্রচলিত ও স্বল্প প্রচলিত ফল যেমন- কুল, আমড়া, আতা, আমলকী, বেল, জলপাই, সফেদা, ডালিম, কামরাঙ্গা, ডেউয়া, কদবেল, জাম্বুরা, কাউ, পেয়ারা, সরিফা ইত্যাদি বছরের বিভিন্ন সময় উৎপাদিত হয়ে থাকে। কাজেই প্রধান ফলের সাথে এসব অপ্রধান ফলের মিশ্র বাগান তৈরি করা গেলে এদিকে যেমন অল্প জমিতে। অধিক ফল পাওয়া যাবে তেমনি সারা বছর ফল ও পুষ্টি জোগানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমাচেনেও তা সহায়ক হবে।

কিভাবে মিশ্র অঙ্গ বাগান তৈরি করবেন

মিশ্র ফল বাগান তৈরির আগে যে বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে তা হচ্ছে এ বাগান থেকে সারা বছরই যাতে কোন না কোন ফল সংগ্রহ করা যায়। বাড়তি আয় করা যায় এবং পারিবারিক পুষ্টি সরবরাহ করা যায়। এ জন্য আগাম, মধ্য ও নাবী জাত লাগিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ফল সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। নিচের ছকে এ ধরনের কিছু জাত উল্লেখ করা হলো।

মিশ্র বহুতর বাগান কি ?

মুলত মিশ্র বহুস্তর বিশিষ্ট বাগান হচ্ছে বিভিন্ন চাষযাগ্য বৃক্ষ, বিরুৎ ও গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতির বৈচির্ত্যসমৃদ্ধ ৩-৪ স্তর বিশিষ্ট উলম্ব ক্যাপনাপি সহযোগে গঠিত উদ্ভিদগুলোর একটি নিবিড় সহাবস্থান। ২০২

মিশ্র বহুস্তর বিশিষ্ট ফল বাগান কাঠামো

আমাদের দেশের ক্রমহ্রাসমান মাথাপিছু জমির কথা চিন্তা করে এই বহুস্তরী ফল বাগান তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় এই বহুতুরী মিশ্র (ফল) বাগানের প্রবর্তক। এখানে ফলদ ও বনজ গাছের সাথে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের মিশ্র চাষের সমন্বয় ঘটানো হয়। এতে কয়েকটি স্তর বিশিষ্ট উলম্ব চাষ বিন্যাস রূপান্তরের মাধ্যমে বহুস্তর বিশিষ্ট ফল বাগান তৈরি করা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বৃক্ষরাজি বিভিন্ন স্তর থেকে সূর্যালোক গ্রহন করে এবং এদের মূল বিভিন্ন গভীরতা থেকে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের (আলো, পানি, পুষ্টি উপাদান) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

বাংলাদেশের জন্য উপযোগী বহুস্তর, বিশিষ্ট মিশ্র বাগান হতে পারে এরকম ভুমি সংলগ্ন লতাপাতা সমৃদ্ধ নিম্নস্তর, বৃক্ষ সমৃদ্ধ উপরের স্তর এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্তর নিয়ে বসতবাড়ির বহুস্তর বাগান।

নিচের স্তরটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে ১ মিটারের কম উচ্চতা বিশিষ্ট সর্ব নিম্ন স্তরে আনারস, তরমুজ, শাকসবজি ও ঔষধী গাছ এবং ১-৩ মিঃ উচ্চতায় কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে। ওপরের স্তরটি দুটি ভাগে ভাগ করে ২৫ মিঃ এর বেশি উচ্চতায় সুউচ্চ বা মন ফলবৃক্ষ যেমন- আম, কাঁঠাল, নারিকেল এবং ১০-১২ মিঃ উচ্চতায় মাঝারি উচ্চতার ফল যেমন- বামন আকৃতির আম, লিচু, সফেদা ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

বহুতর বিশিষ্ট মিশ্র বাগানের জন্য উদ্ভিদ/ফসল নির্বাচন

বহুস্তর বিশিষ্ট মিশ্র বাগানের জন্য উদ্ভিদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বাগানের গাছ লাগানোর জন্য ছায়া পছন্দকারী বা ছায়া সহকারী উদ্ভিদ ফসল চিহ্নিত করতে হবে। নির্বাচিত বিভিন্ন ফসল/উদ্ভিদের সমন্বয় এমন হতে হবে যেন ফসল উৎপাদন চক্র এবং মাত্রা সারাবছর নিয়মিত উৎপাদন বজায় রাখতে পারে। আবহাওয়া ও জলবায়ুগত কারণে বছরে বিভিন্ন সময় ফসল সংগ্রহের পরিমান কম বা বেশি হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটি কিছু না কিছু উৎপাদন যেন থাকে অর্থাৎ বছরের প্রায় সবসময়ই যেন ফলন এবং উপজাত হিসেবে জ্বালানি ও অন্যান্য উপকরন পাওয়া যায়। বহুস্তর বিশিষ্ট মিশ্র বাগানে উৎপাদিত সামগ্রী কৃষকের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে, অতিরিক্ত আয় নিশ্চিত করতে এবং অন্যান্য কৃষি ফসল হানিতে ও দু ফসলের মধবর্তী সময়ে কৃষককে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হবে।

পারিবারিক সদস্যদের ন্যূনতম শ্রমের মাধ্যমেই যেন বাগানে ফসল পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ সম্পন্ন করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাগান রচনার জন্য যে কোন নার্সারী থেকে চারা সংগ্রহ না করে সফল মাতৃগাছের বাগান থেকে বা বিশ্বস্ত নার্সারি থেকে চারা কলম সংগ্রহ করা উচিত।

মিশ্র বহুতর বাগানের সুবিধা

এ ধরনের বাগান পদ্ধতিতে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশের মতো ভূমি স্বল্পতার দেশে এ পদ্ধতির বাগান কৃষিতে এক যুগান্তগাকারী উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে।

ভূমি ছাড়াও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- আলো, মাটির পুষ্টি উপাদান, পানি ইত্যাদির সর্বাধিক ব্যবহার এ পদ্ধতিতে সম্ভব। এ ধরনের বাগান পদ্ধতিতে চাষকৃত বিভিন্ন উদ্ভিদ উলম্বভাবে বিভিন্ন স্তর থেকে সূর্যালোক গ্রহন করে। আমাদের মোট যে সুর্যের আলো পৃথিবীতে আসে তার ২০-৩০ ভাগ ব্যবহার করে উপরের স্তরের ০-৪০ ভাগ ব্যবহার করে মধ্য স্তর অর্থাৎ বিরৎ এবং সর্ব নিম্ন স্তরে থাকে ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ যা বাকি ২০-৩০ ভাগ সূর্যের আলো গ্রহণ করে।

অন্যদিকে এদের মূলতত্ত্ব মাটির বিভিন্ন গভীরতা থেকে মৃত্তিকা পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে যেমন-ছায়া পছন্দকারী উদ্ভিদ যা মাটির ওপরের স্তর থেকে পুষ্টি নেয় । মধ্যম স্তরের উদ্ভিদ মাটির আরো গভীরে থেকে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে । এতে করে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্যও রক্ষা হয় ।

এ উৎপাদন পদ্ধতি আর্থিকভাবে কৃষকের জন্য ঝুঁকিমুক্ত । কেননা কোন কারনে কৃষক এক স্তরের ফসল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হলেও অপরস্তর থেকে ফলন পায় । এছাড়াও বছরব্যাপি এ ধরনের বাগান থেকে অর্থ পাওয়া সম্ভব । কেননা একই জমিতে বিভিন্ন ফসল থাকায় বছরের বিভিন্ন সময়ে তা সংগ্রহ ও প্রয়োজনে বিক্রি করা যায় । এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বৈচির্ত্য সংরক্ষণ করা সম্ভব । একই জমিতে বছরের প্রায় সব সময়ই বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের উপস্থিতি ফসল চাষের বহুমুখিতার পাশাপাশি ফসল তথা উদ্ভিদের বৈচির্ত্যতা আনায়ন করে । নিবিড় চাষ করা হয় বিধায় বসত বাড়ির মহিলারা বা বেকার যুবকরা উৎপাদন কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারে, ফলে বেকার সমস্যা দূরীকরণের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও এ ধরনের বাগান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যাল প্রবর্তিত সফল বহুস্তর/মিশ্র বাগানের মডেলের উদাহরণ- নারিকেল বাগানে ৩ স্তর বিশিষ্ট ফসল চাষ : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ এই ৩ স্তর বিশিষ্ট মিশ্র বাগান তৈরি করেছে । এতে ১ম স্তরে আনারস/আদা/হলুদ, ২য় স্তরে কলা, লেবু, পেঁপে, পেয়ারা এবং ৩য় স্তরে নারিকেল গাছের সমস্বয়ে ৩ স্তর বিশিষ্ট বাগান তৈরি করা হয়, যা অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক ।

চার বছর গবেষণার পর দেখা গেছে নারিকেল থেকে প্রতি বছর হেক্টর প্রতি ৪০,০০০/- টাকার মত আয় হতো । সেই একই বাগানের বহুস্তরী ফসল বিন্যাস (নারিকেল+কলা+আনারস/আদা/কচু) থেকে প্রায় ১,৩০,০০০/- হতে ১,৮০,০০০/- টাকার মতো আয় করা যায় ।

আম বাগানে তিনস্তর বিশিষ্ট ফসল চাষ

আম বাগানে পেঁপে এবং আনারস ভালো জন্মে । আম বাগানে পেঁপে গাছের নিচে আনারস চাষ সফলভাবে সম্ভব হয়েছে । এতে আর্থিক লাভও প্রচুর ।

চার বছর গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রতি বছর শুধুমাত্র আম থেকে হেক্টর প্রতি ৮০ হাজার টাকার মতো আয় হয় । কিন্তু বহুস্তর বিশিষ্ট ফল বাগান (আম+পেঁপে+আনারস) থেকে আমের অনুৎপাদন মৌসুমে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা এবং আমের উৎপাদন মৌসুমে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকার মতো লাভ পাওয়া যায় ।

বহুস্তর বিশিষ্ট মিশ্র ফল বাগান পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা

সর্বাধিক ও সারা বছর ফল পেতে বহুতর বিশিষ্ট ফল বাগানের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি । চারা রোপণ থেকে সর্বশেষ ফল/ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সঠিক উদ্যানতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা আবশ্যক । গাছের নিয়মিত অঙ্গ ছাঁটাই, সার, সেচ, পানি নিস্কাশন ইত্যাদি কাজগুলো সঠিকভাবে করা গেলে প্রতিটি গাছ থেকে ফল ও বিভিন্ন উপজাত সহ সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যাবে (ছক -২) ।

ফল, জ্বালানি, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ ও বহুবিধ কৃষি সামগ্রী পাওয়ার সাথে সাথে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বসতবাড়িতে এবং ফলের বাগানে বহুস্তর বিশিষ্ট মিশ্র ফসল চাষ করা দরকার । উদ্ভাবিত মডেল বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আম, পেয়ারা, সুপারি এবং লিচু বাগানে, পুর্বাঞ্চলের কাঁঠাল বাগানে এবং বাংলাদেশের বনাঞ্চলের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ।

২০২২

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল বাগান পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয় কী কী ?

২। ফল বাগানের জন্য কেন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ?

৩। ফল গাছ লাগানোর পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ ।

৪। মিশ্র বহুস্তর বাগান কি ?

সংক্ষিত প্রশ্ন

১। ফল বাগানের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে লেখ।

২। ষড়ভুজী পদ্ধতিতে ফল বাগানের নকশা বুঝিয়ে লেখ।

৩। ফল বাগান পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে লেখ।

৪। ফল গাছ লাগানোর পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

৫। পঞ্চম সংস্থান পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখ।

৬। বর্গাকার পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল বাগান পরিকল্পনার নীতিমালা বর্ণনা কর।

২। ফল গাছ লাগানোর নকশাগুলোর নাম লেখ। চারা রোপণের জন্য নকশা প্রণয়নের করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলাচনা কর।

৩। বর্গাকার পদ্ধতি সম্পর্কে লেখা একটি আম বাগান করার জন্য ১০ মিটার দূরে দূরে সারি ও ১০ মিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করা হলে ৫ হেক্টর জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে কতটি চারা রোপণ করা যাবে ?

৪। কুইনকাংশ প্রনালীর ব্যাখ্যা কর।

৫। একক অথবা মিশ্র বাগান তৈরির পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। ফল বাগানের গাছ রোপণ প্রণালির গুরুত্ব কী ? ফল বাগানের বিভিন্ন গাছ রোপণ প্রণালি বর্ণনা কর।

২০২২

সপ্তম অধ্যায়

ফল গাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ

বাগানে পরিমিত পরিমাণ ফলন পেতে হলে চারা রোপণের জন্য গর্ত করা এবং গর্তে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা অপরিহার্য। চারা গাছ লাগানোর সময় নির্দিষ্ট আকারের গর্ত খনন করা আবশ্যক। তবে গর্তের আকার নির্ভর করে চারার আকার ও গাছের প্রজাতির ওপর। জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপনের প্রণালি মোতাবেক ফিতা বা মাপ কাঠির মাধ্যমে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের জন্য স্থান চিহ্নিত করতে হবে। এরপর সঠিক স্থানে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত খনন করে খননকৃত মাটি চার পাশে ছড়িয়ে রাখতে হবে। যেন গর্তের মাটি ভালোভাবে রোদ শুকায়। চারা লাগানোর কম পক্ষে দু সপ্তাহ আগে গর্ত তৈরি করা উচিত। এতে করে গর্তের মাটি উন্মুক্ত থাকে এবং রোদর তাপে জীবাণুসমূহ মারা যায় ও অনেক বিষাক্ত পদার্থ অপসারিত হয়। এর ফলে চারা লাগানোর পর রোপণজনিত ধকল সহ্য করে গাছ বেড়ে উঠতে পারে।

গর্তে সার প্রয়োগ

গর্ত তৈরির এক সপ্তাহ পরে গর্তের মাটির সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার মিশিয়ে মাটি ও সারের মিশ্রন দ্বারা গর্ত পূরণ করতে হবে। প্রতি গর্তে সারের পরিমান নির্ভর করে মাটির উর্বরতা, গাছের প্রজাতি, গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ইত্যাদির উপর। সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত পূরণ করতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার পর গর্তে গাছ লাগানোর জন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

ফল গাছ রোপণের জন্য গর্ত তৈরির কৌশল

বাগানে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ফলন পেতে হলে চারা রোপণের জন্য গর্ত করা এবং গর্তে পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা অপরিহার্য। চারাগাছ লাগানোর সময় পরিমিত আকারের গর্ত খনন করা আবশ্যক। তবে গর্তের আকার নির্ভর করে চারার আকার ও গাছের প্রজাতির ওপর ফল গাছের চারা রোপণের জন্য অন্তপক্ষে ৩টি কাজ করা আবশ্যক। যথা

(ক) সঠিক সময়ে ও সঠিক মাপে গর্ত খনন ।

(খ) গর্তে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ ও

(গ) গাছের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক চারা রোপণ ও পরিচর্যা।

ক) গর্ত খনন: চারা রোপনের জন্য গর্ত খননের গভীরতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত আছে। গর্ত বর্গাকার ও অগভীর হলে চারার শিকড় কুন্ডলী পাকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তবে যতদূর সম্ভব গর্ত যথেষ্ট গভীর ও চওড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়। চারা অবস্থায় শিকড় দুর্বল থাকে তাই গর্তের চারিপাশের শক্ত মাটিভেদ করে সহজে খাদ্য ও রস সংগ্রহ করতে পারে না। গর্তের আকার বড় করে এবং উপরের মাটি নিচে দিয়ে গর্ত ভর্তি করে দিতে হয়। এতে দুর্বল ও নরম মূলসমূহ নরম মাটি হতে সহজে রস নিয়ে তাড়াতাড়ি বড় হতে পারে। অনুর্বর মাটিতে এই পদ্ধতি অনুশীলন অত্যন্ত ফলপ্রসু। শুষ্ক ও বৃষ্টিপাতহীন অঞ্চলের মাটিতে শক্ত ও অপ্রবেশ্য স্তর থাকে। এক্ষেত্রে শক্তিশালী বিস্ফোরক ব্যবহার করে শকুন্তর ভেঙ্গে দিয়ে ভালভাবে গাছ জন্মানো যায়।

বৃক্ষ জাতীয় গাছের জন্য ৫ ফুট ব্যাস ও ৪ ফুট গভীর করে গর্ত করা যায়। গর্ত খননের পর উপরের মাটি নিচে দিয়ে গর্ত পুরণ করতে হয়। এতে গাছের শিকড় খুব ভালোভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে। বড় গর্তে রোপণকৃত গাছের শিকড় ১ বৎসরে ৭.৫ ফুট গভীরে এবং পাশে ৬ ফিট পর্যন্ত ছড়াতে পারে। অথচ ছোট গর্তে রোপণকৃত গাছের শিকড় ১ বৎসর ২ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

চারা রোপণের জন্য এক সপ্তাহ্ হতে প্রায় একমাস পূর্বে গর্ত খননে অনেকক্ষেত্রেই তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে । বেশি আগে গর্ত খনন করে রাখলে গর্তের পাশের ও তলদেশের মাটি শক্ত হয়ে যায় । এরূপ ক্ষেত্রে চারা রোপনের আগে পুনরায় গর্ত খনন করে নিতে হয় ।

অনুর্বর মাটিতে গর্তের উপরের মাটির সাথে সার মিশিয়ে নিচে দিয়ে গর্ত ভরাট করা হলে গাছের তেজ বেশি হয় । কিন্তু চারার গোড়ার চারপাশে যদি নিয়মিত সারযুক্ত মাটি প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে গাছের বৃদ্ধি আস্তে আস্তে কমে যায় ।

ফল গাছ রোপণের জন্য জাত ভেদে গর্ত করার সময়

বর্ষাকাল অর্থাৎ মে থেকে জুলাই মাস জাত ভেদে সকল ধরনের চারা লাগানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময় । চারা লাগানোর পর এ সময় সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না । বর্ষা বেশি হলে বর্ষার পরও চারা লাগানো যেতে পারে । মেঘলা দিনে বা বিকালের দিকে চারা লাগানো ভালো । পানি সেচের ব্যবস্থা থাকলে বসন্তের প্রথমে ও চারা লাগান যায় । জাতভেদে সকল ধরনের ফল গাছ রোপণের জন্য বর্ষার আগে অর্থাৎ বৈশাখ - জৈষ্ঠ মাসে গর্ত করা উত্তম । গাছের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ এবং শিকড়ের বৃদ্ধির জন্য গাছ রোপণের আগে গর্ত করা একান্ত প্রয়োজন । ভিন্ন ভিন্ন গাছের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের এবং আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে । সাধারণত কোন গাছের জন্য কি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে, তা নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে । যথা

ক) গাছের আকৃতি

খ) শিকড়ের গভীরতা

গ) শিকড়ের বিস্তৃতি

ঘ) চাষের মেয়াদকাল

ঙ) গাছের খাবারের চাহিদা ইত্যাদির ওপর

গাছের আকার, মৌসুম ও মাটি ভেদে গর্তের আকার ও আয়তন

জমি তৈরি সম্পন্ন হলে রোপণ প্রণালি নির্বাচিত করে নির্দিষ্ট দূরত্বে গাছ লাগান উচিত । গাছ লাগানোর জন্য নির্বাচিত স্থানে গর্ত করা উচিত । গর্ত তৈরির জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে ।

গর্ত তৈরির ধাপ : গর্ত তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন- কোদাল, বেলচা, খুন্তি ইত্যাদি আগেই যোগাড় করতে হবে ।

১) জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিতে হবে । মাপ দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে ।

২) চারা রোপণের ২০-৩০ দিন আগে গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে পরিমাণ মত সার দিয়ে মাটি ভরাট করে দিতে হবে । গর্তের মাটি এমন ভাবে চেপে দেওয়া দরকার যাতে মাটি আলগা না থাকে ।

৩) যে সব জায়গায় উইপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে সেখানে উইপোকা প্রতিরোধক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে ।

৪) গাছের আকৃতি বিবেচনা করে গর্তের ব্যাস ও গভীরতা নির্ণয় করতে হবে । যেমন- (ক) ছোট আকারের গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে ৫০ সেমি এবং গভীরতা হবে ৫০ সে:মি: (খ) মাঝারি আকারের গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে ৬০ থেকে ৭৫ সেমি এবং গভীরতা হবে ৬০-৭৫ সে:মি: (গ) বড় বা বৃক্ষজাতীয় গাছের জন্য গর্তের ব্যাস হবে প্রায় ১ মিটার এবং গভীরতা হবে প্রায় ১ মিটার ।

ছক: গাছের আকৃতি অনুযায়ী চারা লাগানোর গর্তের মাপ ও চারার দূরত্ব

গাছের আকৃতি	চারা লাগানোর গর্তের মাপ	এট চারা থেকে আরেকটি চারার দূরত্ব	গর্ত খনন বা রোপণের মৌসুম
(ক) বড় বা বৃক্ষজাতীয় গাছ আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, বেল তেঁতুল ইত্যাদি)	১ মিটার ব্যাস ও ১ মিটার গভীর বা ৯০×৯০ সে.মি.	৭-৮ মিটার	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন পর্যন্ত
(খ) মাঝারি গাছ (পেয়ারা, আতা, শরিফা, সফেদা, লেবু, ডালিম,লীচ,জামরুল, জাম্বুরা, অরবরই ইত্যাদি ।	৬০ সে.মি. মিটার ব্যাস ও ৬০ সে.মি.গভীর বা ৭৫২৭৫ সে.মি,	৪ মিটার	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র আশ্বিন পর্যন্ত
(গ) ছোট গাছ (কলা, পেঁপে, সুপারি ইত্যাদি)	৫০ সে.মি. ব্যাস ও ৫০ সে.মি. গভীর	২ মিটার	বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ
(ঘ) খুব ছোট (আনারস, স্ট্রবেরী ইত্যাদি)	১৫ সে.মি, ব্যাস ও ১৫ সে.মি. গভীর	৩০ সে.মি	বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ

মাটির বুনট বুঝে গর্তের আকার কম বা বেশি করা যেতে পারে । যেমন- বেলে দোআশ মাটির জন্য গর্তের আকার কিছুটা ছোট করা যেতে পারে । কেননা বেলে মাটিতে গর্ত বড় করা হলে চারিপাশের পাড় ভেঙ্গে গর্ত ভরাট হয়ে যেতে পারে । আবার এটেল বা এটেল দোআঁশ মাটির জন্য গর্তের আকার কিছুটা বড় করা যেতে পারে । বৃক্ষ শ্রেণীর গাছের জন্য ৫ ফুট ব্যাস ও ৪ ফুট গভীরতাবিশিষ্ট গর্ত খনন করা যেতে পারে । বড় গর্তে রোপণকৃত চারার শিকড় ১ বছরে ৭.৫ ফুট গভীরে এবং পাশে ৬ ফুট পর্যন্ত ছড়াতে পারে । অথচ ছোট গর্তে রোপণকৃত গাছের শিকড় ১ বছরে ২ ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । কারন ছোট গর্তের চারদিকের শক্ত মাটির স্তুর থাকে ।

(৫) গর্ত খনন করার সময় গর্তের খননকৃত মাটি ছড়িয়ে রেখে শুকায়ে নেওয়া ভাল । গর্তের উপরিভাগে ১৫ সেমি দুইভাগ মাটি (ছবি 'ক' অংশে) একদিকে রাখতে হবে । অনুরূপভাবে গর্তের নিচের দিকের ভাগ মাটি (ছবি 'খ'অংশে । অন্য দিকে রাখতে হবে । গর্তের উপরের দিকের মাটিতে জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে থাকে ।

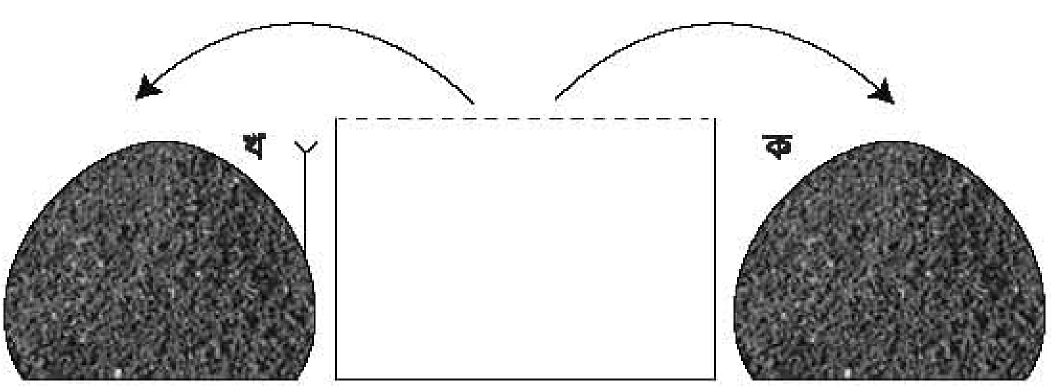

চিত্র: গর্তের মাটি রাখার পদ্ধতি (বাম দিকের 'ক' অংশে এবং ডান দিকের 'খ' অংশে)

(৬) গর্তের উপরের মাটির সাথে প্রয়োজনীয় সার মিশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি নিচে দিতে হবে। আর নিচের অংশের আলাদা করে রাখা মাটি গর্তের উপরিভাগে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি বেশি উর্বর। উপরের মাটি নিচে দিলে গাছ দ্রবত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান তাড়াতাড়ি পাবে।

গর্তে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা

ফল গাছে সার প্রয়োগের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্য গাছের চেয়ে ফল গাছে মাটি হতে প্রচুর খাদ্য ও পুষ্টি টেনে নেয় এবং এই পুস্টি ক্রমাগত কমার ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায়। ফলে মাটির উৎপাদনক্ষমতা হ্রাস পায়, ফলশ্রুতিতে ফলন কমে যায়।

সব গাছের সমান পরিমাণ খাবার লাগেনা। আবার গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরিমাণ পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর ফল গাছের সারের মাত্রা নির্ভর করে।

১। ফল গাছের ধরন ২। গাছের আকার ও বয়স ৩। ফলের জাত ৪। গাছের বৃদ্ধির স্বভাব ৫। গাছের বৃদ্ধির পর্যায় ৬। আবহাওয়া ৭। উৎপাদন মৌসুম ৮। মাটির প্রকৃতি উর্বরতা শক্তি ৯। সার ব্যবহার পদ্ধতি ১০। চাষাবাদ পদ্ধতি ১১। সেচ ব্যবস্থাপনা ১২। জমির ফসল বিন্যাস

সার ব্যবহারে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং ফলের উৎপাদন বেড়ে যায় কিন্তু মনে রাখা প্রয়াজোন যে ত্রুটিপূর্ণ সার ব্যবহারের ফলে গাছের ক্ষতিও হতে পারে। অসময়ে গাছে সার ব্যবহার কররে গাছের ফল ধারন ব্যহত হতে পারে। তাই সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে পরিমাণে সার ব্যবহার করা উচিত।

গর্তে সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

গাছের (ছোট বা বড় আকৃতির ওপর নির্ভর করে ছকে (ছক-১) বর্ণিত ও অন্যান্য নিয়ম মোতাবেক গোবর বা কম্পাস্টে সার, হাড়ের গুড়া বা টিএসপি সার, ছাই বা এমপি সার মাটির সাথে মিশাতে হবে।

চারার উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য গর্তে সময়মত সার ব্যবহারের ফলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয় এবং ফল ধরার পরিমান বেড়ে যায়। এছাড়া অসময়ে সার ব্যহার করা হলে সারের অপচয় হয় এবং গাছের ফল ধারণে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করার পর মাটি শুকনা থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে। ১০-১২ দিন পর গাছ লাগাতে হয়। কেননা সার প্রয়োগের পর পর চারা লাগানো হলে রাসায়নিক সারের বিক্রিয়ায় চারা মারা যেতে পারে। রাসায়নিক সার গর্তের নিচের ৩০ সেমি. মাটির সাথে মিশানো উত্তম। গাছের আকার বিবেচনা করে হাড়ের গুড়ার পরিবর্তে তার অর্ধেক পরিমান টিএসপি এবং ছাই এর পরিবর্তে প্রতি কেজি ছাই এর জন্য ১০০ গ্রাম এমপি সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছক– ১ গাছের আকৃতির ওপর নির্ভর করে গর্ত তৈরির সময় সার প্রয়োগের পরিমাণ

গাছের আকৃতি	গর্তে সারের পরিমাণ (কেজি)		
	গোবর	হাড় গুড়া	লাকড়ী কাঠের ছাই
বড় গাছ	২০-৪০	১	১
মাঝারি গাছ	১৫	১১.৫	১
ছোট গাছ	১০	১.৫	১.৫
খুব ছোট গাছ	৫	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল বাগানে চারা রোপনের জন্য গর্ত খনন এবং গর্তে পরিমাণমত সার প্রয়োগ অপরিহার্য কেন ?

২। চারা রোপনের জন্য গর্তের আকার কী কী বিষয়ে উপর নির্ভর করে ?

৩। গর্তে সার প্রয়োগের মাত্রা কিসের উপর নির্ভর করে।

৪। চারা কলমের ফুল ভেঙে দেওয়া হয় কেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল বাগানে গর্ত তৈরির কৌশল বর্ণনা কর।

২। ফল বাগান গর্ত খননের দূরত্ব ও গর্তের আকার আকৃতি কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে লেখ।

৩। ফল বাগান গাছ রোপণের জন্য জাত ভেদে গর্ত করার সময় উল্লেখ কর।

৪। ফল বাগানে গর্তে সার প্রয়োগের মাত্রা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে লেখ।

৫। কীভাবে চারা লাগানোর জন্য গর্ত করতে হয় আলোচনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল বাগানে গাছ লাগানোর জন্য গর্তকরণ ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে লেখ।

২। ফল চাষে গর্ত তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।

৩। ফল বাগানে চারা রোপনের জন্য গাছের আকার, মৌসুম ও মাটি ভেদে গর্তের আকার ও আয়তন সম্পর্কে বর্ণনা করা।

৪। ফল চাষে গর্তে সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৫। গর্তে সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

ফলের চারা কলম রোপণ এবং পরিচর্যা

বর্ষাকাল অর্থাৎ মে- জুলাই মাস চারা লাগানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কারণ চারা লাগানোর পর এ সময় সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বর্ষা বেশি হলে বর্ষার পরও চারা লাগানো যেতে পারে। মেঘলা দিনে বা বিকেলের দিকে চারা লাগানো ভালো। নার্সারি হতে চারা সংগ্রহ করে লাগাতে দেরি হলে ছায়ায় রেখে দেওয়া যেতে পারে।

রোপণের জন্য চারা/কলমের বৈশিষ্ট্য

সতেজ চারা থেকেই সব সময় সবল ও পর্যাপ্ত ফলনের আশা করা যায়। কখনই দুর্বল, রোগাক্রান্ত চারা ভালো শেকড় গঠনের জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়। কলম থেকে চারা বা বীজ থেকে চারা তৈরি করার পর দু' এক বছর নার্সারিতে পালন করা দরকার। নার্সারি থেকে তোলা চারা বেশ সবল ও দু তিন বছরের পুরানো হওয়া দরকার। চারা গাছ মূল জমিতে বসানোর আগে গাছের দূরত্ব ঠিক রাখা দরকার। যাতে গাছ বড় হয়ে পরস্পর লেগে না যায়। যে গাছ বড় হয়ে পাশে যতটা জায়গা দখল করে বিস্তার লাভ করে সেই গাছের জন্য ততটুকু জায়গা বা দূরত্ব রাখা প্রয়োজন। গাছের আকৃতি বা মাপ অনুযায়ী চারা বসানোর গর্তের মাপও বড় বা ছাট হবে।

রোপণের জন্য চারা/কলম নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

১। নির্বাচিত চারা/কলম সুস্থ, সবল ও সতেজ হতে হবে

২। চারা/কলম রোগ ও পোকার আক্রমণ মুক্ত হতে হবে।

৩। চারাটি/কলমটি স্বাভাবিক আকৃতির হতে হবে।

৪। চারা/কলমের কাণ্ড সোজা ও পাতা স্বাভাবিক সবুজ হতে হবে ।

৫। চারার/কলমের গোড়া সুঠাম হওয়া উচিত।

৬। নার্সারি হতে সংগ্রহীত চারা দুই/তিন বছরের পুরনো হওয়া দরকার।

৭। চারার শিকড় দুর্বল হলে ছায়ায় ২/১ বছর পালন করে শিকড় শক্ত করে নিতে হবে।

৮। নির্বাচিত স্থানের মাটির গুণাগুণ অনুসারে চারার প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। যেমন– রাজশাহীতে আম, লিচু, সিলেটে কমলালেবু, আনারস ইত্যাদি।

৯। চারার গোড়ার মাটি ও মুল ভেজা থাকবে এবং প্রধান শিকড় অক্ষুণ্ণ থাকবে।

১০। নির্বাচিত স্থানটি ছায়াযুক্ত হলে ছায়া সহ্যশীল চারা নির্বাচন করতে হবে।

১১। চারার কাণ্ড সোজা হতে হবে এবং চারা কলম খুব বেশি বয়সের হবে না।

বীজ তলা থেকে চারা/কলম উঠানো এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়ানোর জন্য করণীয় বিষয়গুলো

বীজতলা হতে চারা উত্তোলনের জন্য অন্তত একমাস পূর্বে চারাকে সতর্ক করে নিতে হবে। যাতে চারাটি লাগানোর জন্য উঠানোর ঝুঁকি সহ্য করতে পারে। প্রথমে যে চারাটি তুলতে হবে তার গোড়ার চারদিকে কতদূর পর্যন্ত এবং কি পরিমান মাটিসহ বল আকারে তোলা হবে তা আগেই চিহ্নিত করতে হবে। এরপর চিহ্নের চারদিকে না খুড়ে চারার বা বেশি চারা লাইনে থাকলে, লাইনের কেবল একদিকে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে খুড়ে বা চারার অবস্থাভেদে দূরত্ব কম বেশি করে প্রধান শিকড়ের সাথে খাড়াভাবে গর্ত করতে হবে। এই গর্তটি সাধারনত চারার গোড়া হতে ১০ সেঃমিঃ দূর দিয়ে ৩০ সেঃমিঃ গভীর পর্যন্ত হতে পারে। গর্তটি যথেষ্ট নিচে গেলে চারার প্রধান মূলটি পাশ দিয়ে খুড়ে বের করে কেটে দিতে হবে।

প্রধান মূল কাটার এ পদ্ধতিকে চারা খাসি করন বলে। যে স্থানে মূলটি কাটা হবে সেখানে সাধারণত ২.৫৪ সেঃমিঃ পরিমাণ কেটে সরিয়ে দিতে হবে। অতঃপর গর্তটি ঝুরে ঝুরে মাটি দিয়ে হালকাভাবে জমাট করে দিতে হবে।চারার প্রধান মূল কেটে সর্তকীকরনের পর প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে মূলের কাটাস্থানের চারদিকে অনেক গুলো শিকড় গজাবে। চারা উঠানোর সময় চিহ্নিত স্থান বরাবর পূর্বে যেদিকে গর্ত খুড়া হয়েছিল তার বিপরীতে দিকে অনুরুপ ভাবে অর্ধবৃত্তাকার ভাবে গর্ত খুড়তে হবে। এভাবে দ্বিতীয়বার গর্ত খুঁড়ার পর খুপরি বা অগারের সাহায্যে মাটির বলসহ চারা অনায়াসেই উঠানো যাবে। চারা বড় হলে মাটির বলের আকার বড় হবে এবং চারা ছোট হলে মাটির বলের আকার ছোট হবে। আবার বড় চারা বেশি দূরে নিতে হলে মাটির বলের আকার যতদূর সম্ভব ছোট করতে হবে। চারার প্রধান শিকড় গাছের বৈশিষ্ট্য এবং পাশে শিকড়ের বিস্তৃতির ওপর নির্ভর করেও বলের আকার ছোট বড় করতে হবে। সাধারনত বৃক্ষ জাতীয় গাছের ২ থেকে ৩ বছরের চারার জন্য ২৫ থেকে ৩০ সেঃমিঃ ব্যাস বিশিষ্ট এবং ২০ থেকে ২৫ সেঃমিঃ গভীর মাটির বলই যথেষ্ট।

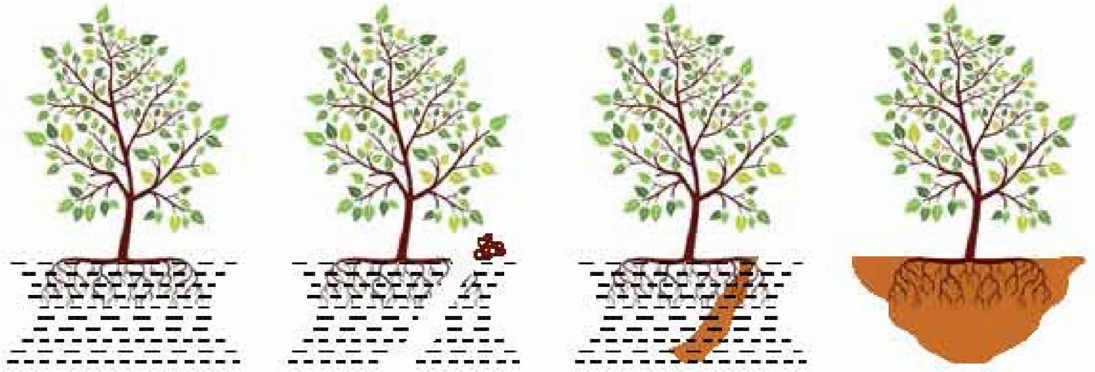

চিত্রঃ চারা উত্তোলনের জন্য গর্ত করা (চারা সতর্কীকরণ) ও চারা খাসিকরণ

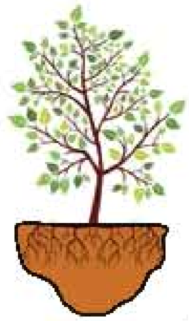

চিত্রঃ চারার বল তৈরি

গাছের আকৃতি	বলের আকার		মন্তব্য
	বলের ব্যাস	বলের গভীরতা	
বড় গাছ	২৫- ৩০ সেঃমিঃ	২৫- ৩০ সেঃমিঃ	চারার গোড়ার ব্যাসের ওপর নির্ভর করে বলের আকার বড় ছোট করতে হয় ।
মাঝারি গাছ	১৫- ২৫ সেঃমিঃ	২০- ২৫ সেঃমিঃ	
ছোট গাছ	১০- ১৫ সেঃমিঃ	১৫- ২০ সেঃমিঃ	
খুব ছোট	চারার গোড়া খোলা থাকে ।	শিকড়ের মাথা ছোট নেয়া হয় ।	অনেক সময় চারার গোড়ায় শুধু কাদা মেখে দেওয়া হয় ।

ছকঃ গাছের আকৃতির উপর নির্ভর করে চারার গোড়ার মাটির বলের আকার

যে সব চারার শিকড় খোলা বা গোড়ায় মাটি থাকবে না সেগুলো উঠানোর আগে কোদাল বা খুরপি দিয়ে মাটি আলগা করে নিতে হবে । এরপর সাবধানে চারা টান দিয়ে উঠাতে হয় । তবে খেয়াল রাখতে হবে যে চারার গোড়ার ছোট শিকড় গুলো যেন ছিড়ে না যায় বা নাড়া চাড়ায় লোমশ শিকড়গুলো শুকায়ে না যায় । ছোট এবং লোমশ শিকড় গুলোকে রক্ষা করতে হলে কালামাটি দিয়ে শিকড় আবৃত করে দেওয়া যেতে পারে চারা দূরে স্থানান্তর করা হলে চারাগুলোকে ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং খড়কুটা দিয়ে গোড়া ঢেকে হালকা সেচ দিতে হবে ।

চিত্রঃ নগ্ন চারা উঠানো

চারা উঠানো বা স্থানান্তরের সময় কোন শিকড় ভেঙে বা দুমড়ে মুচড়ে গেলে তা কেটে দিতে হয়। চারার শিকড় যদি পাকানো বা কুণ্ডলী আকারে থাকে তাহলে কিছু কিছু শিকড় ছেটে দিয়ে লাগাতে হয়। অন্যথায় চারা লাগানোর পর মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিত্রঃ চারার কুণ্ডলী পাকানো শিকড় ছেটে দেয়া

চিত্রঃ ভাঙা বা মুচড়ে যাওয়া শিকড় ছেটে দেওয়া

চারার কুণ্ডলী পাকানো শিকড় কেটে দেওয়া চারা লাগাতে দেরি হলে বা চারা দূরে স্থানান্তর করতে হলে কতগুলো বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন চারার গোড়ার মাটির বল কলার শুকনো খোলে, খড়, নাড়া, নারিকেলের শুকনো পাতা বা চট দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। এমনকি শুকনো ঘাস জড়িয়েও বেধে দেওয়া যাবে। এতে চারার গোড়ার মাটির বল ভাঙার কোন সম্ভাবনা থাকে না এবং চারা বেশিদিন ধরে রাখা যায়।

চিত্রঃ মাটির বলসহ চারা উঠানো ও চারার বলে নারিকেল পাতা বাঁধা

চারা/কলম রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

প্রথমে চারা রোপণের জন্য স্থান চিহ্নিত করে নিতে হবে। তারপর চিহ্নিত স্থানে গর্ত করে সার মিশানো মাটি দিয়ে ভরাট করে প্রায় দু সপ্তাহ রেখে দিয়ে চারা লাগাতে হবে। গর্তের স্থানটি শনাক্ত করার সুবিধার্থে রোপণ তক্তা/প্লান্টিং বোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। এ তক্তার মাঝখানে ১টি এবং দু মাথায় ২টি ছিদ্র থাকে। গর্ত তৈরির পূর্বে তক্তার মাঝের ফুটোতে চারার স্থান নির্দেশক খুটি ঢুকায়ে তক্তা মাটিতে বসাতে হবে। এরপর তার দু মাথায় ছিদ্রে ২টি খুটি ঢুকিয়ে তক্তা উঠায়ে মাঝখানের খুটির স্থানে গর্ত খোড়া যায়। চারা লাগানোর সময় খুটি দুটো তক্তার দুপাশের ছিদ্র দিয়ে ঢুকালে মাঝখানের ফুটো দিয়ে চারার চিহ্নিত স্থান পাওয়া যাবে।

চারা গর্তে রোপণের সময় সার মিশ্রিত মাটি গর্তে আগে থেকে যা ভরাট করে রাখা ছিল তা আলগা করে নিতে হবে। এরপর চারার শিকড় যতটুকু পাশে এবং গভীর বিস্তৃত ছিল গর্তে ততখানি বিস্তৃত ও গভীর দিয়ে আস্তে আস্তে ঝুর ঝুর মাটি চাপা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চারার গোড়া পূর্বে যতটুকু মাটির গভীরে ছিল এখানেও যেন ততটুকু গভীরে থাকে। চারা গর্তে লাগানোর সময় কোন শিকড় উপরের দিকে উল্টায়ে থাকলে চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। লাগানো চারার গোড়ার মাটি চারিপাশ থেকে সামান্য উঁচু করে দিতে হয়।

কোনান চারার গোড়া নিচু হলে বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধতা হতে পারে, যা ক্ষতিকর। আবার লাগানো চারার গোড়ার মাটির ভালভাবে চেপে না দিলে বৃষ্টির। পানিতে চারার গোড়া নিচু হয়ে যেতে পারে। ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে চারা নড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে খুঁটি পুতে চারা বেঁধে দিতে হবে।

চারা লাগালো পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চারার যত্ন নিতে হবে। তাতে চারা তাড়াতাড়ি মাটিতে সহজে লেগে যেতে পারে। চারা লাগানো পর পরই প্রথম কিছুদিন ঝাঁঝরি দিয়ে চারার গোড়ায় হালকাভাবে সেচ দেয়া উচিত। লাগানো চারা নতুন অবস্থায় মাটি হতে রস শোষণ করে তার পাতার সাহায্যে যে বাষ্পীভবন হয় তা সমতা রক্ষা করতে পারে । আর তাই পাতার সাহায্যে বাষ্পীভবনের চেয়ে রস শোষেন কম হলে চারা ঝিমিয়ে পড়ে। এমনকি পাতার বাষ্পীভবন হার নিয়ন্ত্রণ করা না হলে চারা মারা যেতে পারে। বাষ্পীভবন নিয়ন্ত্রণের জন্য চারার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা এবং গোড়ার মাটি শুকনো খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া পাতা কেটে কিছু কিছু ডাল ছেটে দিয়েও বাষ্পীভবনের হার কমানো যেতে পারে।

চিত্রঃ চারার উপর বা নেট ছায়া প্রদান

চির সবুজ (আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি) জাতীয় গাছের চারা লাগানোর সময় প্রধান কাণ্ড ছাড়া অন্যান্য ডাল পালা ও পাতা ছেটে দেয়া যায়। তবে ডালপালা ছাঁটার সময় ফল জাতীয় গাছের আকৃতিও বিবেচনা করতে হয়। চির সবুজ (আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি) জাতীয় গাছের চারা লাগানোর সময় প্রধান কাণ্ড ছাড়া অন্যান্য ডালপালা ও পাতা হেঁটে দেয়া যায়। তবে ডালপালা ছাঁটার সময় ফল জাতীয় গাছের আকৃতি ও বিবেচনা করতে হয়। রোপণের জন্য নির্বাচিত চারার শুধু একটি প্রধান কাণ্ড রেখে অনেক সময় অন্যান্য ডাল পালা হেঁটে দেওয়া যেতে পারে। ফল সংগ্রহের সুবিধার জন্য ভূ-পৃষ্ঠ হতে অন্তত ৪৫ সে:মি: বা তার চেয়ে উপরে প্রধান কাণ্ড কেটে দিতে হবে। প্রধান কাণ্ড বেশি লম্বা হলে সূর্যের তাপে পুড়ে যেতে পারে। এ ধরনের কাণ্ডকে সূর্যপোড়া হতে রক্ষার জন্য কাগজ বা খড় কুটা দ্বারা জড়ায়ে বেঁধে দিতে হবে।

অথবা চুনের গোলা দিয়ে লেপ দিতে হবে। খড়কুটার চেয়ে চুনের গোলা ব্যবহার করা উত্তম। কেননা খড়কুটায় উঁই পোকার আক্রমণ হতে পারে। চারা রোপণের অব্যবহিত পরে কয়েকদিন চারার গোড়ায় ঝাঝরি দিয়ে পানি দেওয়া উচিত। চারার গোড়ায় শুকনা খড় দিয়ে ঢেকে দিলে রস সংরক্ষণ হয় এবং উপরে ছায়ার ব্যবস্থা করলে উপকার হয়। চির সবুজ জাতীয় গাছের চাইতে পাতা ঝরা (বেল, আতা, শরিফা, আমড়া ইত্যাদি) জাতীয় গাছের চারা উঠানোর পর দেরিতে লাগালেও তেমন অসুবিধা হয় না।

ডাল পালা কাটা

ডালপালাসহ চারা

চিত্রঃ চারা গাছের ডালপালা ছেঁটে দেয়া

চারার গোড়ার মাটি যাতে শক্ত হতে না পারে সে জন্য মাঝে মাঝে নিড়ানী দিয়ে আলগা করে ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। চারার গোড়ার চারিদিকে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হয়। বিশেষ করে অগভীর মূলবিশিষ্ট চারার জন্য শুষ্ক মৌসুমে ঘন ঘন পানি সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয়।

নারিকেল গাছের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। পানি সেচের তেমন সুযোগ না থাকলে চারার গাড়ায় মাটি মালচিং করে শুকনো ঘাস বা খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তাতে অনেকদিন ধরে মাটিতে রস সংরক্ষণ হবে।

কলমের চারায় অনেক সময় নতুন অবস্থায় ফুল আসে, চারার গোড়া হতে নতুন ডালপালা গজায়। গাছের প্রকৃতি বুঝে ডালপালা ছেটে দিতে হয়। নতুন অবস্থায় চারাগাছে ফুল আসলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এসময় ফুল ভেঙ্গে দিতে হয়। দুই তিন বছর পর্যন্ত চারার কলমের ফল ভেঙ্গে দিতে হয়।

চারা লাগানোর সাথে সাথেই চারার সমান্তরাল করে পাশই একটি খুঁটি পুঁতে রশি দিয়ে চারাটি বেঁধে দিতে হবে। এর ফলে ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টিপাত বা গরু ছাগলের ধাক্কায় চারাটি কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

২০২২

চিত্রঃ চারাটিকে একটি সমান্তরাল খুঁটির সাথে বেঁধে দেয়া

গাছে সার প্রয়োগ করা যায়। সার দেয়ার পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গর্ত বা নালা করা হলে তা সারমিশ্রিত মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। সার দেয়ার পর হালকা পানি দেয়া উচিত। তাহলে সার থেকে খাদ্য উপাদান গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারবে।

ছকঃ চারা লাগানোর পর থেকে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত গাছ প্রতি জৈব সারের পরিমাণ (কেজিতে)

গাছের আকৃতি	রোপণের এক বছর পর গোবর সার	প্রতি বছর বাড়াতে হবে গোবর সার	১৫ বছর পর গোবর সার
১। বড় গাছ	১০	১০	২৫
২। মাঝারি গাছ	৫	৭	২০
৩। ছোট গাছ	৫	-	-
৪। খুব ছোট গাছ	২	-	-

চিত্রঃ চারা কলমের ফুল ভেঙে দেয়া

সাধারণত চারা রোপণের পূর্বে গর্তে যে পরিমাণ সার দেয়া হয় তার অর্ধেক পরিমাণ সার বর্ষার শুরুতে একবার এবং বর্ষার শেষে বাকি অর্ধেক দিতে হবে। পরবর্তীতে চারার বৃদ্ধির সাথে সাথে বৎসরওয়ারী সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এভাবে চারা লাগানার পর হতে ফলবান হওয়া পর্যন্ত যত্ন নিতে হবে, যাতে গাছ সুস্থ, সবল ও সতেজ থাকে।

সার প্রয়োগের সময় চারার একেবারে গোড়ায় সার দেওয়া উচিত নয়। চারা বা ছোট গাছের ক্ষেত্রে চারার গোড়া বা কমপক্ষে ০.৫ মিটার ও বড় গাছের ক্ষেত্রে ১ মিটার দূর দিয়ে সার ব্যবহার করতে হবে। তবে সাধারণত চারা পাতা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে ঠিক ততদূর পর্যন্ত দূর দিয়ে সার দিতে হবে। কারণ পাতার বিস্তৃতির সাথে সাথে শিকড়ের বিস্তৃতির একটা সম্পর্ক আছে। শুধু মাটির উপর সার দিলে সারের অপচয় হবে। তাই দুপুর বেলায় যত গাছের ছায়া পড়ে ততদূর দিয়ে বৃত্তাকারে দাগ দিয়ে নিয়ে সেটুকু স্থানের মাটি আলগা করতে হবে। মাটি আলগা করার সময় কোদালন বা খুরপি ব্যবহার করতে হবে। চারার চারিদিকে বৃত্তাকারভাবে ঘুরে ঘুরে মাটি আলগা করতে হবে। এতে চারার শিকড় কম কাটার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া স্থানে স্থানে গর্ত করে বা চিকন চিকন নালা কেটে রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে টি এসপির পরিবর্তে হাড়ের গুড়া সার এবং এমপির পরিবর্তে ছাই ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে টিএসপি সার যে পরিমাণ ব্যবহার করা হয় তার দ্বিগুণ পরিমাণ হাড়ের গুড়া সার ব্যবহার করতে হবে। আর এমপি সার যে পরিমান ব্যবহার করা হয় তার আটগুন পরিমান ছাই ব্যবহার করতে হবে। সারের মোট পরিমাণ কে দুই ভাগে ভাগ করে একভাগ গ্রীষ্মের শুরুতে এবং একভাগ বর্ষার শেষে প্রয়োগ করা ভালো।

ছক: চারা লাগানোর পর থেকে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত গাছপ্রতি রাসায়নিক সারের পরিমাণ (গ্রাম)।

গছের আকৃতি	গাছ লাগানোর ৪ মাস পরে			১বছর পর প্রয়োগ করতে হবে			প্রতি বছর প্রয়োগ করতে হবে			১৫ বছর পর প্রয়োগ করতে হবে		
	ইউ	টিক্রপি	ক্রপি	ইউ	টিক্রপি	ক্রপি	ইউ	টিক্রপি	ক্রপি	ইউ	টিক্রপি	ক্রপি
বড় গাছ	১২৫	৫০	১২৫	১২৫	৫০	১২৫	১২৫	৫০	১২৫	৪৫০	৫০০	১০০০
মাঝারি গাছ	১০০	৪০	১০০	১০০	৪০	১০০	১০০	৪০	১০০	৩৪০	২৫০	৫০০
ছোট গাছ	৬০	২৫	৬০									

ইউ = ইউরিয়া, টিএসপি = ট্রিপল সুপার ফসফেট এমওপি মিউরিয়েট অব পটাশ

অঙ্গ ছাঁটাই: বেশির ভাগ বৃক্ষজাতীয় ফল গাছের চারা অবস্থায় কিছু কিছু অঙ্গা ছাঁটাই করার প্রয়াজন হয়। চারা অবস্থায় ছাঁটাই করা হলে চাহিদা মোতাবেক গাছের আকৃতি সুগঠিত ও সুন্দর করা যেতে পারে। কলমের চারার ক্ষেত্রে অঙ্গ ছাঁটাই বিশেষভাবে উপকারী। অনেক সময় বয়স্ক গাছের অঙ্গও ছাটাই করার প্রয়োজন পড়ে। যেমন কুল, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল, গাছ এর উপযুক্ত উদাহরণ। মূলত অঙ্গ ছাঁটাই বলতে গাছের অপ্রয়োজনীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গাছ বড় হলে সমস্যা হতে পারে এমন অংশ কেটে বাদ দেওয়াকে বুঝায়। অঙ্গা ছাঁটাই করা হলে ফলন বাড়ে এবং গাছকে সুন্দর দেখায়। ঘঁটাই এর সময় চারা গাছের ছোট ছোট অংশ/ডালপালা হেঁটে ছোট করে দেওয়া হয়। কোন গাছের একই সাইজের দুটো ডালের মধ্যে যদি একটি অপেক্ষা আরেকটি বেশি ছাঁটাই করা হয় তাহলে বেশি ছাঁটাই করা ডালটি কম বাড়ে! গাছের আকৃতি সুন্দর ও ফল বেশি হওয়ার জন্য অনেক সময় ডালপালা ছাঁটাই করে কমিয়ে দেওয়া হয়। ছাঁটাই এর সাথে ফল উৎপাদনের সরাসরি সংযোগ আছে। অনেক ফলবতী গাছে বেশি ছাঁটাই করা হলে দীর্ঘদিন ধরে ফলন কম হবে। তাই গাছ বিশেষে সতর্কতার সাথে সঠিকভাবে ছাঁটাই করতে হবে। লতানো গাছে ফলন বৃদ্ধি ও সঠিক আকার দেওয়ার জন্য ঘঁটাই অপরিহার্য। আঙ্গুরের মত লতানো ফল গাছকে ছেটে মাচায় দিলে বেশি ফলন দেয়। এছাড়া অনেক সময় বড় গাছের ডাল ঘেঁটে ছোট করে রাখলে ফল পাড়তে, যত্ন নিতে ও মাধ্যমিক পরিচর্যার সুবিধা হয়। কিছু কিছু চারা গাছ লাগানোর পর প্রধান কাণ্ড বা ডগা তাড়াতাড়ি বেড়ে লম্বা হয় এবং ডালপালা কম হয় বা আদৌ হয় না। এসব ক্ষেত্রে প্রধান কাণ্ড বা ডগা কেটে দিলে ডালপালা গজিয়ে ঝাঁকড়া হয়, যা ফলন বৃদ্ধির জন্য ২০২২

সহায়ক। গাছের ভারসাম্য রক্ষার জন্য চারদিকে সমদূরত্বে তিন থেকে পাঁচটি ডাল রাখলে ভালো হয়। বড় গাছের ভেতরের ছোট ছোট ডালে ফল কম হয় এবং গাছের ভিতরে বাতাস ও রোদ চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করে। গাছের কাণ্ড মজবুত করা এবং ফলন বাড়ানোর জন্য চারা লাগানোর দুই তিন বছরের মধ্যে প্রধান কাণ্ডের সাথে পাশের ডালের বিন্যাস ঠিক করে হেঁটে দিতে হয়। যেমন- রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডাল সব সময় হেঁটে দিতে হয়। কেননা রোগাক্রান্ত ডাল থেকে সব সময় রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে।

মুল ছাঁটাই: কখনও কখনও গাছের মূল ছাঁটাই করে উপকার পাওয়া যায়। বর্ষার শেষে গাছের চারিপাশে মাটি চাষ করে বা কোপায়ে দিলে মূল ছাঁটাই এর কাজ অনেকটা হয়ে যায়। গাছের গোড়া হতে ১ থেকে ৩ মিটার দূর দিয়ে হালকা করে নালা কাটা হলে মুল ছাঁটাই হয়। নালাটি গাছের চারিপাশ দিয়ে সম্পূর্ণ চক্রাকারে- বর্গাকারে, এক চতুর্থাংশ চক্রাকারে বা বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের, প্রস্থের ও বিভিন্ন গভীরতার হতে পারে। এছাড়া গাছের গোড়া হতে কিছু। দূরে স্থানে স্থানে গর্ত করলেও মূল ছাঁটাই এর কাজ হয়। যে সব গাছের দৈহিক বৃদ্ধি বেশি সে সব গাছের মুল ছাঁটাই করা হলে ফল বেশি ধরতে সাহায্য করে।

স্থানান্তরকালীন পাতা ছাঁটাই- বীজতলা বা হাপর হতে চারা স্থানান্তরের সময় চারার মুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে মূলের সাহায্যে রস গ্রহন ও পাতার সাহায্যে প্রশ্বেদনের সামর্থ থাকে না এবং চারা মারা যেতে পারে। এ জন্য বীজতলা হতে চারা উঠানোর আগেই কিছু পাতা হেঁটে কমায়ে দিলে গাছ বাঁচানো সহজ হয়।

ফুল ও ফল পাতাল করা: গাছে খুব বেশি ফুল আসলে কিছু কিছু ফুল ভেঙে দিতে হয়। তাতে অন্যান্য ফুলে পরিপূর্ণতা লাভে সহায়ক হয়। অতি ছোট গাছে ফুল হলে তা ভেঙ্গে না দিলে ফল হলে গাছ দুর্বল হয়। অনেক সময় গাছে বেশি ফল ধরলে ফলের আকার ছোট হয় এবং গুনগত মানও কমে যায়। এক্ষেত্রে ফল কিছু কিছু পাতলা করে দিলে অন্যান্য ফলগুলো আকারে বড় হয় এবং মানসম্মত গুণাগুণ বজায় থাকে।

২০২২

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আমাদের দেশে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় কখন ?

২। চারা রোপণের পর ছায়া প্রদান করা হয় কেন ?

৩। চারা গাছের ডাল পালা কেন হেঁটে দিতে হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

১। বাগানে কী ভাবে চারা/কলম রোপণ করতে হয় আলোচনা কর।

২। বীজ তলা থেকে চারা/কলম উত্তোলনের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩। বীজ রোপণের পর থেকে চারা তালোর আগ পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

৪। বাগানে রোপণের পূর্বে ফলের চারা/কলমের কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়ার কৌশল বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল বাগানে চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যাসমূহ বর্ণনা কর।

২। বীজতলা থেকে ফলের চারা/কলম উত্তোলনের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় ব্যাখ্যা কর।

৩। বীজ তলা থেকে চারা/কলম উঠানো এবং কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ানোর জন্য করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ কর।

নবম অধ্যায়

ফল গাছে সেচ ও নিষ্কাশন

মানুষের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় পানির আর এক নাম জীবন, গাছ পালার ক্ষেত্রেও বচনটি সমান ভাবে প্রযোজ্য। গাছ শিকড়ের সাহায্য মাটিতে সংরক্ষিত প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে। গাছ কঠিন কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে পারে না। পানির সাহায্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য গুলিয়ে তরল অবস্থায় গ্রহণ করে। পানির সাহায্যে গাছ সমস্ত খাদ্য বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাঠাতে সক্ষম হয়। পানির অভাব থাকলে গাছ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতে পারে না। গাছকে তখন উপবাস থাকতে হয়। পানির অভাব গাছ বাড়তে পারে না। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানিও গাছের জন্য ক্ষতিকর। মাটিও অতিরিক্ত পানি ধরে রাখতে পারে না। অতিবৃষ্টির সময় অতিরিক্ত পানি মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে নদীনালায় খাবার সময় গাছের অনেক খাদ্য গলিয়ে ধুয়ে নিয়ে যায়। মানুষ যেমন পানিতে ডুবে শ্বাস বন্ধ হয়ে অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। গাছের শেকড়ও তেমনি ভাবে পানিতে ডুবে শ্বাস বন্ধ হয়ে অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। মাটিতে রসের অভাব হলে খরা মৌসুমে গাছে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের প্রকার ভেদে পানির চাহিদা সমান নয়। তাই কোন ধরনের গাছ কত দিন পর কি পরিমাণ সেচ দিতে হবে তা অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। পক্ষান্তরে বর্ষাকালে কোন অবস্থায় যেন গাছের গোড়ায়, বেড়ে, টবে/পলিব্যাগে সংরক্ষিত চারার গোড়ায় পানি জমে না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং পানির অভাব হলে গাছে পরিমাণ মতো পানি দেওয়া আর অতিরিক্ত পানি থাকলে মাটি থেকে তা সরিয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেচ হলো পানির অভাব হলে গাছে কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করে চাহিদা পূরণ করা। আর নিষ্কাশন হলে অতিরিক্ত পানি সরিয়ে দিয়ে গাছের জন্য উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করা। গাছের জন্য উভয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফল গাছে পানি সেচের গুরুত্ব

কৃষি কাজের জন্য অন্যতম এবং অপরিহার্য উপাদান হল পানি। বাংলাদেশের শস্য (ফলসহ) উৎপাদন মৌসুমী জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শীতকালে এদেশে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য মৃত্তিকাস্থ উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানসমুহ অপরিহার্য। পানি মৃত্তিকাস্থ খাদ্যোপাদানসমূহকে দ্রবীভূত করে গাছের বিভিন্ন অঙ্গে সঞ্চালন, অংগার আত্মীকরণ, শস্যের সজীবতা সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সরবরাহ প্রভৃতি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটিতে পর্যাপ্ত রসের অভাব হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত অধিক হলেও এটি বার মাস সমভাবে বিস্তৃত নয়। উদ্ভিদের জন্য পানি একটি অত্যাবশীকীয় উপাদান। যখনই পানির অভাব ঘটে তখনই ঘটে অত্যাবশ্যকীয় উদ্ভিদে নানারূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ সময় পানির অভাব হলে গাছ মারা যেতে পারে। মাটিতে যখন গাছের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সহজলভ্য অবস্থায় থাকে না, তখন কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করাকেই সেচ বলে। গাছে কখন কিভাবে কতটুকু সেচ দিতে হবে তা ঐ গাছের বিভিন্ন অবস্থা, আবহাওয়া ও মাটির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মত একটি অতি জনবহুল দেশের সীমিত জমিতে উৎপাদ বৃদ্ধির জন্য একর প্রতি ফলন এবং ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি অপরিহার্য। আবার উচ্চ ফলনশীল আধুনিক উন্নত জাতের ফসল চাষাবাদ সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ছাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া অনাবৃষ্টি, অল্পবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টিপাত ইত্যাদি কারণে ফসলের ক্ষতি এড়াতে হলে সেচ ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদ করতে হলে তা হবে সম্পূর্ণ সেচ নির্ভর। এমনকি বর্ষা মৌসুমেও সাময়িক অনাবৃষ্টি এড়িয়ে সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করতে হলেও সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কারণে বাংলাদেশে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম।

ফল গাছের পানি নিষ্কাশনের গুরুত্ব

ফসলের জমিতে বা ফলের বাগানে পানি সেচ দেয়া যেমন দরকার তেমনি অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন কোন ফলদ গাছে যেমন-পেঁপে, আনারস, কাঁঠাল, তরমুজ, কলা ইত্যাদি পানির প্রতি বেশি সংবেদশীল অর্থাৎ এসব গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছের খুব ক্ষতি হয়। এমনকি গাছ মারা যেতে পারে। তাই কাঁঠাল বাগানে কোন গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে তা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সুন্দর ভাবে পানি নিষকাশনের জন্য বাগানের চারদিকে নিকাশন নালা থাকা আবশ্যক যে সেচের অতিরিক্ত পানি বা অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে অতিরিক্ত পানি অনায়সে বের হয়ে যেতে হয়। ফসলের সর্বাধিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে শিকড়ের পরিবেশকে প্রয়োজনীয় সরস অবস্থায় রাখাই নিষ্কাশনের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি অপসারন করা হলে গাছের শিকড়ের সহজ বৃদ্ধি, ক্ষতিকর দ্রব্য হ্রাস, আহরণযোগ্য নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি, সময়মত চাষাবাদ ও উপকারী অনুজীবের কার্যকারিতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

ফল গাছে পানি সেচের সময় ও পানির পরিমাণ

জমিতে বা ফলের বাগানে কখন সেচ দিতে হবে এবং কী পরিমাণ সেচ দিতে হবে এ দুটি প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ সেচের পানি প্রদানের লক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে:

- শস্যের পানির আবশ্যকতা (Crop water requirement)
- সেচ পানির প্রাপ্যতা (Water availability)
- শিকড় অঞ্চলে মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা (Water holding capacity)
- সেচ ব্যবস্থাপনা

উলেখিত বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য মৃত্তিকা, উদ্ভিদ, আবহাওয়া, সেচের পানির উৎস ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উপাত্ত ও তথ্যাদির প্রয়োজন।

মৃত্তিকার যে সব তথ্যাদি বিশেষ ভাবে জানা ও বিশেষণ আবশ্যক সেগুলো হচ্ছে মাটির বুনট, গভীরতা, সংযুক্তি, লবণাক্ততা বা ক্ষারত্ব, বায়বীয়তা, নিষ্কাশন, অনুপ্রবেশ, অনুস্রবণ, চুয়ানো, ভূ-গর্ভস্থ পানি তলের গভীরতা এবং পানি ধারন ক্ষমতা ইত্যাদি।

উদ্ভিদ সম্পর্কিত জরুরি তথ্যাদি হচ্ছে ফসলের প্রকার, শেকড়ের বৈশিষ্ট্য, বর্ধনের সময়ে বিভিন্ন ধাপে পানির ব্যবহার, মৃত্তিকায় পানি স্বল্পতার কারণে উদ্ভিদের যে ধাপ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইত্যাদি।

আবহাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে চাষাবাদের ঐতিহ্যগত পদ্ধতি বীজ বপন অথবা চারা রোপণের তারিখ, গাছের ঘনত্ব, সারির দূরত্ব, সার ব্যবহার, আগাছা অথবা পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

উদ্ভিদের ক্ষরা সহনীয়তা বলতে বোঝায় মৃত্তিকাস্থ শিকড় অঞ্চলে যে পরিমাণ সঞ্চিত পানি (%) গাছ ব্যবহার করলে গাছের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। অধিকাংশ ফসলের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, গাছ মৃত্তিকায় সঞ্চিত পানির ৫০% ব্যবহার করার পরে যদি সেচ দেয়া হয় তা হলে ফসল উৎপাদনের মাত্রা কমে যায় না। এ ক্ষেত্রে সেচ কে বলা হয় মৃত্তিকাস্থ প্রাপ্য পানির ৫০% কমতিতে সেচ প্রদান। কোন কোন ফসলের ক্ষেত্রে ৭৫% পানি কমতিতে ও ফসলের উৎপাদনের ক্ষতি হয় না। তবে ৫০% মাত্রাকেই সাধারন সেচের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তিনটি প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সেচের সময় ও পরিমাণ নির্বাচন করা যায় যথা–

ক) মৃত্তিকা সম্পর্কিত খ) উদ্ভিদ সম্পর্কিত গ) আবহাওয়া সম্পর্কিত ২০২২

ক) মৃত্তিকা সম্পর্কিত:

পদ্ধিতে প্রধানত মাটিতে পানির প্রাপ্যতা মাপা হয়। জমি থেকে মাটির নমুনা সগ্রহের সময় মনে রাখতে হবে যেন এই নমুনা যে জমি থেকে মাটি নেয়া হবে মোটামুটি ভাবে সেই জমির মাটির প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। এক্ষেত্রে অনুভব পদ্ধতি এবং অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাটিতে পানির প্রাপ্যতা নির্ধারন করা যায়।

১। অনুভব পদ্ধতি (Feel method) - এ পদ্ধতিতে মৃত্তিকার অবস্থা দেখে এবং স্পর্শ করে মৃত্তিকার পানির পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা করা হয়। মৃত্তিকার পানি ধারণ বা রসের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ফসল ভেদে ৩০-১০০ সে:মি: নিচ থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট ফসলের শিকড়ের গভীরতার ৬০-৭০% নিচ থেকে মাটি খুঁড়ে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা থেকে এক মুঠো মাটি হাতের মুঠিতে চেপে বল বানানো হয় এবং স্পর্শের অনুভূতি ও অবস্থা সারণি-১ প্রদত্ত অবস্থার সাথে তুলনা করে পানি সেচের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা যায়।

হাতের সাহায্যে মৃত্তিকার পানি পরিমান পদ্ধতি ও সেচের সময় নির্ধারণ

সারণি-১

মুক্তিকররসের পরিমাণ (পনি ধরন ক্ষমতার অংশ %	সূক্ষ্ম বুনটের মৃত্তিকা (এটেল মৃত্তিকা, পলি এটেল প্রভৃতি)		মধ্যম থেকে মোটা বুনটের মৃত্তিকা	
	মৃত্তিকা অবস্থা	করণীয় ব্যবস্থা	মৃত্তিকা অবস্থা	করণীয় ব্যবস্থা
০-২৫	খুব শুষ্ক	অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে	খুব শুষ্ক	অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
২৬-৫০	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দল বেঁধে যায় এবং চাপ দেয়ার সাথে সাথে গুড়া গেড়াে হয়ে যায়।	অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে	শুষ্ক-হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে না	অতি সত্বর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
৫১-৭৫	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে শক্ত ও কিছুটা আঠালো দলা বাধে এবং ফেলে দিলে ভাঙ্গে না।	২-৩ দিন পর সেচ দিলেও চলে	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দিলে দলা বাধে, ফেলে দিলে দলা ভোঙ্গে গুড়ো গড়াে হয়ে যায়।	১-২ দিন পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
৭৬-১০০	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে এবং তালু ভিজে যায়, কিন্তু রস বের করে না ফেলে দিলে দলা ভাঙ্গে না।	২-৩ দিন পর সেচ দিতে হবে	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে দলা বাধে পানি বের হয়না ফেলে দিলে দলা ভাঙ্গে যায়।	২-৩ দিন পর সেচের ব্যবস্থা করতে হবে
১০০	কাদা মাটি হাতের মুঠোয় চাপ দিলে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে মাটি বের হয়ে আসে।	সেচ দিতে হবে না। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।	হাতের মুঠোয় চাপ দিলে ভেজা দলা বাধে। তালু ভিজে যায়,কিন্তু পানি বের হয়ে আসে না	সেচ দিতে হবে না। ৭দিন পর পুনঃ মাটি পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হবে।

২০২২

খ) উদ্ভিদ সম্পর্কিত পদ্ধতি

উদ্ভিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেও সেচের প্রয়োজনীয়তা যায় । যখন মৃত্তিকা পানির পরিমাণ কমে যায় তখন গাছের পাতার রং বদলে যেতে পারে (যেমন- সবুজ থেকে হলুদ বর্ণ ধারণ), পাতা কুঁকড়িয়ে যেতে পারে । এ ছাড়াও গাছের বৃদ্ধির হার কমে যেতে পারে । কোন উদ্ভিদের এ জাতীয় উপসর্গ সেচের আবশ্যকতা নির্দেশ করে । তবে এই পদ্ধতির সমস্যা এই যে, এ সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয়ার বেশ আগেই গাছ অতিরিক্ত পানি পীড়নের শিকার হয়, ফলে গাছের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায় ।

গ) আবহাওয়া সম্পর্কিত পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে আবহাওয়ার বিভিন্ন দিক যেমন- বৃষ্টিপাত, সোলার রেডিয়েশন, তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বাষ্পীভবন ইত্যাদি মাপা হয় । সেই সাথে বিভিন্ন গাণিতিক সমীকরণ নির্ণয় করা হয় । বাষ্পীয় প্রস্বেদন, বৃষ্টিপাত, অনুপ্রবেশ, চুয়ানোসহ অন্যান অপচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে সেচের আবশ্যকতা ও সময় নির্ধারণ করা যায় ।

সেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা

জমিতে সেচের পানি বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যায় । ফসলের পানির প্রয়োজনীয়তা, পানির উৎস ও প্রাপ্যতা, পানির গুণাগুণ, মাটির প্রকার, জমির অবস্থান, চাষাবাদের ধরন ইত্যাদির ভিত্তিতে সেচের পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় । আধুনিক সেচ পদতিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায় যথা-

১ । ভূ-উপরিস্থ (Surface)

২ । ভূ-মধ্যস্থ (Sub-surface)

৩ । প্রিংকলার (Sprinkler)

৪ । ট্রিকল (Trickle)

১ । ভূ-উপরিস্থ সেচ পদ্ধতি (Surface irrigation system) এ পদ্ধতিতে পানি সরাসরি জমিতে দেয়া হয় ও সেচের পানি জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় । এক্ষেত্রে জমিতে কয়েক সে:মি: পানি দিয়ে পরীবিত করা হয় । পানির প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জমিকে প্রথমে মসৃণ এবং পরে জমিতে বর্ডার (পাড় বা কিনার) ফারো (লাঙলের ফলার গভীর দাগ), কবোগেশন (ঢেউ খেলানো আকৃতি) ইত্যাদি তৈরি করা হয় । ভূ-পরিস্থ সেচ পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত ৩ ভাগে ভাগ করা যায় ।

১ । অনিয়ন্ত্রিত পাবন পদ্ধতি (Uncontrolled flooding)

২ । নিয়ন্ত্রিত পাবন পদ্ধতি (Controlled flooding) । এ পদ্ধতি আবার ৩ প্রকার । যেমন-

ক) বর্ডার স্ট্রিপ (Border Strip)

খ) চেক পাবন (Check flooding)

গ) বেসিন (Basin)

৩ । ফারো পদ্ধতি (Furrow Method) । এ পদ্ধতি আবার ২ প্রকার । যেমন-

ক) ফারো (Furrow)

খ) করোগেশন (Corrugation)

২০২২

১। অনিয়ন্ত্রিত পাবেন পদ্ধতি (Uncontrolled flooding) যখন নালা থেকে পানি কোন রকম বাধ অথবা তাইক অথবা অন্য কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই জমিতে দেয়া হয় তখন তাকে অনিয়ন্ত্রিত পরাবান পদ্ধতি বলে। যেখানে অত্যন্ত সস্তায় প্রচুর পরিমাণে সেচের পানি পাওয়া যায় সেখানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

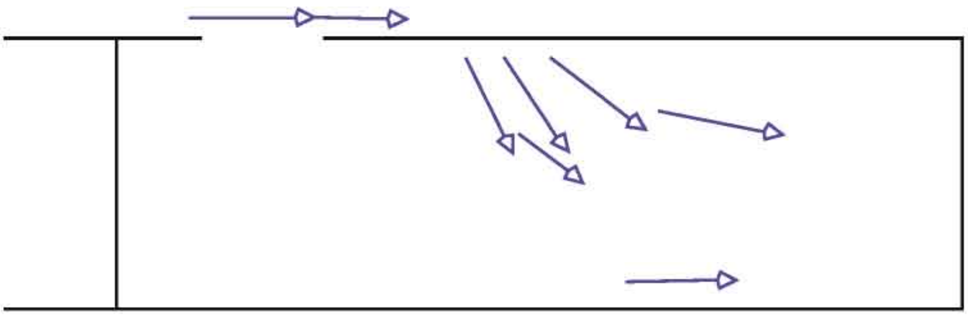

চিত্র: অনিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি

সুবিধা

- কম শ্রমিক দ্বারা অল্প সময়ে বেশি জমি ভেজানো যায়
- এতে কোন বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না
- জমি সমতল বা একদিকে সামান্য ঢাল করে নিলেই হয়

অসুবিধা

- সেচের পানির প্রায় ৮ ভাগই অপচয় হয়
- ভূমিক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে
- জমি সমতল করা প্রয়োজন হয়
- সেচের সময় তদারকির দরকার হয়

২। নিয়ন্ত্রিত পরাবন পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে মুক্ত পাবনের পানিকে নিয়ন্ত্রণ বা বাধ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রবাহিত করা হয়।

ক) বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতি (Border strip)

এ পদ্ধতিতে মাঠকে অনেকগুলো খণ্ড বা ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই খণ্ড গুলো সাধারণত ১০-২০ মি: প্রশস্ত ও ১০০-৪০০ মিটার লম্বা হয়। একটি খণ্ড থেকে অন্য খণ্ড নিচু বাঁধ বা ডাইক দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয়। সরবরাহ নালা থেকে পানি এই খণ্ডসমূহে সরবরাহ করা হয়। পানি নিচের দিকে প্রবাহিত যে সমস্ত খণ্ডের জমিকেই ভিজিয়ে দেয়। প্রতিটি খন্ডে আলাদাভাবে সেচের পানি দেয়া হয়। সব ধরনের মৃত্তিকাতেই এই পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যায়।

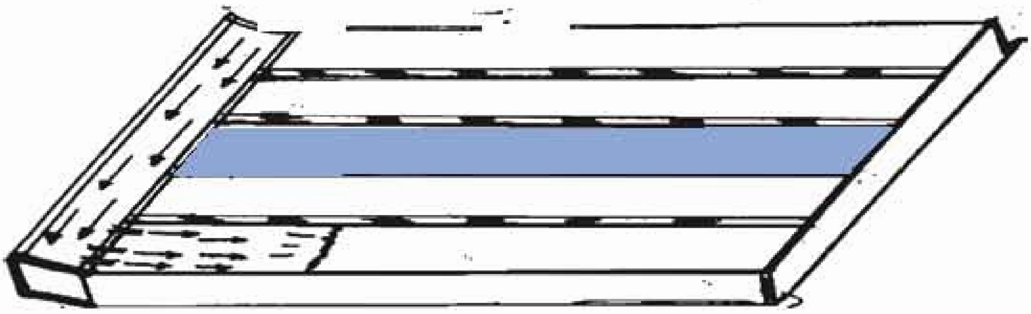

চিত্র: বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতি

খ. চেক প্লাবন পদ্ধতি (Check Flooding)

এ পদ্ধতিতে চারদিকে নিচু বাঁধ দ্বারা ঘেরা তুলনামূলক সমতল জমিতে বেশি পানি দেয়া হয়। অত্যন্ত পরিশোষক মৃত্তিকা ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশি উপযোগী। এছাড়াও ভারি মৃত্তিকা যেখানে পানি হার কম সেখানেও এ পদ্ধতি কার্যকর। বস্তুত এই পদ্ধতি বর্ডার স্ট্রিপ পদ্ধতির একটি রূপান্তর।

গ) বেসিন পদ্ধতি

নিচু বাধ দ্বারা পরিবেষ্টিত সমতল জমিতে দ্রুত পানি দেয়া হয় এবং জমি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত পানি ধরে রাখা হয়। ধান চাষের জন্য এ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও ফল বাগান সেচ প্রদানের জন্য এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। একটি বেসিনের আওতায় ১ থেকে ৫ অথবা বেশি পরিমাণ সেচ দেয়া হয়।

সুবিধা

- পানির অপচয় বেশি হতে পারে না।
- যে বাগানে যতটুকু পানি প্রয়োজন সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।
- জমির অবস্থান বিবেচনা করে সমস্ত জমি সমতল করার প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা

- জমিতে অনেক আইল করার কারণে জমির অপচয় হয়।
- শ্রমিক খরচ বেশি।
- আংশিক ভূমি ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে।
- বাঁধ যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য সার্বক্ষণিক তদারকি ও শ্রমিক রাখা প্রয়োজন হয়।

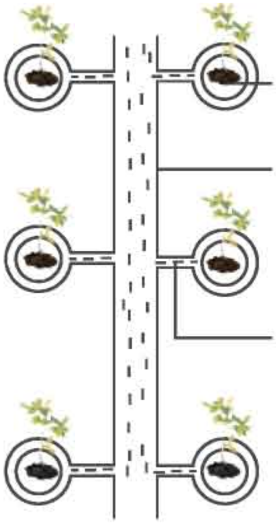

চিত্র: বেসিন পদ্ধতি

৩। ফারো পদ্ধতি ফারো পদ্ধতি

দু'ধরনের যথা ফারো ও করোগেশন

ক) ফারো: ফারো পদ্ধতিতে শস্য/গাছের সারির মধ্যবর্তী ফারো (ছোট নালা) তে পানি সরবরাহ করা হয়। নালা গুলো সাধারণত প্রায় সমান্তেত ভূমি অথবা জমির ঢাল অনুযায়ী করা হয়। যে সমস্ত শস্য সারিবদ্ধ ভাবে চাষ করা হয় তাদের জন্য এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

খ) করোগেশন:

এটি ফারো পদ্ধতিরই একটি রূপান্তরিত অবস্থা। এ পদ্ধতিতে পানি ছোট নালায় দেয়া হয় এবং এই নালা গুলো সমস্ত মাঠ জুড়ে নির্মাণ করা হয়। পানি এই নালার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং চুবিয়ে দুই নালার মধ্যবর্তী এলাকাতে সেচ প্রদান করে।

সুবিধা

- ভারি মাটিতে পানির অপচয় কম হয়, যেহেতু সমস্ত জমিতে ভাসানো সেচ দিতে হয় না
- ভূমির ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই

অসুবিধা

- সতর্কতার সাথে নালা তৈরি করতে হয়
- হালকা মাটি হলে পানি চুয়ায়ে বেশি ক্ষতি হয়
- হালকা মাটিতে নালার পাড় ভেঙে নালা বন্ধ হয়ে যায়

২০২২

২। ভূ- মধ্যস্থ সেচ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে মাটির বুনট এবং ফসলের শিকড়ের গভীরতার ভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠের নিচে পানি প্রবাহিত করা হয়। ক্রিয়ার পানি শিকড় অঞ্চলে পৌঁছায়। গভীর নালা, মাটিতে প্রোথিত সিমেন্ট বা ধাতু নির্মিত ছিদ্রযুক্ত পাইপ, টাইল ড্রেন ইত্যাদির মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের নিচে গাছের শিকড় অঞ্চলে পানি সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে ভূ অভ্যন্তরে এমন একটি কৃত্রিম পানির তল তৈরি করা হয় যেখানে গাছ প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করতে পারে।

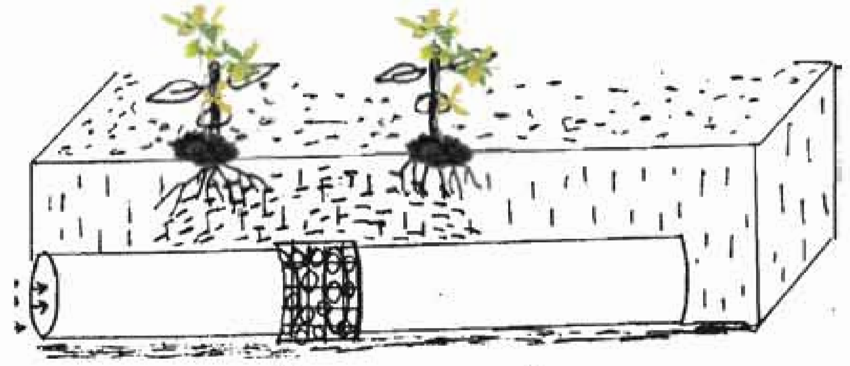

চিত্রঃ ভূ-মধ্যস্থ সেচ পদ্ধতি

সুবিধা

- পানির অপচয় হয় না
- মাটি শক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না
- ভূমি ক্ষয় হয় না
- ভূমি নষ্ট হয় না

অসুবিধা

- নল বা পাইপ বসানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- নল বা পাইপ বসানোর জন্য শ্রমিক বেশি লাগে, খরচ বেশি।
- গাছের শিকড় বা মাটি দ্বারা পাইপের ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

৩। স্প্রিংকলার /ছিটানো পদ্ধতি/সিঞ্চন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে পানি পাইপ ও স্প্রিংকলার নজল এর মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং তা বৃষ্টির মতই মাটিতে পড়ে। এ পদ্ধতি প্রায় সব রকম ফসল ও মৃত্তিকার জন্যই উপযোগী।

সুবিধা

- পাহাড়ি বা অসমতল জমিতে এ পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী
- পানির অপচয় কম হয় এবং সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- সার ও কীটনাশক এ পানিতে মিশিয়ে দেয়া যায়

অসুবিধা

- পাইপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির খরচ বেশি
- সেচের জন্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন
- জোরে বাতাস বয়ে যাওয়ার সময় সেচ দেওয়া যায় না

৪। ট্রিকল বা ড্রিপ পদ্ধতি এটি ড্রিপ পদ্ধতি

হিসেবেও পরিচিত। এ পদ্ধতিতে ছোট ব্যাসযুক্ত পাইপের একটি বিস্তারিত নেটওয়ার্ক থাকে। যা দ্বারা পানি সরাসরি গাছের গোড়ায় ফোটায় ফোটায় দেয়া হয়। এই পদ্ধতি ফল বাগান ও গ্রিন হাউসের জন্য বিশেষ উপযোগী।

সুবিধা

- তুলনামূলকভাবে পানি কম লাগে
- প্রতিটি গাছের গোড়ায় সঠিক ও সম পরিমাণ সেচ দেওয়া যায়
- বেলে মাটি ও অসমতল পাহাড়ি জমিতে সেচ দিতে বিশেষ উপযোগী
- শ্রমিক খরচ ও আগাছার প্রকোপ কম হয়।

অসুবিধা

- গড় এলাকায় সেচ দেওয়া সুবিধাজনক নয়
- স্থাপন বেশ ঝামেলাপূর্ণ ও ব্যয় বহুল
- পানির নল ও পানি নিঃ সরক প্রায়ই বন্ধ হতে পারে
- খুবই পরিষ্কার পানির দরকার
- পানির প্রবাহ অবিরাম পর্যবেক্ষণ করতে হয়

নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি

নিষ্কাশন নালা বা নর্দমার মাধ্যমে ফসলের শিকড় অঞ্চল থেকে অপ্রয়াজনীয় বা অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়াকে নিষ্কাশন বলে। নিষ্কাশন নালা প্রধানত দুই ধরনের হয় প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম কার্য পদ্ধতি অনুসারে নিষ্কাশন নালা তিন প্রকার। যথা–

(১) ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Surface)

(২) ভূ-নিম্নস্থ নিষ্কাশন নালা (Sub -- Surface or tile)।

(৩) সম্মিলিত ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-নিম্নস্থ নিষ্কাশন নালা (Combinaton of surface and sub surface drains)

(১) ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা

যে সমতল জমিতে উপরিতরের গভীরতা কম এবং ভূ-পৃষ্ঠের অল্প নিচেই অপ্রবেশ্য তর যেমন-লাঙল তল, শক্ততল বা এটেল মাটির স্তর রয়েছে সে সব জমির জন্য ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা উপযোগী।

২০২২

ভূ- পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা তিন রকমের যেমন—

ক) স্টর্ম নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা গভীর নালা ব্যবস্থা

খ) চুয়ানো নিষ্কাশন ব্যবস্থা

গ) সম্মিলিত স্টর্ম ও চুয়ানো নিষ্কাশন ব্যবস্থা

ক) স্টর্ম বা গভীর নিষ্কাশন নালা: এ নালা সাধারণত অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নির্দিষ্ট সময়ে বের করে দেওয়ার জন্য গভীর করে তৈরি করা হয়।

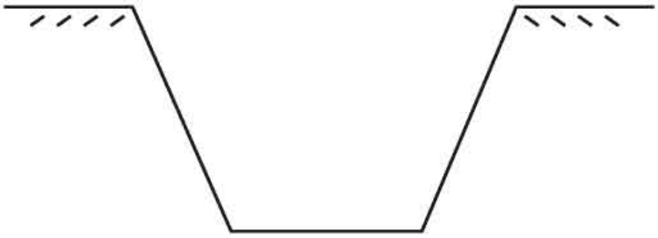

চিত্র: স্টর্ম নিষ্কাশন নালা

(খ) চুয়ানো নিষ্কাশন নালা (Seepage drain): সেচ নালার বা খালের পানি পাশের জমির চাইতে উচু দিয়ে প্রবাহিত হলে পাড় চুইয়ে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। চুয়ানো পানি নিষ্কাশনের জন্য সেচ খালের পাড়ের পাশেই চুয়ানো খাল খনন করা হয়। খাল গভীর করে খনন করতে হয়। চুয়ানো পানি জমা হলে এখান দিয়ে নিষ্কাশিত হয়।

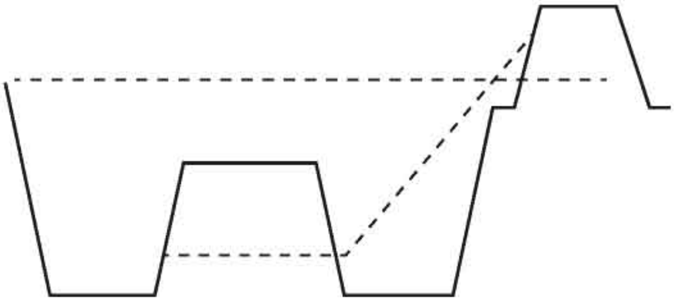

চিত্র: চুয়ানো নিষ্কাশন নালা ফল গাছে সেচ ও নিষ্কাশন

(গ) সম্মিলিত স্টর্ম ও চুয়ানো নিষ্কাশন নালা ঃ এ নালা প্রথমে চওড়া ও অগভীর করে তৈরি করে মাঝখান দিয়ে কম চওড়া করে অগভীর নালা করা হয়। এতে বৃষ্টির পানি এবং চুইয়ে আসা পানি উভয়ই বের হতে পারে।

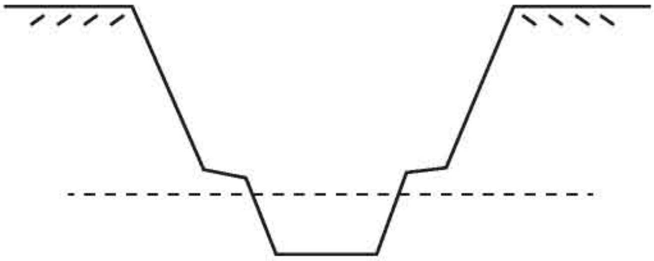

চিত্র: সম্মিলিত স্টর্ম ও চুয়ানো নিষ্কাশন নালা ২০২২

ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা ব্যবস্থার প্রকার

পাঁচ ধরনের ভূ-পৃষ্ঠস্থ নিষ্কাশন নালা ব্যবস্থা আছে। ফসল ক্ষেতের অবস্থা বিবেচনা করে এ পাঁচ প্রকার ব্যবস্থা থেকে দুটি বা ততোধিক ব্যবস্থা সম্মিলিত ভাবে ব্যবহার করতে হতে পারে। ব্যবস্থাগুলো নিম্নরূপ

ক) এলাপোথাড়ি নালা ব্যবস্থা (Random)

খ) প্রবাহ পথে আটক করন নালা ব্যবস্থা (Interception)

গ) ভিন্নদিকে প্রবাহিত করান নালা ব্যবস্থা (Diversion)

ঘ) উপরিভাগ নালা ব্যবস্থা (Bedding)

ঙ) মাঠ নালা ব্যবস্থা (Field drain)

২। ভূ-মধ্যস্থ বা ভূ-নিম্নস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা/টাইল (Sub-Surface or tile): এ পদ্ধতিতে মাটির অভ্যন্তর থেকে পানি টাইল অথবা মালে (এরবহব ভূৎ সড়বধ) নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করে ভূ-গর্ভস্থ পানির তল গাছের শিকড় অঞ্চলের নিচে নামানো হয়। এই নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে টাইল নিষ্কাশন ব্যবস্থাও বলে। এই নিষ্কাশন ব্যবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠের নিচে নিষ্কাশন নালা স্থাপন বা তৈরি করা হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানি তলের অবস্থান গাছের শিকড় থেকে গভীরে নামিয়ে শিকড়ের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও শিকড় অঞ্চলে প্রয়োজনীয় বায়ু চলাচলের সুবিধার জন্য এ নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী। বাংলাদেশে উঁচু জমিতে আবাদকৃত ফসলের জন্য এই ধরনের নিষ্কাশন নালা ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্রঃ ভূনিম্নস্থ নিষ্কাশন নালা

২০২৫

বিভিন্ন উপাযাগেিতা বিবেচনায় টাইল নালা পদ্ধতিতে কয়েক ধরনের বিন্যস্ততা দেখা যায় । সাধারন টাইল নিষ্কাশন পদ্ধতিসমূহ হলো -

১ । ইন্টারসেপশন (Interception)

২ । র‍্যানডম (Random)

৩ । ডাবল মেইন (Double main)

৪ । প্যারালাল (Parallel)

৫ । গ্রিড আয়রন (Gridiron)

৬ । হেরিং বানে (Herring bone)

(৩) সম্মিলিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূনিম্নস্থ বা ভু মধ্যস্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা

এই পদ্ধতিতে উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার নিষ্কাশন পদ্ধতি একত্রে ব্যবহার করা হয় । এ ব্যবস্থায় ভূ পৃষ্ঠস্থ পানি নিষ্কাশনের নালার তলদেশের মাটির নিচে নিষ্কাশন নালা তৈরি করা যায় । এ নালার চতুর্দিকে ফিল্টার দ্রব্য ব্যবহার করা হয় ।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল গাছে সেচের প্রয়োজন হয় কেন ?

২। কৃষি কাজের জন্য অন্যতম এবং অপরিহার্য উপাদান কোনটি ?

৩। ফল বাগানে নিকাশের প্রয়োজনীয়তা কী ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পানি সেচ বলতে কী বোঝায় লেখ।

২। ফল বাগানে পানি নিকাশের উপকারিতা লেখ।

৪। ফোয়ারা বা বর্ষণ সেচ পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখ।

৫। সেচ ও নিকাশের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

৬। ফল বাগানে সেচের সুফল বর্ণনা কর।

৭। সঠিক সময়ে সেচের পানি প্রদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সেচের প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলোর নামসহ যে কোন একটি পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা লেখ।

২। পানি নিষ্কাশনের উদ্দেশ্য এবং সুবিধা অসুবিধা লেখ।

৩। বাগানে সেচের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের বিষয়াবলি বর্ণনা কর।

৪। ফল বাগানে সেচ ও নিষ্কাশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৫। ফল গাছে পানি সেচের সময় ও পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করা যায় লেখ।

দশম অধ্যায়

ফল ও ফল গাছে পোকা দমন

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কতগুলো ইউরোপীয় মিশন ব্রিটিশ (বৃটেন), ফ্রান্স এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া হতে ফলের নতুন নতুন জাত প্রবর্তনের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক বাণিজিক ফলের বাগান এদেশে প্রতিষ্ঠিত করে।

কলা, কাঁঠাল, বাতাবি লেবুর, কয়েকটি জাত এবং আম, ভারতের দেশীয় ফল। লিচু, কমলা, লেবু প্রভৃতি চীন দেশ হতে পেঁপে, আনারস, সফেদা আমেরিকা হতে আঙ্গর, ডালিম প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অবিভক্ত ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশে বর্তমানে (২০০৫-০৬) প্রায় ১.৩৯ লাখ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন ফলের চাষ হয়। তন্মধ্যে আম কাঁঠাল, কলা, লিচু, কাগজিলেবু, বাতাবি লেবু, কমলা লেবু, আনারস, পেয়ারা, পেঁপে, আতাফল, তরমুজ , ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া বাংলাদেশে আরও অন্যান্য ফলের চাষ এলাকা ভিত্তিক কম বেশি হয়ে থাকে। বিভিন্ন সমস্যার মাতা ফল ও ফুল গাছ পোকা মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রতিবছরই বাংলাদেশে এই সব অনিষ্টকারী পোকামাকড় আমাদের মুল্যবান ফল ও ফল গাছের ব্যাপক হারে ক্ষতি করে। ফুল ও ফলগাছের অধিকাংশ পোকামাকড় আকারে ছোট কিন্তু তাদের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি।

ক্ষতির প্রকৃতি এবং স্বভাব বিবেচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন পোকা ফল ও ফলগাছের চারা ফলগাছ, কাণ্ড, পলব, ফুল ও কুঁড়ির যথেষ্ট ক্ষতি করে। এর ফলে অনেক সময় ফল উৎদানকারী ও ফল জাত দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ হয়ে দাড়ায়। ফল ও ফল গাছের অনিষ্টকারী পোকামাকড় যথাযথভাবে প্রতিরোধ ও তাদের আক্রমণে প্রতিহত করতে হলে এদের স্বভাব, প্রকৃতি, বিস্তৃতি, জীবনবৃত্তান্ত, আর্বিভাবের সময় ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আমাদের জানা প্রয়োজন, কোন সময় ফল বা ফল গাছ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ক্ষতির প্রকৃতি বা ধরন সম্পর্কেও জানা দরকার। সেই সাথে ঋতুভেদে পোকামাকড়ের সংখ্যাধিক্য, স্থায়ীত্ব, আবির্ভাবের সময় এবং বিস্তৃতি কেমন হয় তাও জানা প্রয়োজন। এসব তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে পোকামাকড়ের আক্রমণের পুর্বাভাস দেয়া সম্ভব হতে পারে। সম্ভব হলে ফল ও ফল গাছ রক্ষায় আগাম ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সারা বিশ্বে এক হাজারের বেশি পোকা ও তার প্রজাতি ফল ও ফল গাছের অনিষ্ট করে থাকে। বাংলাদেশে শত শত পোকামাকড় প্রতি বছর ফল ও ফল গাছের ক্ষতি করে থাকে।

ফল ও ফল গাছের আক্রমণকারী প্রধান প্রধান পোকা

বালাদেশের প্রধান প্রধান ফলে ও ফল গাছে নানা ধরনের পোকা মাকড় আক্রমণ করে থাকে। নিম্নের সারণিতে ফল ও ফল গাছে আক্রমণকারী প্রধান প্রধান পোকামাকড়ের তালিকা দেওয়া হলো।

ফসলের নাম	পোকামাকড়ের নাম	আক্রান্ত স্থান
১। আম	১। আম ফলের ভামেরা পোকা ২। আম ফলের মাছি পোকা ৩। আম ফলের শোষক পোকা (হপার) ৪। আমের ডগার মাজরা পোকা ৫। আমের কাণ্ডের মাজরা পোকা ৬। আমের পাতার বিছা পোকা ৭। আমের মিলিবাগ ৮। গল পোকা	ফল ফল ফল শাখা /ডগা গাছের কাণ্ড গাছের পাতা

২। কাঁঠাল	১। ফলের মাজরা পোকা	ফল
	২। কাণ্ডের মাজরা পোকা	গাছ
৩। নারিকেল	১। পিপড়া, ইদুর	ফল
	২। গোবরে পোকা	গাছ
	৩। গন্ডার পোকা	গাছ
	৪। পাতা খনক	গাছ
	৫। উই পোকা	গাছ
	৬। লাল কেড়ি পোকা, কালো মাথা শূয়া পোকা	গাছ
৪। লিচু	১। বিটল	ফল
	২। সাদা মাছি	ফল
	৩। লিচুর মাকরসা	গাছ
	৪। বিছা পোকা	গাছ
	৫। গুড়ির মাজরা পোকা	গাছ
	৬। কাণ্ডের মাজরা পোকা	গাছ
৫। কলা	১। বিটল পোকা	ফল
	২। ঘোড়া পোকা	গাছ
	৩। কান্ডের ভোমরা পোকা	গাছ
	৪। মাজরা পোকা	গাছ
	৫। নেমাটোড	শিকড়/গাছ
৬। জমি	১। সদ মাছি	ফল
	২। সুরঙ্গ পোকা	গাছ
	৩। থ্রিপস	গাছ
৭। পেয়ারা	১। ফলের মাছিপোকা	ফল
	২। শোষক পোকা	গাছ
	৩। জাব পোকা	গাছ
৮। কুল	১। ফলের মাছি পোকা	ফল
	২। কুলে উইভিল পাতা খেকো	গাছ/পাতা
	৩। শুয়া পোকা	গাছ
	৪। লাবা পোকা	গাছ
৯। আনারস	১। মিলিবাগ	ফল
	২। খোসা পোকা ব স্কেল পোকা	ফল
১০। পেঁপে	১। ফলের মাছি পোকা	ফল
	২। লাল মাকড়সা	ফল ও গাছ
	৩। লিফহপাং	গাছ
	৪। কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা	গাছ
	৫। থ্রিপস পোকা	গাছ
	৬। জাব পোকা	গাছ

২০২২

১১। লেবু	১। লেবু প্রজাপতি ২। লিফ মাইনর ৩। লেবুর হলদে খোসা পোকা ৪। লেবুর মাছি পোকা ৫। লেবুর ছাতরা পোকা	গাছের কচি পাতা ও ডগ গাছের কচি পাতা গাছের কচি পাতা ও শাখা গাছ পাতা ও শাখার রস
১২। আমড়া	১। আমড়া পাতার বিটল পোকা	গাছের পাতা ও ডগ
১৩। তরমুজ	১। তরমুজের মাছি পোকা ১। তরমুজের লাল পাম্পকিন বিটল	ফল গাছের পাতা
১৪। ডালিম	১। ডালিমের প্রজাপতি	ফল

ফল ও ফুল গাছের আক্রমণের ধরন দেখে পোকা শনাক্ত

ফল ও ফুল গাছের অনিষ্টকারী পোকামাকড় দমন করতে হলে এর স্বভাব, প্রকৃতি, বিস্তৃতি, জীবন বৃত্তান্ত আবির্ভাবের সময় ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিম্নের বর্ণিত ফলের প্রধান প্রধান পোকার আবির্ভাবের সময় ও ক্ষতির লক্ষণ দেখে শনাক্তকারী পোকার বাংলা ও ইংরেজি নাম দেওয়া হলো।

ক্র নং	অবির্ভাবে সময়	আক্রমণের ধরন/ক্ষতির লক্ষণ	শনাক্তকারী পোকার বাংলা ও ইরেজি নাম
১	জানুয়ারি - এপ্রিল ও জুন-জুলাই	বাচ্চা ও পূর্ণবয়ক অবস্থায় কচি পাতা ও ফুলের রস চুষে খায়। গাছ দুর্বল হয়, যথেষ্ট ফুল হওয়া সত্ত্বেও গুটি হওয়ার আগেই ফুল ঝরে পড়ে।	আমের হপার পোকা Mango hopper
২	এপ্রিল - মে	স্ত্রী পোকা কঁচা আমের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে ফলের শাঁসের মধ্যে আঁকা বাঁকা সুড়ঙ্গ তৈরি করে খেতে থাকে। প্রতি বয়স্ক উইভিলে পরিণত হয়ে আমের খোসা ছিদ্র করে বাইরে বের হয়ে যায়।	আম ফলের ভোমরা পোকা Mango fruit weevil
৩	মার্চ - নভেম্বর	স্ত্রী পোকা আম গাছের কাণ্ড ও শাখায় গর্ত করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কড়া বের হয়ে কাণ্ড বা শাখার মধ্যে সুড়ঙ্গ করে ঢোকে। আক্রান্ত শাখা সহজেই ভেঙ্গে যায়। চারা গাছের কাণ্ড আক্রান্ত হলে গাছ মারা যেতে পারে।	আম গাছের কাণ্ডের মাজর পোকা Mango stemborer
৪	মার্চ - নভেম্বর	বিছা পোকার কীড়া আম গাছের পাতা খেয়ে গাছকে পাতা শূন্য করে দেয়। ফলে গাছে ফুল ও ফল আসে না।	আম পাতার বিছা পোকা Mango leaf gall midges
৫	এপ্রিল - মে	কীড়া আমের ভেতর ঢুকে শাস খাওয়ার ফলে আম পঁচে যায়। আক্রান্ত যা কাটলে তার মধ্যে অসংখ্য কীড়া। কিলবিল করতে দেখা যায়	আমের মাছি পোকা Mango) fruit fly
৬	মে - অক্টোবর	কাঁঠাল ছিদ্র করে ভেতর ঢুকে পচিয়ে ফেলে।	কাঁঠালের ফল ছিদ্রকারী পোকা Store wecvil

২০২২

৭	এপ্রিল - আগষ্ট	পূর্ণ বয়স্ক বিটল কঁচি কলা পাতা ও কচি কলার খোসা খায়। ফলে কলার পাতা ও ফলের ওপর ছোট ছোট দাগের সৃষ্টি হয়।	কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা Banana leaf and fruit beetle
৮	জুলাই - অক্টোবর	পুর্ন বয়স্ক উইভিল কলা গাছের গোড়ায় শিকড়ের ওপর ডিম পাড়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়ে কাণ্ডের ভেতর ঢুকে যায়। ফলে আক্রান্ত অংশ পচে যায়, ডগার পাতা শুকিয়ে গাছ মরে যায়।	কলা গাছের কাণ্ডের শুড় পোকা Banana Stem weevil
৯	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল	কীড়া ফসলের বোটার দিকে ছিদ্র করে ঢুকে শাঁস ও বীজ খায়।	লিচু ছিদ্রকারী পোকা Litchi fruit boner
১০	মার্চ - জুন এবং আগস্ট-অক্টোবর	ক্ষুদ্র মাকড় পাতার নিচে ছিদ্র করে রস শোষণ করে। ফলে আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায় ও শুকিয়ে ঝরে পড়ে।	লিচু পাতার বুদ্র মাকড় Litchi mite
১১	মে - অক্টোবর	পাতা থেকে রস চুষে খায়।	পেয়ারা সাদা মাছি Spiraling whitefly
১২	মে - অক্টোবর	ফল ছিদ্র করে শাঁস খায়।	ফলের মাছি (Fruit fly)
১৩	জুন - সেপ্টেম্বর	ডগা, ফল, কুড়ি থেকে রস চুষে খায়, ফলের আকার ছোট হয়।	ছাত্ররা পোকা Maly bug
১৪	সারা বছর	নারিকেল গাছের মাথায় না বের হওয়া পাতা কেটে ক্ষতি করে।	নারিকেল গাছের গন্ডার বা গুরা পোকা Rhinoceros beetle
১৫	জুলাই-সেপ্টেম্বর	বাকল ও কাণ্ড ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে সুড়ঙ্গ বর খায়	রেড পাম উইভিল Rod palm weevil
১৬	এপ্রিল - অক্টোবর	অল্প বয়স্ক কীড়া কচিপাতা ও কচি ডগা খায়। পাতার কিনারা থেকে শুরু করে শিরা পর্যন্ত যায়। অনেক সময় সম্পূর্ণ গাছের পাতা খেয়ে পাতা শূন্য করে ফেলে।	লেবুর প্রজাপতি Lemon butterfly
১৭	সারা বছর	অপূর্ণাঙ্গ ও পূর্নাঙ্গ সাদা মাছি পাতার নিচে থেকে রস চুষে খায়। ফলে পাতা কুঞ্চিত ও বাদামি রঙের হয়, লেবুর ফলন কমে যায়।	লেবু গাছের সাদা মাছি Citrus white fly
১৮	জুন - সেপ্টেম্বর	নিস্ক ও পুর্ণবয়স্ক ছাতরা পোকা লেবু গাছের পাতা ও শাখা থেকে রস শোষণ করে খায় ফলে গাছ নেতিয়ে যায়এবং আক্রান্ত শাখা মরে যায়।	লেবু গাছের ছাতরা Otrus stem borer
১৯	এপ্রিল - আগষ্ট	ক্রীড়া অবস্থায় এরা লেবু গাছের ডগার মাঝখানে গর্ত খুঁড়ে সুরঙ্গের সৃষ্টি করে।	লেবু গাছের মাজরা পোকা Citrus stern borers
২০	মে - জুলাই	বাচ্চা (নিম্প) ও বয়ক পোকা চারা গাছের কচিপাতা, ডগা ও কচি ফলের রস শোষণ করে খায়।	লেবু হলদে খোসা পোকা Citrus yellow scale

২০২২

২১	সারা বছর	ক্রীড়া অবস্থায় এরা লেবু গাছের কচি পাতায় গর্ত খুঁড়ে সর্পিল আঁকাবাঁকা দাগের সৃষ্টি করে। এমনকি বড় গাছের নরম পাতা ডাল তাড়াতাড়ি খেয়ে গাছকে প্রায় পাতা শূন্য করে ।	লেবু পাতার ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ পোকা বা পাতা কুবন্দী পোকা Citrus leaf Miner
২২	জুন - নভেম্বর	বাচ্চা ও পূর্ণ বয়স্ক গান্ধি পোকা বাড়ন্ত ফলের রস শোষণ করে। আক্রান্ত ফল নিতেজ হয়, পচন ধরে ও মাটিতে ঝরে পড়ে।	কলমা লেবুর গন্ধি পোকা Dangebug
২৩	নভেম্বর - জানুয়ারি	কীড়া ফলের শাঁস খায়, আক্রান্ত ফলে পচন ধরে মাটিতে ঝরে পড়ে।	ফলের মাছি পোকা Fruit fly

পোকা দমন পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা

ফসলকে বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য পোকা দমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। প্রধানত দুই প্রকার পদ্ধতিতে পোকা দমন করা হয়। যেমন–

১) প্রাকৃতিক দমন ও ২) ফলিত বা কৃত্রিম দমন

প্রাকৃতিক দমন (Natural Control)

১. জলবায়ুগত উপাদান সমূহ দ্বারা

২. ভূমির বন্ধুরতা বৈশিষ্ট্য দ্বারা

৩. শিকারি জীব দ্বারা

৪. পোকার রোগ দ্বারা

ফলিত বা কৃত্রিম দমন (Applied or Artificial Control)

১. যান্ত্রিক দমন

২. ভৌত দমন

৩. কৃষিজ পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ

৪. জৈবিক দমন

৫. রাসায়নিক দমন

৬. কৌলিকভাবে দমন

৭. আইনগত নিয়ন্ত্রণ

প্রাকৃতিক দমন (Natural Control)

জলবায়ুগত উপাদানের মধ্যে তাপমাত্রা, আদ্রতা, আলো, বাতাস ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। এ সকল উপাদানের বিভিন্ন মাত্রা বিভিন্ন পোকা সহ্য করতে পারে ও বংশ বিস্তার করে থাকে। এসব উপাদানের পরিবর্তন ঘটলে বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। যেমন গ্রীষ্মের সময় অত্যধিক তাপমাত্রায় বা খরায় পোকার মৃত্যু ঘটে। অল্প আদ্রতায় শোষক পোকার মৃত্যু ঘটে। আর্দ্রতা বেশি হলে পোকার দেহে ছত্রাকজনিত রোগ বেশি হয় এবং পোকা মারা যায়। এছাড়া খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির জন্য একই অথবা একাধিক প্রজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে প্রাকৃতিক ভাবে পোকা দমন হয়।

ফলিত বা কৃত্রিম দমন (Applied or artificial control) মানুষ কতৃক গৃহীত দমন ব্যবস্থাকে কৃত্রিম বা ফলিত দমন বলে। প্রাকৃতিক ভাবে দমন কার্যকরী না হলে কৃত্রিম দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হয়। ২০২২

ক. যান্ত্রিক দমন (Mechanical control): যান্ত্রিক উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ হলো বিশেষ কোন ধরনের কোন যন্ত্র, মানুষের শ্রম ও কোন বিশেষ দ্রব্যের সাহায্যে কীটপতঙ্গ দমনের কৌশল। অথাৎ হাত দ্বারা ধরে এবং বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পোকা মাকড় দমন পদ্ধতিকে যান্ত্রিক দমন বলে। যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি গুলো হলো। নিম্নরুপঃ

১. হাতে ধরা এ পদ্ধতিতে মাজরা পাকার ডিম, মথ ও পূর্ণাঙ্গা পোকা দমন করা যায়। হাতের সাহায্যে এগুলো সংগ্রহ করে পিটিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে।

২, পাতার অগ্রভাগ কাটা : পামরি পোকাসহ কতিপয় পোকা এবং তাদের ডিম ও গ্রাব পাতার অগ্রভাগে মোড়ানো অবস্থায় বা পাতার শিরার মাঝখানে থাকে। এ অবস্থায় পাতার অগ্রভাগ এবং মোড়ানো অংশ কেটে মাটিতে পুতে বা আগুনে পুড়ে ফেলা যায়।

৩. আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা : আক্রান্ত গাছগুলো বিশেষ করে ভাইরাস আক্রান্ত গাছ গুলো তুলে আগুনে পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

৪. আলোর ফাঁদ: হ্যাজাকলাইট, হারিকেন, বৈদ্যুতিক বাতি ইত্যাদি দ্বারা আলোর ফাদ তৈরি করে ক্ষেতের মধ্যে বা পাশে ঝুলিয়ে রাখলে বিভিন্ন পোকা আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়। বাতির নিচে রক্ষিত একটি কেরোসিন বা কীটনাশক মিশ্রিত পানির পাত্রে পোকাগুলো পড়ে মারা যায়।

৫. আঠা লাগানো ফাঁদ ও কয়েকটি হার্ডবার্ডের টুকরায় আঠা বা গাম লাগিয়ে জমিতে বিছিয়ে রাখলে পোকা চলাচলের সময় বার্ডের আঠায় আটকিয়ে যায়। এ ধরনের ফাদে সবুজ পাতা ফড়িং ও বাদামি গাছ ফড়িং বেশি ধরা পড়ে। হলুদ রঙের দিকে বাদামি গাছ ফড়িং এবং সাদা রঙের দিকে থ্রিপস বেশি আকৃষ্ট হয়।

খ, আধুনিক চাষাবাদ বা পরিচর্যা পদ্ধতি র মাধ্যমে দমন (Cultural method)

১. রোগবালাই প্রতিরোধী জাত (Resistant variety) চাষের মাধ্যমে দমন: রোগ প্রতিরোধী জাতের ফসল চাষ করে পোকা মাকড়ের আক্রমণ বহুলাংশে রোধ করা যায়। যেমন - আই আর- ২০, ব্রি ধান-৫, ব্রিধান-৩৩, বিআর-৩১, বিআর-৬, চান্দিনা জাতগুলো ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রোপণ করলে বাদামি গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে ধানের জমি রক্ষা করা সম্ভব। বিআর-১, ১০,১১ ও ১২ মাজরা পোকা সহনশীল জাত হিসাবে চিহ্নিত (সুত্র: আধুনিক ধানের চাষ: ব্রি)।

২. রোদ শুকানো: জমি চাষ করে আলগা অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা রোদ শুকাতে দিলে অনেক পোকা মারা যায়।

৩, গভীরভাবে চাষ: গভীর ভাবে চাষ দিলে পোকা উপরে ওঠে আসে। তারপর রোদ শুকিয়ে মারা যায় বা পাখি খেয়ে নেয়।

৪. মুড়িয়ে ফসল কাটা: ধান কাটার পর যদি অবশিষ্ট অংশ বেশি থাকে। তবে তার মধ্যে মাজরা পোকা, লেদা পোকার পুত্তলী আশ্রয় নেয় ।তাই মুড়িয়ে ফসল কাটতে হবে যাতে পোকা আশ্রয় নিতে না পারে।

৫. পর্যায়ক্রমে ফসলের চাষ: একই জমিতে একই ফসল প্রতি বছর আবাদ করলে সে ফসলে পোকার আক্রমণ বেড়ে যায়। কিন্তু যদি পর্যায়ক্রমে ফসলের চাষ করা হয় যেমন- কলার পরে পেঁপে বা আনারস এতে পোকার আক্রমণ কমে যায়। ধানের ক্ষেতে পাট বা গম ইত্যাদি।

৬. পানি ব্যবস্থাপনা: পানি সেচ দিয়ে উড়চুঙ্গা, শীষকাটা লেদা পোকা ইত্যাদি পোকা মারা যায়। আবার পানি সরিয়ে দিয়ে ধানের জমি হতে চুঙ্গি ও ঘাস ফড়িং এর আক্রমণ কমানো বা রোধ করা যায়।

৭. আগাছা মুক্ত জমি: আগাছা পাকামাকড় ও রোগবালাই এর আশ্রয় স্থল এবং বংশবিস্তারের মাধ্যম আগাছা মুক্ত রাখার মাধ্যমে পোকামাকড়ের আক্রমণ কমানো যায়।

গ. রাসায়নিক দমন (Chemical Control)

পোকা মাকড় এবং রোগবালাই দমন পদ্ধতির মধ্যে রাসায়নিক দমন হলো সর্বশেষ বহুল ব্যবহৃত দমন পদ্ধতি। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এ পদ্ধতির প্রয়োগ না করাই ভালো। এ পদ্ধতি তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন অন্য কোন উপায়ে পোকা দমন সম্ভব নয়। এতে করে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী জীবাণুর বিশেষ ক্ষতি হয়। রাসায়নিক পদ্ধতি কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে কীটনাশকের সঠিক প্রয়োগ পদ্ধতি ও সময় জানা প্রয়োজন। এ দমন পদ্ধতিতে ডায়াজিনন, সুমিথিয়ন, সেভিন, ফুরাডান, ফাইফানন ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য, এলটুসিড, ডিমিলিন ইত্যাদি কৃত্রিম হরমোন, নিম, বিষকাঁঠালী, নিশিন্দা ইত্যাদি ভেষজ বিষ হিসাবে পোকা দমনে ব্যবহার হয়। রাসায়নিক বালাইগুলো ব্যবহারের পূর্বে নিমের বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

(i) ফসলে কী ধরনের পোকার আক্রমণ হয়েছে তা পরীক্ষা করা

(ii) ওষুধ ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতে দমন করা সম্ভব কিনা যাচাই করা

(iii) সঠিক বা অনুমোদিত সর্বনিম্ন মাত্রায় প্রথম বার বালাইনাশক প্রয়োগ

(iv) সঠিক সময়ে সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা

(v) ফসলের উপকারী পোকামাকড় যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে নজর রাখা

(vi) ফসলের আর্থিক ক্ষতির নিম্নতম পর্যায় অতিক্রম করলেই কেবল প্রয়োগ করা ইত্যাদি

ঘ. জৈবিক দমন (Biological Control): এই পদ্ধতিতে পোকার প্রাকৃতিক শর্তসমুহ যেমন- পরভোজী, পরজীবী এবং রোগজীবাণু কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করে আক্রান্ত শস্য ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে দমন করা হয়। অর্থাৎ ফসলের মাঠে/বাগানে ক্ষতিকর কীটপতঙ্গা সমূহকে বিভিন্ন প্রকার রাগজীবাণু, পরভোজী ও পরবাসী কীটপতঙ্গ, পোকা খাদক পাখি, ব্যাঙ, ইত্যাদি উপকারী জীব দ্বারা দমন করার পদ্ধতিতে জৈবিক দমন পদ্ধতি বলে। জৈবিক দমন পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপঃ

(i) পরভোজী পোকা সংরক্ষণঃ যে সব পোকা অন্য পোকাকে খেয়ে বেঁচে থাকে তাদেরকে পরভোজী পোকা বলে। এদের মধ্যে রয়েছে লেডিবার্ডবিটল, মেরিড বাগ, মাকড়সা ইত্যাদি। এরা ফসলের অনিষ্টকারী পোকা যেমন- সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামি গাছ ফড়িং ইত্যাদি খেতে ভালাবাসে। এছাড়া টাইগার বিটল, ড্রাগন ফ্লাই ইত্যাদি পরভোজী পোকাগুলো অন্যান্য অনিষ্টকারী পোকা খেয়ে জৈবিক দমনে সাহায্য করে। কাজেই এসব পরভোজী পোকা সংরক্ষণ করা অতীব জরুরী।

(ii) প্রবাসী পোকা সংরক্ষণঃ ফসলের অনিষ্টকারী পোকার সাথে টেলিনমাস, ব্রাকনিড ইত্যাদি কতগুলো পরবাসী পোকা বাস করে। ব্রাকনিড হল ধানের পামরি পোকার এবং টেলিনমাস হল হলুদ মাজরা পোকার ডিমের প্যারাসাইট। এরা আগষ্ট হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৬০ থেকে ১০০ ভাগ পোকার ডিম নষ্ট করে।

(ii) পাখি বসার ডালঃ শালিক, ময়না, দোয়েল ইত্যাদি পাখি পোকা খায়। ক্ষেতের মধ্যে গাছের ডাল বা বাঁশের আগা ইত্যাদি পুঁতে দিয়ে পাখি বসার সুযোগ করে দিলে বিভিন্ন অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ দমনে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট দূরত্বে ধৈঞ্চা লাগিয়েও পাখি বসার সুযোগ করে দেয়া যায়।

(iv) মাছ ও হাঁসের চাষঃ বোরো ও রোপা আমন ধানের ক্ষেতে মাগুর, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছের চাষ করলে মাছ পোকা খেয়ে ধানের উপকার করে। আবার ধানের জমিতে হাঁস ছাড়লে জমির পোকা খেয়ে হাঁস ধানের উপকার করে।

২০২২

(iv) **ব্যাঙঃ** ফসলের ক্ষেতে বিশেষ করে ধানের জমিতে ব্যাঙ ছেড়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলে ব্যাঙ পোকামাকড় ধরে খায়।

(ঙ) কৌশিক ভাবে দমনঃ গামা রশ্মি প্রয়োগে কীট পতঙ্গের প্রজনন ক্ষমতা রহিত করে এবং পোকার সংখ্যা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে পুরুষ পাকাগুলোকে গামা রশির মাধ্যমে বন্ধা করে স্ত্রী পোকাগুলোর সহিত স্বাভাবিক যৌন মিলনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এদের মিলনের ফলে সব ডিমই বা হয় এবং বাচ্চা হয় না।

(চ) আইনগত নিয়ন্ত্রণঃ কোন ক্ষতিকর পোকা কোন দেশ বা অঞ্চলে যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আইনগত ভাবে বাধা প্রদান করা হয়। আক্রান্ত গাছের অংশ ও বীজ এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চলাচলে আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করে অনেক পোকা ও রোগের ব্যাপক বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

যান্ত্রিক পোকা দমনের পদ্ধতি ও উপকারিতা

যান্ত্রিক পদ্ধতির উপকারিতা

১. পরিবেশ দূষণ হ্রাসে সহায়তা করে বা কমিয়ে আনে।

২. অল্প খরচে সামান্য কিছু উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে পাকার বংশ প্রাথমিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. এই পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব, কোন রকম দূষণ সৃষ্টি না করে পোকা দমন করা যায়।

৪. এই পদ্ধতি কম ব্যয় বহুল

৫. কৃষকের উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়। কম খরচে বেশি ফলন পেতে সহায়তা করে।

৬, অল্পতেই কৃষককে এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্পর্কে সেখানে যায়।

৭. উপকারী পোকা মাকড়, মাছ, ব্যাঙ, পশুপাখি ইত্যাদির সংরক্ষনে সহায়তা করে।

৮. প্রাকৃতিক ভাবে বিদ্যমান জৈবিক ভারসাম্যের কোন ক্ষতি করে না

৯. ক্ষতিকর বালাই নাশকের ব্যবহার কমিয়ে কৃষকের আর্থিক সাশ্রয় করে।

পোকাদমনে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থার উপকারিতা

সমন্বিত বালাই দমনের বহুবিধ সুবিধার মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. উপকারী পোকামাকড়, মাছ, ব্যাঙ, পশু-পাখি প্রভৃতি সংরক্ষণ করা যায়

২. বালাইনাশকের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে করে উৎপাদন খরচ কমে যায়

৩. ক্ষতিকারক পোকা মাকড়, বালাইনাশক সহনশীলতা অর্জন করার সুযোগ পায় না

৪. বালাই নাশ ক্রিয়া রোধ করা। এতে করে বালাইনাশক হজেই এড়ানো যায়।

৫. বালাইয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা কমে যায়।

৬. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

৭. কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনা যায়।

৮. জনস্বাস্থ্য ভালো রাখা যায়।

৯. ফসল সংরক্ষণ খরচ কমিয়ে আনা যায়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সারা বিশ্বে কত প্রজাতির পোকা মাকড় ফল ও ফল গাছের অনিষ্ট করে থাকে ?

২। পোকা মাকড়ের প্রাকৃতিক দমন বলতে কী বোঝায় ?

৩। কাঁঠালের ফল ছিদ্রকারী পোকার নাম কী ?

৪। পোকা দমনে যান্ত্রিক পদ্ধতির উপকারীতা কী ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আম ছিদ্রকারী পোকার অপর নাম কী ? এ পোকা দমনের উপায় বর্ণনা কর।

২। কলার পাতা ও ফলের বিটলের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

৩। নারিকেলের গন্ডার পোকার অপর নাম কী ?

এ পোকাকে গন্ডার পোকা বলা হয় কেন ? এ পোকা দমনের উপায়গুলো লেখ।

৪। পোকা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লেখ।

৫। প্রাকৃতিক দমন ও কৃত্রিম দমনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

৬। যান্ত্রিক ও জৈবিক পদ্ধতিতে পোকা দমনের উপকারিতা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কলার পাতা ও ফলের বিটল কোন অবস্থায় কলা গাছের ক্ষতি করে। এ পোকার ক্ষতির নমুনা ও দমনের উপায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা দমন কৌশলগুলার বর্ণনা কর।

৩। জৈবিক উপায়ে পোকা দমন পদ্ধতির বিবরণ দাও।

৪। ফল ও ফল গাছে পাকার আক্রমণের ধরন দেখে আম, কাঁঠাল কলা, নারিকেল ও পেয়ারার ২টি করে প্রধান পোকা শনাক্ত করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায় ? এর উপকারিতা বা সুবিধাগুলো লেখ।

একাদশ অধ্যায়

ফল ও ফল গাছে রোগ দমন

খাদ্যপ্রাণে ভরপুর ফল অতি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ফলের মধ্যে যেসব উপাদান আছে তা আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন। আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সব ভিটামিন প্রয়াজন তার সবগুলো ফলে রয়েছে। শরীরিক সুস্থতা ও সুঠাম দেহ রক্ষায় ফলের ভূমিকা অপরিসীম। খাদ্য হিসাবে ফলের সুবিধা হলো যে রান্না ছাড়াই ফল খাওয়া যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ফল চাষের খুব উপযোগী এবং একর প্রতি গড় ফলন যে কোন মাঠ ফসলের তুলনায় বেশি। মাঠ ফসলের তুলনায় ফল উৎপাদনে বেশি হওয়ায় ফলচাষে আর্থিক দিক দিয়ে কৃষকের আরও বেশি লাভবান হতে পারে।

বাংলাদেশে সারাবছরই বিভিন্ন জাতের ফল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রোগের দরুন ফলের উৎপাদন অনেক স্থানে আশাতীত হয় না। তাছাড়া রোগ ফলের গুণাগুণও নষ্ট করে। ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফলের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বাংলাদেশের ফল ও ফল গাছের প্রধান প্রধান রোগের তালিকা

ক্র নং	রোগের নাম	ফসলের নাম	ফল বা ফল গাছের আক্রান্ত অংশা
১	আগা মরা (Die-back)	আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু লিচু, নারিকেল	কাণ্ড
২	স্যুটি মোল্ড (Shooty mould)	আম, জাম পেয়ারা, পেঁপে, কাঁঠাল, লিচু, লেবু	পাতা
৩	ফোস্কা, ফল পঁচা (Anthrac nose)	আম, পেয়ারা, কলা	ফুল, ফল, পাতা, কাণ্ড
৪	লাল মরিচ (Red rust)	আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বেল	পাতা ও ফল
৫	পিংক রোগ (Pink)	আম, কাঁঠাল, লেবু	
৬	বিকৃতি (Malformation)	আম	ফল
৭	পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)	আম, কুল, পেঁপে	ফুল ও কাণ্ড,পাতা ও ডাল
৮	বৃন্ত পঁচা (Stem-rot)	আম, কলা, পেঁপে	ডাল
৯	সিগাটোকা (Sigatoka)	কলা	ফল
১০	পানামা (Panama)	কলা	গাছ
১১	ফল পচা (Fruit rot)	আম, কলা, পেঁপে, কুল	গাছ
১২	গোড়া পঁচা (Collar rot)	পেঁপে, কলা	ফল
১৩	মোজাইক (Mosaic)	পেঁপে	গাছ
১৪	রাইজোপাম ফল পঁচা	কাঁঠাল	পাতা
১৫	গ্রে লিফ স্পট (Grey leat spot)	নারিকেল, লিচু	ফল
১৬	কাণ্ডের রস বরন (Stem bleeding)	নারিকেল, লেবু	ফল
১৭	উইলট (Wilt)	পেয়ারা	গাছের কাণ্ড

২০২২

১৮	ক্যাংকার (Canker)	লেবু	ডালপাতা, ফল ও ফুল
১৯	স্ক্যাব (Scab)	লেবু	পাতা
২০	কাণ্ড পঁচা	আনারস	গাছ
২১	কাণ্ডের ব্যাংকার	পেয়ারা	কাণ্ড
২২	গুড়া মিলডিউ	লিচু, আম, কাঁঠাল, কুল	ফল ও ফুল
২৩	কুঁড়ি পচা, ট্যাপারিং	নারিকেল	গাছ
২৪	চারার বরাইট	পেয়ারা	গাছ
২৫	ডগা মরা	পেয়ারা	গাছ
২৬	পাতায় দাগ পড়া	লচু, পেঁপে, নারিকেল, পেয়ারা	পাতা
২৭	ব্যাকটেরিয়াল লিফ স্পট	কাঁঠাল, আম	পাতা ও ফুল
২৮	পচা রোগ	কাঁঠাল, লিচু, কুল	গাছ, ফুল ও ফল
২৯	ঢলে পড়া রোগ	কলা	গাছ
৩০	এক্সোকরটিস	লেবু	ডাল

ফল ও ফল গাছের রোগের লক্ষন দেখে সনাক্তকরণ

ক্র নং	ফসল/ফলের নাম	রোগের লক্ষণ	রোগের কারণ/ বৈজ্ঞানিক নাম	রোগের নাম
১	লেবু, পেয়ারা	শিকড় ছাড়া, সব অঙ্গেই ফোস্কার মতো উচু দাগ পড়ে দাগের চারদিকে গ্রিজের মতো মনে হয় এবং বৈশিষ্ট্যমূলক হলুদ দাগ দেখা যায়।	ছত্রাক কলেটট্রিকাম গিরওসপরিঅইডিস Colletotricum gloeosporiodes	আগামরা (Die back)
২	আম, পেয়ারা, আনারস, পেঁপে, লেবু, নারিকেল	পাতায় বাদামি রঙের কোনোচ দাগ হয়। বোটা আক্রান্ত হলে কাল হয়ে আম ঝরে পড়ে। আক্রান্ত মঞ্জুরী ফুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে।	ছত্রাক	এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)
৩	আম, পেঁপে, কুল, আনারস, তরমুজ	কচিপাতা, পুষ্প মঞ্জুরী, কচি ফলে সব স্থানে প্রথমে সাদা এবং মাঝে মাঝে ধূসর বর্ণের পাউডার দ্বারা আবৃত হয়। পুষ্প মঞ্জরি এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।	ছত্রাক Oidium sp অডিয়াম এসপি	পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew)
৪	আম. জাম, পেয়ারা, লেবু	সুটি মোল্ড পাতার কালো পাউডারের আস্তরণে ঢেকে যায় ও কুৎসিৎ করে ফেলে।	ছত্রাক Capnodium sp (ক্যাপননাডিয়াম এসপি)	স্যুটি মোল্ড Shooty mould
৫	আম, পেঁপে, কলা	রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ফলের বোটার গোড়ার নিচে চারদিক দিয়ে কালচে হয়ে আসতে থাকে। দাগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বৃন্তকে ঘিরে ফেলে এবং সম্পূর্ণ আম কালো হয়ে যায়।	ছত্রাক Diplodia theobromae/ Diplodia natalensis	বৃন্ত পচা (Stem-end Rot)

২০২২

৬	কলা	প্রথমে পাতাতে শিরার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সমান্তরাল ভাবে ছোট ছোট ও লম্বাটে ঈষৎ হলুদ রঙের দাগ দেখা দেয় পরে লম্বা হয়ে গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে।	ছত্রাক Bata Cercos pora musae (সারকোসপোরা মিউসি)	সিগাটেকা Sigatoka
৭	আম,কলা, পেঁপে	ফলের খোসা শুকায়ে বাদামি রং ধারণ করে। খোসা উঠানো হলে ভিতরে শাঁস ঘোলাটে ও অস্বচ্ছ দেখায় এবং হালকা দুর্গন্ধযুক্ত হয়।	ছত্রাক Colletotrichum sp (কলেটট্রিকাম এসপি)	ফল পচা (Fruit rot)
৮	কাঁঠাল	আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ রং ধারণ করে এবং সম্পূর্ণ গাছ ফ্যাকাশে হয়ে আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে। ডাল বা শিকড়ের ছালা উঠালে কাঠের উপর দিয়ে সাদা এবং বাদামি ছত্রাক দেখা যাবে যায়।	ছত্রাক Pestal oliopsis palmarum	বাদামী শিকড় রোগ
৯	পেঁপে	আক্রান্ত পাতা সাদাটে হয় ও পাতা কুকড়ে যায়। পাতার ক্লোরফিল নস্ট হয়ে পাতায় ছিটিছিট হলুদ সবুজ মাজাইক দাগ পড়ে	ভাইরাস	মোজাইক রোগ Mosaic
১০	লেবু	আক্রান্ত চারার পাতা বাদামি বর্ণ ধারণ করে। আগা থেকে শুরু করে নিচের দিকে আস্তে আস্তে পাতা বাদামী রঙ ধারণ করে।	ছত্রাক	সিডলিং বাইট
১১	পেয়ারা, লেবু	এই রোগ কাণ্ডে হলে কাণ্ড ফেটে যায়, কাল দাগ পড়ে। ফল আক্রান্ত হলে সবুজ ফল ত্বকে কালো দাগ দেখা যায়। দাগগুলো গভীর হয় না।	ব্যাকটেরিয়া Xantho monas campestris pv, citi	ক্যাংকার রোগ (Canker)
১২	লেবু	পাতা ও ফলে আক্রমণ করে। পাতা আক্রান্ত হলে ছোট ছোট বাদামী রং এর ফোলা ফোলা দাগ পড়ে। এই দাগ পরে বড় হয়ে চ্যাপ্টা শক্ত আঁচিলের মত হয়। আঁচিলের চার পাশে হালকা হলুদ রঙ ধারণ করে।	ছত্রাক Elsinoe fawcetti (এলসিনে ফসেটি)	ক্যাব (Scab)s
১৩	বেল	এ রোগে পাতায় ও ফলে মরিচা পড়া দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতায় বাদামি দাগ পড়ে এবং পাতা হলুদ হয়ে যায়।	ছত্রাক Cephaleuros parasitica (সেফালিওরস প্যারাসাইটিকা)	মরিচা পড়া রোগ Red rust

১৪	আমড়া	মাঝে মাঝে কচি ডালের মাথা হতে নিচের দিকে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়।	ছত্রাক	আমড়ার চারার ডগা মরা রোগ
১৫	কলা	মাথার পাতা ছোট আকারের হয় নতুন । পাতগুলো ঘন হয়ে বের হয় এবং আগা গুচ্ছ রূপ ধারন করে।	মাইকোপরাজমা Micoplasma	গুচ্ছ মাথা রোগ Bunchy top (বাঞ্চি টপ)
১৬	পেঁপে, কলা	গাছের গোড়ায় মাটি সংলগ্ন কাণ্ডের চারদিকে পচা চিহ্ পাওয়া যায়। গোড়া পচা স্থান বাদামি রঙের হয়। অল্প বাতাসে ঢলে পড়ে। টান দিলে উঠেআসে, মাটির নিচের অংশে পঁচা দেখা । যায় এবং দুর্গন্ধ বের হয়।	ছত্রাক Pythium aphani dermatum (পিথিয়াম এ্যাফানিডারমেটাম)	গোড়া পচা রোগ Collar rot
১৭	নারিকেল, লেবু	বর্ষার সময় কাণ্ডের গায়ে এক বা একাধিক জায়গা থেকে লাম্বাটে বাদামী রঙের রস ঝরতে থাকে। রস ঝরা স্থানের আশে পাশের কাণ্ড পচতে থাকে। পচা স্থানে আস্তে আস্তে বড় গর্ত তৈরি হয়।	ছত্রাক Ceratocystis paradoxa (সিরাটোসিসটিস প্যারাডক্স)	কাণ্ডের রস ঝরা (Stem bleeding)
১৮	কাঁঠাল	কাঁঠালের পুষ্প মঞ্জুরি, কচি ফল বা মুচি এ রোগে আক্রান্ত হয়। পানি সিক্ত কালো দাগ হিসাবে পুষ্প মঞ্জুরী গোড়ায় বা মুচির বৃন্তে কাল দাগ বৃদ্ধি পায় এবং সম্পূর্ণ বৃন্ত ও মুচি কাল হয়ে যায়। আক্রান্ত পুষ্প মজুরি বা মুচি নরম হয়ে । পচে ঝরে পড়ে	ছত্রাক Rhizopus Artocarpi (রাইযোপাস আরটোকারপি)	কাঁঠালের ফল পচা Fruit rot of jack Fruit
১৯	পেয়ারা	এ রোগে গাছের ডাল একটি একটি করে মরতে থাকে। প্রথমে গাছের উপরের ডালপালা দুএকটি করে শুকায় এবং ধীরে ধীরে নিচের ডাল পালা শুকিয়ে পুরো গাছটি মারা যায়।	ছত্রাক Fusarium oxysporum sidil (ফিউজেরিয়াম অক্সিসপারোম এফএসপিসিডিল)	পেয়ারার উইলট বা আগা মরা Guava wilt
২০	আনারস	এ রোগের আক্রমণে সবুজ পাতা ক্রমশ হলদে হয়ে যায়। ডগা বাদামি বর্ণ ধারণ করে, মাঝের পাতা টানলে সহজেই উঠে আসে।	ছত্রাক	মাঝপাতা পচা রোগ Top leaf blights

ফল ও ফল গাছের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার

বৈজ্ঞানিক কৃষির বিকাশ ও উদ্ভিদ রোগের বিকাশ ফসল চাষাবাদের শুরু থেকে সমান্তরালভাবে চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ শুরু করে। যেমন-

১। নতুন জাতের আবাদি ফসল/গাছ

২। অধিক ফলনশীল ফসলের জাত

৩। উন্নত সার আধুনিক সারের উদ্ভাবন ও ব্যবহার

৪। অঢেল সেচের পানি এবং

৫। পতিত না রেখে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার

কিন্তু রোগব্যাধির প্রতি বিশেষ নজর না রেখে এসব প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মাধ্যমে রোগ বালাই বিস্তার লাভ করে। যেমন-

১। বীজ ও অন্যান্য অঙ্গজ বংশবৃদ্ধির উপকরণের সাথে শক্তিশালী রোগজীবাণুর আবির্ভাব

২। নতুন শস্য জাত চাষের ফলে পুর্বের রোগ জীবাণুর অধিকতর শক্তি সঞ্চয়

৩। বিরাট এলাকা জুড়ে একই ফসল ও একই জাত চাষ, নিবিড় চাষ এবং সারা বছর ফসল দ্বারা মাঠ আচ্ছাদিত থাকায় রোগজীবাণু বেঁচে থাকার বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ পায়।

৪। সার ও পানি নির্বিচারে ব্যবহার রোগজীবাণু বিস্তারে সহায়ক। সুতরাং যে প্রযুক্তি বা কৌশল আমরা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োগ করছি তা রোগ জীবাণু বৃদ্ধির জন্য অনুকূল। আধুনিক প্রযুক্তি রোগ জীবাণু সম্পর্কিত বিপদ বৃদ্ধির যেমন সহায়ক, তেমনি বৈজ্ঞানিক ভাবেই রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রনও সম্ভব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাকোবিলায় অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োজন। একই ভাবে রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণে ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এই দুই পরিস্থিতি হতে ফসলের রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার অথাৎ সংরক্ষনের উপর গুরুত্ব অনুধাবন করতে যাতে অধিক উৎপাদনের মাঝে সাথে রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলোঃ

১। মাঠে বা বাগানে যা রোপণ বা বপন করা হবে তা শস্য/গাছে পরিণত হবে।

২। যা আবাদ করা হবে তা থেকে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যাবে।

৩। যা উৎপন্ন হবে তা নিরাপদে বাজারে আসবে এবং অবশেষে তাই গ্রাহকের নিকট পৌছুবে।

উপরোক্ত তিনটি বাক্য হতে এটা বোঝায় যে, ফসল চাষাবাদের প্রত্যেকটি বা যে কোন ধাপে রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগ দমনের প্রয়োজন রয়েছে, উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রেখে লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছার জন্য। উদ্ভিদ রোগ দমনের মূলনীতি (Principles of plant disease control) একটি কার্যকরী উদ্ভিদ রোগ দমন কর্মসুচী প্রনয়নে নিম্নলিখিত মুল বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার।

১। শস্যের প্রকার : লতা, গুল্ম গাছ, অর্থকরী ফসল, খাদ্য শস্য ইত্যাদি শস্যের বৃদ্ধির পর্যায়।

২। রোগজীবাণুর প্রকৃতি ও ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি রোগ জীবাণুর জীবনচক্র, বীজ, মাটি বা বায়ু বাহিত, বিস্তারের ধরন ইত্যাদি।

৩। রোগের প্রকৃতি ও অভ্যন্তররীণ/বাহ্যিক, বীজ, মূল, ফুল, পাতায় আক্রমণ এ সকল বিষয় মনে রেখে উদ্ভিদ রোগ দমন কর্মসূচি নিম্নলিখিত ৪টি মূলনীতির ভিত্তিতে প্রনয়ন করা যায়।

ক. রোগজীবাণু বর্জন (Exclusion of pathogen)

খ. রোগ জীবাণু নির্মূল (Eradication of the pathogen)

গ. রোগ জীবাণুর হাত থেকে ফসলকে বাঁচানো।

ঘ. রোগ প্রতিরোধী জাত উন্নয়ন (Resistant variety)

উপরোক্ত ৪(চার) মূলনীতির উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের রোগ দমনে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়

১। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে (Legislative measures)

২। চাষাবাদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (Cultural practices)

৩। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার (Use of Chemicals)

৪। রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার (Use of resistant variety)

৫। জৈবিক দমন (Biological control)

৬। সমন্বিত রোগ দমন (IPM- Integrated Pest Management)

রোগ দমন ব্যবস্থা কোন সময় নেওয়া হলো তার উপর ভিত্তি করে রোগ দমন পদ্ধতি দুই প্রকার

১। প্রাফোইলক্সিস - রোগ যাতে সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা নেওয়াকে প্রিভেনটিভ ব্যবস্থা বলে।

২। থেরাপি ও রোগ শুরু হওয়ার পর রোগের বৃদ্ধি রহিত করার ব্যবস্থাকে কিউরেটিভ ব্যবস্থা বলে।

সারণি– ১ উদ্ভিদের রোগ দমন পদ্ধতিগুলো নিম্নে ছকে দেখানো হলো

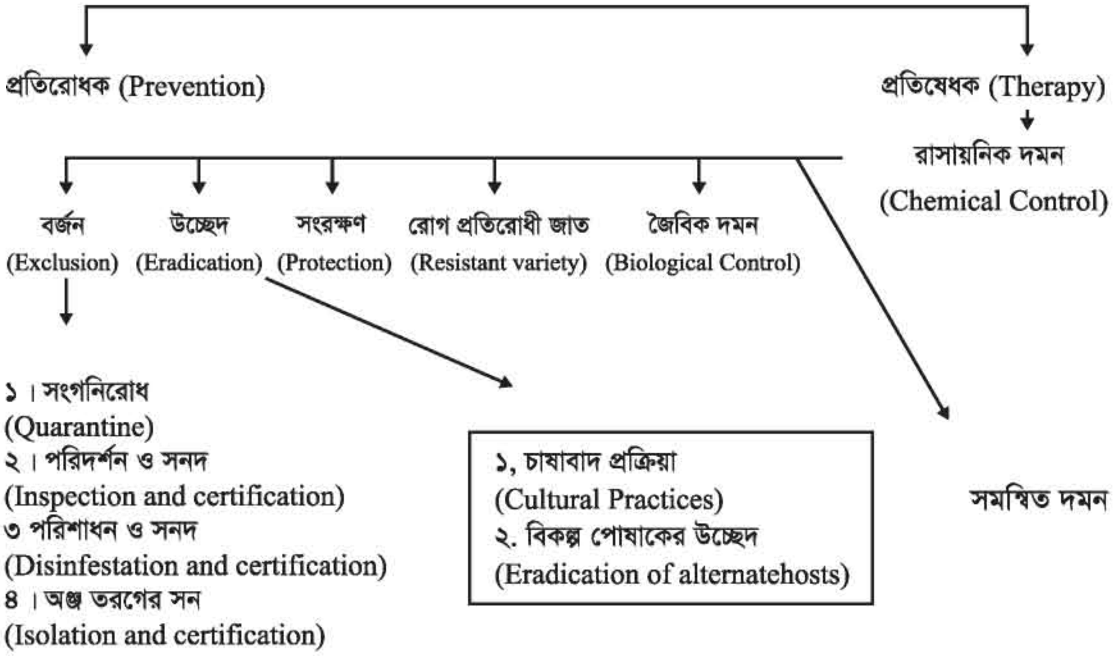

(Plant Quarantine) সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি আইন যার মাধ্যমে কোন এলাকায় কোন নতুন বা অধিকতর শক্তিশালী রোগ জীবাণু প্রবেশে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য কৃষিজাত পণ্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বলা হয়।

১৬৬০ সালে কারবারী গাছ নিষিদ্ধ করে ফ্রান্সে প্রথম উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন চালু করে। পরবর্তীতে ১৯১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল কোয়ারেন্টাইন আইন চালু হয়। বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালের ক্ষতিকর বালাই আইন প্রণীত হয় যা ১৯৮৯ সালে সংশোধিত ও ১৯৯২ সালে বর্ধিত আকারে অনুমোদিত হয়ে চালু রয়েছে।

কোয়ারেন্টাইল বা সংগনিরোধ ব্যবস্থাকে ২ ভাগে প্রয়োগ করা যায়।

ক) Exclusive quarantine: এটা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়। যেমনঃ আলুর মড়ক রোগ দেখা দিলে কোন দেশ ইচ্ছা করলে সে বৎসর পৃথিবীর যে কোন দেশ থেকে আলু বীজ আমদানি বন্ধ রাখতে পারে। অথবা নির্দিষ্ট কোন দেশ থেকে আলু বীজ আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।

খ) নিয়ন্ত্রিত কোয়ারেন্টাইনঃ এটা কিছুটা শিথিল আইন। পরিদর্শন সনদপত্র প্রদান, বীজ পরিশোধন ও সনদপত্র প্রদান এবং অন্তরণ সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে বীজ আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উপরোক্ত আইন সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের জন্য দরকার পোষক ও রোগজীবাণুর প্রাকৃতি ও রোগ বিস্তারের ধরনের উপর সম্যক জ্ঞান।

কোয়ারেন্টাইন আইন কোন দেশের প্রবেশ পথে (বিমান বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর, স্থল বন্দর ইত্যাদি) কার্যকরী করা যায়। ঐ সব পথে কোয়ারেন্টাইন বস্তু পরীক্ষা করা হয়। কোয়ারেন্টাইন বতু বলতে বুঝায়, চারা গাছে গাছের পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড, মূল বা মুল সমষ্টি, বীজ সমষ্টি, বীজ, মাটিস্থ টবের গাছ ইত্যাদি, যাদের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত রোগজীবাণু বাহিত হতে পারে।

প্রবেশ পথে রোগজীবাণুকে তিনটি শ্রেণিতে বিবেচনা করে কোয়ারেন্টাইন বস্তু পরীক্ষা করা হয়। যথা-

শ্রেনী কঃ যে রোগজীবাণু কোন এলাকায় সম্পূর্ণ নতুন ও শক্তিশালী। যেমন- বাংলাদেশের জন্য Septoria nodorum (সেপটোরিয়া নডরাম) (গমের বরচ রোগ) , সিনকাইট্রিয়াস এন্ডাবোয়োটিকাম (আলুর ওয়াট রোগ)।

শ্রেণি খঃ যে রোগজীবাণু নতুন নয় কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী যেমনঃ ফাইটোপথরা ইনফেসটানস (আলুর মড়ক রোগ)।

শ্রেণি গঃ যে রোগ জীবাণু সব সময় কিছু না কিছু রোগ ছড়ায় তবে মারাত্মক নয়। বাইপালারিস অরাইজি (ধানের বাদামি দাগ রোগ)।

চাষাবাদ পদ্ধতি (Cultural practices)

চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমেও ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন ভালো এবং সুস্থবীজ বাছাই করে বপন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে জমি তৈরি, ভালো ভাবে জমি চাষ দেয়া, সুষম সার ব্যবহার, শস্য পর্য্যায় বা জমি পতিত রেখে, আগাছা দমন করে, পরিষ্কার সেচের পানি ব্যবহার, পরিপক্ব ফসল কাটা, ফসলের আবর্জনা পরিষ্কার, ফসল সঠিকভাবে শুকানো ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে রোগ-জীবাণু এড়িয়ে চলা যায়। উদাহরন স্বরুপ বলা যেতে পারে সুস্থ বীজ বপন করলে বীজ বাহিত রোগের তীব্রতা কমে। জমিতে পটাশ সারের অভাব হলে ধানের কাণ্ড পচা রোগ যেমন বেশি হয়, তেমনি নাইট্রোজেনের আধিক্যে ধানের বাস্ট ও ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগ বেশি হয়।

আগাছা অনেক রোগজীবাণুকে আশ্রয় দেয়। যেমন বন্য বেগুন গাছ কেটে ফেললে আলুর মড়ক রোগ এড়ানো যায়। শস্য পর্যায় অবলম্বন করে বায়ুবাহিত রোগ লিফ রাষ্ট পাউডারি মিলডিউ, অলটরনারিয়া বাইটের তীব্রতা কমানো যায়। জমি পতিত রেখে কৃমিজনিত শিকড়-গিট, গোড়াপচা ও মুল পচা রোগ দমন করা যায়।

উচ্ছেদ (Eradication): প্রধান পোষক বা বিকল্প পোষক ধ্বংসের মাধ্যমে রোগ দমন করা যায়।

জৈবিক দমন (Biological Control)

উদ্ভিদ রোগ জীবাণুকে জীবিত এজেন্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রণকে জৈবিক দমন বলে। এ সমত এজেন্টকে এস্টাগনিস্ট বলে। ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি কৃত্রিম এন্টাগনিস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এস্টাগনিষ্ট এর বৈশিষ্ট্য হলো এরা উদ্ভিদের রোগ উৎপাদন করে না।

মাটিতে বা পত্রপৃষ্ঠে রোগজীবাণু ও এন্টাগনিষ্ট একত্রে বাস করে। এ দুয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। ভারসাম্য বজায় থাকলে ফসলে রোগ হয় না বা তীব্রতা কম থাকে। কিন্তু ভারসাম্য ক্ষুন্ন হলে অর্থাৎ এন্টাগনিস্ট যদি শক্তি হারিয় ফেলে তাহলে ফসলের রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি মহামারী দেখা দিতে পারে। এন্টাগনিস্ট-এর শক্তি বৃদ্ধি করে এন ভারসাম্য পুনরায় স্থাপন করা যায়।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে এটা করা যায়। যেমনঃ

১। **হাইপার প্যারাসিটিজমঃ** এখানে এন্টাগনিষ্ট রাগজীবাণুর রোগ সৃষ্টি করে।

২। **আরোপিত প্রতিরোধঃ** রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাশীল ভাইরাস স্ট্রেন অনুপ্রবেশের দ্বারা উদ্ভিদের প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে পরবর্তীতে অধিকতর শক্তিশালী ভাইরাস ঐ গাছের রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। রোগ জীবাণু দমনের এ কৌশলকে Cross Protection বলে।

৩। **ব্যাকটেরিয়াও কাজ প্রয়োগঃ** ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী ভাইরাস প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস।

৪। **ফাঁদ শস্যঃ** কিছু শস্যের সংস্পর্শে আসলে কৃমি খাদ্যাভাবে মারা যায়। তিতা বেগুন জমিতে লাগালে কৃমির সংখ্যা কমে যায়।

৫। **বৈরিভাবাপন্ন গাছঃ** এসপারাগাস ও মেরিগান্ডে প্রভৃতি গাছের মূল থেকে বিষাক্ত পদার্থ (পটাসিয়াম সায়ানাইড) বের হয় বলে সংবেদনশীল শস্যের সাথে এদের মিশ্র ফসল চাষ করলে কৃমির সংখ্যা কমে যায়।

৬। **মিশ্র ফসলঃ** পোষক ও অপোষক শস্য মিশ্র ফসল হিসাবে চাষ করলে অপোষক গাছ রোগজীবাণুর সহায়ক নয় বলে পোষাকের রোগের তীব্রতা কমে যায়।

৭। **বীজ বাহিত রোগঃ** এন্টাগনিস্ট ব্যাকটেরিয়া পাউডার বীজের সাথে মিশ্রিত করে বীজ বপন করলে বীজের পচন, চারার বাইট ইত্যাদি রোগ কমে যায়।

৮। **মাটির জৈব সংশোধনঃ** সবুজ সার, করাতের গুঁড়া, হাড়ের গুঁড়া, সরিষার খৈল, ছাই ইত্যাদির দ্বারা মাটি পরিশোধন করলে মাটিতে উপকারী অনুজীবের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে ফসলের রোগের তীব্রতা কমে যায়।

পোকা দমনের মত উদ্ভিদ রোগের জৈবিক দমন এখনও কার্যকরীভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। কিনতু ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। যেমন- Trichodernoa harzianum নামক ছত্রাক।

উদ্ভিদ নির্যাস দ্বারা রোগ দমন (Plant extract) উদ্ভিদের নির্যাস ব্যবহার করে উদ্ভিদের রোগ দমন একটি আধুনিক প্রযুক্তি। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশেও উদ্ভিদ রোগ দমনে উদ্ভিদ নির্যাস সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন- রসুনের রস (পানিঃ রসুন = ১৪১) কিংবা মান্ডা

পাতার রস (পানি ও পাতা = ১:১) দ্বারা বীজ শাধেন করলে চযড়সড়ংরং বিহীধং অনেক বীজবাহিত ছত্রাককে দমন করা যায় ।

রোগ প্রতিরোধজাত ব্যবহার (use of disease Resistant variety)

রোগ প্রতিরোধী বলতে পোষাকের দ্বারা পরজীবির আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতোক বুঝায় । পাষকের এই ক্ষমতা নিজস্ব বংশ পরম্পরায় স্থায়ী । এটা জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । উদ্ভিদের রোগ প্রতিরাধী ক্ষমতা প্রকট (dominant) ও রোগ সংবেদনশীল প্রচ্ছন্ন বিশিষ্ট । প্রকট জিন যে জাতে থাকে সে জাত রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পন্ন । বিভিন্ন পদ্ধতিতে (নির্বাচন, সংকরায়ণ, টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি) এ প্রকট "জিন" সংবেদনশীল জাতে স্থানান্তর করা যায় । রোগপ্রতিরোধী জাত ব্যবহারই হচ্ছে উদ্ভিদ রোগ দমনে উত্তম ও আধুনিক পন্থা ।

রাসায়নিক দমন (Chemicals Control) উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টির পূর্বে বা পরে রোগনাশক প্রয়োগে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় । কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে রোগনাশককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা

১) প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক ২) নিরাময়কারী রোগনাশক এবং অ্যান্টিবায়োটিক

প্রতিরক্ষামূলক (Preventive) রোগনাশক

এগুলো প্রতিরোধের লক্ষ্যে রোগাক্রমণের পূর্বে বা শুরুতে প্রয়োগকরা হয় । প্রতিরক্ষামূলক রোগনাশক অজৈব ও জৈব রাসায়নিক প্রকৃতির হতে পারে । রোগ দমনের ঔষধগুলোকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় । যথা- তম্র- ঘটিত রোগ নাশক, গন্ধক ঘটিত রোগনাশক, জৈব রোগনাশক (ঔষধ), পারদ ঘটিত রোগ নাশক এবং ধুম্র উৎপাদক মাটি পরিশোধক । অধিকাংশ ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট রোগ ঔষধ প্রয়োগে দমন করা যায় । ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ঔষধ ব্যবহারে তেমন ফল লাভ হয় না বরং বীজ পরিশোধন দ্বারা রোগ বিস্তার রোধ করা হয় । ভাইরাস রোগ আক্রান্ত গাছকে সুস্থ করার কোন ঔষধ নেই, কেবল মাত্র আক্রান্ত গাছকে ধ্বংস করে কীটনাশক ছিটিয়ে জাবপোকা, হপার প্রভৃতি দ্বারা রোগ বিস্তৃতি রোধ করা যায় । ভাইরাস হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে সুস্থ গাছ হতে বীজ নেয়ার ব্যবস্থা করা হয় । নেমাটোডজনিত রোগ ও অন্যান্য কোন কোন রোগের বেলায় মাটি পরিশোধন করতে হয় ।

সাধারণত আক্রান্ত গাছ কিংবা অঙ্গকে রক্ষা করা ও রোগকে সরাসরি দমন করার উদ্দেশে তাম্র ঘটিত, গন্ধক ঘটিত ও জৈব ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা হয় । পারদ ঘটিত ঔষধ গুঁড়ার আকারে ডাষ্টিং এর কাজে ব্যবহার করা হয় বীজ শোধনের জন্য । ফিউমিগ্যান্ট বা ধুম্র উৎপাদক ঔষধ ব্যবহৃত হয় মাটি শোধনের জন্য । বোর্দোমিকচার সহ কয়েকটি ঔষধ নিজেরাই তৈরি করে নেয়া যায় । যে সব স্থানে বোর্দোমিকচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বোর্দো মিকচারের স্থানে অন্যান্য তাম্র ঘটিত ঔষধ যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড, কপার-এ- কম্পাউন্ড, কুপ্রাভিট ও পেরেনকসের যে কোনটি প্রযোজ্য ।

উপরে বর্ণিত রোগনাশকগুলো গাছ বিশাষেন করেনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা করলেও তা সর্বাঙ্গে ছড়ায় না । সাধারণত এগুলো স্থানীয় ভিত্তিতে কাজ করে । এগুলো গাছের রোগের আক্রমণ কমায় তাতে কোন সন্দেহ নেই ।

২০২২

কিন্তু আক্রান্ত গাছকে রোগমুক্ত করে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে না কিছু কিছু রোগ-নাশক আছে যা গাছে বিশোষিত হয়ে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের দেহের মধ্যে জীবাণু থাকলে অথবা প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে তাকে ধ্বংস করে এবং রোগ নিরাময় করে গাছকে সুস্থ করে। নিরাময়কারী রোগনাশক সিস্টেমিক বা সর্বাঙ্গবাহী, অক্সামিন, পিরাসিডিন ও বেঞ্জি মিডাজেল শ্রেণির, সিস্টেমিক প্রকৃতির অক্সামিন, ভিটাভেক্স ও পন্ট ভ্যাক্স। পিরামিডিন-মিলকার্ব, মিলটেক্স বেঞ্জিমিডাজেল- বেনামিল-এবং ব্যাভিস্টিন অ্যান্টিবায়োটিক রোগনাশক- এটি অণুজীব থেকে উৎপন্ন এক প্রকার দ্রব্য যা অন্যান্য অণুজীবের ক্ষতি কারক। সিস্টেমিক রোগনাশকের ন্যায় এটিও সর্বাঙ্গীয় প্রকৃতির। স্ট্রেপটোমাইসিন, এগ্রিমাইসিন এক্টিডাওন, ব্লাস্টিসিডিন, কাসুমিন বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক রোগনাশক।

সমন্বিত রোগ দমন (Integrated Pest Management)- IPM

উদ্ভিদের সবগুলো রাগ দমন পদ্ধতি সমানভাবে কার্যকরি নয় এবং রাসায়নিক পদ্ধতি তাৎক্ষণিক কার্যকর হলেও রোগনাশক পরিবেশ দুষন করে। রোগ প্রতিরোধীজাত উন্নয়ন সময় সাপেক্ষ ও অন্যান্য পদ্ধতি ব্যয় বহুল। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত না করে উদ্ভিদ রোগ দমনের সকল কার্যকর উত্তম পদ্ধতিগুলোর সমন্বয় সাধন করে রোগ দমনের যে পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা তাই সমন্বিত রোগ দমন। এতে থাকতে পারে সুস্থ সবল রোগ, জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহার, পরিচ্ছন্ন ভাবে জমি তৈরি, আগাছা দমন, সুষম সার প্রয়োগ, রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার, মাঠে রোগ দমনে কার্যকর রোগনাশকের ন্যূনতম ব্যবহার ও উপযুক্ত সময় ফসল উত্তোলন।

ফল ও ফল গাছের রোগের নামগুলো বর্ণনা

ফল ও ফল গাছের প্রধান প্রধান রোগের নামের বর্ণনা প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায়ের ৮.১ এ বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

ফল ও ফল গাছের রোগের লক্ষণ দেখে শনাক্তকরণ

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ফল ও ফল গাছের রোগ ও রোগের লক্ষণ দেখে শনাক্তকরণের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায়ের ৮.২ এ দেয়া হয়েছে।

রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা ব্যাখ্যা

ফল ও ফল গাছের প্রধান প্রধান রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বর্ণনা প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায়ের ৮.৩ এ দেওয়া হয়েছে।

রোগনাশকের নাম ও প্রয়োগ মাত্রা

ফল ও ফল গাছের রোগ দমনের জন্য যে সকল বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেগুলোর নাম, প্রয়োগ মাত্রা এবং কোন কোন রোগের জন্য ব্যবহার করা হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায়ের পৃষ্ঠা- ৭৪-৭৫ সারণি ১, ২ এ দেয়া হয়েছে।

প্রধান প্রধান ফল গাছের প্রধান প্রধান রোগগুলোর নাম, লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হলো
আমের-এনথ্রাকনোজ, স্যুটি মোল্ড, পাউডারি মিলডিউ।

২০২২

১. অ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose)

লক্ষন: পাতা ও কচি ডালে ফোসকা পড়ে। আক্রান্ত স্থানের তন্তু ফেটে যায়। আক্রান্ত কচি ডাল ও পুষ্পদণ্ড কাল হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। মুকুল কালো রং ধারন করে শুকিয়ে যায় পরিণত আমের গায়ে কাল দাগ পড়ে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার ও আম বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে ০.২ % ব্যাভিস্টিন টিল্ট (০.০৫) নোইন ভালকান -৭২ ডব্লিউপি (০.২%) ৩/৪ বার প্রে করলে এবং মার্চ - এপ্রিল ও আগষ্ট - সেপ্টেম্বর মাসে অনুরূপ স্প্রে করলে গুটি ও পরিপক্ক আমের আক্রমণ দমন করা যায়।

২, রোগের নাম : পাউডারি মিলডিউ (Powdry mildew)

লক্ষণ: কচি পাতা ও পুষ্পমঞ্জরীতে পাউডারের মত গুড়া দেখা যায়। রোগের ব্যাপক তা বৃদ্ধি পেলে গাছের আক্রান্ত অংশ সাদা পাউডারে আবৃত হয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে। পুষ্প দণ্ড বা ফল দণ্ড শুকিয়ে যায় এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আগা মরা লক্ষণ দেখা দেয়।

কারণ: অইডিয়াম গিফেরি নামক ছত্রাক।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার: আম বাগান পরিষ্কার ও পরিছন্ন রাখতে হবে। ফুল আসার আগে ও পরে থিওভিট (০.৩%) সালফোটক্স (০.২%) টিল্ট (০.০৫%) ৩ ৪ বার ছিটালে এ রোগ দমন সম্ভব।

৩. রোগের নাম (Shooty mould)

লক্ষণ: পাতার উপরি ভাগ কাল পাউডারের আবরণে ঢেকে যাওয়াই হচ্ছে এ রোগের লক্ষন। পোকা নিঃসৃত মধুতে ছত্রাক আটকে যায়। ঐ অবস্থায় ছত্রাক কর্তৃক উৎপাদিত প্রচুর কাল ভারে পত্রপৃষ্ঠে লেগে যায় এবং কাল আস্তরণের সৃষ্টি করে।

কারণ: ক্যাপননাডিয়াম ম্যাংগিফেরি নামক ছত্রাক, জাব পোকা, হপার বা স্কেল পোকা যৌথভাবে স্যুটি মোল্ড রোগের সৃষ্টি করে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার: ম্যালাথিয়ন (০.০৩%) এর সাথে ব্যভিষ্টিন বা গোল্ডেন এম ৪৫(০.২%) মিশ্রিত করে ২/৩ বার ছিটালে পাতার কাল তর দূর হয়।

কলার রোগ- সিগাটোকা, পানামা, গুচ্ছ মাথা

৪. রোগের নাম: সিগাটোকা (Sigatoka)

লক্ষণ: রোগের প্রথমদিকে ঈষৎ হলুদ থেকে সবুজাভ হলুদ বর্ণের ছোটদাগ বয়স্ক পাতার শিরার সমান্তরালে সৃষ্টি হয়। কালক্রমে পাতার দাগ আকারে বড় হয় ও গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে পাতার কিনারা আক্রান্ত হয় এবং পাতা পোড়া বা ঝলসানো ভাব ধারণ করে।

কারন: সারকোসপোরা মিউসি নামক ছত্রাক

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১. নির্দিষ্ট দুরত্বে গাছ লাগানো ও রোগমুক্ত সাকার ব্যবহারে এ রোগের আক্রমণ কমানো যায়।

২০২২ ২. রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত ও বয়স্ক পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩. বর্ষার প্রারম্ভে ও বর্ষার শেষে নিয়মিত টিল্ট (০.০৫%) বা ব্যাভিস্টিন (০.১%), ৩/৪ বার স্প্রে করলে সিগাটোকার আক্রমণ হ্রাস করা সম্ভব।

(ii) রোগের নাম: পানামা (Panama or Fusarium with)

লক্ষণ: রোগের প্রথমে আক্রান্ত গাছের বয়স্ক পাতার কিনারায় হলুদ বর্ণের দাগ পড়তে থাকে। কালক্রমে পাতা সম্পূর্ণ হলুদ হয়ে যায় ও পরে বাদামি বর্ণ ধারণ করে। শেষে আক্রান্ত পাতার বৃন্তের মাঝখানে ভেঙে যায় এবং নিচের দিকে ঝুলে পড়ে।

কারণ: ফিউজেরিয়াম অক্সিসপোরাম নামক ছত্রাক

প্রতিরোধ ও প্রতিকার:

১। চারা লাগানোর আগে গর্তে ৫% ফরমালডিহাইড দ্বারা গর্তের মাটি নির্জীব (শোধন) করতে হবে।

২। চারা লাগানার পূর্বে হেক্টর প্রতি ২.২৫ টন চুন জমিতে ছিটিয়ে মাটির অম্লত্ব কমালে রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে যায়।

৩। আলু, টমেটো ও বেগুন ব্যতিত অন্য ফসলের সাথে শস্য পর্যায় অবলম্বন করে রোগের তীব্রতা কমানো সম্ভব।

(iii) রোগের নাম ও গুচ্ছ মাথা (Bunchy top)

লক্ষণ: এ রোগের প্রথম লক্ষণ হলো পাতায় গাঢ় সবুজের মধ্যে হালকা সবুজ বা অতি হালকা হলুদ রঙের ডোরা। পাতা ফ্যাকাশে হয় এবং গাছের মাথা থেকে একযোগে গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতার আকার স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট এবং তলায়োরের মতো সোজা হয়। গাছের উচ্চতা ২-৩ ফুটের বেশি হয় না।

কারণ: মাইকোপ্লাজমা ও জাব পোকা এ রোগ ছড়ায়।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১। রোগমুক্ত এলাকা ও গাছ থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে।

২। আক্রান্ত গাছ দেখলে তা তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩। হেক্টর প্রতি ২-২.৫ মন চুন প্রয়োগে রোগের তীব্রতা কমায়

পেঁপের রোগ - মোজাইক, এনথ্রাকনোজ, কান্ড বা গোড়া পচা ও চারা ঢলে পড়া

(i) রোগের নাম: পেঁপের মোজাইক (Papaya Mosaic)

লক্ষণ : সকল বয়সের গাছে মোজাইকের আক্রমণ ঘটে। গাছের শীর্ষ কচি পাতায় গাঢ় সবুজ বর্ণের জ্যাবড়া এলাকা একান্তভাবে হলুদাভ সবুজের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত পাতা ক্ষুদ্রাকৃতির ও কুকড়ে যায়। পত্র বৃন্ত দৈর্ঘ্যে হ্রাস পায় এবং শীর্ষ পাতা গুলো খাড়া হয়ে যায়। ফল ক্ষুদ্রাকৃতির ও বিকৃত হয়।

কারণ: পাপাইয়া মোজাইক ভাইরাস

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১। ভাইরাস মুক্ত গাছের ফল থেকে সংগৃহীত বীজ লাগানো।

২। জাবপোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন/সুমিথিয়ন বা এনথিও ০.১% হারে পেঁপে গাছের ২ মাস বয়স থেকে ১৫ দিন অন্তর ৬-৭ বার স্প্রে করলে মোজাইকের তীব্রতা কমানো যায়।

৩। আক্রান্ত জমিতে পেঁপে ও কুমড়া জাতীয় ফসল চাষ না করাই উত্তম।

(ii) রোগের নাম: এনথ্রাকনোজ (Anthracnose): পেঁপের এনথ্রাকনোজ রোগ আমের বা পেয়ারার এনথ্রাকনোজ রোগের মত একই বৈশিষ্ট্যের।

চিত্রঃ পেঁপের এন্থ্রাকনোজ রোগ, বামে- প্রাথমিক পর্যায়ে হালকা হলুদ রঙের দাগযুক্ত পেঁপে;
ডানে- গোলাকার কালচে দাগ ও উহার মধ্যস্থিত গোলাপি গুটিযুক্ত পেঁপে

(iii) রোগের নামঃ কাণ্ড বা গোড়া পচা ও চারা ঢলে পড়া (Stem or foot rot and Damping off)

লক্ষণঃ গোড়া পচা রোগ সাধারণত ২-৩ মাস বয়স্ক গাছে দেখা যায়। কাণ্ডের গোড়ায় মাটি সংলগ্ন স্থানের অংশ পচে যায় এবং আক্রান্ত অংশে গাঢ় বাদামি বা কাল হয়ে যায়। এ পচন কাণ্ডে ও নিচের দিকে সম্প্রসারিত হতে পারে। বাতাসের ধাক্কায় গাছ উপড়ে পড়ে গিয়ে মরে যায়।

কারণঃ পিথিয়াম এ্যাফানিডারমেটাম ছত্রাক নামক রোগ জীবাণুর।

চিত্রঃ পেঁপের ড্যাম্পিং অফ ও রোগের লক্ষণ

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১। অপেক্ষাকৃত উঁচু ও পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত যুক্ত জমিতে নার্সারি করলে চারা ঢলে পড়া রোগের সম্ভাবনা কমে যায়।

২। নার্সারির মাটি ০.৫% ফরমালিন দ্বারা শোধন করে বীজ লাগানো উচিত।

৩। আক্রান্ত গাছের গোড়ায় ০.১% লেপনিল স্প্রে করলে গোড়া পচা বন্ধ হয়।

পেয়ারার রোগ-এনথ্রাকনোজ, উইলট

(1) রোগের নামঃ পেয়ারার ফোসকা রোগ (Anthracnose)

লক্ষণঃ সব বয়সের পাতায় ফোসকা পড়ে। প্রথমত পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট দাগ পড়ে যা পরবর্তীতে বড় হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। ফলের ত্বক ছিঁড়ে যায় ও কালো হয়ে যায়। আক্রমণ বেশি হলে কচি ও পরিপক্ব ফল ফেটে যায় এবং পরবর্তীতে পচে যায়।

কারণঃ কলেকটট্রিকাম সিডি, পেস্টালোটিওপসিস সিডি ও বট্রাইওস্ফিরডিয়া থিওমি নামক তিনটি ছত্রাক দ্বারা এ রোগের বিস্তার ঘটে।

চিত্রঃ পেয়ারার এনথ্রাকনোজ

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাগান

২। পেয়ারার কুঁড়ি আসার পূর্বে থ্রাউড/টিল্ট(০.১%) বা ডায়থেন, এম ৪৫ (০.২%) ১৫ দিন অন্তর ৪/৫ বার স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

(ii) রোগের নামঃ পেয়ারার উইলট (Guava Wilt)

লক্ষণঃ এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো গাছের আগা মরে যাওয়া

কারণঃ মৃত্তিকা বাহিত ফিউজেরিয়াম অক্সিসপারোম এফ এসপি সিডি নামক ছত্রাক

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১। আক্রান্ত গাছে জিংক সালফেট দ্রবণ স্প্রে করা

২। ১% পটাশ স্প্রে করা

৩। আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটিতে ০.২% রিডোমিল দ্রবণ ঢালা ।

কাঁঠালের রোগঃ কাঁঠালের ফল পচা রোগ

(i) রোগের নামঃ ফল পচা (Fruit rot of jack Fruit)

লক্ষণঃ কচি ফল বা মুচি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। পানি সিক্ত কাল দাগ হিসেবে পুষ্প মঞ্জুরীর গোড়ায় বা মুচির বৃন্তে এ রোগের আবির্ভাব ঘটে। কালক্রমে দাগ বৃদ্ধি পায় এবং সম্পূর্ণ বৃন্ত ও মুচি কাল হয়ে যায়। আক্রান্ত পুষ্পমঞ্জুরী বা মুচি নরম হয়ে পচে ঝরে পড়ে।

কারণঃ রাইজোপাস আরটোকারপি

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

১। মরা পাতা, ডাল-পালা ইত্যাদি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেললে ছত্রাকের সুপ্ত শক্তি কমে যায়।

২। কচি ফল, পুষ্প মঞ্জুরী ও পুরুষ ফুলে মৌসুমের প্রারম্ভে অর্থাৎ মার্চ-মাসের গোড়ার দিকে ০.২% ডায়াথেন এম- ৪৫ বা ০.১% জোইন কিংবা এডিস্টিন/জেনুইন(০.২%) ১০ দিন অন্তর ৩/৪ বার স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যেতে পারে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আগা মরা রোগের ফল বা ফল গাছের কোন অংশ আক্রান্ত হয় ?

২। পাউডারি মিলডিউ রোগে ফল ও ফল গাছের কোন অংশ আক্রান্ত হয় ?

৩। ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ কী ?

৪। পানামা রোগের লক্ষণ কী ?

সংক্ষিত প্রশ্ন

১। আমের অ্যানথ্রাকনোজ ও কাঁঠালের পচা রোগের লক্ষণগুলো লেখ।

২। কলা, পেঁপে ও পেয়ারার প্রত্যেকের ৩টি করে রোগের নাম লেখ।

৩। পেয়ার ক্যাংকার ও কুলের পাউডারী মিলডিউ রোগের দমন পদ্ধতি লেখ ।

৪। ডাইব্যাক রোগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৫। আমের স্যুটি মোল্ড কি বর্ণনা কর।

৬। পেঁপে গাছের মোজাইক রোগ সম্বন্ধে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আম, কাঁঠাল কলা, পেঁপে ও পেয়ারা প্রত্যেকটির ১টি করে রোগের নাম , কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা কর।

২। ফল ও ফল গাছের রোগ কীভাবে নির্ণয় করা যায়। বাংলাদেশে প্রধান তিনটি ফলের ও ফল গাছের রোগের লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে লেখ।

৩। পেঁপের কাণ্ড পচা রোগের কারন , বিস্তার ও তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

৪। কাঁঠালের ফল পচা রোগের লক্ষণ, রোগের কারণ ও প্রতিরোধ এবং প্রতিকার বর্ণনা কর।

৫। কলার পানামা রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

৬। ফলের প্রধান প্রধান ১০টি রোগের নাম, ফসলের নাম ও কারণ লেখ।

৭। ফল ও গাছে রোগাক্রমণের লক্ষণ দেখে আম, কাঁঠাল পেপে, কলা ও পেয়ারার প্রত্যেকর ২টি করে রোগ শনাক্ত করার পদ্ধতি লেখ।

৮। বাংলাদেশে ব্যবহার হয় এমন ১০টি রোগনাশকের নাম ও রোগের নাম এবং প্রয়োগ মাত্রা লেখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

ফল সংগ্রহ ও বাছাইকরণ পদ্ধতি

ফসলের লাভজনক ফলন এবং তার গুণাগুণ শুধু উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না। সাথে সাথে সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ এবং সংগ্রহ প্রনালীর ওপরও তা অনেকটা নির্ভর করে। ফসল সংগ্রহ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফলকে উৎপাদন পর্যায় হতে ব্যবহারিক পর্যায় আনা হয়। যত্নের সাথে এ কাজের তদারকি এবং সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহের ফলে আমরা পাই আর্থিক মূল্য সম্পন্ন গুণগতমানের ফসল এবং এর বর্ধিত খাদ্য উপাদান। ফল অক্ষত অবস্থায় দীর্ঘদিন সংরক্ষনের জন্য এবং উৎকৃষ্ট মানের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য দ্রব্য তৈরি করার জন্য ফসল যথা সময়ে সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের লক্ষ্য অনুযায়ী ফসল যখন নিজ নিজ জাতের সর্বোৎকৃষ্ণ আকার, রং, স্বাদ এবং গুণাগুণ অর্জন করে। তখনই ফসল সংগ্রহ করা উচিত। অপরিপক্ক ফল সংগ্রহ করলে যেমন গুণাগুণ বজায় থাকে না তেমনি চাষী ফলের ন্যায্য মূল্য পায়না। আবার বেশি পরিপক্ক হলেও গুনগত মান তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে ফল দ্রুত পচায় । ফলে বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। ফলের পরিপক্কতা এমন একটি অবস্থা যখন ফলের আকার ও আয়তন এবং বয়সের সর্বশেষ অবস্থা, অর্থাৎ এরপর ফলের আকার ও আয়তন আর বৃদ্ধি পায় না। ফল পাকার অর্থ হলো পরিপকৃতার পর ফলের গুণাগুণের এমন পরিবর্তন, যার মাধ্যমে ফল ভক্ষণযাগ্য বা খাবার উপযোগী হয়। ফল পাকার সাথে সাথে ফলের রং, গন্ধ ও বুনটের পরিবর্তন হয় যার দরুণ ফল ভোক্তার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

ফলের পরিপকৃতা

ফলের পরিপক্বতা এমন একটি অবস্থা যখন ফল আকার, আয়তন এবং বয়সে সর্বশেষ অবস্থায় পৌছে অর্থাৎ এর পর ফল আর আকার ও আয়তনে বৃদ্ধি পায় না। কিছু লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা যায়। এই লক্ষণগুলো কে ফলের পরিপকৃতার লক্ষণ বা (Maturity Index) বলা হয়। ফল ধারণ থেকে দিবস সংখ্যা, আকার , আকৃতি, রং, বুনট, আপেক্ষিক ঘনত্বের পরিমাণ, দ্রবণীয় শক্ত পদার্থ, চিনি, অম্লে হার এবং চর্বির পরিমান ইত্যাদি পরিপক্বতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নতি করা হয়। ফল সংগ্রহের পূর্বে ফলের পরিপক্বতা দেখে সংগ্রহ করা উচিত। ফল সংগ্রহের সময়ের ওপর নির্ভর করে ফলের বাহ্যিক সতেজতা, ফলের স্বাদ, গুণাগুণ, গন্ধ ও আকার ইত্যাদি। ফল বর্ধনের তিনটি ধাপ। বিদ্যমান। যেমন:

১। বাড়ন্ত (ফুল হতে গুটি ধারণ করে উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত)

২। পরিপক্কতা (ফল উপযুক্ত হওয়ার পর সংগ্রহ করার পর্যায়ে পৌছা পর্যন্ত) এবং

৩। পরিপক্কতার পর পেকে উঠা বা ফিজিওলোজিক্যাল ম্যাচুরিটি।

ফল তালোর জন্য ফলের পরিপক্কতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা। কারন ফল পাকা অবস্থাতেই খাওয়ার উপযুক্ত হয়। উদাহরণ- কলা, জাম, আনারস, পেয়ারা, বেল, পিচ, আংগুর, লিচু ইত্যাদি, একমাত্র পরিপক্ক অবস্থাতেই খাওয়া যায়।

ফলের মধ্যে এমন অনেক ফল আছে যে গুলোর শ্বসন, কাজ ফল তালোর পর বন্ধ হয়ে যায়। শ্বসন কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে তার মধ্যে সঞ্চিত শর্করা বা শ্বেতসার থেকে চিনিতে রূপান্তর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। যেমন- আংগুর, লেবু, জাম্বুরা, লিচু, ইত্যাদি।

আবার ফলের মধ্যে এমন অনেক ফল আছে যেগুলোর শ্বসন কাজ ফল তালার পরও চলতে থাকে। এমনকি ১১০১

ফলের পরিপক্বতার সাথে সাথে শ্বসন কাজ বাড়তে থাকে এবং ফলের মধ্যে সঞ্চিত শর্করা বা শ্বেতসার চিনিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে বেল, কামরাঙ্গা, আমড়া, ইত্যাদি। তাই এ জাতীয় ফল পরিপক্ক অবস্থা হতে খাওয়ার উপযোগী বা উপযুক্ত হওয়ার সময়ের মধ্যে পাড়তে হবে। এরপর পরিবহন ও বাজারজাতকরণের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।

ফলের পরিপক্বতা এমন একটি অবস্থা যখন ফল, আকার, আয়তন, রং এবং বয়সের সর্বশেষ অবস্থায় পৌছে এবং তারপর আর আকার ও আয়তনে বাড়ে না। বিভিন্ন লক্ষণ দেখে ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা হয়। বিশেষ অবস্থায় ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য। যেমন -

ক) বাড়ন্তবস্থায় ফল রোগাক্রান্ত হলে অপরিপক্ক অবস্থায় পরিপক্ক ফলের মত রং ধারণ করে।

খ) জমিতে রস ও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকলে অপরিণত বয়সের ফল পরিপক্ক দেখায়।

গ) জমিতে রসের ও পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ বেশি থাকলে এবং তাপমাত্রা কমে গেলে ফলের পরিপক্বতা বিলম্ব হয়।

ঘ) পোকা মাকড়ের আক্রমণ হলে ফল অপরিণত বয়সে পেকে যায়

ঙ) হঠাৎ অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়ায় পরিণত বয়সেও ফল পরিপক্ব হয় না।

ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা যায় দু'ভাবে যথা-

১। বাহ্যিক অবস্থা দেখে ও

২। অভ্যন্তররীণ পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে

১। বাহ্যিক অবস্থা - ফল ধারণ থেকে দিনের হিসাব, ফলের আকার ও আকৃতি, ফলের রং, ফলের ওজন, ফল শক্ত বা নরম, ফলের ত্বকের গন্ধ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে।

২। অভ্যন্তররীণ - শর্করা বা শ্বেত সারের পরিমান, মিষ্টতার পরিমাণ, ফলের কষ বা রসের ঘনত্ব, বীজের পরিপুষ্টতা , ভক্ষণযোগ্য অংশের ঘনত্ব (শক্ত বা নরম অবস্থা), আঁশের পরিমাণ, আশের দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষন করে।

ছক: বাহ্যিক পরিবর্তন দেখে ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ

ফলের নাম	ফুল ধরা হতে পরিপক্ক অর্থাৎ উপযুক্ত হওয়ার সময় (দিন)	ফলের শরীর তাত্ত্বিক পরিবর্তন/বাহ্যিক পরিবর্তন
(ক) আমড়া	৬০	১। আমড়া পরিপুষ্ট হলে চামড়া টান টান ও মসৃণ হয়। ২। আমড়ার বোটার চারদিকে সামান্য দূরে ফিকে হলদে ও উজ্জ্বল বর্ণ হয় ৩। পরিপুষ্ট আমড়ার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা কালচে চিহ্ন দেখা দেয়।
(খ) কামড়াঙ্গা	৬০	১। পরিপুষ্ট ফল সামান্য হলদে হয় ও ফলের ত্বক উজ্জ্বল হয়। ২। শিরাগুলোর মাঝের গভীরতা কমে যায় অর্থাৎ শিরাগুলো নিচের দিকে মোটা হয়ে যায়। ৩। হাতে নিলে ভারি অনুভূত হয়।
(গ) বেল	১ বৎসর	১। পরিপক্ব ফলের গায়ের রং হালকা হলদে ভাব হয়। ২। বোটায় চাপ দিলে বোটা খসে যায় এবং বোটার সংযোগস্থানে সামান্য ঢেউ খেলানো গর্ত হয়ে যায়। ৩। ফলের গায়ে টোকা দিলে টন টন শব্দ করে। ৪। সামান্য জোরে আঘাত করলে ফলের চামড়া ফেটে যায়। ৫। হাতে নিলে হালকা অনুভূত হয়।
(ঘ) পেঁপে	২০	১। পেঁপের রং ঘন সবুজ থেকে হালকা সবুজাভ হলুদ হতে থাকে। ২। পেঁপের কষ স্বচ্ছ পানির মত হতে থাকে। ৩। বোটার চারদিকে হালকা হলুদ রঙের উজ্জ্বল আভা দেখা যায়। ৪। পেঁপের গায়ে নখ দিয়ে চাপ দিলে কষ বের হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমে যায়।
(ঙ) আনারস	১১০	১। আনারসের চোখগুলো সামান্য হলুদ রং ধারণ করে ২। চোখের মধ্যস্থল চ্যাপ্টা দেখায় এবং চারপাশে সামান্য ফুলে উঠে ৩। আনারসের নিচের দিকে হালকা হলুদ রং করে। ৪। চোখের উপরের খোসাগুলো ধীরে ধীরে শুকায়ে যায়।
(চ) লিচু	১২০	১। লিচুর খোসার রং লালচে হয়। ২। গায়ের কাটাগুলো চ্যাপ্টা হয়ে গায়ের সাথে অনেকটা সমান হয়ে যায়। ৩। ফলে ও বোটায় সবুজাভ রং থেকে হলুদাভ বা লালচে দাগ পড়ে। ৪। ফলের বোটা একদিকে চাপ দিয়ে টান দিলে খোসাসহ অনেক দুর পর্যন্ত উঠে আসে।
(ছ) পেয়ারা	৯০	১। পেয়ারার ত্বক টান টান ও চকচকে হয়। ২। ফলের গায়ের রং সবুজ থেকে ধীরে ধীরে ফিকে হলুদাভ হয়। ৩। দিনের বেলায় বিভিন্ন ধরনের পাখি ও রাতে বাদুড় আনাগানো করে। ৪। বিটপের পাতাগুলো খসখসে হয়ে যায়।
(জ) জাম	৯০	১। জাম পাকতে শুরু করলে এর রং সবুজ থেকে লালচে আভা এবং পুরোপুরি পেকে গেলে গাঢ় কালচে বেগুনি রং রণ করে। ২। ফল পাকা শুরু করলে ডালে ঝাকুনি দিলে ফল ঝরে পড়ে। ৩। ফলের গা টান টান থাকে এবং উজ্জ্বল হয়। ৪। ফলের পিছনের খাঁজকাটা অংশ ফলের সাথে মিশে যায়।

২০২২

(ঝ) কাঁঠাল	৯০-১২০	১। কাঁঠাল পরিপক্ক হলে গায়ের কাটাগুলো কিছুটা সমান টানটান হয়। ২। ফলের বোটায় ফিকে হলদেভাব দেখা যায়। ৩। পরিপক্ব ফলের গায়ে টোকা দিলে ড্যাব ড্যাব শব্দ করে। ৪। পরিপুষ্ট ফলের আঠার রং ধবধবে সাদা হয় না। ৫। পরিপক্ব কাঁঠাল ঘ্রাণ ছড়ায়।
(ঞ) নারিকেল	প্রায় ১ বছর (ঝুনো হওয়া পর্যন্ত)	১। পরিপক্ব নারিকেলের খোসার রং হালকা বাদামি বা ধূসর হয়। ২। খোসার উপর দিয়ে নারিকেলের সাথে লম্বালম্বি হালকা খাজকাটা দাগ পড়ে ও সরু সরু আশের মত দাগ দেখা যায়। ৩। খোসার উপর মাঝে মাঝে কালোকালো তিলের মতো দাগ দেখা যায়। ৪। নারিকেল হাতে নিয়ে ঝাকুনি দিলে ভিতরের পানির শব্দ শানো যায়। ৫। নারিকেল হাতে নিলে ওজনে হালকা অনুভূত হয়। ৬। নারিকেলের গায়ে টোকা দিলে টন টন শব্দ করে। ৭। পানিতে ছেড়ে দিলে ভাসতে থাকে।

ফল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি:

মানুষের শরীর সুস্থ, সবল ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে ফলের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ফলের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সঠিক সময়ে গাছ থেকে ফল পাড়া অতীব জরুরি।

ফলের ভালো ফলন এবং তার গুণাগুণ শুধু উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের ওপর নির্ভর করে না। সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে ফল সংগ্রহ করার ওপরও ফলের গুণাগুণ এবং লাভ নির্ভর করে। অনেক সময় অনেক বেশি মূল্যে বিক্রির জন্য কাঁচা ফলই বাজারে উঠায়। এটা মোটেই উচিত নয়। মাঝে মাঝে কাঁচা ফলকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পাকা রঙ ধারন করায়ে বাজারে বিক্রয় করে। এতে অনেকে প্রতারিত হয়। লোকে জানাজানি হলে এ ধরনের ফল আর ক্রয় করতে চায় না। এতে উৎপাদক, বিক্রেতা , দেশে সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই ফল এমন অবস্থায় পড়তে হবে যাতে পাড়ার পর অতি অল্প সময়ে পাকে এবং কেউ প্রতারিত না হয়।

ফল তরতাজা রাখার জন্য সংগ্রহের সময় বিশেষ যত্নবান হতে হবে। সংগ্রহের সময় ফল ক্ষতিগ্রত বা আঘাত প্রাপ্ত হলে বাজার মূল্য ও পুষ্টিমাণ কমে যায়। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আর্থিক ক্ষতি হবে। তবে ফলের মান বজায় রাখার জন্য পরিপুষ্ট অবস্থায় ফল সগ্রহ করা উচিত। ফল সংগ্রহের জন্য কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয়, যেমন- কাঁচি, ছুরি, মই, রশি, ব্যাগ, ধারালো দা ইত্যাদি। ফল সংগ্রহের প্রাককালে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হবে যেমন-

ক) ফলের পরিপক্বতার উপযুক্ত বয়সে সগ্রহ করতে হবে।

খ) পরিষ্কার আবহাওয়ার সময় ফল পাড়তে হবে।

গ) ফল পাড়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে ফল আঘাত না পায় বা থেতলে না যায়।

ঘ) সাবধানতার সাথে ফলগুলো এক জায়গায় জড়ো করতে হবে।

ঙ) ফল জড়ো করার স্থানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ছায়াযুক্ত হতে হবে।

চ) ফল পাড়ার জন্য ব্যবহৃত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। সাধারণত দু'ভাবে ফল সংগ্রহ করা যায়। যথা-

১। হাত দিয়ে তোলা বা পাড়া এবং

২। মেশিনের সাহায্য পাড়া

১। হাত দিয়ে তোলা বা পাড়া- উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই বেশির ভাগ ফল সতেজ অবস্থায় বিক্রির জন্য হাত দিয়ে পাড়া হয়। হাত দিয়ে ফল পাড়ার কতগুলো সুবিধা আছে। যেমন

- অনেক বেশি যত্ন সহকারে ফল পাড়া যায়।
- একসাথে অনেক লোককে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- হাত দিয়ে ফল পাড়তে এক সাথে বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না।
- অপরিপুষ্ট বা যে ফল আরও কিছু সময় গাছে রাখা যাবে সেগুলো বাদ দিয়ে সংগ্রহ করা যায়।
- ফল পাড়ার সময় সহজেই চারদিকে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষন করে ফল পাড়া যায়।

হাত দিয়ে পাড়ার অসুবিধাগুলোঃ

- ফল পাড়তে বেশি সময় লাগে
- জরুরি ভিত্তিতে বেশি লোক দরকার হলে অনেক সময় চাহিদামত লাকে পাওয়া যায় না
- কোন ফল কোন বয়সে সংগ্রহ করতে হবে সে বিষয়ে সব শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

২। মেশিনের সাহায্যে ফল পাড়া ও হাত দিয়ে ফল পাড়া বেশি পছন্দনীয় হলেও অনেক সময় মেশিনের সাহায্য ফল সংগ্রহ করতে হয়। মেশিনের সাহায্যে ফল সংগ্রহের কতগুলো সুবিধা আছে।

যেমন সুবিধাগুলো

- তাড়াতাড়ি ফল সংগ্রহ করা যায় বা পাড়া যায়।
- কাজের পরিবেশ আধুনিক ও উন্নত মানের হয়।
- কাজে নিয়োজিত লোকদের কাজ তদারকি করা সুবিধাজনক হয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকলে তাড়াতাড়ি ফল পাড়া যায়।

মেশিনে ফল পাড়ার অসুবিধাগুলোঃ

- ফল পাড়ার সময় গাছের ক্ষতি হতে পারে।
- যন্ত্র বা মেশিনের দাম অনেক বেশি যা সকলের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয় না।
- ছোট বাগান বা অল্প সংখ্যক গাছের জন্য মেশিন দিয়ে ফল সংগ্রহ করা লাভজনক হয় না।
- যেখানে শ্রমিক সহজলভ্য সে এলাকায় মেশিন ব্যবহারে লোকের কাজ করার সুযোগ কমে যাবে, ফলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।
- মেশিন ব্যবহারের জন্য বড় বড় বাগান তৈরি করতে হয়।
- মেশিনে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত, ছোট/বড়, উত্তম/খারাপ সব ফলই একসাথে সংগ্রহ হয়ে যায়।

ফল পাড়ার সময় বা ছিড়ার সময় যে সব ফল আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে পাড়া উচিত। যে সব ফল হাতের নাগালের মধ্যে থাকে না সে গুলো গাছে উঠে অথবা জালি বাঁধা বাশের লাঠির সাহায্যে পাড়া উচিত। তাতে লাঠির মাথার জালির মধ্যে করে আস্তে আস্তে ফল পাড়া যায়। আবার লাঠির মাথায় ছুরি বা কাচি বেধে বোটা কেটে ফল পাড়া যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল যে পাড়তে উঠে তার কাঁধে থলে বা ঝুড়ি ঝুলায়ে রাখলে সুবিধাজনক হয়।

ফল পাড়ার আগে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে যে ফল কি উদ্দেশ্য পাড়া হচ্ছে। কেননা আচার বা টক জাতীয় খাদ দ্রব্য হিসেবে ফল সংরক্ষণ করতে হলে অপরিপক্ক অবস্থায় অনেক সময় ফল পাড়তে হয়। অন্যদিকে জুস জাতীয় খাদ্য দ্রব্য তৈরি করতে হলে বেশি পাকানোর প্রয়োজন হয়। ফল টাটকা অবস্থায় দূরে পাঠাতে হলে সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট অবস্থায় পড়তে হয়। অনেক সময় বেশি দুরে পাঠাতে হলে ফল পাকার ৪-৫ দিন আগেও পাড়তে হয়। ফল পরিপুষ্ট হলে বিভিন্ন ফলের জাত বিশেষে সর্বোৎকৃষ্ট আকার রং, স্বাদ গন্ধ এবং গুণাগুণ অর্জন করে। আর তা ক্রেতার নিকট সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য হয়। ফল পাড়ার পূর্বে বিবেচ্য বিষয় বা গাছ থেকে ফল পাড়ার সর্তকতা :

১। পুষ্টতা সঠিকভাবে নির্ধারণে করে ফল পাড়ার কাজ শুরু করতে হবে। কারণ অপুষ্ট ফল পাড়লে তা ঠিকমত পাকে না এবং স্বাদ, রং, সুবাস ইত্যাদির ঠিকমতো উন্নয়ন ঘটে না।

২। ফলের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফল সংগ্রহের কাজে শ্রমিকরা সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। এ ছাড়া গাছে ঝাঁকি দিয়ে ফল পাড়া ঠিক নয়।

৩। গাছ মোচড়ানো, ফল মাটিতে ফেলে দেয়া, ফলের গায়ে আঘাত দেয়া, ফলের গায়ে মাটি লাগানো, সংগৃহীত ফলে সূর্যের তাপ লাগানো পরিহার করতে হবে।

৪। ফল বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

৫। গাছ থেকে ফল পাড়ার পর দীর্ঘক্ষন তা গাছের নিচে জমা করে রাখা ঠিক নয়। কারণ বাতাসে ভাসমান রোগের জীবাণু এ সময় আমের বোটায় আক্রমণ করার সুযোগ পায় ও বোটা পচা রোগের সৃষ্টি করে।

৬। সকাল বেলা ফল পাড়া ভালো, কারণ তখন আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে বৃষ্টি বাদলার দিনে ফল পাড়া পরিহার করতে হয়।

৭। কিছু বেঁটাসহ ফল সংগ্রহ করা ভালো। আমের ক্ষেত্রে ৩-৪ সেঃমিঃ বোটাসহ আম পাড়তে পারলে বোটা পচা রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায়। অবশ্য গাছ ছোট হলে এ কাজ সহজ হয়।

৮। ফল পাড়ার জন্য সব সময় ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে। ছোট গাছের ফল পাড়ার জন্য সিকেচার ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

৯। প্রত্যেক ফলের বোটায় একটি নরম জায়গা থাকে, সেখানে চাপ দিলে বোঁটা সহজেই ভেঙে যায়।

১০। আম পাড়ার পর কিছুক্ষণ উপুড় করে রাখা ভালো, এতে ফলের আঠা আমের গায়ে লাগতে পারে না।

ফল বাছাইকরণ

ফল গাছ হতে সংগ্রহ করা সব ফল একই মান ও আকার সম্পন্ন হয় না। একই জাত অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফল আকার আকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের হয়। এদের মাঝে আবার কতগুলো রোগাক্রান্ত বা পোকায় খাওয়া হতে পারে। উলিখিত সব ধরনের ফল মিশ্রিত অবস্থায় বাজারজাত করার পূর্বে ফলকে বাছাই বা শ্রেণিভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। আকার আকৃতি ও অন্যান্ন গুণাগুণ বিবেচনায় বাজারজাত করা হলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ফলের দাম নির্ধারন সহজতর হয়। এতে করে ক্রেতা তার পছন্দ মত ফল ক্রয় করে সন্তুষ্টি হতে পারে। ফলের উৎপাদিত অঞ্চল হতে দূরবর্তী কোন অঞ্চলে প্রেরণের উদ্দেশ্য থাকলে ফলের পরিপক্কতার মাত্রানুযায়ী বাছাই করে পৃথক পৃথক বাক্সে পাঠানো প্রয়োজন। এতে ফল নস্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

২০২২

ফল সংগ্রহকালীন সময় হতে শুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কমবেশী ফল বাছাই সম্পন্ন হয়।

পরিপক্ব হওয়ার পর একই গাছ হতে সংগ্রহ করা ফল একইরকম গুণ সম্পন্ন হয় না। কেননা একই গাছের সব ফল এক সাথে বড় হয় না এবং একই আকৃতির হয় না। একই সাথে পরিপুস্ট হয় না এবং একই সাথে পাকেও না। এমন কি পাকার সময় একই ধরনের রংও ধারণ করে না। একই গাছের বা একই জাতভুক্ত গাছের ফল কতগুলো রোগাক্রান্ত, পোকায় খাওয়া বা শারিরিকভাবে বিকৃত হতে পারে। এমন কি একই গাছে ফুল ও ফল হওয়ার সময় যে অংশ রোদ বা আলো বাতাস বেশি পায় সে অংশের ফলের মধ্যে একধরনের পরিবর্তন দেখা দেয়। আবার গাছের ভেতরের দিকের বা ডালপালার ছায়ায় যে সব ফল হয় সেগুলোর মধ্যে অন্য ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। গাছের যে অংশে রোদ ও আলাবাতাস বেশি পায় সে অংশের ফল সাধারণত রোদ পোড়া, উজ্জ্বল রং বা ফলের ত্বকে ফোটা ফোটা তিলের মত দাগ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ ফল গুলো আগে পাকে এবং বেশি মিস্টি হয়। গাছের ভিতরে বা ছায়ায় যে ফলগুলো হয় সেগুলো সাধারণত আকারে বড় হয়, ফল ও জাত বিশেষ রং সবুজ বা কোমল হয় এবং মিষ্টতা কম হয়।

পাড়ার পর সমত ফল একত্রে মিশানো অবস্থায় না রেখে বড়, ছোট, রোগাক্রান্ত বা পোকায় খাওয়া, অপরিপক্ক, শারীরিক ভাবে বিকৃত, রং ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে বাছাই করে শ্রেণি বিভক্ত করা উচিত। তাছাড়া ভালো ফলের আকর্ষণীয়তা ফুটে উঠেনা। ফল দেখতে সুন্দর না হলে তা দাম দিতে আগ্রহী হয় না। তাই ফল জারে পাঠানোর আগে বাছাই করে শ্রেণি বিভক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। খারাপ ফলগুলোকে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা যেতে পারে। ফল বাছাই করনের সময় উ"চমান সম্পন্ন ফলের সাথে নিম্ন ৫-১০ মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে। সাধারনত আকার, আকৃতি, রং, পরিপক্কতার মাত্রা, রোগাক্রান্ত, পোকা খাওয়া ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ফল বাছাই করা হয়ে থাকে। খারাপ ফলগুলোকে ফলজাত দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা। যেতে পারে। ফল বাছাই দু'ভাবে করা যায়। যথা-

ক) হাতের সাহায্যে এবং

খ) মেশিনের সাহায্যে

ক) হাতের সাহায্যে ফল বাছাই করতে হলে ফল হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফলের আকার নির্নয় করা হয়। চোখে দেখে ফলের আকার ও রং অনুমান করে শ্রেণি বিভক্ত করা হয়। অনেক সময় হাতে নিয়ে ফলের ওজন নির্ণয় করা হয়। ফল শক্ত কেমন তা হাতে ধরে অনুমান করা হয়। তবে এ কাজটি ফল ভেদে বিভিন্ন রকম হতে পারে। গাছ হতে পাড়ার পর সব ফল একই রকম পাওয়া যায় না। কোনটি হালকা হলুদ, কোনটি গাঢ় সবুজ, কোনটি বড়, কোনটি ছোট, কোনটি খুব শক্ত এবং ওজন বেশি আবার কোনটি তেমন শক্ত নয় এবং ওজনে হালকা, কোনটি রোগ ও পোকা মাকড়ে আক্রান্ত কোনটি পাড়ার সময় আঘাত প্রাপ্ত বা থেতলানা, আবার কোনটি সুস্থ ও সতেজ, কোনটি মিষ্টি ঘ্রান যুক্ত, আবার কোনটির কোন ঘ্রান নাই ইত্যাদি। হাতের সাহায্যে ফল বাছাই করলে বাছাই কাজটি অনেকাংশেই নিখুত ও ভালো হয়।

খ) মেশিনের সাহার্যে বাছাই করতে হলে ফল বাছাইয়ের আকৃতি নির্ধারণী রিং ব্যবহার করা হয়। ফল ভেদে বিভিন্ন মাপের নির্ধারণী রিং হতে পারে। যেমন- ৬০,৬৪, ৭০,৭৫, ৮০, ৮৫ সে:মি: সাইজের রিং, মেশিনে ফল বাছাই ও গ্রেডিং সহজে এবং দ্রুত করা যায়। কিন্তু কোন ফল থেতলানো বা রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত থাকলে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে হাতে আলাদা করে নিতে হয়। এমনকি ফলের গায়ে ময়লা থাকলে তা হাত দিয়ে আলাদা করে নিতে হয়। মেশিনে বাছাই করা ফল কনভেয়ারের মাধ্যমে বিভিন্ন আকারের প্যাকিং বাক্সে স্থানান্তরিত হয়, যা আগে হতে নির্ধারণ করা থাকে।

২০২২

ফল বাছাইকরণের সুবিধা

১। বিভিন্ন আকারের ফল আলাদা আলাদা করা থাকে, তাই দাম নির্ধারণ করা সহজ হয়।

২। আঘাতপ্রাপ্ত, রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফল আলাদা আলাদা থাকে, তাই ফল নষ্ট হয় না।

৩। ফল বাছাই করার জন্য শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪। বিভিন্ন আকারের ফল বিভিন্ন প্যাকিং বাক্সে সর্বোচ্চ সংখ্যায় সাজানো হয় ।

৫। প্যাকিং-এর জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজের সংখ্যা দেখে ফলের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়।

৬। ফল বাছাই করনের মাধ্যমে ফলের মান নির্ণয় করা সহজ হয়।

৭। ফলের আকার এবং পরিপকৃতার ওপর নির্ভর করে সিধান্ত গ্রহণ করা যায় যে তা দূরে পাঠানো যাবে কিনা। কেননা বড় ফলের সাথে ছোট ফল একত্রে থাকলে বড় ফলের চাপে ছোট ফল নস্ট হতে পারে।

ফল বাছাইকরণে সতর্কতা বা ফল বাছাইয়ের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়

১। ফল বাছাই করনের স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর, ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত ও যথেষ্ট বাতাস চলাচল সম্পন্ন হতে হবে।

২। ফল বাছাইকরণের সময় ভাল ফলের সাথে আঘাত প্রাপ্ত, রোগাক্রান্ত বা পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফল একত্রে রাখলে নষ্ট ফল দ্রত পঁচে তা ভালো ফলকে নষ্ট করতে পারে। ভালো ফল এবং নষ্ট ফল পৃথক পৃথক রাখতে হবে।

৩। বাছাই করার সময় ফল একজায়গা হতে অন্য জায়গায় ছুড়ে না ফেলে আস্তে আস্তে রাখতে হবে।

৪। বাছাই করার সময় নিচে চট বা নরম জিনিস বিছায়ে নিয়ে তার উপর ফল নাড়াচাড়া করা উচিত। তাতে ফল কম আঘাত পাবে।

৫। যতদূর সম্ভব কম সংখ্যক ফল একত্রে স্তুপ করা উচিত। কেননা বেশি উঁচু করে ফলের তূপ করা হলে চাপে নিচের ফল নষ্ট হতে পাবে।

৬। বাছাই করার সময় উচ্চমান সম্পন্ন ফলের সাথে নিম্নমানের ফলের ৫ থেকে ১০ ভাগের বেশি যেন মিশ্রণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ফলের আকার অনুযায়ী গ্রেডিং

বাছাই এর পর ফলের আকার ও মান অনুযায়ী ফল শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। কারন ভালো আকার ও ভালো মানের ফল বেশি অর্থায়নে সাহায্য করে। বৃহৎ ও উৎকৃষ্টতর গুণসম্পন্ন ফল পায় সর্বদাই ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট ফল অপেক্ষা অধিক অর্থ আনায়ন করে থাকে। সর্ব আকারের ও প্রকারের ফলকে একই সঙ্গে না রেখে ও গুলোকে আকার ও গুণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে নিলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের পক্ষেই সঠিক মূল্য নির্ধারণে সুবিধা হয় এবং তাতে কারোরই ঠকবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং বিক্রয়ের জন্য ফল বাক্সবন্দী করা অথবা স্থানান্তরিত করনের পূর্বেই সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে নেওয়া উত্তম। একই বস্তা, ঝুড়ি বা বাক্সের নীচে ছোট এবং উপরে প্রদর্শনের জন্য বড় আকারের ফল রাখার প্রথাটি একান্তভাবে বর্জনীয় ফলকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মানে বিভক্ত করন (Standardization) একটি উত্তম পদ্ধতি।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। একমাত্র পরিপক্ক অবস্থাতেই খাওয়া যায় এমন তিনটি ফলের নাম লেখ।

২। অপরিণত বয়সের ফল পরিপক্ক দেখায় কি কারণে?

৩। বেল ফুল ধরা হতে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত কত দিন লাগে ?

৪। উচ্চমান এবং নিম্নমান সম্পন্ন ফলের মিশ্রণ কত ভাগ পর্যন্ত গ্রহণ যোগ্য ?

৫। বাজারে সাধারনত কোন কোন মাপের ফল গ্রেডিং নির্ধারণী রিং পাওয়া যায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল বাছাইকরণে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় লেখ।

২। ফলের পরিপক্বতার লক্ষণ কাকে বলে?

৩। ফলের পরিপক্বতার ও পাকার মধ্যে পার্থক্য কী ?

৪। গ্রেডিং কেন করা হয় ?

৫। ফল বাছাইকরণের সুবিধাগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফল বর্ধনের ধাপ গুলো কি কি এবং কোন কোন অবস্থায় ফলের পরিপক্বতা নিরূপণ করা হয় লেখ।

২। ফল সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাতকরণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। ফল কিভাবে সংগ্রহ করা যায় এবং ফল সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা আলোচনা কর।

৪। ফলের পরিপক্বতা কিভাবে নিরূপণ করা যায় ? আম,কাঁঠাল ও পেয়ারার পরিপক্কতা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫। বোর্দো মিকচারের প্রস্তুত প্রনালি বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

লিচু ও নারিকেল চাষাবাদ কৌশল

লিচু চাষাবাদ কৌশল লিচু মধ্যম আকৃতির দ্বিবীজ পত্রী, চিরহরিৎ ও বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। আমাদের অনেক পরিচিত ও প্রিয় ফলের মধ্যে লিচুর এক বিশেষ স্থান রয়েছে। রূপে, গুনে ও স্বাদে লিচু একটি আকর্ষণীয় ও উপাদেয় ফল। আমাদের দেশে লিচু একটি অন্যতম জনপ্রিয় ফল। এতে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ, শর্করা জাতীয় খাদ্য ও ভিটামিন সি থাকায় লিচু একটি পুষ্টিকর ফল ও ঘটে। এতে ভিটামিন এ, বি১ ও বি২ উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। লিচু গ্রীষ্ম প্রধান ও অগ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের ফল। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১৫০ মিমি ও বাতাসের আপেক্ষিক আদ্রতা ৭০-৮০ % লিচু চাষের জন্য উপযোগী।

জাত - বাংলাদেশে চাষ কৃত লিচুর উৎকৃষ্ট জাতগুলো হলো- বোম্বাই, বেদানা, মুজাফফরপুর, এলাচিরোজ, দুধিয়া, চায়না - ৩ ইত্যাদি। বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট বারি লিচু-১, বারি লিচু-২, এবং বারি লিচু-৩ নামে ৩টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

বংশবিস্তার-বীজ থেকে ও অঙ্গজ পদ্ধতিতে লিচুর চারা তৈরী করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারার ফল পেতে ৭-১২ বছর সময় লাগে। চারা উৎপাদনের জন্য গুটি কলম সর্বাধিক উপযোগী। গুটি কলম হতে উৎপাদিত চারা হতে ৩-৪ বছরের মধ্যেই ফল ধরে।

মাটি ও জমি নির্বাচন

লিচু গাছ বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মাতে পারে যদি তা পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত থাকে। প্রচুর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ সুনিষ্কাশিত গভীর বেলে দোঁআশ মাটি লিচু চাষের উপযুক্ত। বেলে মাটি লিচু চাষের জন্য অনুপযুক্ত। কেউ কেউ বলেন লিচু ক্ষার মাটিতে ভালো হয়। তাই অনেকে লিচুর বাগানে চুন ব্যবহার করে থাকেন। মাটি খুব বেশি অম্ল বা খুব বেশি ক্ষার হলে গাছের জন্য ক্ষতিকর। ৬.৫-৬.৮ পিইচ সম্পন্ন মাটিতে লিচু ভালো হয়। সামান্য অম্লীয় মাটিতে মাইকোরাইজা উৎপন্ন হয় যা লিচু গাছের জন্য উপকারী। নতুন চারা গাছের গোড়ায় পুরাতন লিচু গাছের নিচের কিছু মাটি প্রয়োগ করলে মাইকোরাইজা সৃষ্টি হয়।

গাছ রোপণের জন্য জমি ও গর্ত তৈরি

বাড়ীর আশেপাশে বা বসতভিটায় দু'একটি গাছ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরির প্রয়োজন নেই। গাছ রোপণের গর্তগুলো (Planting pit) করলেই চলবে। কিন্তু লিচুর বাগান করতে চাইলে জমিতে ঝোপ জঙ্গল ও আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জমি সমান করে নিতে হবে এবং ভালো ভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। লিচু গাছ ১০×১০ মিটার দূরে দূরে রোপণ করতে হয়। লিচু গাছ ষড়ভুজ প্রণালীতে রোপণ করা উত্তম। ১০ মিটার দূরে দূরে লাইন টেনে লাইনে ১০ মিটার দূরে দূরে গাছ রোপণ করতে হবে। প্রথমেই মাপ জোক করে কাঠি পুঁতে গাছ রোপণের স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। এরপর কাঠিটিকে কেন্দ্র করে ১মি:× ১মি:× ১মি: সাইজের গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তের মাটিতে ভালোভাবে রোদ পাওয়ার জন্য গর্ত খুড়ে ২-৪ সপ্তাহ খোলা রাখতে হবে। গর্ত তৈরির সময় গর্তের উপরের ও নিচের মাটি আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে। এ মাটির সাথে জৈব সার ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছ রোপণের কমপক্ষে ১০-১৫ দিন আগে এই সার মিশানো মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখতে হবে। গর্তের মাটি শুকানো থাকলে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব উভয় দিকে ১০ মিটার রাখতে হবে। জৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসে লিচু চারা রোপণের উত্তম সময়। সেচ সুবিধা থাকলে বছরের অন্যান্য সময়েও (অতি খরা সময়বাদে) ছোট ছোট বাগানে চারা রোপণ করা যেতে পারে।

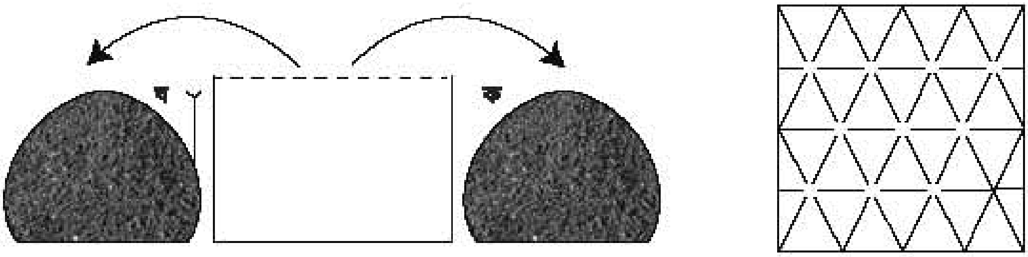

চিত্রঃ গর্ত খনন ও গাছ রোপণের নকশা

সার প্রয়োগের কলা কৌশল

প্রথমে উপরের (Top soil) মাটির সাথে গর্ত প্রতি ১০ কেজি গোবর সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলতে হবে। এরপর ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমপি সার গর্তের উপরের ২৫ সেঃমিঃ মাটির মধ্যে হালকা কোপ দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। এখন রোপণের জায়গাটি কাঠি পুঁতে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। এর ১০-১৫ দিন পর লিচুর কলম উক্ত গর্তে রোপণ করা যাবে। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ার মাটির বলটি না ভেঙ্গে যায়। এরপর গাছটি মাটিতে বসিয়ে চারদিকের মাটি পা দিয়ে শক্ত করে বসিয়ে দিতে হবে এবং রোপণের পর পরই সেচ দিতে হবে।

গাছ রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

লিচু বাগান আগাছামুক্ত রাখতে হবে। লিচুর শিকড় বেশি গভীরে যায় না। তাই শুষ্ক মৌসুমে সপ্তাহে ২-৪ বার হালকা ভাবে চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে রাখলে রস সংরক্ষণে সহায়তা হবে। গাছ ছোট অবস্থায় বাগানে সবুজ সারের চাষ করা যেতে পারে। গাছ বৃদ্ধির জন্য শুষ্ক মৌসুমে সেচ দিতে হবে। এটি ফল ঝরে পড়ে রোধে সাহায্য করে। গরমের দিনে হঠাৎ বৃষ্টিপাত হলে ফল ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে ফল ফেটে যাওয়া অনেকাংশে রোধ হয়। লিচু বাগানের মাটি চাষ করে কলাই জাত এর চাষ করা যেতে পারে। এতে বাড়তি আয় হবে এবং মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। লিচু বাগানে সবজি চাষ করা যায়। এতে বাগান পরিষ্কার থাকে।

সারে উপরি প্রয়োগ ও সেচ ব্যবস্থাপনা

লিচু গাছে বছরে দুবার সার দিতে হবে। প্রথম কিস্তিতে বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তি ভাদ্র-আশ্বিন মাসে। গাছের সন্তোষজনক বৃদ্ধির জন্য সার দরকার। প্রথম চার বছর যে হারে সার দিতে হবে তা সারণিতে দেয়া হলো। সার দেয়ার পরপরই প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

সারণি - ১ প্রথম চার বছর লিচু গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ

গাছের বয়স	গোবর সার কেজি প্রতি গাছ প্রতি বছর	ইউরিয়া গ্রাম/প্রতি গাছ/প্রতিবছর	টিএসপি গ্রাম প্রতিগাছ প্রতি বছর	এমপি গ্রাম/প্রতি গাছ প্রতি বছর
১	৫	১৭০	৫০	১২৫
২	৫	২২০	৫০	১৭০
৩	৫	৩২০	১১০	২৫০
৪	৫	৫৫০	১৬০	৪২০

সম্পূর্ণ গোবর সার ও টি এসপি এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি প্রথম কিস্তিতে বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ মাসে একসাথে গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের গোড়া হতে ৫০ সে:মি: দুরত্বে বা গাছের ডাল যতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে ততদূর পরিমাণ দূর দিয়ে সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার দেয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া ও এম পি সার দ্বিতীয় কিস্তিতে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে একই ভাবে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দেয়া ভালো! সার প্রয়োগে মাটির উর্বরতা, গাছের দূরত্ব ও বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। তবে প্রতি বছর সারের মাত্রা বাড়িয়ে ৫ বছর বা তদুদ্ধ বয়সের গাছ প্রতি সার প্রয়োগ সারণি - ২ তে দেয়া হলো।

সারণি-২ পাঁচ বছর বা তদুর্ধ লিচু গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ

গাছের নাম	গাছ প্রতি সার			
	৫-৬ বছর	৭-১০ বছর	১০ বছরের বেশি	১১-১২ বছর পর
গোবর সার (কেজি)	১০	৬০	৬০-৭০	৬০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১২৫০	৭৫০	১০০০	৭৫০
টিএসপি(গ্রাম)	৪০০	৭০০	৭৫০	৩০০০
এমপি(গ্রাম)	১০০০	৫০০	৬০০	৭৫০

প্রতি ক্ষেত্রেই সার প্রয়োগের পরপরই লিচু বাগানে সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছে ফুল আসার পর থেকে শুরু করে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দিলে ফল বড় হয় এবং ফলন বাড়ে। পানির অভাব হলে ফল ঝরে পড়ে।

ট্রেনিং ও প্রুনিং

ফলন্ত লিচু গাছে ট্রেনিং বা প্রবনিং দরকার নাই। নার্সারিতে থাকতে এবং রোপণের পর কয়েক বছর গাছের কিছু ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর দরকার আছে। যাতে গাছের একটি মাত্র প্রধান কাণ্ড কমপক্ষে এক থেকে দু মিটার উচু হতে পারে। এ জন্য পাশের অন্যান্য ডালপালা ঘেঁটে দিতে হবে। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগে মরা ও রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। লিচু ফল এক বছর বয়সের প্রান্ত শাখায় হয়ে থাকে। ফল আহরণের সময় শাখার কিছু অংশ ফলসহ ভেঙে নেওয়া হয়। শাখার কিছু অংশ ভাঙার ফলে নতুন শাখা প্রশাখা বের হয়। সেগুলো পরবর্তী বছর ফল দেয়। এর বেশি ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না।

পোকা মাকড় ও রোগ বালাই

লিচুর তেমন কোন মারাত্মক রোগ নেই। তবে Litchi Fruit লিচু গাছের অতিক্ষুদ্র মাকড়, ও Litchi Fruit Borer লিচু ফলের বীজ খেকো মাজরা পোকা লিচু ফলের মারাত্মক ক্ষতি করে।

বাদুর পাকা লিচুর প্রধান শত্রু। এটি পাকা ফলে আক্রমণ করে। ফল পাকার সময় মাছ ধরার জাল দিয়ে গাছ ঢেকে রাখলে বাদুরের উৎপাত কমে যায়। লিচু মাইট পাতার রস চুষে পাতাকে শুকিয়ে ফেলে। এর আক্রমণে পাতার নিচের পিঠে বাদামি বর্ন ধারন করে এবং পাতা কুঁকড়িয়ে যায়। কচি শাখা প্রশাখা ফুলের কুঁড়ি ইত্যাদিও আক্রান্ত হয়। প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০-৩০ ঘন মি: লি: ক্যালথেন বা ২০ গ্রাম থায়াভিট মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ইহা দমন হয়। পোকার শুককীট ফলের বোটার দিকে গর্ত করে ঢুকে শাঁস ও বীজ আক্রমণ করে। ফল পাকার সময় হলে এ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। কচি অবস্থায় ফলের উপর জায়াজিনন ৫০ ইসি ৬ মিলি ১লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। লিচু উচ্চ আর্দ্র ও কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়ায় পুষ্প মঞ্জুরী মিলডিউ ও অ্যানথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অনেক সময় ফল পচতে ও শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। এর প্রতিকারে বোর্দোমিশ্রণ ও ডাইথেন এম -৪৫ ছত্রাকনাশক ছিটানো যেতে পারে।

২০২২

ফল সংগ্রহ ও সক্ষণ কৌশল

কলমের গাছে ৪-৫ বছরের মধ্যেই ফল ধরতে শুরু করে ও ভাল ফলন পেতে ৭-৮ বছর সময় লাগে। বীজের গাছে ফল আসতে ৮-১০ বছর সময় লাগে। একটা গাছে প্রায় ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত ভালো ফলন পাওয়া যায়। ফেব্রুয়ারি - মার্চ মাসে লিচু গাছে ফুল আসে ও মে - জুন মাসে লিচুর পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল পুষ্ট হলে কাটা গুলো অনেকটা মোটা হবে ফলের রং উজ্জ্বল হবে এবং বোটার নিচে লালচে রং ধারণ করবে পরিপক্ব লালচে ভাবাপন্ন লিচু সগ্রহ করা হয়। এতে ফল বেশি দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। বৃষ্টির পর পরই কখনো ফল সংগ্রহ করা উচিত নয়। সাধারণত প্রতিটি গাছ থেকে ৩০০০ হতে ৫০০০ লিচু পাওয়া যায়। গাছ প্রতি ফলন ৮০-১৫০ কেজি।

সংরক্ষণ

সাধারণত লিচু সংগ্রহের পর ২-৩ দিনের বেশি ঘরে রাখা যায় না। লিচুর উপর লবণের পানি ছিটিয়ে বাঁশের ঝুড়িতে করে দূরবর্তী স্থানে লিচু প্রেরণ করলে সহজে নষ্ট হয় না। ২.২° -৩.৩° সে: তাপমাত্রায় ৮০ ৮৪% আর্দ্রতায় লিচুকে একমাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল নারিকেল। নারিকেল এমন এক ধরনের গাছ যার ফল, ছোবড়া, খোল, পাতা, কাণ্ড, মূল প্রভৃতি সমস্ত কিছুই মানুষের কাজে লাগে। বাংলাদেশের সব জেলাতেই নারিকেল জন্মায়। তবে উপকূলীয় জেলাসমূহে এর উৎপাদন বেশি। নারিকেলের জন্য উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। যে সব স্থানের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৭° সে. এবং তাপমাত্রা দৈনিক উঠানামা ৬-৭° সে: বেশি নয় এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২৫ সে:মি: এর বেশি সেখানে এটি সবচেয়ে ভালো জন্মে। নারিকেলের জাত প্রধানত তিনটি (১) টিপিকা জাত যা লম্বা শ্রেণিভুক্ত (২) জাভাটিকা জাত মাঝারি লম্বা শ্রেণি এবং (৩) নানা জাত যা বামন শ্রেণির

মাটি ও জমি নির্বাচন

নারিকেল গাছ প্রায় সব রকম মাটিতেই জন্মে। তবে সুনিষ্কাশিত অগভীর পানিতল বিশিষ্ট দোআশ বা বেলে দোঁআশ হতে এঁটেল মাটিতে খুব ভালো জন্মে। স্বাভাবিক জোয়ার ভাটার প্রভাবাধীন স্থান সমূহ নারিকেল চাষের জন্য উপযোগী। ৫.০ - ৮.০ অম্লক্ষারত্বে নারিকেল জন্মানো যায়। অত্যাধিক অম্ল বা অত্যধিক ক্ষার মাটি নারিকেল চাষের জন্য ভালো নয়। মাটির পটাসিয়াম ও সোডিয়াম লবন নারিকেলের জন্য ভালো। যে স্থানে মাটি সব সময় স্যাঁতসেঁতে থাকে অথচ শিকড় এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না। তথায় নারিকেল সবচেয়ে ভালো জন্মে। নারিকেল জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। অথচ পর্যাপ্ত রসের প্রয়োজন, তাই সমুদ্রের কাছাকাছি পরিবেশে নারিকেল ভালো ভাবে জন্মে।

জমি তৈরি ও গর্ত তৈরি

জমি বেশ কয়েকবার চাষ দিতে হয়। তারপর মাটি ঝুর ঝুরে করে তৈরি করে আগাছা পরিষ্কার করে নিতে হয়। নারিকেল গাছ লাগানোর জন্য উঁচু জমি প্রয়োজন। জমিতে ১.৫ থেকে ২মি: উচু চওড়া বাধ তৈরি করে সেখানে নারিকেল গাছ লাগানো যায়। চারায় ছায়া প্রদানের সুবিধার্থে আগে হতে গর্তের স্থানের চারদিকে ৫০ সে.মি. দূর দিয়ে ধইঞ্চা বা শন পাটের বীজ বপন করা যেতে পারে। সারি থেকে সারির দুরত্ব এবং সারি থেকে গাছের দুরত্ব মাপজোক করে রোপণের স্থানে কাঠি পুঁতে নির্দিষ্ট করতে হবে। চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে ৯০ সে.মি. প্রস্থ ও ৯০ সে.মি. গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হবে। কোন কোন সময় চারা লাগানোর স্থানে ১.০×১.০×১.০ মিটার আকারের গর্ত করে ১৫ দিন থেকে ১ মাস রোদ খোলা রাখা হয়। গর্তের আকার বড় হলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। এ গর্ত খোড়ার সময় উপর স্তরের মাটি আলাদা রাখতে হবে। এই উপরের মাটির সাথে ভালো ভাবে সার মিশিয়ে গাছ রোপণের ১০-১৫ দিন আগেই গর্তগুলো ভরাট করে দিতে হবে।

২০২২

সার প্রয়োগের কলা কৌশল

গর্তের উপরের মাটির সাথে গর্তপ্রতি ২০ কেজি গোবর মিশিয়ে গর্তগুলো ৩০ সেঃমিঃ ফাঁকা রেখে ভরাট করতে হবে। তারপর প্রতি গর্তের উপরে ২৫ সেঃমিঃ মাটির সাথে নিম্নের সারনিতে উল্লেখিত সারগুলোর অর্ধেক মিশাতে হবে।

সারণি ও প্রতি গর্তে গাছে সারের পরিমাণ

গোবর	২০ কেজি
ইউরিয়া	১৩২৫ গ্রাম
টিএসপি	১০৪০ গ্রাম
এমপি	১৬৬০ গ্রাম
জিপসাম	২৭৭৫ গ্রাম
জিংক সালফেট	২৭৫ গ্রাম

বাকি সার অর্ধ - আশ্বিন মাসে গাছের চারদিকে ৩-৫ মিটার পর্যন্ত ছিটিয়ে টিলার বা লাঙ্গল দিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশে দিতে হবে।

চারা রোপণের দূরত্ব

বাগান করলে গাছ থেকে গাছ ও সারি থেকে সারি ৬.৫-৮.৫ মিটার দূরে চারা লাগানো যায়। তবে গাছ থেকে গাছ। এবং সারি থেকে সারি ৫-৬ মিটার দূরত্বেও লাগানো যেতে পারে। বর্গাকার, ষড়ভুজী বা ত্রিকোনাকার পদ্ধতিতে নারিকেল চারা রোপণ করা যায়। ষড়ভুজ পদ্ধতিতে বর্গাকার বা ত্রিকোণাকার পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি গাছ লাগানো যায়।

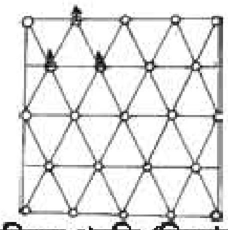
চিত্রঃ ত্রিভুজ পদ্ধতি (ত্রিকোণাকার)

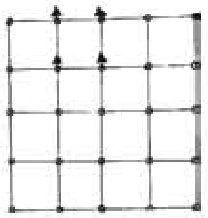
চিত্রঃ চারা লাগানোর নকশা

চারা নির্বাচনঃ যে সব চারা দ্রুততর গজায় এবং ঘন ঘন পাতা উৎপাদন করে সেগুলো উৎকৃষ্ট। ঐগুলোর পাতা চওড়া, গাঢ় সবুজ। পাতার বোঁটা খাটো, চারার গোড়া পুরু, শিকড়ের সংখ্যা অধিক। তেজী চারা লাগালে দ্রুত ফল পাওয়া যায় এবং ফলনও বেশি হয়।

চারা রোপণের সময়ঃ মে হতে জুলাই বা আগষ্ট মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যেতে পারে। বীজ তলা হতে চারা তোলার দিনই মূল বাগানের জমিতে চারা লাগানো উচিত। তাতে চারা খুব তাড়াতাড়ি লেগে যেতে পারে।

চারা রোপণ পদ্ধতিঃ সার মিশানো মাটি দিয়ে গর্ত গুলো ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর নারিকেলের সুস্থ ও সবল চারা জমির সমতল হতে ৩০ সেঃমিঃ গভীরে গর্তের মাঝখানে বসাতে হবে। চারা গর্তের মাটিতে রোপণের সময় চারা নারিকেলটি শুধু মাটি চাপা দিতে হবে এবং চারদিকের মাটি শক্ত করে বসিয়ে দিতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় যখন মাটি কর্দমাক্ত থাকে তখন সার মিশানো বা চারা রোপণ না করে যখন জমিতে "জো" আসে তখন করা সবচেয়ে ভালো। রোপণের পরপরই চারার দু পাশে দুটি কাঠি পুঁতে বাংলা চারটি এর মত করে চারটি মাঝখানে রেখে দুটি কাঠি বেঁধে দিতে হবে।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

রোপণের পর ৪-৫ বছর পর্যন্ত নারিকেল গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা যথা সময়ে করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে গাছ দ্রুত ফলবান হবে এবং পরবর্তী সময়ও গাছের উপর এর শুভ প্রতিক্রিয়া থাকবে।

সেচ ও পানি নিকাশ এবং অন্যান্য পরিচর্যা: প্রথম অবস্থায় গর্তের চারাটি মাটি এসে চারার গোড়া যেন ঢেকে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এরূপ হলে অতিরিক্ত মাটি চারার গোড়া হতে সরিয়ে ফেলতে হবে। চারা যতই বড় হতে থাকবে গর্তের মাটিও আস্তে আস্তে ভরাট হতে থাকবে। শুকনো মৌসুমে নিয়মিত সেচ দিতে হবে এবং বর্ষা মৌসুমে নারিকেল বাগানে যেন জলাবদ্ধতা না হয় এ জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কোন গাছের ছায়া যাতে ক্ষতি না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে। নারিকেল গাছ উন্মুক্ত আলো বাতাস চায়।

সারের উপরি প্রয়োগ: গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ফল উৎপাদনের জন্য সব খাদ্যোপাদানই আবশ্যক। চারা রোপণের পর গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য জৈব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় চারার বৃদ্ধি কম হলে ফল ধরতে দেরী হয়। সাধারণত ৪ থেকে ৭ বছরের মধ্যে নারিকেল গাছে ফল ধরতে শুরু করে। তবে ১২ বছর বয়স হতে ভালভারে ফল ধরা শুরু করে। এক পরীক্ষায় প্রমান পাওয়া গেছে যে নারিকেল গাছে ফসফরোগর চাহিদা কম, পটাসিয়ামের চাহিদা বেশি এবং নাইট্রোজেনের চাহিদা মোটামুটি মাঝারি ধরনের। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

ছক - ১ নারিকেল গাছে চারার বয়স অনুসারে সার ব্যবহারের পরিমাণ।

চারার বয়স	সারের পরিমাণ	সারের নাম ও আনুপাতিক হার
১ বছর	৭৫০ গ্রাম	ইউরিয়া: টিএসপি: এমপি (২:১:৩)
২ বছর	১০০০ গ্রাম	
৩ বছর	১২৫০ গ্রাম	
৪ বছর	১৫০০ গ্রাম	

সাথে প্রতি বছর ১০ কেজি গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে।

সূত্র: বিএআরসি/ডিএই

ছক-২ ফলন্ত নারিকেল গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ
ইউরিয়া	১.৫০
টিএসপি	১.০০ কেজি
এমপি	১.৭০ কেজি
জিপসাম	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	২০০ গ্রাম

চিত্র: গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ ও পানি সেচ

সারের অধিক মে-জুন মাসে এবং বাকি অর্ধেক সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের গোড়ার চারদিকে ৪০-৬০ সে.মি. দূর দিয়ে ৫০ সে:মি: চওড়া ও ১২-১৫ সে:মি: গভীর করে গর্ত করতে হবে। গাছ বাড়ার সাথে সাথে এই দূরত্ব বাড়িয়ে দিতে হবে। মে-জুন মাসে যে অর্ধেক সার দেওয়া হবে তা গর্তে ছড়িয়ে দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বাকি অর্ধেক সার গাছের চারদিকে ৩-৫ মিটার দূর দিয়ে ছিটিয়ে চাষ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার প্রয়োগের পর পরই সেচ দিতে হবে। গাছ বাড়ার সাথে সাথে সার প্রয়োগ করা না হলে ফলন কমে যায়। নিয়মিত সার ও সেচ দিলে ফলন স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। নারিকেল গাছে সার প্রয়োগের ১৫-২০ মাস পর ফলনের ওপর সারের প্রভাব পাওয়া যায়।

পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন কৌশল

পোকা দমন ও দুটি পোকা নারিকেল গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এদের একটি Rhinoceros beetle বা গোবরে পোকা এবং অপরটি রেড পাম উইভিল। গোবরে পোকা কচি অগ্রভাগ ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে এবং গাছের কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে সেখানে পচন ধরে এবং বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। পচা অংশের আকর্ষণে রেড পাম উইভিল এর আগমন হয়। এর শুককীট গাছের অগ্রভাগ কেটে ফেলে এবং গাছের মৃত্যু ঘটায়। এ দুটি পাকার আক্রমণ থেকে গাছকে রক্ষার জন্য নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১। নারিকেল গাছ মারা গেছে বা মরার উপক্রম হয়েছে সেগুলো কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং আক্রান্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২। নারিকেল বাগানের মধ্যে বা আশে পাশে গোবর ও আবর্জনা রাখা যাবে না।

৩। বছরে অন্তত দু'বার বর্ষা শুরুর আগে এবং শেষে গাছের অগ্রভাগের আবর্জনা, শুষ্ক পাতা ও ছড়ার অংশ পরিষ্কার করে দিতে হবে। ছিদ্র দেখলে লাহোর শিক ঢুকিয়ে পোকা গেঁথে মেরে ফেলতে হবে। তাছাড়া ছিদ্র পথে যত টুকু সম্ভব প্লাষ্টিকের সিরিঞ্জের সাহায্যে "নগস" বা ডেনকাভ্যাপন ১০০ ইসি ঢুকিয়ে ছিদ্র কাদা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। কীটনাশক হতে উৎপন্ন বিষ বাস্প নারিকেল গাছের অভ্যন্তরে উইভিলের কীড়া ধ্বংস করবে।

রোগ দমন: নারিকেল গাছের শীর্ষ পচা (Bud rot) রোগ খুবই মারাত্মক। এ রোগে আক্রান্ত গাছের শীর্ষদেশের কোমল অংশ পচে বিকট গন্ধ ছড়ায়। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় বোর্দো মিকচার ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যায়। অথবা আক্রান্ত গাছের মাথা কেটে পুড়ে ফেলা উচিত এবং নিকটবর্তী গাছগুলোতে বোর্দো মিকচার ছিটানো উচিত।

ফল আহরণ ও সংরক্ষণ কৌশল

ফুল আসা থেকে শুরু করে ঝুনা হতে প্রায় ১ বছর সময় লাগে। অনুকূল অবস্থায় চারা লাগানোর ৫-৬ বছরের মধ্যে নারিকেল গাছে ফুল ধরতে শুরু করে। বছরের বিভিন্ন সময়ে নারিকেল পাড়া যায়। কতবার নারিকেল পাড়া যাবে তা সংখ্যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হয়ে থাকে। পরিপক্ব নারিকেল গাছে উঠে কঁধি কেটে রশিতে বেঁধে নিচে ফেলে সংগ্রহ করা হয়। দূরে পাঠাতে হলে বা বাজারজাত করতে হলে খোসাসহ খাঁচায় বা গাড়িতে করে পরিবহন করা যেতে পারে। ডাব হিসেবে ব্যবহার করতে হলে ৬-৭ মাস বয়সের ফল পাড়া ভালো। ঝুনা নারিকেল ঘরের শুকনো মেঝেতে ৩-৪ মাস রাখা যায়। বছরে গাছ প্রতি ১০০-১৫০ টি নারিকেল পাওয়া যায়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। লিচু বাগানের জন্য মাটির উপযুক্ত পিএইচ মান কত ?

২। লিচুর মাইট পাকা দমনে কি কীটনাশক ব্যবহার করা হয় ?

৩। লিচু সংরক্ষণের জন্য তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা কত হওয়া উচিত ?

৪। নারিকেল গাছের জন্য গর্তে গোবর এবং জিপসাম সার কত গ্রাম দিতে হয় ?

৫। নারিকেলের শীর্ষ পচা রোগ দমনে কি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করবেন ?

৬। বাগানে লিচু গাছ কত দুরে দুরে লাগাতে হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নারিকেল চারা রোপণ পদ্ধতি ও দূরত্ব সম্পর্কে লেখ।

২। লিচু গাছ রোপণের সময় ও দূরত্ব লেখ।

৩। চিত্রসহ নারিকেলের চারা রোপণ পদ্ধতি লেখ।

৪। লিচু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কৌশল লেখ।

৫। নারিকেল সংগ্রহ কৌশল লেখ।

৬। নারিকেল চাষের জন্য জমি নির্ধারন ও জমি তৈরি সম্পর্কে লেখ ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। নারিকেলের চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

২। লিচুর চাষাবাদ কৌশল বর্ণনা কর।

৩। নারিকেল ও লিচুর প্রধান প্রধান পোকাও রোগবালাই দমন কৌশল বর্ণনা কর।

৪। নারিকেল ও লিচুর রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা বর্ণনা কর।

৫। বয়স্ক লিচু/গাছে নারিকেল গাছে প্রয়োগের জন্য সারের নাম ও পরিমাণ ছক আকারে লেখ।

২০২২

চতুর্দশ অধ্যায়

আমড়া ও কামরাঙ্গা চাষাবাদ কলাকৌশল

আমড়া চাষাবাদ (Hog plurn)

বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত টক ফল আমড়া। আমড়া অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল। এতে প্রচুর ভিটামিন এ, বি, লৌহ, ক্যালসিয়াম ও খনিজ লবণ আছে। বাংলাদেশে বরিশালের আমড়া প্রসিদ্ধ। এটা আমের স্বগোত্রীয় ফল দেখতে অনেকটা ছোট আকারের আমের মত। এটা বাংলাদেশ- ভারত অঞ্চলের ফল, পত্র পতনশীল গাছ এবং এর চাষাবাদও খুব কঠিন নয়। সহজেই বীজ থেকে চারা উৎপাদান ও চাষ করা যায়।

আমড়া চাষের জন্য মাটি ও জমি নির্বাচন

প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং পানি নিকাশের ব্যবস্থা ভাল থাকলে যে কোন ধরনের মাটিতেই আমড়া চাষ করা যায়। তবে আর্দ্রতাপূর্ণ পেঁয়াশ মাটি আমড়া চাষের জন্য উত্তম। মাটিতে পানি দাঁড়ানো অবস্থা সহ্য করতে পারে না। পানি জমলে জমি উঁচু বা নিচু যে ধরনেরই হোক তাতে কোন অসুবিধা হয় না। খোলামেলা বা আংশিক ছায়াযুক্ত জমিতে আমড়া চাষ করা যায়।

গাছ রোপণের জন্য জমি ও গর্ত তৈরি পদ্ধতি

বর্ষার পূর্বে অথাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে ৭৫ সে:মি:×৭৫ সে.মি,×৭৫ সে.মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। দুই সারির মাঝখান দিয়ে নালা তৈরি করে নালার মাটি গাছের সারিতে উঠিয়ে দিলে উঁচু বেডের মত হবে। এতে গাছের গোড়ায় পানি দাঁড়াতে পারবে না। চারা রোপণের ২ থেকে ৩ সপ্তাহ আগে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি গোবর সার ও ১ কেজি কাঠের ছাই মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

চারা রোপণের দূরত্ব (Spacing of Planting)

পরস্পর দুটি চারার ও সারির মধ্যে দূরত্ব থাকবে ৮ থেকে ১০ মিটার

চারা রোপণের সময় (Time of planting)

জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। বৃষ্টিপাত বেশি হলে ও পানি নিকাশের ভালো ব্যবস্থা থাকলে চারা লাগানো যায়।

চারা রোপণ পদ্ধতি (Method of planting)

চারার বৃদ্ধি ও ভালো ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করার ২-৩ সপ্তাহ পরে নির্দিষ্ট গর্তের মাঝখানে চারা লাগাতে হবে। চারা লাগানোর পর চারার সারি উঁচু বেড আকারে না থাকলে গোড়ার মাটি উঁচু করে দিতে হবে। তবে জমির সমতল হতে চারা লাগানোর স্থান ৩০-৪০ সে:মি: উঁচু হলে ভালো হয়।

সার প্রয়োগের কলা কৌশল

দেশি আমড়া গাছে সার দেওয়ার প্রচলন নাই, তবে বিলাতি আমড়ায় কিছু সারের চাহিদা আছে। চারার বৃদ্ধি ও ভাল ফলনের জন্য বর্ষার আগে গাছ প্রতি ১৫-২০ কেজি গোবর ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। নিচে উল্লেখিত পরিমাণ সার সমান দু'ভাগে ভাগ করে দুবারে প্রয়োগ করতে হবে।

২০২২

ছক: আমড়া গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ (কেজি/গ্রাম

সারের নাম	প্রতি বছর গাছ প্রতি সারের পরিমাণ	পূর্ণ বয়ক ফলত গাছ প্রতি সারের পরিমাণ
গোবর সার	১৫-২০ কেজি	৩০-৪০ কেজি
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম	১০০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ গ্রাম	৮০০ গ্রাম
এমপি	১০০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

আমড়ার চারা অত্যন্ত নরম। তাই ঝড়ে যাতে ভেঙে যেতে না পারে সেজন্য চারা রোপণের পর বাঁশের খুটি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। আম গাছের মত আমড়া গাছে অসম বা একান্তর ভাবে ফলন দেখা যায়। অর্থাৎ এক বছর ফলন বেশি হলে পরের বছর ফলন কম দেয়। যে বছর ফলন বেশি হয় সে সময় ছোট অবস্থায় কিছু ফল পেড়ে ফল পাতলা করে দিতে হয়। এতে অবশিষ্ট ফল বড় হয় এবং একান্তর ফলন কিছুটা রোধ হয়। এছাড়া ফল শেষ হয়ে গেলে শুকনো ও রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দিতে হয়। গাছের নিচের জমি আগাছামুক্ত ও মাটি নরম রাখার জন্য বাগানের ফাকা জায়গায় আদা, হলুদ, চাষ করা যায়। বড় গাছে তেমন সেচের প্রয়োজন হয় না। চারা ছোট অবস্থায় এবং সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হলে সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন কৌশল

আমড়া গাছের শত্রু কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা। এই পাকা গাছের কাঠ সমেত নরম অংশ খেয়ে ফেলে এবং গর্ত করে দেয়। এই গর্তে বর্ষার জল ঢুকে পচন শুরু হয় এবং নরম ডালপালা সহজেই ভেঙে যায়। এই পোকার মল দেখে সহজেই চেনা যায়। প্রতিকার হিসাবে লোহার শলাকা দিয়ে পোকা বের করে মারা হয়। এছাড়া ৫০% বি.এইচ সি গুলে গর্তে ঢেলে দিয়ে গর্তের মুখ সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে ডাল শুকা রোগ (Die back) আক্রান্ত হয়। এছাড়া তেমন রোগ চোখে পড়ে না।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষন কৌশল

দেশি আমড়া গাছে ৫-৭ বছরে এবং বিলাতি আমড়া গাছে আরো আগে ফল ধরা শুরু করে। ফেব্রুয়ারি - মার্চ মাসে মুকুল আসে এবং জুলাই-আগষ্ট মাসে ফল পাকে। দেশি আমড়া ছোট অবস্থায় তোলা যায় এবং চাটনি খাওয়া যায়। ফল পুষ্ট হলে গায়ের চামড়া টান টান হয় এবং বোটার দিকে হালকা সবুজ বা হালকা হলদে ভাব হয়। ডাসা অবস্থায় ফল পাড়া হয়। পরিপুষ্ট ফল পেড়ে বড় ছোট গ্রেডিং করে বাজারজাত করা হয়। ঠান্ডা পরিবেশে এবং আলো বাতাস চলাচলের সুবিধাজনক স্থানে এক সপ্তাহের বেশি সময় রাখা যায়। গরম বা বদ্ধ স্থানে রাখলে তাড়াতাড়ি পেকে যায়। স্বাভাবিক ঠান্ডা ঘরে সংরক্ষণ করলে মাঝে মাঝে হালকা পানির ছিটা দিলে ফল সতেজ থাকে।

ফল সংরক্ষণ (Fruit preservation): ভঁসা ফল পেড়ে মিষ্টি আচার তৈরি করে অনেক দিন রাখা যায়। কবিরাজেরা আমের মত আমড়া সত্ত্ব করে রাখেন বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য। একটি আমড়া গাছ ২৫-৩০ বছর পর্যন্ত বছরে ২০০-৩০০ কেজি ফল দেয়।

২০২২

কামরাঙ্গা (Carambola) চাষাবাদ কৌশল

অম্লমধুর স্বাদযুক্ত কামরাঙ্গা ফল আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। কাচা ফল টক পাকলে কিছুটা মিষ্টি। সারা বাংলাদেশে এই ফল গাছে দেখতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়িক ভাবে কামরাঙ্গা চাষ তেমন লাভজনক নয় তবে অনেকে বাগানে বা বাড়ির আশে পাশে গাছ লাগিয়ে থাকেন। এই ফলে প্রচুর ভিটামিন এ ও সি এবং বি, বি২, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও খনিজ লবণ আছে। কবিরাজী মতে পাকা ফল শীতল, বাতনাশক, অর্শরোগে উপকারী রুচিকর ও পুষ্টিকর। এই ফল খাওয়া উপকারী। বর্তমানে হাইব্রিড মিষ্টি জাতের কামরাঙ্গা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মাটি ও জমি নির্বাচন

হালকা দোঁআশ মাটি কামরাঙ্গা চাষের জন্য উত্তম হলেও পানি নিষ্কাশন ও সেচের সুবিধাযুক্ত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই এর চাষ করা যায়। বালি মাটিতে এই ফলের চাষ করা অসুবিধাজনক পানি না জমলে জমি উচু বা নিচু যে ধরনে হাকে তাতে কোন অসুবিধা হয় না। খোলামেলা বা আংশিক ছায়াযুক্ত জমিতে কামরাঙ্গা চাষ করা যায়।

চারা রোপণের জন্য জমি ও গর্ত তৈরি এবং সার প্রয়োগ পদ্ধতি

বর্ষার পূর্বে অথাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে জমিতে কয়েক বার চাষ দিয়ে জমির আগাছা পরিস্কার করে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের মাপ হবে ৭৫ সে:মি:×৭৫ সে:মি:×৭৫ সে:মি:। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি গাবর সার ১ কেজি কাঠের ছাই, ৫০০ গ্রাম হাড়ের গুড়া, ঝুরা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রাখতে হবে। গর্ত গাছের রোপণের ২০-২৫ দিনে পূর্বে করতে হবে।

চারা রোপণ পদ্ধতি (Method of Planting)

গর্তের মাঝখানে চারা বসিয়ে গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হবে। একটা শক্ত কাঠির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে নরম চারাকে দাঁড়াতে সাহায্য করতে হবে। তারপর পানি সেচ দিতে হবে।

চারা রোপণের সময় (Tine of planting): বর্ষা কালে অর্থাৎ মার্চ - এপ্রিল মাসে চারা রোপণ করা হয়।

চারা রোপণের দূরত্ব (Spacing of Planting): পরস্পর গাছ ও সারির দূরত্ব থাকবে ৪-৫ মিটার।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

সার প্রয়োগ (গবহঁৎরহম) ও সার প্রয়োগে ফলন ভালো ও ফলের মান উন্নত হয়। এ জন্য বর্ষার আগে প্রতি বছর গাছ প্রতি ১৫-২০ কেজি গোবর সার বা খামার সার, ১ কেজি কাঠের ছাই, ১ কেজি সরিষার খৈল গোড়ার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে। চারা ছোট অবস্থায় সার কিছুটা কম দিয়ে গাছকে সবল করে তুলতে হবে। বড় গাছে বর্ষার শুরুতে ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি এনপিকে বা সুফলা (১৫:১৫:১৫) প্রয়োগে বেশি ফলন পাওয়া যাবে। ভাল ফলনের জন্য বয়ক গাছে বর্ষার আগেও পরে দুই দফায় সার দেওয়া দরকার। প্রথমে বর্ষার আগে ছকে দেখানো সারের অর্ধেক ও বর্ষার পরে বাকি অর্ধেক সার ছিটিয়ে গাছের গোড়ার মাটি কুপিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

২০২২

ছক– বয়ক (ফলন্ত) কামরাঙ্গা গাছে সার প্রয়োগের পরিমাণ

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ
গোবর সার	৪০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	১.৫ কেজি
এমপি	১.০ কেজি

সেচ (Irrigation): বড় গাছের সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। চারা অবস্থায় গরমকালে ও সার প্রয়োগের পর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। চারার প্রথম অবস্থায় প্রতি মাসে নিয়মিত একবার সেচ দিতে হবে।

ছাঁটাই: ভালো ফলন পেতে যত্ন ও পরিচর্যা প্রয়োজন। ফল শেষ হয়ে গেলে হালকা ভাবে ডাল ছাঁটাই করে গাছের আকৃতি সুন্দর করতে হয়। গাছ বড় হয়ে গেলে গাছের নিচে ঘন ছায়া হওয়ার জন্য সাথী ফসলের চাষে অসুবিধা সৃষ্টি করে।

পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন কৌশল

এই গাছে তেমন রোগ ও পোকা নেই বললেই চলে। ফল পাকলে বা পাকতে শুরু করলে বাদুর, কাঠবিড়ালির অত্যাচার শুরু হয়। কাঁচা অবস্থায় টিয়াপাখি কঁচা ফল কেটে নিচে ফেলে বিনষ্ট করে।

ফল সংগ্রহ ও সরক্ষণ পদ্ধতি

বীজের গাছে ৩-৪ বছরের মধ্যে ফুল আসলেও ভালো ফলন ৫-৬ বছরের আগে হয় না। কলমের গাছে ১ বছরের মধ্যে ফুল ধরে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এবং জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে ফল পাকে। ফল পুষ্ট হলেই পাড়া হয়। পুষ্ট ফলের রং ইষৎ হলদে হয় এবং শিরাগুলির গভীরতা কমে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পাড়া ফল রেখে দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই পেকে যায়। প্রতিটি পুর্ন বয়স্ক গাছ হতে বছরে ৬০০-৮০০ টি ফল পাওয়া যায়।

ফল সংরক্ষণ: পাকা ফলের রস থেকে জেলি তৈরি করা যায় এবং এই জেলি বেশ সুস্বাদু হয়। এছাড়া মুখরোচক আচার তৈরি হয়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আমড়া ফলে বিদ্যমান ভিটামিন ও খনিজ পদার্থগুলো কি কি ?

২! আমড়া গাছ রোপণের উপযুক্ত সময় কখন ?

৩। আমড়া গাছের কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা দমনে কি ঔষধ ব্যবহার করা হয় ?

৪। কামরাঙ্গা গাছ রোপণের জন্য গর্তের মাপ কত হবে ?

৫। ফলন্ত কামরাঙ্গা গাছ প্রতি গোবর, টিএসপি এবং এমপি সারের প্রয়োগ মান কত ?

৬। কামরাঙ্গা কি কি রোগ উপশমে ব্যবহার করা হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কামরাঙ্গা চাষে জমি ও মাটির চাহিদা লেখ।

২। কামরাঙ্গা গাছে সার প্রয়োগে কৌশল বর্ণনা করা।

৩। আমড়ার রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

৪। কামরাঙ্গার ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আমড়ার চাষাবাদ কৌশল বর্ণনা কর।

২। কামরাঙ্গার চাষে জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, গর্ত খনন, সার প্রয়োগ ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

২০২২

পঞ্চদশ অধ্যায়

আঙ্গুর ও লটকন চাষাবাদ কৌশল

আঙ্গুর চাষাবাদ ফলের মধ্যে আঙ্গুর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আঙ্গুর সুপাচ্য, পুষ্টিকর ও তৃপ্তিদায়ক। এর উৎপাদন বিশ্ব ফল উৎপাদনের অর্ধেক। আর পৃথিবীর প্রচীনতম ফলসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের মানুষের নিকট আঙ্গুর কোন নতুন ফল নয়। বরং এদেশের সবার কাছে সুপরিচিত ও সমাদৃত। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সীমিত আকারে আঙ্গুর চাষ হচ্ছে। কিন্তু এগুলো গুনে ও মানে উন্নত মানের নয়। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক উষ্ণ মন্ডলে উৎকৃষ্ট মানের আঙ্গুর চাষ হচ্ছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশেও উৎকৃষ্ট মানের আঙ্গুর চাষের সম্ভবনা আছে। তথ্য মতে বর্তমানে বাংলাদেশে দুটি জাতের আঙ্গুর চাষ শুরু হয়েছে। একটি জাককাউ জাতের অন্যটি হলো বাকরুবী বা কালো আঙ্গুর। এ দুটি জাতের আঙ্গুরেই বীজ থাকে। জ্যাককাউ জাতের আঙ্গুর সম্পূর্ণ না পাকলে টক মিষ্টি স্বাদের। কিন্তু কালো আঙ্গুর খেতে বেশ ভালো। বাক রুবী জাতের আঙ্গুর বাংলাদেশে বছরে দু'বার ফল দেয়। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বাড়িতে যেখানে বৃষ্টির পানি দাড়ানো এমন জায়গায় খুব অল্প পরিশ্রমে ও কম খরচে কালো আঙ্গুর গাছ লাগিয়ে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে প্রচুর লাভবান হতে পারেন।

মাটি ও জমি নির্বাচন

উর্বর দো আশ ও বেলে দোঁআশ মাটি ও রৌদ্রযুক্ত খোলা মেলা জায়গা আঙ্গর চাষের জন্য উপযুক্ত। আজ্ঞুর গাছ যে কোন মাটিতে হতে পারে, তবে উঁচু পানি সুনিষ্কাশিত ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর বেলে দোঁআশ মাটি সবচেয়ে উত্তম। আজ্ঞুর কিছুটা লবণাক্ততা ও ক্ষারত্ব সহ্য করতে পারে কিন্তু অতিরিক্ত চুন ক্ষতিকর। বেলে কাকুরে মাটিতেও আজ্ঞুর ফল ভালো হয়।

চারা রোপণের জন্য জমি ও গর্ত তৈরি পদ্ধতি এবং সার প্রয়োগ কৌশল

রৌদ্র উজ্জল খোলামেলা আলো বাতাস যুক্ত জায়গা আঙ্গর চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। চারা রোপণের আগে জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে অসমতল জমি সমতল করতে হবে। জমির ক্ষয়রোধের জন্য উপযুক্ত বাঁধের ব্যবস্থা করতে হবে। জমি প্রস্তুত হলে চারা লাগানোর জায়গা গুলো ৭৫ সে:মি:×৭৫ সে:মি:×৭৫ সে:মি: মাপের গর্ত খুড়ে প্রতি গর্তে ৫০ কেজি খামার জাত সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্তগুলো ভরাট করতে হবে। চারা রোপণের কমপক্ষে তিন সপ্তাহ পূর্বে গর্ত খনন করা উচিত। চারা রোপণের সময় গর্তের মাটির সাথে ১২৫ গ্রাম করে টি এসপি ও এমপি সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। বর্গাকার পদ্ধতিতে ৪×৪ মি: দূরত্বে গর্ত খনন করতে হবে।

চারা রোপন (Method of Planting)

সমতল জমিতে বর্গাকার বা আয়তকার পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ি এলকার জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কলমের চারা রোপণ করা হয়। গর্ত তৈরির ২০-২৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হয়। প্রতি গর্তে ২-৩ টি করে আজ্ঞুরের কাটিং বসানো হয়। পরে তেজী চারটি রেখে বাকি চারাগুলো তুলে ফেলতে হয়। এক বছর বয়স্ক চারার ৪টি মুকুল রেখে বাকি অংশ ঘেঁটে দেওয়া হয় এবং এই রকম চারাগুলোকে গোড়ার মূলসহ তুলে নিয়ে প্রতি গর্তের ঠিক মাঝখানে

সামান্য মাটি সরিয়ে একটি চারা সোজাভাবে বসানো হয়। চারাগুলো বসানোর পর গাছের গাড়ায় মাটি ধরিয়ে সামান্য চাপ দিতে হবে। এবং প্রত্যেক গাছে হালকা ভাবে সেচ দিতে হবে। প্রতি (চারা কাঠি দিয়ে বেঁধে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

চারা রোপণের সময় (Time of planting)

সাধারণত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সরাসরি জমিতে আজ্ঞুর গাছের কাটিং বসানো হয়। জুন মাসে রোপণ ভালো, তবে ঠিকমত যত্ন করলে সারা বছর আঙ্গর চারা লাগানো যায়।

চারা রোপণ দূরত্ব (Spacing) সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছ পরস্পর ৪ মিটার দূরত্বে চারা রাপেণে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়।

আঙ্গর গাছ রোপণের পরবর্তী পরিচর্যা

আগাছা দমন: আজ্ঞুর বাগানে আগাছা দমন একান্ত প্রয়াজন। গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে তা তুলে ফেলতে হবে। কারণ আগাছা মুল গাছের ক্ষতি করে থাকে এবং খাদ্য গ্রহনে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে।

বাউনি দেওয়া: আজ্ঞুর গাছ যেহেতু একটি লতানো উদ্ভিদ; তাই গাছে বাউনি দেওয়া আবশ্যক। বাউনি (মাচান) স্থায়ী হওয়ার প্রয়োজন। টাই- এর পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাউনি দেওয়ার নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে।

(ক) হেড পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে গাছের ডালপালা এমন ভাবে ছাঁটাই করা হয় যাতে গাছ একটি গুল্মের আকৃতি ধারন করে। যে সব জাত প্রশাখার গোড়ার দিকে ফল উৎপন্ন করে এ পদ্ধতি সেগুলোর জন্য উত্তম। বাউনি না দিলে উৎপাদন খরচ কম হয় কিনতু ফলনও সেই সাথে কমে যায়।

(খ) একটি খুঁটি (Single Stake): বাওয়ার জন্য প্রতি গাছে একটি করে খুটি দেওয়া হয়। লতা বাওয়ার জন্য খুটির সাথে সমান্তরালে বাঁশ বা কাঠের লাঠি দেওয়া হয়।

(গ) কউন পদ্ধতি: এতে গাছের সারি বরাবর কিছু দূরে দূরে শক্ত খুঁটি পুতে তার দিয়ে খুঁটিগুলি সংযুক্ত করে বেড়ার মত কাঠামো তৈরি করা হয়। তার নিদিষ্ট সংখ্যক শাখা তারের সাথে সমান্তরাল করে বেঁধে দেওয়া হয়।

(ঘ) বাওয়ার পদ্ধতি: টেকসই বস্ত দিয়ে বিভিন্ন আকারের মাচান বা খিলান (Pergola) তৈরি করে দুই পাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে গাছ লাগানো হয় এবং মাচানের উপর ডালপালা দিয়ে লাউ কুমড়া গাছের মত বাইয়ে বাওয়ার সুবিধে করে দেওয়া হয়।

ছাঁটাই (Pruning)

আজ্ঞুর গাছেেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারন ছাঁটাই দ্বারা গাছ ফল ধারনে প্রভাবিত হয়। ছাটাই এর পদ্ধতি নির্ভর করে গাছের দৈহিক বৃদ্ধির উপর। যে সব এলাকায় সুস্পষ্ট শীতকাল আছে সেখানে শীতকালে পাতা ঝরে যায়। তখনই ঘঁটাই করতে হয়। শীতের শেষে নতুন গজানো ডালপালায় ফুল উৎপন্ন হয়। সারা বছর উষ্ণ থাকে এমন স্থানে আজ্ঞুরের গাছ পত্র মাচেন করে না। সেই ক্ষেত্রে ফল ধরাতে হলে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে গাছে সুপ্তি অবস্থা আনতে হবে। তখন ডালপালা ছাটাই করতে হবে। আজ্ঞুরের শাখার প্রতিটি পাতার কক্ষে দুটি করে সুপ্ত কুড়ি থাকে। এর মধ্যে বড়টি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পাতা ও ফুল উৎপন্ন করে। ছোটটি কেবল পাতা উৎপন্ন করে। ২০২২

যদি সুপ্তিকালে শাখার আগা কেটে ফেলা হয় তাহলে কক্ষের ছোট কুড়িটি বাড়তে শুরু করে এবং এর প্রভাবে বড়টির সুতি ভেঙে যায় এবং তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে ফুল উৎপন্ন করে। এ ভাবে শীতের প্রভাব ছাড়াও ফল উৎপাদিত হয়। আঙ্গুর গাছ হেঁটে (Pruning) ও সঠিক ভাবে লতিয়ে (Trailing) ফলন বাড়ানো যাবে, গাছ ছাঁটাই করা ছাড়াও সরু ডাল পাতলা করা ও ফল পাতলা করা প্রয়োজন। এতে ফলের আকারও পরিমান বৃদ্ধি পাবে এবং গুণগত মান বাড়বে। গাছে সঠিক পরিমাণ ও নিয়মিত ফলন পেতে মোটা ডালের কিছুটা ছাল তুলে (girdling) দেওয়া হয়।

সারের উপরি প্রয়োগ ও সেচ ব্যবস্থাপনা

আঙ্গুর গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ আবশ্যক। আঙ্গুর গাছে পটাশ সারের প্রয়োজন খুব বেশি। প্রথম বছর প্রতি গাছে ১০ কেজি জৈব সার, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম সুপার ফসফেট এবং ২৫০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হয়। তারপর প্রতি বছর প্রতি গাছে ৫কেজি জৈব সার, ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও সুপার ফসফেট এবং ৩২০ গ্রাম এমপি সার দিতে হয়। ৫ বছরের বেশি বয়সের গাছে ২০ কেজি গোবর সার, ১.৫ কেজি নাইট্রোজেন সার, ৩ কেজি সুপার ফসফেট ও ৪.৫ কেজি এমপি সার প্রয়োজন। গাছ ফল ধরা শুরু করলে সার দেওয়ার সময় পরিবর্তন করতে হবে। শীতকালে ঘঁটাই করার পর জৈব সার, ফসফেট এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি সার গ্রীষ্মকালে ছাটাই এর পর প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ (Irrigation): গাছের বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফল ধরার জন্য গাছের গোড়ায় রস থাকা দরকার। গাছের গোড়ায় ৮ সে:মি: গভীর সেচের পানি অবশ্যই প্রয়োজন। গাছ ছাটাইয়ের পর গ্রীষ্মকালে সেচ দরকার। সার প্রয়োগের পর কিংবা ফল বৃদ্ধির সময় সেচ দিতে হয়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মাটি ও আবহাওয়া অনুযায়ী ১৫-২০ দিন অন্তর সেচের প্রয়োজন।

পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন কৌশল

বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় ও রোগ দ্বারা আঙ্গুর গাছ আক্রান্ত হয়ে থাক। রোগ ও পোকা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। মাজরা পাকা গাছের প্রধান শাখার ত্বকভেদ করে কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কাণ্ডের মধ্যে বসবাস করে ক্রমাগত গাছের ছাল খেয়ে ফেলে। অধিক আক্রমণে আক্রান্ত শাখাগুলো শুকিয়ে যায়। আলকাতরার সাহায্যে গর্তের ফুটগুলো বন্ধ করে এই পোকা দমন করা যায়।

ফ্লী বিটল: শুককীট ও পূর্ণাঙ্গ পোকাগুলো আঙ্গুর গাছের নরম পাতা এবং শাখাসহ মুকুল গুলো খেয়ে ফেলে ও গাছের বৃদ্ধি রহিত করে। প্রতিকারের জন্য আক্রমণের শুরুতে ৫০% মিথাইল প্যারালিয়ন স্প্রে করে এদের সহজে দমন করা যায়।

মাকড়, আঁশ পোকা, জেসিড, থ্রিপস: রস শোষক পোকাগুলো দলবদ্ধ ভাবে আঙ্গুর গাছের পাতা, শাখা, মুকুল ইত্যাদির রস শাষেন করে। এর ফলে গাছ বিবর্ন হয়ে বৃদ্ধি রহিত হয়। প্রতিকারের জন্য রগর ৩০ ইসি আক্রান্ত গাছে রোদর দিনে স্প্রে করতে হবে।

অ্যানথ্রাকনোজ: এ রোগের আক্রমণে গাছের শাখার ডগায়, ফুলেও ফলে বাদামি রঙের গালে ছাপ পড়ে। সেগুলোর কিনারা কালচে দেখায়। এই অংশগুলো শুকিয়ে যায় এবং পাতা ঝরে পড়ে। ফুল আক্রান্ত হলে ফল ধরে না। আবার ফল আক্রান্ত হলে ফেটে যায়। ডাল ছাঁটাই এর পর বার্দোমিশ্রন ছিটালে উপকার পাওয়া যায়।

২০২২

ডাউনি মিলডিউ: এ রোগের আক্রমণে আঙ্গরের ভীষণ ক্ষতি হয়। আক্রান্ত হওয়ার পরেই রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতায় রোগ বেশি দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার উপরে সবুজ ছাপে এবং নিচে সাদা সাদা গুড়ো দেখা যায়। এগুলো ঘষলে উঠে যায়। আর্দ্রতা বেশি হলে রোগটি বেড়ে যায়। কচি পাতায় আক্রমণ বেশি হয়। বোর্দো মিশ্রন স্প্রে করে এদের দমন করা যায়।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কৌশল

বাংলাদেশে শীতের শেষে ফুল আসে এবং জুন-আগস্ট মাসে ফল পাকে। এই সময় বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ায় ফল মিষ্টি হয় না। রোগ ও পোকার আক্রমনে ফল নষ্ট হয়। ফলে তালোর নিয়ম হলো গাছের ফল নাড়া দিলে ২/১ টা ফল পড়ে যায় । সেই সময় গুচ্ছটি কাচির সাহায্যে কেটে নিতে হবে। গুচ্ছ গুলো একই সঙ্গে না পাকায় ফল সংগ্রহ কয়েক দিন ধরে চলে। জাত ও স্থানের উপর ফলন নির্ভর করে। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে। ফল পাকার সহজ লক্ষণ হলো। ফলের গায়ের সাদা আবরণ ধীরে ধীরে মিশে যায় এবং চকচকে দেখা যায়।

ফল সংরক্ষণ (Fruit preservation): জাত অনুসারে হিমাগারে ০° সে থেকে ২০ সেঃ তাপমাত্রায় ৮৫-৯০% আর্দ্রতায় ৪-৬ সপ্তাহ রাখা যায়। গাছ হতে ফল সংগ্রহের পর ঠিকমত গুদামজাত করলে ১৫-৪০ ভাগ ফল নষ্ট হয়। এই অপচয় বন্ধ করতে গাছ থেকে ফল পাড়ার ৪ দিন পূর্বে ফলের গায়ে ০.২ শতাংশ ক্যাপটেন প্রে করতে হবে।

লটকন (Latkan) চাষাবাদ কৌশল

এটা বাংলাদেশের একটি বুনো ফল। এদেশে লটকা বা লটকন নামে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এটি লটকা বা নটকা ফল নামে পরিচিত। তবে জানা গেছে যে চীন দেশেও এ ফলটির চাষাবাদ রয়েছে এবং সেখানেও এ ফলটি লটকা নামেই পরিচিত। ছোট গালাকার ফলের ভিতরে থাকে অম্ল মধুর শাস। শাসের মধ্যভাগে তিন চারটি মাংসাল বড় বীজ থাকে এবং খেতে খুবই সুস্বাদু। লটকন খুব কম গুরুত্বপূর্ণ ফল হওয়ায় এই ফলের চাষের বিকাশে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষনা করা হয় নাই। ঢাকার আশেপাশে গাজীপুর, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, কিশারেগঞ্জ, টাঙ্গাইল এলাকায় এর চাষ বেশি হয়। বাংলাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় দেশের সর্বত্রই এই ফল চাষের সুযোগ রয়েছে। ফলটির নতুন জাত উদ্ভাবন এবং উন্নতির দিকে লক্ষ্য দিলে ভবিষ্যতে জনপ্রিয় ফল হিসাবে বিস্তার লাভ করার সুযোগ রয়েছে।

মাটি ও জমি নির্বাচন

লটকন গাছ যে কোন মাটিতে হতে পারে। তবে উঁচু বা মাঝারি উচু সুনিষ্কাশন ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর বেলে দোআশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। এই গাছের অম্লমাটি সহনশীল ক্ষমতা রয়েছে। গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। রৌদ্রো উজ্জল উন্মুক্ত জায়গায় বা আংশিক ছায়াযুক্ত জায়গায়ও লটকনের চাষ করা যায়।

গাছ রোপণের জন্য জমি তৈরি, গর্ত তৈরি ও সার প্রয়োগ

চারা রোপণের আগে জমি ভালো ভাবে চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও অসমতল জমি সমতল করে নিতে হবে। জমি প্রস্তুত হলে চারা লাগানোর স্থানগুলো কাঠি পুতে চিহ্নিত করতে হবে। গাছ বসানোর একমাস আগে থেকে নির্দিষ্ট আকারের গর্ত তৈরি করে নিতে হবে। প্রতি গর্তের মাপ হবে ৬০ সেঃমিঃ×৬০ সেঃমিঃ×৬০ সেঃমিঃ। প্রতি গর্তে ঝুরঝুরে মাটির সঙ্গে ১৫-২০ কেজি গোবর সার, ২কেজি কাঠের ছাই, ৫০০ গ্রাম হাঁড়ের গুড়া মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ফেলে রাখতে হবে।

২০২২

চারা রোপণ পদ্ধতি (Method of planting)

গর্তের মাঝখানে চারা বসিয়ে সেচ দিতে হবে। গোড়ার মাটি একটু উচু করে দিতে হবে। চারা রোপণের পর বাঁশের ঠেকনা দেওয়া দরকার হয়। ৩০ সে:মি: লম্বা চারা রোপণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

চারা রোপণের সময় (Time of planting)

বর্ষাকাল জুলাই-আগষ্ট মাসে চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এর আগে বা পরে চারা রোপণ করা যায়। তবে সে জন্য সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অর্থাৎ সেচের ব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই চারা রোপণ করা যায়।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

উপরি সার প্রয়োগ: এই ফলের গাছের সারের বিশেষ চাহিদা নেই। ভালো ফলনের জন্য এবং চারা সতেজ করার জন্য সার প্রয়োগ প্রয়োজন। বর্ষার আগে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিয়ে গাছ প্রতি ১৫ কেজি গোবর সার, ২ কেজি কাঠের ছাই, ২০০ গ্রাম হাড় গুড়া, তার সঙ্গে ১০০ গ্রাম এনপিকে (১০:২৬:২৬) মিশিয়ে দিতে হবে। এর পর পর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত বড় গাছের জন্য প্রতি বছর ফুল আসার আগে ২০ কেজি গোবর সার ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম ফসফরাস ও ১০০ গ্রাম পটাশ গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচ: গোড়ার মাটিতে সব সময় উপযুক্ত রস থাকা প্রয়োজন। চারা ছোট অবস্থায়, গরমের সময়ে ও সার প্রয়োগের পর সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

ডাল পালা ও ফল ছাঁটাই: শুকনা রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা কেটে দেওয়া ছাড়া তেমন যত্নের প্রয়োজন হয় না। বেশি ফল ধরলে ফলের থাকো থেকে কিছু ফল ছিড়ে হালকা করে দিলে অবশিষ্ট ফলের আকৃতি বড় হবে। গাছের নিচে সাথি ফসল চাষে অসুবিধা আছে কারণ লটকন গাছ বেশ ঝাপালো ধরনের হয়ে থাকে।

পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন

লটকন শক্ত ধরনের গাছ। এ গাছে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। মাঝে মাঝে পাতা খাওয়া পোকার আক্রমণ হয়। এ পোকা দমনে বি এইচ সি ৫০% গুড়ো, পানিতে গুলে ছিটালো উপকার পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

আগস্ট মাসে ফল পাকে। ফলের থোকায় রং ধরা শুরু করলে থাকো সমেত ফল পেড়ে ঝুড়িতে রাখা হয়। ঘরের গরম জায়গায় ফল রাখলে পেকে যায়। ফলের গায়ে আঘাত বা ঘষা লাগলে খোসার গায়ে কালচে দাগ পড়ে। ফলের মান কমে যায়। বীজের গাছ ৬-৭ বছর থেকে ও কলমের গাছ ৩-৪ বছর থেকে ফল দেয়া শুরু করে। ৮-১০ বছরের ভালো গাছ থেকে ২০০-২৫০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

ফল সংরক্ষণ ও আলো বাতাস চলাচল করে এমন শুকনো স্থানে মাচানের উপর রাখলে অল্প সময়ের মধ্যে
২০২২ সংরক্ষণ করা যায়।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আঙ্গুরের কয়েকটি জাতের নাম লেখ ?

২। এক বছর বয়স্ক আঙ্গুর গাছে কয়টি মুকুল রেখে বাকিগুলো হেঁটে দিতে হয় ?

৩। আঙ্গুর গাছে অ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমনে কি ব্যবস্থা নেয়া হয় ?

৪। আঙ্গুরের রস শোষক পোকা দমনে ব্যবহার যোগ্য কীটনাশকের নাম লেখ।

৫। লটকন গাছ রোপণের উপযুক্ত সময় কখন (মাসের নাম) ?

৬। ফলন্ত লটকন গাছে প্রতিবছর কী পরিমাণ গোবর, টিএপি এবং এমওপি সার প্রয়োগ করা দরকার ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। লটকনের জমি ও মাটি নির্বাচন এবং গর্ত তৈরি সম্পর্কে লেখ।

২। লটকনের অন্তর্বর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

৩। আঙ্গুর সংগ্রহ ফল সম্পর্কে লেখ।

৪। আঙ্গুরের জাতসমূহ লিপিবদ্ধ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। আঙ্গুরের জমি ও মাটি নির্বাচন জমি তৈরি এবং চারা রোপণ কৌশল বর্ণনা করা

২। আঙ্গুর চাষে বাউনি দেওয়া ও ঘঁটাই সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৩। আঙ্গুর গাছে সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

৪। লটকনের চাষাবাদ কৌশল বর্ণনা কর।

৫। আঙ্গুরের পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমন কৌশল সম্পর্কে লেখ।

২০২২

ষোড়শ অধ্যায়

ফল বাগানে সাথী ফসল চাষাবাদ

কোন জমিতে প্রধান ফসলের সাথে অন্য কোন ফসল চাষ করার প্রক্রিয়াকে আন্তঃফসল চাষ আর অতিরিক্ত যে ফসল চাষ করা হয় তাকে সাথী ফসল বলে। মাথাপিছু আবাদি জমির স্বল্পতা, মাটির উর্বরতা, কৃষকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা, জনসংখ্যাধিক্য, সহজলভ্যতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ফলের বাগানে সাথী ফসল চাষের জন্য খুবই উপযোগী। আমাদের দেশে ফল বাগান করলে প্রাথমিক ভাবে বেশ কয়েক বছর লেগে যায় ফল পেতে এবং সম্পূর্ণ জায়গা পূরণ করতে। এই সময় যদি বাগানে আতফসলের চাষাবাদ করা যায় তবে বেশ কিছু টাকা আয় করা যায়। তাছাড়া বাগানে আগাছা জন্মে না। লিগুম জাতীয় আনতফসল চাষ করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ভুমি ক্ষয়রোধ হয়। আচ্ছাদন জাতীয় সাথী আন্তঃফসল চাষ করলে বাগানের আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। ফল বাগানে আফসল চাষ করতে গেলে ফসল নির্বাচনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সাথী ফসল যেন বাগানের মাটিকে অনুর্বর ও অনুৎপাদনশীল করে না তুলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সাথী ফসল নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য বিষয়াবলি

সাথী ফসল নির্বাচন ও চাষ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

১। সাথী ফসল কোন সময়ই মূল বা প্রধান ফসলের সাথে পানি ও খাদ্য উপাদানের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না।

২। সাথী ফসল বাগানে পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের উৎস হিসেবে কাজ করবে না।

৩। সাথী ফসল মূল ফসলের জন্য আন্তঃপরিচর্যা, প্রুনিং, সেচ, ঔষধ ছিটানো, সার প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না।

৪। মূল ফসলের ফুল ফল ধারণে সাথী ফসল কোন ক্ষতি করবে না।

৫। সাধারণভাবে সাথী ফসল হিসেবে বহুবর্ষজীবী ফসল অপেক্ষা একবর্ষজীবী বা কম সময়ের ফসলকে প্রধান্য দেওয়া উচিত।

৬। সাথী ফসল কোন সময় প্রধান ফসলের ফুল, ফল ধারণ, বৃদ্ধি ও পরিপক্বতা এবং গুণগত মানের ক্ষতি করবে না।

৭। ফল বাগান থেকে আগাম অর্থিক সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাথী ফসল চাষ করা হয় সেহেতু সাথী ফসল হিসেবে তুলনামূলকভাবে দামি ফসলকে নির্বাচন করতে হবে। এ জন্য স্থানীয় বাজারের চাহিদা ও দামের ওপর নির্ভর করে সাথী ফসল নির্বাচন করা উচিত।

৮। সাধারণভাবে লিগিউম বা সীম জাতীয় ফসলসহ যাদের ভালো বাজার মূল্য আছে সেগুলোর চাষ করা উচিত। কারন সীম জাতীয় ফসল আর্থিক সহায়তার সাথে সাথে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমান বাড়ায়।

৯। সাথী ফসল মূল ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কেটে ফেলতে হবে। আমাদের দেশে স্বল্পমেয়াদি ফল বাগানে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজী, তেল ও ডালজাতীয় ফসলের চাষ করা হয়। অন্য দীর্ঘ মেয়াদী ফল বাগানে স্বল্পমেয়াদি ফল গাছ যেমন- পেঁপে, কলা, আনারস, লেবু, আতা, শরীফা ইত্যাদি ফলের চাষ করা হয়।

সাথী ফসল আবাদের পদ্ধতি

বাগানে সাথী ফসল বা আন্তঃফসল চাষ করতে হলে সাথী ফসলের বৈশিষ্ট্য ও ফল বাগানে গাছের বৃদ্ধি বা বাড়ন্ত অবস্থা লক্ষ্য করে সাথী ফসল আবাদের জন্য নির্বাচন করতে হয় । সাথী ফসল যাতে বাগানের মাটিকে অনুৎপাদক বা অনুর্বর না করে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আবাদ করতে হয় । দীর্ঘমেয়াদি ফল বাগানে কী ধরনের সাথী ফসল করা যাবে সেগুলোর সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো:

আবাদের জন্য সাথী ফসলের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে ফসলগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন ক) অধিক সূর্যালোক পছন্দকারী- কলা, পেঁপে, পেয়ারা, টমেটো, মরিচ, বেগুন, বীট, গোল আলু, গাজর, লেটুস, পালংশাক, মুলা, পেয়াজ ইত্যাদি

খ) মাঝারী সূর্যালোক পছন্দকারী - লেবু, আনারস, ডালিম, পেয়ারা, জামরুল, জাম্বুরা, করমচা, স্ট্রবেরী, মিষ্টি আলুশাক, কলমিশাক ইত্যাদি ।

গ) কর্ম সূর্যালোক পছন্দকারী -- আদা, হলুদ, মানকচু, ওলকচু, মেটে আলু ইত্যাদি ।

বাগানে নতুন অবস্থায় উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে কয়েক বছর সূর্যালোক ও মাঝারি সূর্যালোক পছন্দকারী ফসল সাথী ফসল হিসেবে সফলভাবে জন্মানো যায় । পরবর্তীতে ফল গাছ লাগানোর জমিতে ছায়া পড়ে গেলে কম সুর্যালাকে জন্মিতে পারে এমন ফসল গুলো চাষ করা উচিত । স্বল্পমেয়াদি কলা, পেঁপে, ডালিম, জামরুল ইত্যাদির সাথে ডালজাতীয়, সরিষা, মুলাশাক, লালশাক, ডাটাশাক, কলমীশাক, ধনেপাতা, ইত্যাদি স্বল্পমেয়াদি ফল বাগানে সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যায় । স্বল্পমেয়াদি ফলও বাগানে চাষ করা যাবে । এমনকি স্বল্প মেয়াদী ফল গাছ গুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ফল বাগানে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যাবে ।

প্রধান মূল জাতীয় প্রধান ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসেবে গুচ্ছ মূল জাতীয় ফসল নির্বাচন করতে হবে । যেমন পেয়ারা, ডালিম, কমলা, নাশপাতি ইত্যাদির সাথে পিয়াজ, লেটুস, গিমাকলমী, ইত্যাদি । তবে দীর্ঘমেয়াদী প্রধান মূলজাতীয় প্রধান ফসলের সাথে স্বল্পমেয়াদি প্রধান মুল জাতীয় ফসল কোন কোন ক্ষেত্রে জন্মানো যায় । যেমন আম, কাঁঠাল, লিচু, জামের সাথে ডালিম জামরুল পেঁপে ইত্যাদি । গভীর মুলজাতীয় ফসলের সাথে অগভীর মূলজাতীয় ফসল নির্বাচন করতে হবে । যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, ইত্যাদির সাথে কলা, আনারস পেঁপে ইত্যাদি । সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যেতে পারে ।

কলা, পেঁপে, ডালিম, পেয়ারা, শরিফা, আতা, জামরুল, লেবু, ইত্যাদির সাথে লালশাক, গালে আলু, মুলা, পটল, মিষ্টি আলু, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী বা বহুবর্ষজীবী ফসলের সাথে স্বল্পমেয়াদি বা এক বর্ষজীবী ফসল নির্বাচন করতে হবে । যেমন- আম, জাম, কাঁঠাল লিচু ইত্যাদির সাথে কলা, পেঁপে, আনারস, স্ট্রবেরি, বেগুন ইত্যাদি ।

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে ফলবাগানে সাথী ফসল চাষ করা হলে দেশের ফলের ঘাটতি পূরণ করে কৃষকের আর্থিক অস্বচ্ছলতা দূর করা যায় । মাটির উর্বরতা রক্ষার লক্ষ্যে ফলের বাগানের খালি জমিতে আগাম ফসল করে বেশি লাভ করা যায় এবং লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় ।

সাথী ফসল চাষে জমির সদ্ব্যবহার ও আর্থিক সুবিধা

ফল বাগানে গাছ লাগানোর পর এর পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য বেশ কিছু সময়ের দরকার হয়। এই অন্তর্বর্তী সময়ে দু গাছের মাঝখানের জমি খালি থাকে। এ খালি জমিতে অস্থায়ী ফসল লাগিয়ে বাগান থেকে বেশ কিছু আগাম অর্থ উপার্জন করা যায়। এই অস্থায়ী ফসলটি হলো সাথী ফসঙ্গ। বাংলাদেশে মাথা পিছু জমির স্বল্পতা, মাটির উর্বরতা, কৃষকের আর্থিক অচ্ছলতা, জনসংখ্যাধিক্য, সহজলভ্যতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ফলের বাগানে সাথী ফসল চাষের জন্য খুবই উপযোগী। আমাদের দেশে ফল বাগানের সাথী ফসল চাষের বিশেষ সুযাগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। কারন যে কোন দীর্ঘমেয়াদি ফলের বাগান করলে প্রাথমিক ভাবে বেশ কয়েক বছর লেগে যায় ফল পেতে এবং সম্পূর্ণ জায়গা পূরণ করতে। এই সময় যদি বাগানে আন্তঃফসলের চাষ করা যায় তবে কিছু টাকা আয় করা যায়। যার দ্বারা কৃষক বা সুবিধাভাগী অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পারে। যেমন- কলা ও পেঁপে বাগানে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি সরিষা ও ডাল জাতীয় সাথী ফসলের চাষ করা হয়। অপর দিকে দীর্ঘমেয়াদি ফল গাছের..সাথী ফসল চাষের ফলে বাগানে আগাছা জন্মাতে পারে না। লিম জাতীয় আতঃ উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ভুমি ক্ষয় রোধ হয়। আচ্ছাদন জাতীয় সাথী আন্তঃফসল চাষ করতে গেলে ফসল নির্বাচনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সাথী ফসল যেন বাগানের মাটিকে অনুর্বর ও অনুৎপাদক করে না তুলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছকে জমির সদ্ব্যবহার ও আর্থিক সুবিধার জন্য ফল বাগানে চাষযোগ্য সাথী ফসলের বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক্র:নং	প্রধান ফসল	প্রধান ফসলের প্রাথমিক পর্যায়ে আবাদযোগ্য ফসল	প্রধান ফসঙ্গের শেষ পর্যায়ে আবাদযোগ্য সাথী ফসল
১	ফল বাগান	সব ধরনের সবজি	আনারস, আদা, হলুদ, ধনিয়া ও ছায়ায় জন্মাবে এমন সবজি
২	কলা বাগান	লতানো সবজি ব্যতীত যে কোন স্বল্প মেয়াদি সবজি	কিছুই না
৩	পেঁপে	লতানো সবজি ব্যতীত যে কোন স্বল্পমেয়াদি সবজি	কিছুই না
৪	নারিকেল ও আম	কলা, লেবুজাতীয় ফল	আদা, হলুদ
৫	কলা, পেঁপে	লেবু, আনারস ইত্যাদি ফল জাতীয় গাছকে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়	

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। লিগুম জাতীয় আন্ত ফসল চাষ করলে জমির কিকি উপকার হয় ?

২। দীর্ঘমেয়াদি ফল বাগানে রোপণযোগ্য স্বল্পমেয়াদি ফল গাছের নাম লেখ।

৩। কম সূর্যালোক পছন্দকারী কয়েকটি সাথী ফসলের নাম লেখ।

৪। এক বর্ষজীবী কয়েকটি ফসলের নাম লেখ ?

৫। ফল বাগানে কি কি সাথী ফসল আবাদ করা যাবে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সাথি ফলের চাষ বলতে কী বোঝায় ?

২। সাথী ফসল ও ফসল পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩। সাথী ফসল চাষের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন।

১। সাথী ফসল নির্বাচনের নিয়মাবলি লেখ।

২। সাথী ফসল আবাদের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

৩। সাথী ফসল চাষে জমির সদ্ব্যবহার ও আর্থিক সুবিধা সম্পর্কে লেখ।

৪। ছকের মাধ্যমে ফল বাগানে চাষকৃত সাথী ফসলের বর্ণনা কর।

সপ্তাদশ অধ্যায়

অফলন্ত গাছকে ফলবতী করতে করণীয় ধাপগুলো

গাছ ফল দেয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পরও যদি একেবারে অথবা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ফল না দেয় তাহলে সেই গাছকে অফলন্ত গাছ বলা হয়। অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের প্রক্রিয়াসমূহ আলোচনা করার আগে ফলন্ত ও অফলন্ত গাছ কী এবং ফল না ধরার কারণ কী তা আমাদের জানা উচিত।

ফলন্ত গাছ কোন গাছ নিদৃষ্ট বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি পরিমিত ফুল ও ফল ধারণ করে এবং ফুল সগ্রহ পর্যন্ত ফল বহন করে তখন তাকে আমরা ফলন্ত গাছ বলি। গাছে ফুলের মুকুল বিকশিত হওয়ার পর তা প্রস্ফুটিত হয় এবং পরাগায়ণ ও নিষিক্তকরণের পর ফুলের গর্ভাশয় স্ফীত হয়ে ফলে পরিণত হয়। ফলন্ত গাছে শুধু পরিমাণ। মত ফুল ফলই ধরে না, ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত তা বহন করে। এটি ফলন্ত গাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা দেখি অনেক গাছে প্রচুর পরিমাণ ফুল ও ফল ধরে। কিন্তু সেই ফল পরিপক্ব হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। এ ক্ষেত্রে গাছটিকে ফলন্ত বলা যাবে না। কারণ গাছটি যে ফল বহন করেছিল তা পরিপকৃতার আগেই ঝরে পড়েছে এবং তা চাষীর কোন কাজেই লাগেনি।

অফলন্ত গাছ - কোন গাছ ফল দেয়ার বয়সে উপনীত হওয়ার পর যদি ফল না দেয়, ফুল, ফল ঝরে পড়ে, কম পরিমাণ ফল ধারণ করে অথবা অনিয়মিত ও ত্রুটিযুক্ত ফল দেয় তখন সেই ফল গাছকে আমরা অফলন্ত গাছ বলি।

ফল না ধরার কারণ

গাছে ফলোৎপাদন ঠিকমত হয় না বা ফল ধরে না- এরুপ সমস্যা প্রায়ই দেখা যায়। এ অবস্থার পেছনে নানা কারণ থাকতে পারে। বিভিন্ন কারণগুলোকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা-

ক) অভ্যন্তররীণ কারণ ও খ) বাহ্যিক কারণ

ক) অভ্যন্তররীণ কারণ (Internal factors)

বিভিন্ন গাছে যে অভ্যন্তররীণ সমস্যার কারনে ফল ধারণে বিলম্ব হয় বা আদৌ ফুল ও ফল হয় না বলে ধারণা করা হয় সে সমস্যা গুলো হলো

১। ফুলের অসম্পূর্ণতা (Imperfect flower)

২। অসম স্ত্রী কেশর

৩। ফুলের পুং ও স্ত্রী কেশরের পূর্ণতার সময়ের অমিল

৪। পুষ্প কুঁড়ির পতন

৫। পরাগ রেণুর হীন বলতা

৬। শংকরায়নজনিত বন্ধ্যাত

৭। বংশগতিজনিত অসংগতি

৮। রেণু নলের ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্তি

৯। গাছের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যোপাদানের জটিলতা

১০। কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের অনুপাতে অসামঞ্জস্য

১। ফুলের অসম্পূর্ণতা: অধিকাংশ ফলের গাছে ফুল সম্পূর্ণ থাকলেও কতগুলি গাছ একাবাস পুষ্পী (Monoceious) এবং কতগুলি গাছ ভিন্নবাস পুষ্পী (Diocious) হয়ে থাকে। একলিঙ্গ ফুলের বেলায় একটি ফুলে অপর ফুলের পরাগ রেণুর সাহায্যে পরাগায়ন হয়ে থাকে। খেজুর, তাল, পেঁপে, ডুমুর, জাপানি পার্সিস, মাস্কাডিন আঙ্গুর এবং স্ট্রেবেরী এর উদাহরণ। কোন কোন কারনে স্ত্রী পুষ্পের কাছাকাছি পরস্পর অবস্থান না থাকলে পরাগায়ণ ও গর্ভধারণ সম্ভব হয় না।

২। অসম গ্রী কেশর (Heterostyle): অনেক সময় উভয়লিঙ্গ ফুল হওয়া সত্ত্বেও গভদণ্ড ছোট এবং পুংকেশর বড় হয় অথবা বিপরীত ধরনের হতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্বপরাগায়নে ব্যাঘাত ঘটে এবং ফল ধারণে সমস্যা দেখা দেয়। উদাহরণ- কাঁঠাল।

৩। ফুলের পুং ও মস্ত্রী কেশরের পুর্নতার সময়ে অমিল: কোন কোন পুংকেশর গ্রীকেশর অপেক্ষা আগে পূর্ণতা লাভ করে অথবা বিপরীত ঘটনাও ঘটে। এক্ষেত্রে স্বপরাগায়নের ব্যাঘাত ঘটে। উদাহরণ- নারিকেল, এ্যাভাকোডো, শরীফা ইত্যাদি।

৪। পুষ্প কুঁড়ির পতন: অনেক গাছে অনেক সময় পুষ্পকুঁড়ি ফোটার আগে ফুল ঝরে যায়। উদাহারণ-টমোটো, আঙ্গুর, বিলাতী বেগুন ও স্টবেরি ইত্যাদি।

৫। পরাগরেণুর হীন বঙ্গতা: কোন কোন গাছের ফুলে পরাগরেণুর উৎপাদন হয় অতি সামান্য এবং অধিকাংশ রেণু অকেজো হয়। এক্ষেত্রে কিছু কিছু ফল ধরেও তা বীজশূন্য হয়। উদাহারণ- মাস্কাতে জাতের আঙ্গর।

৬। শংকরায়নজনিত বন্ধ্যত্ব: দুটি অতি দূরবর্তী জাতের মধ্যে শংকরায়ন ঘটলে এটি স্বপরাগায়নে অসমতা ঘটাতে পারে। কখনও কখনও সংকর শ্রেণির গাছে ধনিষেকী অপেক্ষো অধিক পরনিকেষী ধরনের হতে পারে।

৭। বংশগতজনিত অসংগতি: এমন কিছু ফল গাছ আছে যার ফুল নিজের রেণু বা একই জাতের অন্য গাছের রেনু দ্বারা পরাগয়িত হয় না উদাহরণ- বাদাম, আপেল, নাশপাতি ইত্যাদি।

৮। রেণুনলের ধীর বৃদ্ধি: ফুলের গর্ভমুণ্ডে রেনু পতিত হওয়ার পর গর্ভদণ্ডের ধীর বৃদ্ধি ও ডিম্বকের মাথেমিলিনে বিলম্ব হলে ফল ধারণ বিঘ্নিত হতে পারে। উদাহারণ- নাশপাতি পীচ, পাম ইত্যাদি।

৯। গাছের অভ্যরস্থ খাদ্যোপাদানের জটিলতা: আভ্যন্তরীণ খাদ্যাবস্থা বহু ক্ষেত্রেই গাছের ফলোৎপাদনের দুর্বলতা কিংবা অসমর্থতার জন্য দায়ী। ফল গাছে পুষ্পবস্থায় সময়ের আগে বা পরে অভ্যন্তরস্থ খাদ্যোপাদান স্বাভাবিক না থাকলে বহু ফুল ঠিকমত পরাগায়ণে ব্যর্থ হয়।

১০। কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের অনুপাত: গাছের কায়িক বৃদ্ধি ও ফলাৎপাদন ক্ষমতোক প্রভাবান্বিত করে। শুধু পরিমাণই নহে, বরং এদের পরিমাণের অনুপাত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। খুব ভাল ফলন পেতে হলে কার্বোহাইড্রেট অধিক পরিমাণে এবং নাইট্রোজেন কিছু কম পরিমাণে এরূপ অনুপাতে থাকা দরকার।

(খ) বাহ্যিক কারণ (External Factors)

অনেক সময় ফলের গাছ বড় হওয়ার পরও ফুল ধারণ করে না। আবার বয়ক গাছও নিয়মিত এবং আশানুরুপ পরিমান ফুল উৎপাদন করেন। এ সকল ক্ষেত্রে গাছের অভ্যন্তররীণ কারণের পাশাপাশি কিছু বাহ্যিক কারণ দায়ী।

বাহ্যিক কারণগুলো যথা—

১। উত্তাপ ২। আলো ৩। আর্দ্রতা ৪। কুয়াশা ৫। বৃষ্টিপাত ৬। বায়ুবেগ ৭। গাছ বা জমির অবস্থান ৮। ঋতু ৯। গাছের খাদ্য সরবরাহ ১০। গাছের বয়স ও প্রান শক্তি ১১। অঙ্গছাঁটাই ১২। কলম করা ১৩। রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ ১৪। জন্ম ত্রুটি ইত্যাদি।

১। উত্তাপ (Texamprature): অতিরিক্ত উত্তাপে ফুল ঝরে যেতে পারে, ফুলের গর্ভমুণ্ড শুকায়ে যেতে পারে, গর্ভমুণ্ডের আঁঠালো ভাব নষ্ট হতে পারে ইত্যাদি। বেশি ঠান্ডায় মৌমাছি মৌচাক ছেড়ে কোথাও যেতে চায়না, ফলে পরাগায়ণ ঠিকমত হয় না। অধিক ঠান্ডায় কলা, পেঁপে, ইত্যাদি গাছে ফল ধরা ব্যাহত হয়।

২। আলো (Light): ছায়াময় স্থানে প্রায় সকল গাছের ফলন কম হয়। দিনের দৈর্ঘ্য কম বেশি হলে আলোর তারতম্য ঘটে। ফলে টমেটো, স্ট্রোবেরী ইত্যাদির ফল ধরা বিঘ্নিত হয়।

৩। আর্দ্রতা (Humidity): মাটিতে রসের আধিক্য এবং বাতাসে কম আর্দ্রতায় ফল ঝরে যেতে পারে। বাতাসে বেশি আর্দ্রতায় আপেল ঝরে যায়। মাটিতে রসের অভাব হলে আম, লিচু, ইত্যাদি ঝরে যায়।

৪। কুয়াশা: আম ও লিচুর ফুল আসার সময় বেশি কুয়াশা পড়লে ফুল ঝরে যায়। অনেক যফলের ক্ষেত্রেই অধিক কুয়াশায় ফল ঝরে যায়।

৫। বৃষ্টিপাত (Rainfall): অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাতে ফুলের প্রাগরেণু ও গর্ভমুন্ডের আঁঠা ধুয়ে যায়। রেণু ফুলে ফেঁপে মোটা হয়ে বৃষ্টির সময় ফেটে যায় পরাগায়নে সাহায্যকারী পোকামাকড়ের ক্রিয়া লাপ কমে যায়।

৬। বায়ুবেগ (Wind Velocity): বায়ু জোরে প্রবাহিত হলে ফুলের ক্ষতি হয়। কেননা পরাগরেণু বেশি দূরে ছড়ায়ে যায়, উপকারী পাকামাকড় চলাচল ব্যাহত হয়।

৭। গাছ ও জমির অবস্থান: হয়তো স্থানীয় উত্তাপ, আর্দ্রতা, আলো এবং মাটির খাদ্যোপাদনের কারণে বরিশাল এলাকায় আমড়া, পেয়ারা, নারিকেল ভালো হয় অথচ অন্যস্থানে সুবিধাজনক হয় না। অনুরূপ রাজশাহী ও দিনাজপুরে আম ও লিচু ভালো হয়। অন্যত্র ভালো হয় না।

৮। ঋতু: শীতকালে পেঁপে, কলা ইত্যাদি কম টিকে এবং ফল ছোট হয়। আবার আম লিচুর প্রথমভারের অপেক্ষা শেষের দিকের ফুলে বেশি স্বপরাগায়ন হয়।

৯। গাছে খাদ্য সরবরাহ (Nutrient Supply): মাটিতে সঠিক পরিমাণের বেশি গাছের খাদ্যোপাদান থাকলে ফল উৎপাদন ব্যাহত হয়। আবার মাটিতে গাছের খাদ্যোপাদানের অভাবে গাছ দুর্বল হয়ে ফুল ও ফল ধারণে অসুবিধা হয়। অক্টোবর - নভেম্বর মাসে আমগাছে বেশি পরিমাণ ইউরিয়া সার দিলে ফল ধারণে সমস্যা হয়। অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করা হলে ফুল দেরিতে হয় এবং গাছে পোকা মাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়। গাছে ফুল হওয়ার সময় বা ৭-১০ দিন আগে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করা হলে ফল টিকে থাকা অনেক গুণে বেড়ে যায়।

১০। গাছের বয়স ও প্রাণশক্তি: (Age and vigour of plant): কম থাকলে বয়সী নারিকেল, পেঁপে, সুপারি, আঙ্গুর ইত্যাদি গাছে প্রচুর ফুল ধরে ঝরে যায়। গাছে আবার অতিরিক্ত প্রাণশক্তি থাকলে দেরিতে ফুল আসতে পারে।

১১। অঙ্গ ছাঁটাই (Pruning): লিচু, জাম, আঙ্গুর, কুল ইত্যাদি গাছের অজ্ঞা ছাটাই করা না হলে ফল ধারণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। আবার গাছ ভেদে অতিরিক্ত অঙ্গ ছাটাই ফল ধারন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

১২। কলম করা (Grafting): কলম করার সময় আদি চারা (স্টক) সঠিকভাবে নির্বাচন করা না হলে পরবর্তীতে কলমের গাছে ফলন কম হতে পারে। কাজেই সঠিক ষ্টক আগেই নির্বাচন করতে হবে।

২০২২

১৩। রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ (nsects and Diseases): সাধারণত কীট ও রোগের আক্রমণে ফলন কমে যেতে পারে। আমের হপার পোকা আম গাছের সম্পূর্ণ ফুল ঝরায়ে দিতে পারে। থ্রিপসপোকা নাশপাতি, আপেল ইত্যাদির ফুল বিনষ্ট করে দেয়। লাল পিপড়া, ইদুর নারিকেল ফল নষ্ট করে দেয়।

১৪। ঔষধ ছিটানো (Spraying): গাছ পুষ্পিত হওয়ার কালে গাছে ঔষধ ছিটালে ফলনের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হতে পারে। ঔষধ সরাসরি রেণু কিংবা গর্ভমুণ্ডের অনিষ্ট করে, অথবা পরাক্ষেভাবে মৌমাছি কিংবা অন্যান্য রেনু বাহক কীটের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। আপেলে ক্রমাগত লাইম সালফার ছিটানোর ফলে ফলন প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়। সঠিক সময়ে সঠিক ঔষধ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

অফলত গাছকে ফলবতী করার কৌশল

উদ্ভিদের ফল ধারণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং বিভিন্ন অভ্যন্তররীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে জন্মগত ত্রটির কারণে নিখুঁত ফল পাওয়া যায় না। ফল গাছের অকলাৎপোদন সমস্যাকে তিনটি তরে ভাগ করা যায়। যথা-ক) ফল গাছে নিয়মিত ও যথাসময়ে ফুল না আসা খ) ফুলের পরাগায়ন ও নিষেকের প্রক্রিয়ায় ব্যর্থতা এবং গ) ফুল ঝরে পড়া। গাছে ফুল না হওয়ার সমগত সমস্যাকে সহজে বা স সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে আগে থেকে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিলে কিছু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এগুলো এড়ানো যেতে পারে এবং গাছকে ফবর্তী করা যেতে পারে। অফলন্ত গাছকে ফলবর্তীকরণের কয়েকটি পদক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হলো :

১। বিপরীত লিঙ্গের গাছ জন্মানো এবং কৃত্রিম পরাগায়ন- (Growing plants of opposite sex and artificial pollination): যে সব গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ভিন্ন ভিন্ন গাছে হয় যেমন তাল, খেজুর, পেঁষ্টে ক্ষেত্রে বাগানে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে স্ত্রী ও পুরুষ গাছ লাগিয়ে ফল না অসা ও সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ণ ঘটিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন- পেঁপে গাছে কৃত্রিম উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে ফল ধারণ করানো যায়।

২। অনেকগুলো গাছ একসাথে জনাননা (Growing mummerous plants): ফুলের মধ্যে অসমতা থাকলে বিভিন্ন ধরনের ফুলসমৃদ্ধ গাছ বাগানে জন্মাতে হয়।

৩। পরাগরেণু সরবরাহকারী গাছ লাগানো (Use of polinizer plants): একই জাতীয় গাছের মধ্যে স্বপরাগায়নে অসুবিধা হলে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতের গাছ লাগানো উচিত। স্বপরাগায়নে সুবিধার জন্য রেণু সরবরাহ করতে পারে এমন গাছের কলম করে দেয়া যেতে পারে।

৪। সুষম সার (Use of balance fertilizer): গাছের খাদ্য ও পুষ্টি যাগোন স্বাভাবিক রাখার জন্য নাইট্রোজেন, ফসরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, জিংক, বারেন ইত্যাদি সার সুষম মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত।

৫। কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেন উপযুক্ত অনুপাতে থাকা (Preserving correct CN Ratio): গাছে কার্বোহাইড্রেট ওনাইট্রোজেন সঠিক অনুপাতে থাকলে ফল বেশি ধরে। শিকড় হেঁটে বাকলা কেটে, ফল পাতলা করে, ধুয়া প্রয়োগে সার ও সেচ দিয়ে এবং পরিচর্যার মাধ্যমে এই অনুপাত সঠিক মাত্রায় আনা যায়।

৬। **শিকড় ঘেঁটে দেয়া (Root pruning):** বাগানে মাটি চাষ করে, গাছের গোড়া হতে কিছুদূর দিয়ে নালা কেটে বা চারদিকে ভাবে নালা কেটে শিকড় কমানো যায়। গাছে ফুল হওয়ার এক থেকে দুই মাস আগে মাটি শুকনা থাকা অবস্থায় বিভিন্নভাবে শিকড় ছোট দেয়া হয়। তবে এক থেকে দুই সপ্তাহ মাটি আলগা রেখে তারপর প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার মিশিয়ে শিকড় ঢেকে দিতে হয়। এর ফলে গাছে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং পাতায় খাবার তৈরি হয়ে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেড়ে যায়। পরবর্তী ফল ধরার জন্য যা সহায়ক হয়।

৭। **চক্রাকার বাকল কেটে দেয়া (Ringing):** গাছের প্রধান শাখাসমূহে বা কাণ্ডের গোড়ায় চক্রাকারে বাকল কেটে তুলে দেয়া হয়। এতে নাইট্রোজেন গ্রহণ ও বিভিন্ন অংশে কার্বোহাইড্রেট প্রেরণ ব্যাহত হয়। সাধারণত ৬ থেকে ১০ মাস বয়সের ডালে চক্রাকারে ২.৫ সে:মি: চওড়া করে বাকল তুলে ফেলে দেওয়া হয়। তবে বাকল চক্রাকারে কাটার সময় ১.২৫ সে:মি: এর বেশি চওড়া না হওয়াই উচিত। আর যে কাণ্ডে করা হবে তা গাছ বিশিষে ১০ সে:মি: এর কম ২৩ সে:মি: বেশি ব্যাস বিশিষ্ট না হওয়াই উচিত। এতে নাইট্রোজেন গ্রহণ ও তৈরি কার্বোহাইড্রেট গাছের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ বাধাগ্রস্ত হয়।

৮। **ফল পাতলাকরণ (Fruit thining):** কিছু কিছু ফল ছিড়ে পাতলা করে দিলে গাছে কার্বোহাইড্রেট জমা হতে থাকে। তাতে পরবর্তী বছর ফল ধারণে সহায়ক হতে পারে। এছাড়া ফল ছিড়ে পাতলা করার পরে গাছের অবশিষ্ট ফল বড় হতে পারে এবং ফলের গুণাগুণ বৃদ্ধি হতে পারে।

৯। **ধুয়া প্রয়োগ করা:** গাছের নিচে খড়কুটা পুড়িয়ে চুঙ্গির সাহায্যে গাছের কেন্দ্রীয় এলাকার ভেতর দিয়ে ধুয়ার প্রবাহ যেতে দিতে হয়। এর ফলে কার্বোহাইড্রেট ও নাইট্রোজেনের অনুপাত তাড়াতাড়ি সঠিক মাত্রায় আসে, যা ফল ধারণের কাজ ত্বরান্বিত করে।

১০। **ডালপালা ও পাতাছাটাই করা:** কোন কোন সময় গাছের খুব বেশি বাড়তি হলে শাখা প্রশাখা হেঁটে দিতে হয়। এতে গাছে ফুল ও ফল ধারণে সহায়ক হয়।

ছক- কয়েকটি ফলের ছাঁটাই সময় ও ছাঁটাইয়ের বৈশিষ্ট্য

ফলের নাম	ছাটাই সময়	ছাঁটাইয়ের ধরন বৈশিষ্ট্য
কুল	৭ মার্চ - এপ্রিল	বেশি করে ছাঁটাই (ভারী ছাঁটাই)
কাঁঠাল	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	ভিতরে ছোট ছোট ডালপালা ছাঁটাই (ফলের বোটাসহ পানি ডাল)
আঙুর	নভেম্বর- ডিসেম্বর	বেশি করে ছাঁটাই (ভারী ছাঁটাই)
নারিকেল	অক্টোবর- নভেম্বর	গাছের কেন্দ্রের কিছু ডাল ব্যতীত অন্যান্য ডালার জালিসহ পুরাতন ডালপালা (হালকা ছাঁটাই)
জাম	জুন - জুলাই	ফলের ডালপালা ছাঁটাই (হালকা ছাটাই)
পেয়ারা	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	ফলের ডালপালা ছাঁটাই (হালকা ছাটাই)
জামরুল	আগষ্ট - সেপ্টেম্বর	ফলের ডালপালা ছাঁটাই (হালকা ছাটাই)
লিচু	মে - জুন	ফলের ডালপালা ছাঁটাই (মাঝারি ছাটাই)

২০২২

১১। হরমোন প্রয়োগ (Hormone application): গাছে হরমানের অসাম্যতার জন্য ফুল - ফল ঝরে পড়ে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের হরমোন অত্যন্ত কম মাত্রায় গাছে প্রয়োগে ফুল ধারণ ত্বরান্বিত করে, ফল ঝরা রোধ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফলের আকৃতি বৃদ্ধি করে। নিচে কয়েকটি হরমোনের উদাহরণ দেওয়া হলো :
(i) NAA এর হালকা দ্রবণ ছিটিয়ে আনারসের ফলন বাড়ানো যায়।

(ii) এলাচী ও কাগজীলেবুতে ১০-১৫ পিপিএম ঘঅঅ প্রয়োগ করে ফল ঝরা কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানো যায়।

(iii) Planofox দ্বারা সিঞ্চন করে বিভিন্ন ফল ঝরা রোধ করে ফলের আকার বৃদ্ধি করে ফলন বাড়ানো যায়।

১২। শাখা নোয়ানো (Bending of branches): গাছের ডাল টেনে নোয়ায়ে রাখলে নোয়ানো শাখায় বহুপ্রশাখা জন্মায়। লেবু গাছের ডাল টেনে মাটিতে শোয়ায়ে মাটি চাপ দিলেও বহুশাখা প্রশাখা জন্মে। এই শাখা প্রশাখা বাড়ার ফলে বেশি করে ফল ধরে।

১৩। ভাল জাত ও ফলধারী গাছ রোপণ: যে সব জাতের গাছে বেশি করে ফল ধরে এবং ফলের গুণাগুণ ভাল সে সব জাতের গাছ রোপণ করা উচিত।

১৪। রোগ ও পোকামাকড় দমন: রোগও পোকার আক্রমণ হলে তাড়াতাড়ি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আম গাছের হপার, লিচুর মাইট ও নারিকেলের লাল পিপড়ার আক্রমণ ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস দ্বারা গাছ আক্রান্ত হলে বিশেষভাবে ফলন কমায়। এমনকি এগুলোর আক্রমণে গাছের সম্পূর্ণ ফুল ও ফল নষ্ট হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক অনুরূপভাবে ফুল ও ফলের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

প্রশ্নমালা

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফল গাছে ফল না ধরার কারণের ২টি শ্রেণি কী কী ?

২। কার্বোহাইড্রেট এবং নাইট্রোজেনের অনুপাতে অসামঞ্জস্য থাকলে তাকে কি ধরনের কারণ বলে?

৩। ফল না ধরার বাহ্যিক কারণগুলোর তিনটি উদাহরণ দাও।

৪। কোন কোন ফল গাছে ভারী ছাটাই দিতে হয় ?

৫। আনারস এবং লেবু গাছে ফলন বাড়ানোর জন্য কি হরমোন ব্যবহার করা হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অফলন্ত বা অফলাৎপোদক গাছ বলতে কী বোঝায় ?

২। গাছে উপযুক্ত বয়সে ফল ধরার পরও কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে ?

৩। সময়মত গাছ ফলবতী না হওয়া বা ফল না ধরার কারণগুলো কী কী ?

৪। অফলন্ত ও ফলন্ত গাছ কাকে বলে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অফলন্ত গাছকে ফলবতী করার পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।

২। সময়মত গাছে ফল না আসার বা ফল না ধরার কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।

৩। অফলন্ত ও ফলন্ত গাছ কাজে বলে? গাছ অফলন্ত হওয়ার কারণসমূহ তালিকা বধকর এবং অফলন্ত হওয়ার প্রধান প্রধান কারণ বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় পত্র, দশম শ্রেণি

ব্যবহারিক

অনুশীলনী- ১: ফলের পুষ্টি উপাদানের নাম ও পরিমাণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের তালিকা তৈরি করতে হবে। ফলের সহজলভ্যতা এবং ব্যবহারের ভিত্তিতে ফলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যাবে। পুষ্টি উপাদানের তালিকা মোতাবেক কোন ফলে কি পরিমাণ উপাদান পাওয়া যাবে তা নিরূপণ করা যাবে।

উপকরণ

১) বিভিন্ন প্রকার ফল

২) বিভিন্ন প্রকার ফলের পুষ্টি উপাদানের তালিকা

৩) ফল রাখার পাত্র এবং টেবিল

৪) ফল কাটার জন্য আরোলা চাকু, কাটা চামচ, চিনামাটি বা কাচের পাত্র

৫) কাগজ, কলম, স্কেল বা স্লাইড ক্যালিপার, নিক্তি, হ্যান্ড গাভস (হাত মোজা)

৬) পানি

কাজের ধাপ

১) সংগ্রহকৃত ফলগুলোর তালিকা তৈরি করতে হবে।

২) ফলের ওজন, আকার, আকৃতি ও রং ভালোভাবে দেখে পৃথক পৃথক ভাবে লিখতে হবে।

৩) ফলের ত্বকের মসৃণতা, পাকা বা কাঁচা লক্ষ করে তা লিখতে হবে।

৪) ফল একটা একটা করে কাটতে হবে।

৫) ফলের ভিতরে আহার উপযোগী অংশের ওজন নিতে হবে।

৬) ফলের কাটা অংশ চামচ দ্বারা নিয়ে টক বা মিষ্টতা পরীক্ষা করতে হবে।

৭) একটি একটি করে ফল কেটে ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত বিষয়গুলো খাতায় চার্ট আকারে লিখতে হবে।

৮) আহার উপযোগী অংশের পরিমাণ দেখে একটি ফলে কি পরিমাণ উপাদান থাকতে পারে তা নির্ণয় করতে হবে।

ফল	ফলের স্বাদ	ফলের রং	ফলের ওজন (গ্রাম)	ওজন (গ্রাম)	শতকরা হার

বিভিন্ন ফলের পুষ্টি মানের চার্ট তৈরিকরণ ও বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফলে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের পরিমানের চার্ট তৈরী।

২০২২

সারণি ও বিভিন্ন ফলের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রাম)

ফলের নাম	ক্যালসিয়াম মি.গ্রাম	ফসফরাস মি.গ্রাম	লৌহ মি.গ্রাম	ক্যারেটিন মি.গ্রাম	থায়মিন মি.গ্রাম	রিবেফ্লাবিন মি.গ্রাম	নয়সিন মি.গ্রাম	ভিটামিন সি মি.গ্রাম
আঙ্গুর	২০	২৩	০.৫	৩	০.০৪	০.০৩	০.২	১
আতা	১০	১০	০.৬	৬৭	-	০.০৭	০.৬	৫
আনারস	২০	৯	১.২	১৮	০.২০	০.১২	০.১	৯
আম(পাকা)	১৪	১৬	১.৩	২৭৪৩	০.০৮	০.০৯	০.০৯	১৬
আমড়া	৩৬	১১	৩.৯	২৭০	০.০২	০.০২	০.৩	১১
আপেল	১০	১৪	১.০	০	-	-	০	১
আমলকী	৫০	২০	১.২	৯	০.০৩	০.০৩	০.২	৬০০
কমলালেব	২৬	২০	০.৩	১১০৪	-	-	-	৩০
কলা	১৭	৩৬	০.৯	৭৮	০.০৫	০.০৮	০.৫	৭
কাগজিলেবু	৯০	২০	০.৩	১৫	০.০২	০.০৩	০.১	৬৩
কাঁঠাল	২০	৪১	০.৫	১১৭৫	০.৩	০.১৩	০.৪	৭
কুল	৪	৯	১.৮	২১	০.০২	০.০৫	০.৭	৭৬
খেজুর (শুক)	১২০	৫০	৭.৩	২৬	০.০১	০.০২	০.৯	-
গোলাপজাম	১০	৩০	০.৫	১৪৯	০.০১	০.০৫	০.৪	৩
তরমুজ	১১	১২	৭.৯	০	০.০২	০.০৪	০.১	১
নাশপাতি	৮	১৫	০.৫	২৮	০.০৬	০.০৩	০.২	০
লিচু	১৫	৪১	২.৪	০	০.০২	০.০৩	০.৫	৬
পেয়ারা	১০	২৮	১.৪	০	০.০৩	০.০৩	০.৪	২১২
পেঁপে (পাকা)	১৭	১৩	০.৫	.৬৬৬	০.০৪	০.২৫	০.২	৫৭
ফুটি	৩২	১৪	১.৪	১৬৯	০.১১	০.০৮	০.৩	২৬
বাতাবিলেবু	৩০	৩০	০.৩	১২০	০.০৩	০.০৩	০.২	২০
বেদানা	১০	৫০	০.৩	০	০.০৬	০.১০	০.৩	১৬
বেল	৮৫	৭০	০.৬	৪৫	.০১৩	১.১৯	০.১	৮
লিচ	১০	৩৫	০.৭	০	০.০২	০.০৬	০.৪	৩১
লেবু	৭০	১০	২.৩	০	০.০২	০.০১	০.১	৩৯
সফেদা	২৮	২৭	২.০	৯৭	০.০২	০.০৩	০.২	৬
শরীফা	১৭	৪৭	১.৫	০	০.০৭	০.১৭	০.৩	৩৭

উৎস: গোপালন, শাস্ত্রী ও বালসুব্রামানিয়াম

বিভিন্ন প্রকার ফলের ১০০ গ্রাম খাওয়ার উপযোগী অংশে ভিটামিন ও খাদ্য উপাদানের গড় পরিমাণ রান্না করা নয়) ।

ক্রমিক নং	ফলের নাম	শর্করা মি.গ্রাম	ভিটা-এ মি.গ্রাম	ভিটা-বি মি.গ্রাম	ভিটা-সি মি.গ্রাম	লৌহ মি.গ্রাম	ক্যালসিয়াম মি.গ্রাম
(১)	পাকা কলা	২৫	৪৩	০.১০	২৪	০.৯	১৩
(২)	পাকা আম	২০	৮৩০০	০.১০	৪১	১.৩	১৬
(৩)	পাকা কাঁঠাল	৯.৯	৭৬৩	০.১১	২১	০.৫	২০
(৪)	আম(পাকা)	৮.৩	১৭৫০	০.০৪	৫৬	০.৩	২০
(৫)	পেয়ারা	১৫.২	২৮০	০.০৫	১৪২	০.৯	২৩
(৬)	লেবু (কাগজি)	১০	১৫	০.০২	৬৩	০.৩	৯০
(৭)	আনারস	৬.২	৫০	০.১৭	২৬	০.২	১৮
(৮)	লিচু	১৩.৬	-	০.০২	৩১	০.৭	১০
(৯)	আমড়া	১৫	২৭০	০.০২	২১	০.৯	৩৬
(১০)	বেল	১৮.৮	৫৫	০.১৩	৮	০.৬	৮৫
(১১)	শরীফা	২০.৬	-	০.০৭	৩৭	১.৫	১৭
(১২)	আমলকি	৬.৯	৯	০.০৩	৬০০	১.২	৫০
(১৩)	জাম	১.৪	১২০	০.০৯	৬০	৪.৩	২২

অনুশীলনী- ২: ফল চাষের সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিরূপণ

ফল চাষের সমস্যাবলি ও সমাধানের তালিকা প্রতুতকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

অঞ্চল বিশেষে কী কী ফল উৎপন্ন হয় তা জানতে হবে। ফলের উৎপাদন ও ফলনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা, ফলের চাহিদা ও বাজার ব্যবস্থা, নার্সারী , ফল সংরক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে জরীপ করতে হবে। কৃষকদের আগ্রহ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, খাদ্যাভ্যাস, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে হবে।

উপকরণ

(১) ফল চাষের জন্য তথ্যাভিত্তিক চার্ট (চাষকৃত জমির পরিমাণ, ফলন, জমির প্রাপ্যতা ইত্যাদি)

(২) অঞ্চল ভিত্তিক বৃষ্টিপাত, মাটির কধুরতা ও মৃত্তিকা জরিপ ম্যাপ

(৩) কাগজ, কলম, বার্ডে, চক, ডাষ্টার

(৪) মাটি পরীক্ষার যন্ত্র , ঔষধ প্রয়োগ যন্ত্র , প্যাকিং সামগ্রী

(৫) উন্নত জাতের চারা, বাগান পরিচর্যার যন্ত্রপাতি, বই ইত্যাদি ।

কাজের ধাপ

(১) ফল চাষের সমস্যাগুলোর সার্বিক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এ জন্য ছক তৈরি করে জরীপ করতে হবে।

(২) ফল চাষে আর্থসামাজিক সমস্যার তালিকাগুলো পৃথকভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

(৩) ফল চাষে কারিগরি সমস্যাগুলো পৃথকভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

(৪) সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে।

২০২২

ক) আর্থসামাজিক সমস্যাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১) জমির স্বল্পতা

২) উন্নত বীজ বা চারা কলমের অভাব ।

৩) সার, সেচযন্ত্রপাতির মূল্য বেশি ও দুষপ্রাপ্যতা

৪) কীটনাশক ঔষধ ও প্রয়োগ যন্ত্রপাতির দুষ্প্রাপ্যতা

৫) কৃষকের দারিদ্রতা ও ঋণগ্রস্থতা,

৬) আর্থিক ঝুঁকির আশঙ্কা

৭) গতানুগতিক প্রথায় চাষাবাদ করা

৮) বাজারজাতকরণ সুযোগের অভাব

৯) ফসল বীমার প্রচলন না থাকা

১০) ফলের বাজার মূল্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ।

(খ) কারিগরি সমস্যাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

১) কৃষকের ফল চাষের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাব

২) মাটি ও আবহাওয়ার প্রকৃত তথ্য স্বল্পতা এবং

৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত পূর্বাভাস সময়মত প্রচারের ব্যবস্থা না থাকা

৪) ফল সংরক্ষণের জন্য হিমাগার ও পরিবহনে হিমায়িত গাড়ীর অভাব,

৫) ফল সংগ্রহ কৌশল, গ্রেডিং ও প্যাকিং পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব ।

ফল চাষের সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধান নিম্নোক্ত ভাবে করা যায়:

(১) সমবায় ব্যবস্থা চালু করা

(২) নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও দেশ বিদেশ হতে উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহ

(৩) সকলের জন্য কৃষি শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করণ

(৪) ঋণ সহজীকরণ ও বীমার ব্যবস্থা চালু করা ।

(৫) সার, বীজ, ঔষধ ও সেচ যন্ত্র সরবরাহ সহজ লভ্য ও নিশ্চিত করা

(৬) হিমাগার ও শিল্পকারখানা স্থাপন করা

(৭) প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান ও আবহাওয়া পঞ্জিকা প্রণয়ন

(৮) বাজার ব্যবস্থা ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন

(৯) ভাল কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা

(১০) শিক্ষিত যুবকদের বিভিন্নভাবে সুবিধা প্রদান

২০২২ (১১) বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক পদার্থের (সার, হরমোন) মূল্য কম করা ।

অনুশীলনী- ৩ঃ ফল চাষের জন্য বাগানের বিভিন্ন ধরনের নকসা তৈরি অনুশীলন

বিজ্ঞানসম্মত ফল বাগান স্থাপন করতে হলে বাগানে গাছ লাগানোর জন্য নকশা তৈরি করা অবশ্যই প্রয়োজন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফল বাগানের নকশা বা পরিকল্পনা করা হয়। এ পদ্ধতিগুলো হলোঃ- ১। আয়তকার পদ্ধতি ২।। বর্গাকার পদ্ধতি ৩। ত্রিভুজাকার পদতি ৪। ষড়ভুজী পদ্ধতি ৫। কুইনকাংশ পদ্ধতি ৬। সমঢাল পদ্ধতি এবং সিড়ি পদ্ধতি।

ফল গাছ চাষের জন্য নকসা তৈরি ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়।

বর্গাকার পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর নকশা ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়।

প্রাসঙ্গিক ভুথ্য

জমি সমতল কিনা তা প্রথমে জানতে হবে। কেননা পাহাড়ী জমিতে বর্গাকার, আয়তকার, ত্রিভুজাকৃতি বা ষড়ভুজী পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এছাড়া জমি সমতল অথচ জমির আইল আঁকাবাকা বা অসমান, সেক্ষেত্রে জমির ম্যাপ দেখে কাগজে প্রথমে নকশা করে নিতে হবে। জমির আইল আঁকাবাকা বা জমি অনিয়মিত আকারের হলে সে ক্ষেত্রে অনেক সময় গাছ হতে গাছের দূরত্ব পরিবর্তন করা প্রয়োজন হতে পারে।

উপকরণ

(১) সাদা কাগজ

(২) পেনসিল, রাবার

(৩) ত্রিকোণী (সেট ও মিটার স্কেল)

(৪) শক্ত খুঁটি বা কাঠি

(৫) মাপার ফিতা, রশি বা সূতলী

(৬) ফল গাছ রোপনের জন্য চিহ্নিত স্থানে স্থাপনের জন্য চিকন কাঠি।

কাজের ধাপ

(১) জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ নিতে হবে।

(২) এরপর কাগজে জমির নকশা মোতাবেক মাপ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(৩) কাগজে জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মোতাবেক লাইন টানতে হবে। এভাবে দুই দিকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ লাইন টানলে একটি আরেকটির উপর লম্ব তৈরি হবে। এভাবে জমির নকশা অনুযায়ী কাগজে জমির চারদিকের বাউন্ডারী বা সীমানা লাইন টানতে হবে।

(৪) এরপর বাউন্ডারী রেখা জমির ভিতর দিকে সারি হতে সারির দূরত্বের অর্ধেক দূরত্ব বাদ দিয়ে গাছ লাগানোর রেখা (মূল রেখা ও মুক্ত রেখা টানতে হবে।

(৫) এভাবে মুলরেখা টানার পর ঐ রেখার একপ্রান্ত হতে গাছ হতে গাছের যে দূরত্ব হবে তার দূরত্বের অর্ধেক দূরত্ব বাদ দিয়ে প্রথম গাছ লাগানোর চিহ্ন দিতে হবে। এরপর গাছ হতে গাছের যে দূরত্ব হবে তা পর পর চিহ্নিত করতে হবে।

(৬) মূল রেখা টানার পর এর সমান্তরাল করে সারি হতে সারির দূরত্ব চিহ্নিত করে লাইন টানতে হবে।

(৭) জমির কিনারা হতে মূলরেখা (সারি হতে সারির দূরত্বের অর্ধেক দূরত্ব বাদ দিয়ে) টানার পর ঐ সারিতে গাছ হতে গাছের দূরত্ব নিয়ম মোতাবেক চিহ্নিত করতে হবে। এ সকল চিহ্ন হতে লম্ব টানা হলে (মুক্ত রেখার) অন্যান্য সমান্তরাল রেখার ওপর যেখানে অতিক্রম করবে সেখানে চিহ্ন দিতে হবে।

(৮) মূল রেখার সমান্তরাল রেখার ওপর লম্বাভাবে অতিক্রম করা স্থানগুলো চিহ্নিত করে যাগে করলে এক একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি হবে।

(৯) এভাবে কাগজের নকশা অনুযায়ী জমির সীমনা হতে একদিকে গাছ লাগানোর জন্য সরল লাইন তৈরি করতে হবে। এই লাইনের সাথে অন্য লাইনের লম্ব তৈরির জন্য রশি নিয়ে ৩:৪:৫ অনুপাতে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর দুইদিকে রশির লাইন প্রসারিতি করলে একটি ৯০° কোণ তৈরি হবে। এই প্রসারিত লাইন জমির শেষ পর্যন্ত নিতে হবে। এখন দুইদিকের প্রসারিত লাইনে (গাছ হতে গাছ এবং সারি হতে সারি) গাছ লাগানোর দূরত্বে প্যানটিং বোর্ড বা খুঁটি পুতে চারা রোপনের স্থানগুলো চিহ্নিত করা যাবে।

(১০) রশির দুইদিকের লাইনের প্রতিটি চিহ্ন হতে পরস্পর লম্ব রেখা বরাবর রশি নিয়ে জমির অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে।

(১১) এভাবে উভয়দিকের পরস্পর লাইনের উপর হতে নেয়া রশির সংযুক্তি স্থানগুলোতে কাঠি পুতে চিহ্নিত করতে হবে। এই চিহ্নিত স্থানগুলো গ্রাফ পেপারে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের মত দেখাবে।

(১২) এভাবে সারা জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে মাঠে গাছ লাগানোরে স্থান চিহ্নিত করা যাবে।

(ক) বর্গাকার পদ্ধতিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয়

এ পদ্ধতিতে গাছ হতে গাছ এবং সারি হতে সারির দূরত্ব সমান থাকবে। কোন নির্দিষ্ট জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি (বর্গাকার বা আয়তকার পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর জন্য কেবল প্রযোজ্য): -

প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা = এক হেক্টর জমি (১০,০০০ বর্গ মিটার)। লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব×গাছ থেকে গাছের দূরত্ব।

উদাহরণ: আম গাছ রোপণের দূরত্ব ও সারি থেকে সারি ১০ মিটার এবং গাছ থেকে গাছ ১০ মিটার। তাহলে এক হেক্টরে কয়টি চারা লাগানো যাবে তা নির্ণয় কর।

আম গাছের সংখ্যা = ১০,০০০ বর্গ মিটার । ১০ মিটার×১০ মিটার = ১০০ টি

অর্থাৎ বর্গাকার পদ্ধতিতে এ হেক্টর জমিতে প্রতি হেক্টর ১০০ টি আমের চারা লাগানো যাবে।

উদাহরণ: কাঁঠাল গাছ রোপনের দূরত্ব ও সারি হতে সারি ১৫ মি. এবং গাছ হতে গাছ ১৫ মিটার তাহলে এক হেক্টর জমিতে কয়টি কাঁঠাল গাছ লাগানোর যাবে নির্ণয় কর।

হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা = ১০,০০০ বর্গ মিটার বা ১৫ মিটার×১৫ মিটার = ৪৪

অর্থাৎ বর্গাকার পদ্ধতিতে এক হেক্টর জমিতে ৪৪ টি (প্রায়) কাঁঠাল গাছ লাগানো যাবে।

(খ) আয়তক্ষেত্রে পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর নকসা ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়: এ পদ্ধতি বর্গাকার পদ্ধতির মতই। কেবল পাশাপাশি গাছ হতে গাছের দূরত্বের সাথে সারি বা সারির গাছের দূরত্বের প্রভেদ থাকবে। আয়তকার পদ্ধতিতেও একদিকের লাইনে গাছের দূরত্বের চিহ্ন এবং অপরদিকে সারির দূরত্বের চিহ্ন দিতে হয়। উভয় দিকের প্রসারিত লাইনের সংযুক্তি স্থানে কাঠি পুঁতে গাছ লাগানোর স্থান চিহ্নিত করা হয়।

উদাহরণ: কাঁঠাল বাগানে গাছ রোপনের দূরত্ব সারি থেকে সারি ১০ মিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮ মিটার। তাহাঙ্গে এক হেক্টর জমিতে কয়টি চারা লাগানো যাবে তা নির্ণয় কর।

প্রতি হেক্টর জমিতে গাছের সংখ্যা = এক হেক্টর (১০,০০০ বর্গ মিটার) । সারি থেকে সারির দূরত্ব×গাছ থেকে । গাছের দূরত্ব = ১০,০০০ মিটার । ১০ মিটার×৮ মিটার = ১২৫

অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ১২৫ টি কাঁঠাল চারা লাগানো যাবে ।

(গ) ত্রিভুজ পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর নকশা তৈরি ও গাছের সংখ্যা নির্ণয়

প্রাসঙ্গিক তথ্য: এ পদ্ধতিতেও মুক্ত রেখা ও মুক্ত রেখার সমান্তরাল রেখা এবং মুক্ত রেখার উপর লম্ব রেখা টানতে হবে । (বর্গাকার পদ্ধতির অনুরূপ)

উপকরণ

● বর্গাকার পদ্ধতির অনুরূপ ।

কাজের ধাপ

(১) প্রথমে বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় ১ থেকে ৫নং পর্যন্ত একই কাজ করতে হবে ।

(২) উভয় দিকের লাইন টেনে মুক্ত রেখায় গাছ হতে গাছের নির্ধারিত দূরত্বে (মাপ মোতাবেক) চিহ্ন দিতে হবে (প্রথম সারিতে বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় গাছ লাগানোর স্থানে চিহ্ন দিতে হবে) ।

(৩) সারি সংখ্যা বেজোড় হলে প্রতিটি বেজোড় সারিতে অর্থাৎ মুক্ত রেখা বা প্রথম সারির ন্যায় বেজোড় সারিগুলোতে চিহ্ন দিতে হবে ।

(৪) সারি সংখ্যা জোড় হলে প্রথম সারির দুই গাছের জন্য চিহ্নিত স্থানের মাঝ বরাবর প্রতিটি জোড় সারিতে মূল গাছের জন্য স্থান চিহ্নিত করতে হবে ।

(৫) প্রথম সারিতে দুটি চিহ্নিত স্থানের সাথে পরবর্তীতে জোড় সারিতে মাঝ বরাবর বা বর্গকার পদ্ধতির ন্যায় চিহ্নিত স্থান ধরে মাঝখানে যাগে হবে । এতে ৩টি গাছ মিলে একটি ত্রিভুজ সৃষ্টি করবে । তবে জোড় সারির এক প্রান্ত হতে গাছের জন্য প্রথম চিহ্নিত স্থানটি গাছ হতে গাছের দূরত্বের পূর্ণ দূরত্বে চিহ্ন হবে ।

(৬) নকশা অনুযায়ী বর্গাকার পদ্ধতির ন্যায় জমিতে সীমানা ও গাছ লাগানোর লাইন তৈরি করতে হবে । প্রথম সারির এক প্রাতে গাছ হতে গাছের রোপিত দূরত্বের অর্ধেক বাদ দিয়ে প্রথম চিহ্ন দিতে হবে । একই নিয়মে বেজোড় সারিতে চিহ্নিত করতে হবে । এতে সমস্ত বেজোড় সারিগুলোতে প্রথম সারির সাথে সমান্তরাল (লম্বভাবে টানা রেখার) সারিতে একই লাইন চিহ্নিত হবে । আর জোড় সারিগুলোতে প্রথম সারির দুগাছের মাঝ বরাবর চিহ্নিত হবে । জোড় সারিগুলো একান্তর সারি হিসেবে গণ্য হবে এবং এতে একটি করে গাছ কম হবে ।

গাছের সংখ্যা নির্ণয়

ত্রিভুজ পদ্ধতিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয় = (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা×মোট সারির সংখ্যা)-একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা ।

উদাহরণ: কোন জমির দৈর্ঘ্য ২০ মিটার এবং প্রস্থ ১৫মিটার । যদি ঐ জমিতে ৪ মিটার দূরে দূরে লাইন এবং ৩ মিটার দূরে দূরে গাছ লাগানো হয় তবে ঐ জমিতে মোট কতটি গাছ লাগানো যাবে ।

মোট লাইন সংখ্যা = জমির দৈর্ঘ্য: লাইনের দূরত্ব = ২০ মিটার ৪ মিটার = ৫টি । প্রথম লাইনে গাছের সংখ্যা = জমির প্রস্থ : গাছের দূরত্ব = ১৫ মি: ৩ মি: = ৫টি সুতরাং গাছের সংখ্যা = (৫×৫)- (৫-১-২) = ২৫-২ = ২৩টি অর্থাৎ মোট ২৩টি গাছ লাগানো যাবে ।

২০২২

উদাহরণঃ কোন নির্দিষ্ট জমিতে ১২মিটার দৈর্ঘ্যের ৭টি লাইন করা গেলে এবং প্রতিটি লাইনে ৪ মিটার দূরত্বে গাছ। লাগানো হলে ঐ জমিতে মোট কতটি গাছ লাগানো যাবে।

গাছের সংখ্যা = (১২৪×৭)-(৭-১২) একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা

= মোট সারির সংখ্যা-১:২

= (৩×৭)-৩=২১-৩= ১৮টি

অর্থাৎ মোট ১৮টি গাছ লাগানো যাবে।

অনুশীলনী- ৪: অফলবতী গাছকে ফলবতীকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গাছের ফল ধারণের উপযুক্ত বয়স হয়েছে কিনা এবং গাছের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি আছে কি না তা জানতে হবে। এমনকি গাছে পাকামাকড়ের আক্রমণ আছে কি না তাও জানতে হবে। এমনিভাবে মাটিতে রসের ঘাটতি, পরাগায়নের সমস্যা, তাপমাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য সগ্রহ করতে হবে।

উপকরণ

(১) বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ।

(২) বিভিন্ন ধরনের তথ্য (গাছের বয়স, মাটিতে রসের অবস্থা, পরাগায়ণের সুযোগ, তাপমাত্রা, মাটিতে পুষ্টি উপাদান ইত্যাদি)

(৩) প্রুনিং করাত, দা, প্রুনিং কঁচি বা সিকেচার

(৪) কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক

(৫) হরমোন

(৬) ঔষধ প্রয়োগের জন্য সিঞ্চনষত্র ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

(১) অফলবতী হওয়ার অভ্যন্তররীণ ও বাহ্যিক কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

(২) ফুলের মধ্যে অসংগতি আছে কিনা তা দেখতে হবে। যেমন পুংকেশর বড়, গর্ভদন্ড খুব ছোট, আবার গর্ভদন্ড বড়, পুংকেশর ছোট, ফুল একলিঙ্গ, পুংকেশর আগেই বের হয়ে পূর্ণতা লাভ করে, পুংকেশরে পরাগরেণু খুব কম ইত্যাদি।

(৩) ফুল ও ফল হওয়ার সময় বাধা সৃষ্টি করে এমন বাহ্যিক কারণগুলো দেখতে হবে। যেমন-শুষ্ক আবহাওয়া, প্রচন্ড তাপ, বাতাসের ঝড়াে গতি, গাছের অবস্থান খুব উচুতে বা নিচুতে, গাছের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, গাছে অতিরিক্ত ডালপালা গজানো, কীট ও রোগের আক্রমণ, অসময়ে এবং মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক প্রে করা, ফুল হওয়ার পর বৃষ্টিপাত হওয়া ইত্যাদি।

(৪) ফুল আসার আগে গাছের স্বাভাবিক বৃদি বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত মাত্রায় সারের উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে।

(৫) বংশগত কারণে অফলবতী হলে সে গাছ বাদ দিয়ে স্থায়ীভাবে অধিক ফলনশীল ভালজাতের গাছ লাগাতে হবে।

(৬) পরাগায়ণের সুবিধার জন্য মৌমাছি পালন ও হাতের সাহায্য পরাগায়ণ করতে হবে।

চিত্রঃ পর পরাগায়ন

(৭) উপরে ২নং ক্রমিকের বর্ণিত সমস্যা সমাধানের জন্য বিপরীত লিঙ্গের ও অনেকগুলো গাছ একত্রে লাগানো যেতে পারে।

(৮) গাছের দৈহিক বৃদ্ধি বেশি হলে জমি চাষ করে বা অন্য উপায়ে মূল ছাটাই করতে হবে। গাছের প্রধান শাখা বা কান্ডের গোড়ায় রিং আকারে বাকল কাটতে হবে। এই বাকল গাছ বিশেষে ১০ সেঃ মিঃ থেকে ১২ সেঃ মিঃ এর বেশি ব্যাসবিশিষ্ট কাটা যাবে না।

(৯) গাছে ফলের সংখ্যা খুব বেশি হলে ফল পাতলা করে দিতে হবে।

(১০) চিরসবুজ গাছের বেলায় ফল পাড়ার পর ছোট ছোট ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা ছাটাই করে দিতে হবে। এছাড়াও কোন কোন বিশেষ শাখা বৃদ্ধির জন্য অন্য শাখা প্রশাখা কেটে দিতে হবে। লিচু, পেয়ারা, কুল, আম, আমরুল, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল গাছে প্রজাতি ভেদে ভাল ফলনের জন্য কম বা বেশি অঙ্গ ছাঁটাই করতে হবে।

(১১) প্লানো ফিক্স প্যাটেন্ট হরমোন, ২-৪ ডি হরমোন সাধারণত প্রতি দশলক্ষ ভাগ পানিতে ১ থেকে ২০০ ভাগ হরমোন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

অনুশীলনী- ৫ঃ ফল সংগ্রহে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ফল বাগানের যথোপযুক্ত যত্নের উপর গাছের ফল ধরা, ফলের আকার বড় হওয়া ইত্যাদি বিষয় অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার ফলের সংগ্রহ পদ্ধতির ওপর ফলের গুণাগুণ ও ফল সংরক্ষণ সময়কাল নির্ভর করে। সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে ফল সংগ্রহ করা না হলে ফলের বিক্রয়মূল্য কমে যায় এবং ফল বেশি সময় ধরে সংরক্ষণ করা যায় না। ২০২৫

ফল সংগ্রহ: ফল পাকা অবস্থা পর্যন্ত গাছে রেখে সংগ্রহ করলে ফল সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছে। এতে রং ও আকৃতি ভাল হয় এবং স্বাদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। তবে ফল কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কতদূরে পাঠানো হবে, কতদিন রাখা হবে, রোগ, পোকামাকড়ের আক্রমণ, নিরাপত্তা,আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ফল সংগ্রহের সময় নির্ধারণ করতে হয়। গাছের আকার, ফলের বোটা শক্ত বা নরম, বাজারের চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ফল সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

ফজ সংগ্রহ পধতি: সতেজ ফুল সাধারণত দু'ভাবে তালো হয়। তবে অনেক সময় সাধারণ পদ্ধতি (নিচের ক ও খ) অপেক্ষা অন্য পদ্ধতিতেও ফল সংগ্রহ করা যায়। যথা

(ক) হাত দিয়ে তোলা/পাড়া

(খ) মেশিনের সাহায্যে তোলা/পাড়া

(গ) পশুর সাহায্যে তোলা/পাড়া

ফল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. ঝুড়ি (বাঁশের বা কাঠের)

২. চাকু, কাঁচি,

৩. সাকশন ক্যাপ

৪. লম্বা বা ছোট হাতাওয়ালা লাঠির মাথায় বাঁধা থলে,

৫. মই (সাধারণ বা ফোল্ডার)

৬. চটের বা রশির জালির দোলনা,

৭. পলিথিন, ক্যানভাস বা চটের ব্যাগ

৮. রশি বা দড়ি

ফল ব্যবহারের উদ্দেশের ওপর নির্ভর করে ফল সংগ্রহ পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়। যেমন-পাকা খাওয়া, জুস তৈরি, আচার বা চাটনি তৈরি, তরকারি খাওয়া বিদেশে রপ্তানি ইত্যাদি।

ফল সংগ্রহের জন্য ফলের বাগানে বা গাছের নিকট যেতে হবে। তারপর গাছের ফল পাড়ার উপযুক্ত হয়েছে কি না তা দেখতে হবে। ফল পরিপুষ্ট হলে ফল গাছের উচ্চতা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কিভাবে ফল সংগ্রহ করা যাবে।

ঝুড়ি

চাকু

কাঁচি

ঝুলানো ঝুড়ি

লাঠির মাথে বাঁধা থলে

মই

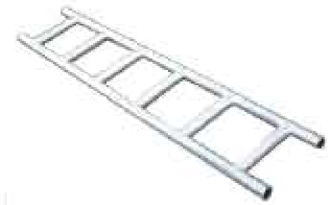

ঝুলানো জালি

চিত্রঃ ফল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরণের উপকরণ

আম সংগ্রহ

(১) আম হাত দিয়ে বা লম্বা লাঠির মাথায় জালি/থলে বেঁধে পাড়তে হবে।

(২) একজনে গাছ হতে আমের বোঁটা ছিড়ে দেবে। আর একজন নিচে বস্তা/থলে ধরে আমটিকে সরাসরি । মাটিতে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে মাটিতে গড়ায়ে দিবে।

(৩) গাছে উঠে চটের থলেতে আম ছিড়ে ভর্তি করে রশির সাহায্যে থলে ঝুলিয়ে নিচে নামিয়ে দিতে হবে।

(৪) গাছের পাশে মই দিয়ে দাঁড়ায়ে বা গাছে উঠে লম্বা লাঠির মাথায় ছুরি বা কঁচি বাঁধা লাঠি দিয়ে বোটা কেটে দিতে হবে। আর ঠিক তার নিচে মশারি টানানারে মত রশির জালি রাখলে তাতে আম পড়বে এবং আঘাত কম পাবে।

পেঁপে সংগ্রহ

(১) গাছ ছোট হলে হাতের নাগালের মধ্যে থাকা অবস্থায় হাতে হ্যান্ড গোভ পরে ফল পাড়তে হবে।

(২) গাছ লম্বা হলে মই দিয়ে উপরে উঠে বা লম্বা হাতাওয়ালা সাকসান কাপ-এর সাহায্যে পাড়তে হবে।

(৩) পেঁপে পাড়ার সময় যাতে ব্যথা না লাগে সেদিকে সর্তক থাকতে হবে।

কলা সংগ্রহ

(১) কলা পরিপুষ্ট হলে কলার কাঁদি একমুখ খোলা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

(২) কলার কাদির মাথার দিক হতে পলিব্যাগ পরায়ে দিয়ে খোলামুখ কাদির গোড়ার দিকে বেঁধে দিতে হবে।

(৩) এর পর কলার কাঁদি কাটার সময় গাছের নিকট দুজন যেতে হবে। একজন কঁদি কেটে দিবে এবং আর একজন নিচে দাঁড়ায়ে কাঁদি ধরবে।

(৪) গাছ বড় হলে কলার কাদির নিচে হুক আকারে বাধা বাঁশ দিয়ে ঠেকা দিতে হবে। তারপর কঁদি যে দিক ঝুলে আছে তার বিপরীত দিকে গাছের কাণ্ডে মাটি হতে ১০০ থেকে ১৫০ সে.মি. উপরে গাছের ব্যাসের ৩ ভাগের ২ ভাগ পরিমাণ স্থান অর্ধবৃত্তাকারে কেটে দিতে হবে। এখন ঠেকা দেয়া বাঁশের গোড়া আস্তে আস্তে দূরে সরানো হলে কাদি নিচে নেমে আসবে। এভাবে কঁদি নাগালের মধ্যে এলে তা ধরে নামানো যাবে।

কাঁঠাল সংগ্রহ

(১) গাছে উঠে বা নিচে থেকে ফলের বোটা গাছের কাণ্ড থেকে সামান্য রেখে কেটে নিতে হবে। ফল ছোট হলে এক হাতে বোঁটা ধরে অন্য হাতে চাকু বা কঁচি দিয়ে বোটা কাটা যাবে।

(২) কাঁঠাল বড় হলে এবং উঁচুতে হলে বোটার সাথে রশি বেঁধে গাছের কাণ্ডে রশি পেঁচ দিয়ে ফলের ঝুলন্ত ভারের সমতা আনতে হবে। তারপর রশির একমাথা ধরে ফলের বোটা কেটে দিতে হবে। এরপর রশি আস্তে আস্তে ঢিলা দিলে কাঁঠাল নিচে নেমে যাবে।

(৩) ফল পাকা অবস্থা হলে থলের মধ্যে কাঁঠাল ভর্তি করে থলের মুখে রশি বেঁধে ২নং ক্রমিকে বর্ণিত নিয়মে ফল পাড়তে হবে।

আনারস সংগ্রহ

(১) ছোট বাগান হলে ফলের বোটার নিচে কাণ্ড কেটে ঝুড়িতে সাজিয়ে আনা হয়।

(২) বড় বাগান বা পাহাড়ি এলাকার বাগান হলে ফল তুলে বেল্টের ঝুড়িতে সাজানো হয়। যান্ত্রিক উপায়ে বা হাতের সাহায্যে বেল্ট ঘুরায়ে দূরে নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো হয়।

লিচু সংগ্রহ

(১) লাঠির মাথায় তুকসহ বাঁধা থলিতে লিচুর গাছো ঢুকায়ে টান দিলে কিছুটা কাণ্ডসহ ভেঙ্গে আসবে।

(২) হাতের নাগালের মধ্যে হলে লিচুর গাছোসহ ধরে মাচেড় দিলে কিছুটা কাণ্ড সহ ভেঙ্গে আসবে।

(৩) লম্বা লাঠির মাথায় আংটার মত করে লাহোর বা কাঠের টুকরা বেঁধে লিচুর গাছোসহ ডালে বাধায়ে টান দিলে ডালসহ ভেঙে আসবে। এ সময় আংটায় বাধানা ভাঙা ডালসহ লিচুর গাছো কাছাকাছি এনে ঝুড়িতে রাখতে হবে।

নারিকেল সংগ্রহ

(১) নারিকেল ঝুনা হলে গাছে উঠে ছড়ার সাথে রশির একমাথা শক্ত করে বঁধতে হবে। রশির অপর মাথা গাছের মাথার সাথে পেঁচ দিয়ে ধরতে হবে। তারপর কাদি কেটে দিয়ে আস্তে আস্তে রশি ঢিলা করা হলে নিচে নেমে আসবে।

(২) নারিকেলের ছড়ার ভেতর দিয়ে প্যাঁচ দিয়ে রশির একমাথা গাছের মাথায় অর্থাৎ নারিকেলের ছড়ার উঁচুতে বাঁধতে হবে। এরপর রশির অপর মাথা কমপক্ষে ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে নিচে দূরে কোন খুঁটির সাথে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। এরপর ছড়ার গোড়া কেটে দিলে রশি বরাবর ছড়া গড়ায়ে নিচে চলে আসবে।

অনুশীলনী- ৬: ফল বাছাই অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ফল কি উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে ফল বাছাই করা হয়। আবার, চাটনি, জ্যাম, জেলি তৈরি করা হলে ফল ছোট বড় বাছাই করার প্রয়োজন হয় না। প্যাকিং করে দূরে পাঠানোর জন্য বড় এবং ছোট ফল একসাথে প্যাকিং করা হলে বড় ফলের চাপে ছোট ফল নষ্ট হতে পারে। তাই বড় এবং ছোট ফল বাছাই করে আলাদা আলাদা করতে হয়।

উপকরণ

(১) ফল বাছাই টেবিল

(২) ফল গ্রেডিং করার জন্য গ্রেডিং বিন

(৩) ফল রাখার ঝুড়ি বা বাক্স বা ট্রে

(৪) প্যাকিং কাগজ, হ্যান্ডগ্লোভ, পরিষ্কার তাজা পাতা, খড় ইত্যাদি

(৫) ফ্যান, ঠান্ডা ঘর বা খোলামেলা ছায়াযুক্ত স্থান

কাজের ধাপ

(১) ফল সংগ্রহ করার পর কাটা, ফাটা বা থেতলানোগুলো আলাদা করতে হবে।

(২) রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফলগুলো আলাদা করতে হবে।

(৩) ছোট, মাঝারি ও বড় ফলগুলো আলাদা আলাদা করতে হবে। (এ কাজ হাতের সাহায্যে বা গ্রেডিং বিনের সাহায্যে করা যায়)।

(৪) কাঁচা ও পরিপক্ব ফল আলাদা করতে হবে।

চিত্রঃ ফল রাখার ট্রে

চিত্রঃ ফল গ্রেডিং বিন

দ্রুত পচনরোধে ব্যবহার্য প্রযুক্তি

(১) গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফুল প্রায় ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গুদামে কিছুদিন রাখা

(২) হিমায়িত গাড়িতে পরিবহন করা

(৩) নিয়ন্ত্রিত গুদামে বাইরের বাতাস ঢুকানো

(৪) গুদাম ঘরে কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বেশি হলে প্রতিটন ফলের জন্য ১৪ থেকে ১৫ কেজি চুন (লাইম) গুদামে রাখতে হবে।

(৫) কলার মত ফল পলিথিন ব্যাগে ভর্তি করে বাইরে পাঠানো যায়

(৬) গুদামে বা প্যাকিং বাক্সে ১ থেকে ৫% অক্সিজেন ও কার্বনডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হলে ফল পচনকারী জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(৭) ফলের পঁচন রোধের জন্য ফলের গায়ে মোমের আবরণ দেয়া হয়।

(৮) ফলের পঁচন রোধে ফলের গায়ে সরিষার তেল দ্বারা প্রলেপ দেয়া হয়।

অনুশীলনী- ৭: ফল বাজারজাতকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্য

দেশের ভেতরে বা বাইরে তাজা অবস্থায় ফল প্রেরণ করার মৌলিক কাজগুলো একই ধরনের। যেমন

(ক) স্থানীয় বা আঞ্চলিক বাজারের বা দেশের বাইরের চাহিদা মোতাবেক গাছ থেকে ফল তালোর বয়স নির্ধারণ

(খ) গাছ থেকে ফল তালোর পর মাঠে ছায়াযুক্ত ঠান্ডা স্থানে ফল জড়ো করা

(গ) বৃষ্টি বা খারাপ আবহাওয়ার সময় ফল না পাড়া

(ঘ) ফল সংগ্রহ করে রোদ ছড়ায়ে না রাখা

(ঙ) সমতল স্থানে মাদুর বা তাজা পাতা বিছায়ে গদির মত করে তার উপর ফল রাখা

(চ) ফল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা ।

(ছ) কাটা, ফাটা, রোগ ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত ফল আলাদা করা

(জ) ছোট, মাঝারী ও বড় ফল আলাদা করে পৃথক পৃথক ঝুড়িতে বা প্যাকেটে প্যাকিং করা

(ঝ) মাঠ হতে নির্দিষ্ট স্থানে (বাজার, আড়ৎ, স্টেশন, ট্রাক স্ট্যান্ড, ঘাট, বিমান বন্দর) পরিবহন করা।

কাজের ধাপ

বাজারজাতকরণের পূর্বে স্থানের দূরত্ব, বাজারে ক্রেতার ধরন ও চাহিদার উপর নির্ভর করে ফলের গ্রেডিং ও প্যাকিং করতে হয়। গ্রেডিং ও প্যাকিং-এর উপর ফলের গুণগত মান অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বাজারজাতকরণের জন্য প্যাকিং

(১) নিরাপদ প্যাকিং করার জন্য ফল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

(২) ফলের গ্রেড অনুসারে পৃথক পৃথক প্যাকেটে ফল সাজাতে হবে,

(৩) ফল একের অধিক স্তরে সাজাতে হলে উভয় স্তরের মাঝে নরম গদির মত করে পাতা, কাগজ বা খড় কুটা দিতে হবে।

(৪) পরিবহন প্যাকেট বায়ুরোধী না হলে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৫) দ্রুত পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) হিমায়িত গাড়িতে পরিবহন করা হলে ফল অনেকটা নিরাপদ থাকবে।

বাজার তথ্য সংগ্রহ

(১) বেশি করে ফল উৎপাদন পরিকল্পনা থাকলে বাজারের পণ্য সরবরাহ ও চাহিদার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ ব্যাপারে বাজার কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

(২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বা পরিসংখ্যান বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে অঞ্চল বিশেষে ফল উৎপাদনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৩) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নকৃত হাটবাজারের ট্যারিফ সার্ভে তথ্য নেয়া যেতে পারে,

(৪) স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য আড়ৎ বা গুদামসমূহের হিসেব বিপণন বিভাগের নিকট হতে নিতে হবে।

(৫) ফড়িয়া বা দালালদের নিকট হতে ফল উৎপাদন ও বিক্রয় বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কেননা তারা স্থানীয়ভাবে ঘুরে ঘুরে পণ্য ক্রয় করে ও আড়তে পাঠায়। তারা যদি ব্যাংক হতে বা ধনী ব্যবসায়িদের নিকট হতে অগ্রীম টাকা পায় তাহলে ক্রয়ের ও বিক্রয়ের আগ্রহ এক ধরনের হবে। আবার নিজ পুঁজিতে ক্রয় ও বিক্রয় করে থাকলে আগ্রহ অন্য ধরনের হবে। যা বাজার দরের ওপর প্রভাব ফেলে।

বাজার তথ্য বিশেষণ

(১) ফল উৎপাদান ও চাহিদার পরিমাণ এবং বিক্রয় স্থানগুলোর অবস্থান এবং সুবিধা-অসুবিধা জানতে হবে।

(২) ফল পরিবহণ সুবিধা এবং প্রেরণকৃত স্থানসমূহের চাহিদা জানতে হবে,

(৩) বিভিন্ন ফল একইসাথে একই বাজারে বাজারজাতকরণ না করে বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা করতে হবে

(৪) উৎপাদান বেশি হলে বা বাজারে সরবরাহ বেশি হলে অতিরিক্ত ফল সংরক্ষণ করার সুবিধা আছে কিনা তা জানতে হবে,

(৫) ফল উৎপাদন অঞ্চলে উৎপাদিত ফলের জাতগুলোর তথ্য জানতে হবে। কেননা একই জাতের ফল বেশি লাগানো হলে সেগুলো একই সাথে উৎপাদিত হবে এবং একই সাথে বাজারে আসবে। যা বাজারমূল্যের ওপর প্রভাব ফেলবে।

ন্যায্য মূল্য বা উচ্চ মূল্য নিশ্চিতকরণ

(১) বাজারের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

(২) বিভিন্ন ধরনের ফলের উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। তারপর এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন হয় এমন ধরনের ফলের জাত নির্বাচন করতে হবে। উৎপাদন কারিদের নিয়ন্ত্রিতভাবে (সময় ও পরিমাণ) উৎপাদন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৩) উৎপাদকগণ এক সাথে যাতে বাজারে ফল না আনে সেজন্য প্রচার ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে

(৪) স্থানীয়ভাবে বা কেন্দ্রিয়ভাবে এলাকা ভিত্তিক ফল উৎপাদনের সঠিক তথ্য থাকতে হবে। যাতে বাজারে পণ্য সরবরাহের কর্মসূচি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়। সব এলাকায় যেহেতু সব ধরনের ফল উৎপন্ন একই সময়ে হয় না। সেহেতু উৎপাদন এলাকা হতে যেখানে চাহিদা আছে সেখানে সরবরাহের পরিমাণ নিরূপণ করে দেয়া যায়। এছাড়া পণ্য চলাচলের কর্মসূচি তৈরি করা যায়।

(৫) অতিরিক্ত পণ্য উৎপন্ন হলে বা বাজারে সরবরাহ বেশি হলে হিমায়িত গুদামে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাজারে সরবরাহ কমে গেলে তখন হিমাগার হতে সরবরাহ করতে হবে। ২০২২

(৬) প্রতি এলাকার জন্য সমবায় বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

(৭) প্রতিটি পণ্যের স্বীকৃত উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করে ন্যূনতম বিক্রয় মূল্য ধার্য করতে হবে। যাতে বাজারে সরবরাহ বেড়ে গেলেও উৎপাদনকারী সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

(৮) উৎপাদনকারীগণ পণ্য বিক্রয় না করে সমবায় বাজারে সরবরাহ দিয়ে গেলে সমবায় বাজার সে পণ্য বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তাতে কৃষকদের হয়রানি বন্ধ হতে পারে।

(৯) সমবায় বাজার উৎপাদক কর্তৃক সরবরাহকৃত ফল পরিষ্কার, গ্রেডিং ও প্যাকিং করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।

(১০) কৃষকদের ফল উৎপাদনে আগ্রহ বজায় রাখার জন্য উৎপাদন ও সরবরাহ বেশি হলে সে সময়ে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অনুশীলনী- ৮: ফলের বংশ বিস্তার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন

একটি গাছ থেকে অনুরূপ গাছের জন্ম লাভই গাছের বংশ বিস্তার অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছ যৌন কোষের সাহায্য নিয়ে বা সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র গাছ উৎপন্ন করে তাকে বংশ বিস্তার বলে। ফলে বংশ বিস্তার দু'ভাবে হয়ে থাকে--যৌন পদ্ধতিতে ও অযৌন বা অঙ্গজ পদ্ধতিতে। যৌন বংশ বিস্তার হলো ফুলের পুংকেশরের পরাগরেণুর সাথে ডিম্বাশয়ের ডিম্বানুর যৌন উপায়ে মিলনের ফলে উৎপাদিত বীজ থেকে চারা উৎপাদন পদ্ধতি। যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের সাধারণ কারণগুলো হচ্ছে (ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা উৎপাদন (খ) নতুন জাত উদ্ভাবন (গ) কলম করার জন্য স্টক গাছ তৈরি। কিছু কিছু গাছপালা আছে যেগুলো বীজ ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা যায় না, যেমন-তাল, নারিকেল, সুপারি। যৌন পদ্ধতিতে উৎপন্ন গাছ কষ্ট সহিষ্ণু হয় ও অনেক দিন বেঁচে থাকে কিন্তু এ পদ্ধতি থেকে উৎপাদিত গাছের ফলে মাতৃগুণ বজায় থাকেনা দেরিতে ফুল ও ফল ধরে। যৌন কোষ ছাড়া মাতৃগাছের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন গাছের জন্ম হয় তাকে অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার বলে। অযৌন বংশ বিস্তার বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে, কর্তন বা ছেদ কলমের মাধ্যমে দাবা, জোড় ও চোখ কলমের মাধ্যমে করা যায়। অযৌন বংশ বিস্তারের সুবিধা হচ্ছে মাতৃ গাছের অনুরূপ গুণাগুণ সম্পন্ন গাছ উৎপাদন করা যায় ও খুব তাড়াতড়ি ফল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে নতুন কোন জাত উদ্ভাবন করা যায় না।

ফল গাছের বংশ বিস্তার

যৌন বংশ বিস্তার পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বীজের সাহায্যে যে বংশ বিস্তার সাধিত হয় তাকে যৌন বংশ বিস্তার বলা হয়। যেমন নারিকেল, সুপারি, পেঁপে, আমড়া, তরমুজ, ফুটি, আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের বীজ থেকে বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে।

যৌন পদ্ধতিতে ফলের বংশ বিস্তারে দুটি ধারায় বা ব্যবস্থায় চারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে- ক) বীজতলা তৈরি করে বীজ সরাসরি বপনের মাধ্যমে চারা উৎপাদন খ) পলি ব্যাগে চারা উৎপাদন।

ক) বীজ তলায় চারা উৎপাদন পদ্ধতি অনুশীলন প্রয়োগ

জনীয় উপকরণ

১। বীজ (বিভিন্ন ফলের) ২। বীজ পাত্র ৩। খড়কুটা ৪। খুঁটি ৫। রশি ৬। চাটাই ৭। ঝাঝরি ৮। খুরপি ৯। বাঁশের কাঠি ১০। পানি ১১। সার (জৈব + রাসায়নিক) ১২। মাপার টেপ ১৩। কোদাল

কাজের ধাপ

● উপরে বর্ণিত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে।

● বীজ তলার জায়গাটি ভালোভাবে লাঙ্গল দিয়ে চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে সমতল করতে হবে।

● এবার বীজ তলার, বেড, ড্রেন ও নালা ইত্যাদি টেপ দিয়ে মেপে নিতে হবে। প্রতিটি বীজ তলা প্রস্থে ১ ১.৫ মিটার ও দৈর্ঘ্য ৩ মিটার বা ততোধিক হতে পারে। পাশাপাশি ২টি বীজ তলার মাঝে ৬০ সে:মি: জায়গা নালার জন্য এবং বীজ তলার চারদিকে ২৫ সে:মি: নিকাশ নালার জায়গা মেপে বাদ রাখতে হবে।

● এবার খুঁটি পুতে রশি টানিয়ে বীজতলার, নালা সাইজ করে নিতে হবে এবং ২ বেডের মাঝের নালা ও চারাপাশের নালা থেকে কোদাল দিয়ে মাটি তুলে বেড় উঁচু করে নিতে হবে।

● প্রতিটি বেডের জন্য ১০-১৫ কেজি জৈব সার ও ৩০ গ্রাম হারে ইউরিয়া,টি,এস,পি এম পি সার এবং অম্ল মাটির জন্য আরও ১২০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করে মাটি কুপিয়ে সার ভালোভাবে বেডের মাটির মাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

● রশি, খুঁটি সরিয়ে বীজ তলা সমতল করে, বীজপাত্র হতে বীজ নিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে সারি করে বীজ বপন করতে হবে। প্রজাতি ভেদে বীজের চাহিদা অনুযায়ী হাতে নড়াচাড়া করে বীজ মাটির নির্দিষ্ট গভীরতায় (২-৩ সে:মি:) বসিয়ে দিতে হবে। রস রক্ষার জন্য খড়কুটা দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে।

● বীজতলার উপর খুটি পুঁতে রশি ও চাটাই দিয়ে ছায়া প্রদান করতে হবে।

● বীজতলায় রস কমে গেলে ঝাঁঝরি দিয়ে বিকেলে হালকা সেচ দিতে হবে। চারা একটু বড় হলে দুপুরে ছায়া দিতে হবে। আগাছা সাবধানে হাত দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

● চারা দুর্বল ও লিকলিকে দেখালে বা কম বাড়ন্ত হলে প্রতি ঝাঝরি পানিতে ১-২ চা চামচ ইউরিয়া গুলে সেচ দিতে হবে। এভাবে যত্ন করে ফলের চারা উৎপাদন করতে হবে।

● মাঝে মাঝে সেচ বন্ধ রেখে চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়াতে হবে।

● যে সমস্ত ফলের বীজ দেরিতে গজায় যেমন-নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা, তালো, খেজুর ইত্যাদির ক্ষেত্রে চারা গজানোর পূর্বেই সেচ দিতে হবে।

সতর্কতা

● উই পোকার উপদ্রব থাকলে খড়কুটা ব্যবহার করা যাবে না।

● জমিতে'জো থাকা অবস্থায় বীজ বপন করতে হবে।

● বীজ বপনের পরপরই সেচ দেয়া যাবে না।

● নিড়ানোর সময় শেকড় যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২০২২

খ) পলিব্যাগে ফলের চারা উৎপাদন পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পলিব্যাগে চারা উৎপাদন একটি আধুনিক প্রযুক্তি বা তুলনামূলকভাবে সহজ ও সুবিধাজনক এতে চারার যত্ন ভালোভাবে নেয়া যায়। তাছাড়া চারা সহজে মরে না, চারা পরিবহণ এবং রোপণ করাও বেশ সহজ।

১। প্রয়োজনীয় উপকরণ

- পলিথিন ব্যাগ
- পঁচা গোবর
- দো-আঁশ মাটি
- টিএসপি/এমপি সার
- আবর্জনা পচা সার
- বীজ
- কোদাল
- ঝুড়ি
- ঝাঁঝরি
- মাটি চালুনি
- মাটি শোধনের ঔষধ
- পলির্থিন সিট ইত্যাদি

২। কাজের ধাপ

- প্রথমে দো-আঁশ মাটি, পঁচা গোবর, আবর্জনা পচা সার, টি,এসপি ও এমপি সার একত্রে ভালভাবে মিশিয়ে দেড় থেকে দুই মাস রেখে দিতে হবে।
- সার মেশানোর পূর্বে মাটিকে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। এর জন্য ২ ঘন্টা মাটিকে তাপ দিয়ে অথবা ১ লিটার ফরমালডিহাইডের সাথে ৫০ লিটার পানি মিশিয়ে তা মাটির উপর ছিটিয়ে দিয়ে পলিথিন সিট দ্বারা ২ দিন ঢেকে রেখে দিতে হবে।
- এরপর মিশ্রণযুক্ত মাটি চালুন দিয়ে চেলে পলিব্যাগ ভর্তি করতে হবে। পলি ব্যাগের নিচের অংশে পার্শ্বের দিকে ২টি ছিদ্র রাখতে হবে। ব্যাগের উপরে কিছু ফাঁকা রাখতে হবে যাতে পানি সেচ ও আন্তঃপরিচর্যায় সুবিধা হয়।
- প্রতি ব্যাগে 'জো' থাকা অবস্থায় নির্বাচিত গাছের ২টি করে বীজ বপন করতে হবে।
- নির্বাচিত নার্সারির স্থানে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১ মিটার প্রস্থের কয়েকটি বেড তৈরি করতে হবে।
- তারপর প্রতিটি বেড়ে উঁচু স্থানে লাইন করে পলিব্যাগগুলো সাজিয়ে রাখতে হবে।
- সাজানো পলিব্যাগের উপর চালা দিতে হবে যাতে বৃষ্টি বা রোদ অঙ্কুরিত চারার ক্ষতি না হয়।
- পলিব্যাগের উৎপাদিত চারায় প্রয়োজন মত ঝাঝরি দ্বারা পানি দিতে হবে ও আনতঃপরিচর্যা করতে হবে।
- পলিব্যাগে একাধিক চারা গজালে সুস্থ সবল চারাটি রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে।
- পলিব্যাগ থেকে চারার শেকড় বের হয়ে আসলে কাছি দ্বারা ছেটে দিতে হবে।
- চারায় রোগ বালাই দেখা গেলে দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সবশেষে কাজের ধাপসমূহ ব্যবহারিক খাতায় লিখতে হবে।

সতর্কতা

- পলিব্যাগের অতিরিক্ত পানি বের করার জন্য নিচের দিকে কয়েকটা ছিদ্র করে দিতে হবে।
- পলিব্যাগ থেকে বের হয়ে আসা শেকড় ও অতিরিক্ত ডালপালা কেটে দিতে হবে।
- রোপণ উপযাগী হলে চারা গুলো যথাযথসময়ে বিক্রির রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য চারপাশে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

২০২২

অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গাছের প্রতিটি কোষই নতুন গাছ সৃষ্টির কৌলতাত্ত্বিক উপাদান সমূহ ধারন করে। এজন্য একটি একক কোষ থেকেই নতুন একটি গাছের জন্ম হতে পারে। যৌন কোষ ছাড়া মাতৃগাছের অন্যান্য কোষ যেমন-কুঁড়ি, পাতা, ডাল, শিকড়, বাকল ইত্যাদি থেকে যে প্রক্রিয়ায় মাতৃগাছের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন গাছের জন্ম হয় তাকে অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার বলে। অযৌন বংশ বিস্তার বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে, কর্তন বা ছেদ কলমের মাধ্যমে, দাবা, জোড় ও চোখ কলমের মাধ্যমে করা যায়।

● শাখা কলাম ও গুটি কলম পদ্ধতি অনুশীলন

শাখা কলম পদ্ধতি অনুশীলন

১। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

- উন্নত জাতের মাতৃ গাছ
- সিকেচার
- ধারালো চাকু
- নার্সারি বেড়
- খুরপী
- কোদাল
- ছায়াযুক্ত স্থান

২। কাজের ধাপ

● শাখার অগ্রভাগ থেকে ১৫ সে:মি: বাদ দিয়ে নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে ৩টি পর্বসহ এক বছর বয়সের ২০-২৫ । সে:মি: দীর্ঘ একটি শাখা সিকেচারের সাহায্যে কেটে নিতে হবে।

● শাখার উপরের প্রান্ত পর্ব সন্ধির ২.০ সেমি উপরে গালে করে কর্তিত শাখার নিচের প্রান্ত পর্ব সন্ধির ঠিক নিচে ৩-৪ সে:মি: দীর্ঘ করে তির্যকভাবে কাটতে হবে।

● এক তৃতীয়াংশ মাটির উপরে ও দুই তৃতীয়াংশ মাটির নিচে রেখে মাটির সাথে ৪৫° কোন করে নার্সারি বেডে ছায়াযুক্ত স্থানে শাখা কলমটি রোপণ করতে হবে। অনুরূপ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা কলম তৈরি করে নার্সারি বেডে রোপণ করতে হবে।

সতর্কতা

● শাখা কলম রোপণের সময় অগ্রভাগ উপরে রেখে নিম্নাংশ মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

● নার্সারি বেড় অর্ধ ছায়াযুক্ত স্থানে হওয়া উচিত।

● নার্সারি বেডের মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক কিন্তু সুনিষ্কাশিত হওয়া প্রয়োজন।

গুটি কলম পদ্ধতি অনুশীলন

১। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

- উন্নত জাতের মাতৃগাছ
- সিকেচার
- ধারালো চাকু
- নার্সারি বেড়
- গোবর মিশ্রিত মাটি
- পানি
- পলিথিন ব্যাগ
- রশি

২০২২

২। কাজের ধাপ

● নির্বাচিত মাতৃগাছের ঝুলন্ত শাখার অগ্রভাগ থেকে ৩০-৩৫ সে:মি: দূরে পর্বসন্ধির ঠিক নিচে ৫-৭.৫ সে:মি: জায়গায় চাকু দিয়ে ক্যাম্বিয়াম সহ বাকল তুলে ফেলতে হবে।

● গোবর মিশ্রিত মাটি ও পানির সাহায্যে একটি গুটি তৈরি করতে হবে। কর্তিত অংশের উপরের পর্ব সন্ধি সহ চর্তুদিকে গুটি লাগিয়ে পলিথিন কাগজ দ্বারা পেঁচিয়ে গুটির উপরে, নিচে ও মাঝে রশি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে।

● অনুরুপ ভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুটি কলম করতে হবে। কলম করার ৩ মাসের মধ্যেই গুটি কাটার উপযুক্ত হবে। গুটি থেকে নিচের দিকে ৫ সে:মি: দূরে শাখাটি চক্রাকারে দুই থেকে তিন ধাপে কাটতে হবে। কাটার পর গুটি কলমটি ছায়াযুক্ত স্থানে নার্সারিতে খড় দ্বারা ঢেকে পানি ছিটিয়ে দিয়ে সপ্তাহ খানেক মাটির উপরে রেখে দিতে হবে। অতপর নার্সারি বেডে রোপণ করতে হবে।

৩। সতর্কতা

● কর্তিত অংশের বাকলের নিচে সবুজাভ ক্যাম্বিয়াম লেয়ার ভালোভাবে তুলে ফেলতে হবে। অন্যথায় গুটি কলম সফল হবে না।

● গুটি সব সময় আর্দ্র রাখতে হবে।

অনুশীলনী- ৯: শাখা কলম, জোড় কলম সংস্পর্শ জোড় কলম তৈরিকরণ পদ্ধতি অনুশীলন

শাখা কলম পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

শাখা প্রশাখার উপযুক্ত অংশ সমূহ মাতৃগাছ থেকে কেটে আলাদা করে অনুকূল পরিবেশে রেখে ও উপযুক্ত যত্ন নিয়ে তা থেকে মূল পলব গজিয়ে নতুন চারা গাছ তৈরি করাই হলো শাখা কলম। শাখা কলাম চার প্রকার যথা-শক্ত কাঠ শাখা কলম, আধাশক্ত কাঠ কলম, কচি/কোমল শাখা কলম/ও বীরৎ শাখা কলম।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

ক) উন্নত জাতের মাতৃগাছ
খ) সিকেচার
গ) আরোলা চাকু
ঘ) নার্সারি বেড
ঙ) খুরপী
চ) কোদাল
ছ) ছায়াযুক্ত স্থান

কাজের ধাপ

● শাখার অগ্রভাগ থেকে ১৫ সে:মি: বাদ দিয়ে নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে ৩টি পর্বসহ এক বছর বয়সের ২০ ২৫ সে:মি: দীর্ঘ একটি শাখা সিকেচারের সাহায্যে কেটে নিতে হবে।

● শাখার উপরের প্রান্ত ২.০ সে:মি: উপরে গোল করে ও কর্তিত শাখার নিচের প্রান্তে পর্ব সন্ধির ঠিক নিচে ৩-৪ সে:মি: দীর্ঘ করে তির্যকভাবে কাটতে হবে।

● এক তৃতীয়াশ মাটির উপরে ও দুই তৃতীয়াংশ মাটির নিচে রেখে মাটির সাথে ৪৫ কোন করে নার্সারি বেডে ছায়াযুক্ত স্থানে শাখা কলমটি রোপণ করতে হবে।

● অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা কলম তৈরি করে নার্সারি বেডে রোপণ করতে হবে।

২০২২

চিত্রঃ গুটি কলম পদ্ধতি অনুশীলন

সাবধানতা

১। শাখা কলম রোপণের সময় অগ্রভাগ উপরে রেখে নিম্নাংশ মাটিতে পুতে দিতে হবে।

২। নার্সারি বেড অর্ধ ছায়াযুক্ত স্থানে হওয়া উচিত।

৩। নার্সারি বেডের মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক কিন্তু সুনিষ্কাশিত হওয়া উচিত।

সংস্পর্শ জোড় কলম পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য

গাছের আদি জোড় ও উপজোড় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যখন একটি একক গাছ হিসাবে বৃদ্ধি লাভ করে তখন তাকে গ্রাট জোড় কলম বলে এবং এ জোড় লাগানোর প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় গ্রাফটিং বা জোড় কলম। জোড় কলম দু'ধরনের (ক) সংযুক্ত বা সংস্পর্শ জোড় কলম (খ) বিযুক্ত জোড় কলম। সংস্পর্শ জোড় কলম পদ্ধতিতে উপজোড়কে তার নিজস্ব মূলতন্ত্রের উপর বৃদ্ধিরত অবস্থায় আদি জোড় সংস্পর্শে এনে জোড়া লাগানো হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

- আদি জোড়
- উপজোড়
- সিকেচার
- ধারালো চাকু
- নাইলন স্ট্রিপ
- পলিথিন ব্যাগ রশি

কাজের ধাপ

● পলি ব্যাগে বীজ থেকে চারা তৈরি করতে হবে। এই চারা আদি জোড় হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

● কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছে উপজোড় নির্বাচন করতে হবে।

● নির্বাচিত উপজোড় ৫ থেকে ৭ সেঃমিঃ স্থানে লম্বালম্বি ভাবে কাঠসহ বাকল তুলে ফেলতে হবে। কর্তনের উভয় প্রান্ত আড়াআড়িভাবে এবং মধ্যাংশ একটু গভীর করে কাটতে হবে। কর্তিত স্থানটি মসৃণ করতে হবে।

● নির্বাচিত আদি জোড় সুবিধামত স্থানে উপজোড়ের অনুরূপ কর্তন দিয়ে আদি জোড় তৈরি করতে হবে।

● আদি জোড় ও উপজোড় একসাথে ভালোভাবে লাগিয়ে রশি দ্বারা শক্ত করে বেঁধে রাখতে হবে।

● মাস দুইপর জোড়স্থানের ৫ সেঃমিঃ নিচে মাতৃগাছ থেকে উপজোড় বিচ্ছিন্ন করে কলমটিকে নিচে নামিয়ে এনে নার্সারিতে লাগাতে হবে।

● কলমটিতে উপজোড় বৃদ্ধি শুরু হলে জোড়স্থানের ৫ সেঃমিঃ উপরে আদি জোড় কেটে ফেলতে হবে।

সতর্কতা

● আদি জোড় ও উপজোড় কর্তিত স্থান মসৃণ হতে হবে।

● আদি জোড় ও উপজোড় একসাথে বাঁধার পর মাঝখানে যেন কোন ফাঁকা না থাকে।

চিত্রঃ সংস্পর্শ জোড় কলম

ভিনিয়ার জোড় কলম পদ্ধতি অনুশীলন

১। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

- আদি জোড়
- উপজোড়
- সিকেচার
- ধারালো চাকু
- নাইলন স্ট্রিপ
- পলিথিন ব্যাগ
- রশি

কাজের ধাপ

- নার্সারি বেড়ে বা টবে বীজ থেকে চারা গাছ উৎপাদন করতে হবে। ৯ মাস থেকে শুরু করে ১৮ মাস পর্যন্ত বয়সের গাছকে আদি জোড় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে উপজোড় সংগ্রহ করতে হবে। উপজোড়ের পাতার বোঁটা ১ সে:মি: রেখে পাতাগুলো কেটে ফেলতে হবে।
- মাটি থেকে ২৫ থেকে ৩০ সে:মি: উপরে আদি জোড়ের ওপর লম্বালম্বিভাবে ৫/৬ সে:মি: তেরছাভাবে কাটতে হবে। উক্ত কর্তনের নিম্নপ্রান্তে ছোট তেরছা কর্তনের মাধ্যমে কর্তিত কাঠ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- উপজোড়ের নিম্নাংশে আদি জোড়ের অনুরূ প কর্তন দিয়ে উপজোড়টি তৈরি করতে হবে।
- পলিথিন ব্যাগ দ্বারা উপজোড়টি আবৃত করে আদি জোড়ের সাথে বেঁধে রাখতে হবে। আদি জোড় ও উপজোড় ভালোভাবে জোড়া লাগার পর (৫০-৬০ দিন পর) জোড়াস্থানের ২/৩ সে:মি: উপরে আদি জোড়টি কেটে ফেলতে হবে।

চিত্র: ভিনিয়ার জোড় কলম

৩। সতর্কতা

- দুই তিনদিন পরপর পলিব্যাগ খুলে ভেতরে জমাকৃত পানি ফেলে দিতে হবে।
- আদি জোড় ও উপজোড় একসাথে বাধার পর মাঝখানে যেন কোন ফাঁকা না থাকে জোড়স্থানের নিচে আদি জোড়ে কোন শাখা প্রশাখা জন্মাতে দেয়া যাবে না।

২২৭

অনুশীলনী- ১০: বাডিং বা কুঁড়ি সংযোজন পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য: বাডিং এমন এক প্রকার জোড় কলম যাতে শাখার পরিবর্তে পলবের কুঁড়ি বা চোখ (নঁফ) উপজোড় রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শীতের শেষে বসতে যখন গাছ বেশ সক্রিয়, রসপূর্ণ ও বর্ধনশীল হয়ে উঠে সে সময় অর্থাৎ মার্চ এপ্রিল মাস এর জন্য খুবই উপযোগী। চোখ কলমের জন্য প্রায় এক বৎসর বয়ক আদি জোড় নেয়া উত্তম। চোখ কলম ছয় ধরনের- ১। টি চোখ কলম ২। আই-চোখ কলম ৩। তালি চোখ কলম ৪। চক্র চোখ কলম ৫। কুচি চোখ কলম। ৬। ফোরকাট বা জিহ্বা চোখ কলম।

টি চোখ কলম (T-budding)

কুঁড়ি চোখ কলম বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহের মধ্যে একটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে উন্নত ডালের একটি মাত্র চোখ ব্যবহার করে নতুন গাছ উৎপন্ন করা হয়।

উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

১। আদি জোড় ও উপজোড়

২। বাডিং ছুরি

৩। দ্বিফলক বিশিষ্ট ছুরি

৪। নাইলন স্ট্রিপ বা সুতলি

কাজের ধাপ

১। নির্বাচিত আদি জোড় মাটি থেকে ২০-২৫ সেমি উপরে কাণ্ডের ওপর আড়াআড়ি ভাবে ১.৩ সে.মি/ পরিমাণ লম্বা কর্তন দিতে হবে। এ কাটা দাগের মাঝখানে থেকে নিচের দিকে ৪-৫ সে.মি. পরিমাণ আরেকটি লম্বালম্বি কর্তন দিতে হবে।

২। লম্বালম্বি দাগ বরাবর চাকু দ্বারা কাঠ থেকে বাকল আলগা করতে হবে।

৩। কাঙ্খিত মাতৃগাছ থেকে সুপ্ত কুঁড়িসহ একটি বাকল কেটে নিতে হবে। বাকলটিকে ঢালের মত করে তৈরি করে নিতে হবে।

৪। কুঁড়িসহ বাকলটি আদিজোড় কর্তিত অংশে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

৫। কুঁড়িটিকে বাইরে রেখে পলিথিন ফিতা দ্বারা বাকলটি আদি জোড়ের সাথে ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে।

৬। সংযোজিত কুঁড়িটি ২০-৩০ দিনের মধ্যে নতুন পলব ছাড়তে শুরু করবে। তখন জংলী ডালপালা গুলো ধীরে ধীরে কেটে দিতে হবে।

১ পৃথককৃত কুঁড়ি

২ পৃথককৃত কুঁড়িটি 'T' আকৃতিতে কাটা বাকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নাইলন স্ট্রিপ দিয়ে বাঁধা হয়েছে

৩ মূল আদিজোড়ে 'T' আকৃতিতে বাকল কাটা হয়েছে

৪ মূল আদিজোড় প্রস্তুত করা হয়েছে

৫ কাটি কলম থেকে কুঁড়ি পৃথক করা হয়েছে

চিত্রঃ টি চোখ কলম

সাবধানতা

১। বাঁধার সময় কুঁড়িটি যেন ঢাকা না পড়ে।

২। প্রস্ফুটিত কুঁড়ি ব্যবহার করা যাবে না।

তালি চোখ কলম অনুশীলন

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

- আদি জোড় ও উপজোড়
- বাডিং ছুরি
- দ্বিফলক বিশিষ্ট ছুরি
- নাইলন স্ট্রিপ

কাজের ধাপ

আদি জোড় নির্বাচিত করতে হবে এবং নির্বাচিত আদিজোড়ের যে কোন সুবিধাজনক স্থানে বর্গাকার বা আয়তকার বাকল তুলে ফেলতে হবে। কাঙ্খিত মাতৃ গাছ থেকে সুপ্ত কুঁড়িসহ আদিজোড় কর্তিত স্থানের অনুরূপ আকৃতির একটি বাকল তুলে এনে আদি জোড়ের কর্তিত স্থানে স্থাপন করতে হবে। কুঁড়িটি বাইরে রেখে পলিথিন ফিতা বা নাইলন স্ট্রিপ দ্বারা বাকলটিকে আদি জোড়ার সাথে ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে।

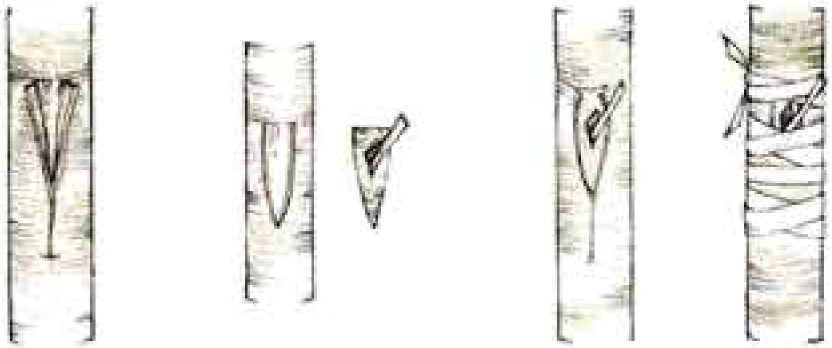

ক, উপজোড় থেকে আয়তাকারে কুঁড়িসহ বাকল তুলে আনা হয়েছে। খ. আদিজোড়ে আয়তাকারে বাকল তুলে ফেলা হয়েছে। গ. উপজোড় থেকে তুলে আনা কুঁড়িসহ বাকলটি আদি জোড়ে স্থাপন করা হয়েছে। ঘ. জোড়াকৃত কুঁড়িটি পলিথিন দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

চিত্রঃ তালি চোখ কলম

সতর্কতা

● সাইকেল স্ট্রিপ বাধার সময় কুঁড়িটি যেন ঢাকা না পড়ে।

● সাইকেল স্ট্রিপ প্রস্ফুটিত কুঁড়ি ব্যবহার করা যাবে না।

চক্র চোখ কলম পদ্ধতি অনুশীলন

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

● আদি জোড় ও উপজোড়

● কাঁচি ও ছুরি

● দ্বিফলক বিশিষ্ট ছুরি

● সাইকেল স্ট্রিপ

কাজের ধাপ

● সাইকেল স্ট্রিপ নির্বাচিত আদি জোড় বাকলের মত মোটা কচি ডালে ২.৫ সেঃমিঃ পরিমাণ বাকল গোল করে রিং-এর মত

করে তুলে ফেলতে হবে।

● সাইকেল স্ট্রিপ কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ থেকে সুপ্ত কুঁড়িসহ আদিজোড়ে কর্তিত স্থানের অনুরূপ আকৃতির একটি বাকল তুলে এনে আদি জোড়ের কর্তিত স্থানে স্থাপন করতে হবে।

● সাইকেল স্ট্রিপ কুঁড়িটি বাইরে রেখে পলিথিন ফিতা বা সাইকেল স্ট্রিপ দ্বারা বাকলটিকে আদি জোড়ের গায়ে ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে।

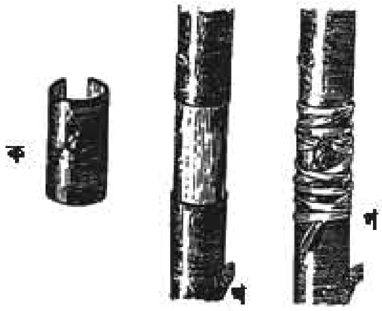

ক. আংটি আকারে কুঁড়িসহ বাকল উপজোড় থেকে তুলে আনা হয়েছে । খ, আদিজোড়ে গোলাকারভাবে আংটির মত বাকল তুলে ফেলা হয়েছে । গ, উপজোড়ের কুঁড়িসহ বাকল আদিজোড়ের উপর বসিয়ে নাইলন স্ট্রিপ দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে ।

চিত্রঃ চক্র কলম বা রাজিং

৩। সতর্কতা

ক) বাধার সময় কুঁড়িটি যেন ঢাকা না পড়ে খ) প্রস্ফুটিত কুঁড়ি ব্যবহার করা যাবে না ।

অনুশীলনী- ১১ঃ গর্তকরণ, গর্তে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

মাঠ ফসলের সাথে উদ্যান তাত্ত্বিক ফসলের মূল পার্থক্য হলো এই যে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের ক্ষেত্রে ভালোভাবে চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট আকারের গর্ত খনন করার পর গর্তে সার প্রয়োগ করে গাছ লাগানো হয় ।

উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

● কোদাল	● খন্তা/শাবল
● পঁচা গোবর ও রাসায়নিক সার	● ঝুড়ি
● মাপযন্ত্র বা ট্যাপ	● ঝরণা
● বাঁশের কাঠি	● বাঁশের খাচা

কাজের ধাপ

১। চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট দুরত্বে নির্দিষ্ট মাপের গর্ত করতে হবে। গর্তের মাটি চারদিকে ছড়িয়ে রাখতে হবে ।

২। গাছের আকৃতির উপর বিবেচনা করে গর্তের গভীরতা নির্ণয় করতে হবে। তবে সাধারণত ছোট ধরনের গাছের বেলায় (ডালিম, পেঁপে) গর্তটি ৫০ সে.মি.×৫০ সে.মি.×৫০ সেঃমিঃ মাঝারি (পেয়ারা, কুল) ধরনের গাছের জন্য ৭০ সে.মি.×৭০ সেঃমিঃ×৭০ সে.মি. এবং বড় ধরনের (কাঁঠাল, তেতুল) গাছের বেলায় ১ মি.×১ মি.×১ মিঃ করা যায় তবে মাটির অবস্থা বুঝে গর্তের মাপ নির্ধারণ করতে হবে। বেলে দোঁয়াশ বা হালকা ধরনের মাটির জন্য গর্তের আকার কিছু ছোট হলেও চলে ।

৩। গর্ত করার সময় মাটির উপরি ভাগের ২/৩ অংশ মাটি (ছবি 'ক' অংশ) একদিকে ফেলতে হবে। আবার নিচের ১/৩ অংশ মাটি অপর এক দিকে (ছবি 'খ' অংশ) রাখতে হবে। উপরের অংশের মাটি উর্বর বেশি। তাই এসব মাটিতে আলাদা ভাবে সার মেশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি নিচে এবং নিচের অংশের মাটি উপরে দিতে হয়।

৪। গাছের আকৃতির উপর নির্ভর করে প্রতি গর্তে ২০-৪০ কেজি পচা গোবর বা আবর্জনা পঁচা সার ও ২০০-৫০০ গ্রাম টিএসপি সার 'ক' অংশের উপরের মাটির সাথে ভালো করে মেশাতে হবে।

৫। সার- গোবর মিশ্রিত উপরের মাটি পুনরায় গর্তে ফেলতে হবে। কিছু কিছু মাটি গর্তে ফেলার পর পা দিয়ে চাপ দিতে হবে। যেন গাছে লাগানোর পর পানি পেয়ে মাটি বসে রোপিত গাছের ক্ষতি না হয়।

৬। সার মেশানো মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার এক সপ্তাহ পর গর্তে চারা লাগাতে হবে। চারা পট বা পলিথিন ব্যাগ থেকে সাবধানে বের করতে হবে।

৭। এখন চারার গোড়ার বলের পরিমাণ মাটি গর্ত হতে সরিয়ে রাখতে হবে। এরপর পলিথিন ব্যাগটি চাকু দ্বারা লম্বালম্বি ভাবে কেটে দিতে হবে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন মাটির বলটি পলিথিন ব্যাগ কাটার সময় অথবা পট থেকে বের করার সময় ভেঙে না যায়।

৮। এমন চারাটি সোজা করে গর্তে বসাতে হবে। গর্তে বসানোর সময় দেখতে হবে যেন বেশি নিচে বা উপরে লাগানো না হয়। আগে যে পরিমাণ নিচে পুঁতা ছিল ঠিক তা বজায় রাখতে হবে।গর্তে বসানোর পর গর্ত হতে সরিয়ে নেয়া মাটি দিয়ে বলটি ভালো করে চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর তাতে ঝাঝরি দিয়ে পানি দিতে হবে।

৯। চারা লাগানোর পর উত্তর - পশ্চিম কোনা বরাবর গাছের সহায়ক খুঁটি দিয়ে হালকা ভাবে বেঁধে দিতে হবে। তা হলে বাতাসে হেলে গাছের ক্ষতি হবে।

১০। চারা লাগানোর পর নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। চারা লাগানোর প্রথম কয়েকদিন কেবল পাতায় পানি দিয়ে গাছকে সতেজ রাখতে হবে এবং কয়েক দিন হালকা ছায়া দিতে পারলে ভাল হয়। বাঁশের খাঁচা দিয়ে চারটি গরু ছাগলের আক্রমণ হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সতর্কতা

১। হালকা মাটিতে গর্ত খননের সময় সাবধানে খনন করতে হবে যাতে গর্তের পাড় ভেঙে না যায়।

২। গর্ত ভরাট করার সময় গর্তের ভেতরের মাটি যেন আলগা না থাকে।

অনুশীলনী- ১২ঃ ট্রেনিং অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ গাছে ফল ধারণের পূর্বে একটি সবল ও সুন্দর কাঠামো তৈরির জন্য গাছে ছাটাই করা হয় । এ কাজটি প্রধান প্রধান কাণ্ডকে কেন্দ্র করে রা হয় বলে এ ধরনের ছাটাইকে ট্রেনিং বলা হয় । অর্থাৎ চারা বা গাছের বিশেষ উচ্চতায় প্রধান কান্ড কাটা বা ছাটাই করা হলো ট্রেনিং ।

ট্রেনিং করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

১ । ট্রেনিংয়ের জন্য গাছের চারা বা ছোট গাছ ২ । ছুরি ৩ । কঁচি ৪ । সিকেচার

৫ । ডাল কাটার দা ৬ । বোর্দোপেস্ট বা ছত্রাকনাশক ৭ । গরম মামে ৮ । পলিথিন

ট্রেনিং পদ্ধতি

ফল গাছে সাধারণত ৩ পদ্ধতিতে ট্রেনিং করা হয় । যথা

ক) উচ্চ কেন্দ্র খ) নাতি উচ্চকেন্দ্র এবং গ) মুক্ত কেন্দ্র

কাজের ধাপ

(ক) উচ্চ কেন্দ্র

১ । নার্সারিতে ১ থেকে দেড় বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে

২ । নির্বাচিত চারাটির উচ্চতা ১ মিটার হলে ভাল হয়

৩ । চারাটির নিচের দিকে পাশে গজানো শাখাগুলো এমনভাবে কাটতে হবে, যেন কাটা চিহ্ন মাটির সাথে । লাভাবে থাকে ।

৪ । শাখার যেখানে কাটা হবে তা যেন প্রধান কাণ্ড হতে কমপক্ষে ২.৫ সেমি, দূরে হয় । অর্থাৎ কাটা ডালটির গোড়ার অংশ প্রধান কাণ্ড হতে প্রায় ২.৫ সেমি. লম্বা থাকবে ।

৫ । শাখার যেখানে কাটা হবে তা যেন পর্ব সন্ধি বা গিরার উপর না হয়

৬ । প্রধান কাণ্ডের সাথে পাশে গজানো বা সংযুক্ত শাখা চিকন হলে প্রুনিং চাকু এবং শাখা মোটা হলে সিকেটিয়ার বা প্রুনিং করাত দিয়ে কাটতে হবে

৭ । সংযুক্ত শাখা কেটে গাছের কাঠামো সুন্দর ও শক্ত করতে ২ থেকে ৩ বছর সময় লাগে ।

৮ । ট্রেনিং এর কাজটি পরিষ্কার ও রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে করতে হবে । খুব সকালে বা একেবারে বিকালে শাখা ছাটাই করা উচিত না ।

(খ) নাতি উচ্চকেন্দ্র

১। এ পদ্ধতিতে কাজের জন্য নার্সারিতে ১ থেকে ২ বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে

২। চারাটির প্রধান কাণ্ড ১ মিটার উচু হওয়া পর্যন্ত পাশের শাখাগুলো কেটে দিতে হবে, তবে এ সময় প্রধান কাণ্ডের মাথা কাটা যাবে না।

৪। এ সমস্ত শাখাগুলো বাড়ার সাথে সাথে প্রধান কাণ্ডটি ১.৫ থেকে ২ মিটার উচু হলে প্রধান কাণ্ডের মাথা কেটে দিতে হবে।

৫। প্রধান কাণ্ড ও পার্শ্ব শাখাগুলো কাটার পর পরই কাটাদ্যানে বোর্দোপেস্ট বা ছত্রানাশক লাগাতে হবে।

(গ) মুক্ত কেন্দ্র

১। এ পদ্ধতিতে কাজের জন্য নার্সারিতে ১ বছরের চারা নির্বাচন করতে হবে

২। চারাটির প্রধান কাণ্ড ০.৫ থেকে ১ মিটার উঁচু হলে মাথা বা শীর্ষকুঁড়ি কেটে দিতে হবে

৩। এরপর পাশের শাখাগুলো বাড়তে দিতে হবে।

৪। গাছ ঝোপালো করার প্রয়োজন হলে পাশের শাখাগুলো কিছুটা বড় হতে দিতে হবে। এরপর শাখাগুলোর মাথা কেটে দিতে হবে।

৫। তবে পাশে গজানো শাখা বেশি ঘন হলে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে কিছু কিছু শাখা কেটে দিতে হবে ৬। এ কাজ সম্পন্ন করে গাছের কাঠামো ঠিক করতে ২ থেকে ৩ বছর সময় লাগে

৭। প্রতিবারই শাখার বা কাণ্ডের কাটাস্থানে বোর্দোপেস্ট বা ছত্রাকনাশক লাগাতে হবে।

২০২২

অনুশীলনী- ১৩ঃ প্রুনিং অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ প্রুনিং বলতে গাছের যে কোন অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেটে ফেলা বা কেটে বাদ দেয়া বোঝায়। ছাটাই এর উদ্দেশ্য হলো গাছকে সুন্দর রূপ দেয়া, গাছের ডালপালা বেশি দৃঢ় করা, বেশি পরিমাণে ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন ফল ধরানাে ও ফলন বেশি করা। গাছ ছাটাই-এর সাথে ফল উৎপাদনের সরাসরি সংযোগ আছে। ছাটাই করে গাছের ডালপালার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। সঠিকভাবে ও সময়মত ছাঁটাই করতে না পারলে ফলবতী গাছে ফলন কমে যায় এবং বেশি সময় ধরে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এমনকি ছাটাই বেশি হলে গাছ মারাও যেতে পারে। সঠিকভাবে ছাটাইয়ের ফলে গাছের পূর্ণ বিকাশ হয়, ফলের রঙ সঠিক হয়, ফলের আকার ভাল হয়, ফল বেশি হয়। এমনকি ফলের গুণগত মানান্নোয়ন হয় এবং গাছের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কমে যায়। ছাঁটাইকৃত গাছের ফল সংগ্রহ করা সহজ হয় এবং অন্যান্য পরিচর্যা করাও সুবিধাজনক হয়।

এ কাজ করার জন্য একটি গাছের নিচে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। লেবু, পেয়ারা, ডালিম, কুল, গালাপজাম ইত্যাদি গাছের গোড়া থেকে লম্বা তেউগ উৎপন্ন হয়। এগুলো অন্যান্য ডালপালার নিচে থাকে এবং কলম করার উপযোগী নয়। এরা নিজেরা তেমন খাদ্য প্রতুত করতে পারে না। তাই এসব ডাল ছাটাই করা উচিত।

উপকরণ

১। ছুরি
২। সিকেচার
৩। ছাটাই ছুরি বা ডাল কাটার দা
৪। গাছ ছাটাই করাত
৫। ডাল কাটার কঁচি
৬। বড় গাছের ডাল কাটা কাঁচ বা পালে প্রনার
৭। ডেটল পানি
৮। খন্তা বা শাবল
৯। কাতে বা কাঁচি

ছাটাই-এর প্রকারভেদ গাছ নির্বাচন

ক) ডালপালা ছাঁটাই এর উপযযাপী গাছ (কুল, কাঁঠাল, আম, লিচু, কামরাঙা, পেয়ারা ইত্যাদি)

খ) শিকড় ছাঁটাই এর উপযাগী গাছ (কাঁঠাল, লিচু, লেবু, কথবেল, জামরুল ইত্যাদি)

গ) ফল পাতলাকরণের উপযোগ গাছ পেঁপে, আমড়া, তরমুজ, জামরুল ইত্যাদি)

ঘ) পাতা ছাঁটাই এর উপযোগী (কলা, নারিকেল, খেজুর, তাল ইত্যাদি)

কাজের ধাপ

১। ডাল ছাঁটাই এর যন্ত্রপাতি ধারাল, পরিষ্কার পরিছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

২। ছোট, কম বয়স্ক এবং ফল উৎপাদন শুরু করেছে এমন গাছে শুধু ছোট ডালপালা কাটতে হবে। যা গাছের নিচের দিকে প্রধান কাণ্ড হতে বের হয়ে ছোট অবস্থায় থাকে। এছাড়া প্রধান প্রধান ডালা হতে ছোট ছোট ডালপালা বের হয়ে যেগুলো গাছের ভিতরমুখী হয়ে থাকে। সেগুলো কেটে ফেলতে হবে।

৩। পুরাতন ও বড় গাছে ভারী আকারে ও বেশি পরিমাণে ছাঁটাই করতে হবে।

৪। যে কোন গাছের বেলায় মৃত, রাগাক্রান্ত বা ঝড়ে ভাঙ্গা ডালপালা কেটে দিতে হবে।

৫। প্রচণ্ড খরা বা তীব্র শীতের সময় গাছের ডালপালা ছাটাই করা যাবে না। ২০২২

৬। যে সব গাছের পাতা ঝরে যায় সে সমস্ত গাছের পাতা ঝরার ১ মাস পরে অপ্রয়োজনীয় ডালা কেটে দিতে হবে।

৭। চিরসবুজ গাছের ফল পাড়ার পর পরই অপ্রয়োজনীয় ডালা কেটে দিতে হবে।

৮। যে কোন গাছের প্রধান কাণ্ড হতে একই উচ্চতায় উভয় দিকে সামনাসামনি গজানো শাখার একদিকের সুস্থ ও সবল একটি ডালা রেখে প্রথমে অন্যটি কেটে দিতে হবে।

৯। পরবর্তীতে ঠিক উপরের দিকে প্রধান কাণ্ড হতে অনুরূপভাবে সাজানো শাখায় প্রথমে যেদিকে রাখা হয়েছে তার বিপরীত দিকেরটা রেখে অন্যটি কেটে দিতে হবে। এভাবে উভয়দিকে পর পর একান্তর ক্রমিকভাবে ডালা রেখে অন্যটি কেটে দিতে হবে। এতে গাছের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

১০। ডালার যে স্থানে কাটা হবে তা প্রধান কাণ্ডের বা শাখা প্রশাখার পূর্ব সৃণি হতে ৫-০ সেমি. উপরে হতে হবে।

১১। ডালা কাটার সময় প্রথমে ডালার নিচের দিকে ডালার ব্যাসের তিনভাগের একভাগ বা তার চেয়ে কম পরিমাণ কাটতে হবে। তারপর উপরের দিকে তিনভাগের দুই ভাগ কাটতে হবে। সম্পূর্ন ডালা কাটার পর কাটা স্থান সমান করে দিতে হবে।

১২। কাটা স্থানে ছত্রাকনাশক বা আলকাতরার প্রলেপ দিতে হবে।

১৩। ছাঁটাই এর কাজ বৃষ্টিপাত বা মেঘলা আবহাওয়ার সময় করা উচিত না।

১৪। গভীর মুল বিশিষ্ট গাছের গোড়া হতে ১০০ থেকে ৩০০ সেমি. দূর দিয়ে নালা খনন করতে হবে। এতে নালার ভেতরের যে মূল কাটা পড়বে তাতেই মুল ছাটাই হবে। এই নালাটি গাছের চারিপাশ দিয়ে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার বা এক চতুর্থাংশ বৃত্তাকার হিসেবে করা যেতে পারে। তবে চওড়ায় বিভিন্ন মাপের হতে পারে।

১৫। গাছের গোড়া হতে কিছু দুর দিয়ে মাঝে মাঝে গর্ত খনন করা হলে মমূল ছাটাই হবে। আবার সারা বাগান জুড়ে লাঙ্গলের সাহায্যে জমি চাষ করা হলেও অনেক মূল ছাটাই হবে।

১৬। ফল বেশি ঘন হলে বা একই বোটায় বেশি ফল ধরলে ছোট, দুর্বল এবং প্রধান বোটার পাশ দিয়ে বা বোটা হতে সরাসরি বের না হওয়া ফলগুলো কেটে দিতে হবে। তাতে অন্যান্য ফলগুলো বড় হবে ও আকার ভাল হবে।

১৭। পাতা ছাটায়ের জন্য সাধারণত ডালপালাহীন গাছের নিচের দিকে ঝুলে থাকা বয়স্ক পাতাগুলো গোড়াসমেত পরিষ্কার করে দিতে হবে। তবে পাতার গোড়া তাজা ও শক্ত থাকলে পুত্র ফলকের কিছু অংশ রেখে কাটতে হবে। এছাড়া ছোট চারা স্থানান্তরের সময় কিছু কিছু পাতাও কেটে দিতে হয়।

অনুশীলনী- ১৪: ফলের রোগ শনাক্তকরণ ও প্রতিকার

আমড়া, নারিকেল, আঙ্গর ও লিচুর গুরুত্বপূর্ণ রোগ সনাক্ত ও রোগের নমুনা প্রদর্শন:

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

রোগ জীবাণু উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে সেখানে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে। পোষাকের দেহের কোষ নষ্ট করে। খাদ্যরস গ্রহণ করে। উদ্ভিদের দৈনন্দিন কাজে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এ অস্বাভাবিকতার বাহ্যিক প্রকাশকে আমরা রোগের লক্ষণ বলে (Symptom)। এটা বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়। যেমন পাতা পঁচা, পাতার দাগ, পাতা পাড়ো, কাণ্ডের দাগ। কাণ্ড পচা, ঢলে পড়া ইত্যাদি। আবার কোন কোন সময় রোগের এ বাহ্যিক লক্ষণের মধ্যে রোগজীবাণুর উপস্থিত থাকে। যেমন একটি পাতার দাগের মধ্যে রোগজীবাণুর পারে বা মাইসেলিয়াম খালি চোখে দেখা যায়। লক্ষণের মধ্যে রোগজীবাণুর আংশিক উপস্থিতিকে চিহ্ন বা সাইন বলে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা, ডাল, ফুল, ফল বা মূল।

২। কাগজ, পেনসিল, রাবার।

৩। আমড়া, নারিকেল, আঙ্গুর ও লিচুর প্রধান প্রধান রোগের নমুনা।

কাজের ধাপ

১। সংগৃহীত নমুনা (রোগাক্রান্ত, পাতা, ফুল, ফল, বাকল ও মূল) টেবিলে নিয়ে আসতে হবে।

২। নমুনাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৩। নমুনার কোন অংশে রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তা খাতায় লিখে রাখতে হবে।

৪। আক্রান্ত অংশের রং, আকার, আয়তন, ইত্যাদি লিখে রাখতে হবে।

৫। আক্রান্ত অংশে দাগ পড়লে দাগের সংখ্যা নিরুপণ করতে হবে।

৬। লিখিত লক্ষণের সাথে প্রকাশিত বইয়ের লক্ষণের সামঞ্জস্যতা মিলিয়ে দেখতে হবে।

৭। রঙিন স্লাইড প্রদর্শিত হলে, স্লাইডগুলো ভাল করে দেখ, আক্রান্ত অংশের রঙের পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে।

৮। পুক, ছবি হারবেরিয়াম শিট ও কাচের আধারে রক্ষিত নমুনার বৈশিষ্ট্য ও জীবাণুর বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে রোগকে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করতে হবে।

সতর্কতা

১। রোগাক্রান্ত পাতা ডাল, ফল বা মূল সংগ্রহের সময় রোগ না পোকার আক্রমণ বা অন্য কোন কারণ তা দেখে নিতে হবে।

২। রোগাক্রান্ত নমুনাটি সংগ্রহের পরপরই পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শুকিয়ে গেলে অনেক লক্ষণ চেনা নাও যেতে পারে।

বোর্দো মিক্সচার প্রস্তুত পদ্ধতি অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্য: এটি একটি তামাঘটিত অজৈব, খুবই জনপ্রিয় ও সবচেয়ে পুরাতন ছত্রাকনাশক। এ ঔষুধ বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সাধারণত শতকরা একভাগ ক্ষমতা সম্পন্ন বোর্দোমিক্সচার গাছে ছিটানো হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কুঁতে ২। চুন ৩। পানি ৪। ২টি ছোট ও একটি বড় মাটির পাত্র ৫। ২টি বাঁশ বা কাঠের কাঠি ৬। প্রেয়ার ৭। একটি ইস্পাতের চাকু।

কাজের ধাপ

১। কুঁতে ও চুন পৃথকড়াবে মিহি করে গুড়া করতে হবে।

২। ছোট মাটির পাত্র দু'টিতে ৫ লিটার করে পানি নিতে হবে।

৩। একটি পাত্রে ১০০ গ্রাম মিহি চূর্ণ কুঁতে ও অন্য পাত্রে ১০০ গ্রাম মিহি চূর্ণ চুন ঢেলে দিতে হবে।

৪। বাঁশের কাঠি দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে ঘুটে নিতে হবে। ৮-১০ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

৫। অতঃপর দু'পাত্রের দ্রবণ বড় মাটির পাত্রে একসাথে ঢেলে নিতে হবে। পাত্রটি একটু ঝাঁকিয়ে নিতে হবে।

এটাই বোর্দো মিক্সচার অর্থাৎ তৈরি মিশ্রণটি বোর্দো মিক্সচার।

৬। মিক্সচারের রঙ পরীক্ষা করতে হবে।

৭। মিশ্রণের রঙ গাঢ় নীল হলে মিশ্রণ সঠিক হয়েছে বুঝতে হবে। সবুজ রঙ বা সাদাটে হলে বুঝতে হবে যথাক্রমে পুঁতে বা চুন বেশি হয়েছে।

৮। বোর্দো মিক্সচার এখন স্প্রে করতে পারবে।

সতর্কতা

১। কুঁতে ও চুন মিহি করে চূর্ণ হয়েছে কি না ভাল করে দেখে নিতে হবে। চূর্ণ করার পর তঁত ও চুন সঠিক ভাবে মেপে নিতে হবে।

২। বোর্দো মিক্সচার তৈরির ২-৩ ঘন্টা মধ্যে স্প্রে করতে হবে।

৩। প্রস্তুতকৃত বোর্দো মিক্সচার ইস্পাতের চাকুর অগ্রভাবে ডুবিয়ে দেখো লালচে দাগ পড়ে কি না। না পড়লে বুঝবে মিশ্রণ ঠিক হয়েছে।

২০২২

অনুশীলনী- ১৫ঃ ফলের পোকা শনাক্তকরণ অনুশীলন

পোকা মাকড় সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ফলের উপকারী ও অপকারী পোকা মাকড় চেনা এবং এ পোকা ক্ষতির ধরন সম্পর্কে জানা, যাতে করে এ পোকা দমনের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেয়া যায়।

উপকারী পোকা মাকড় সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

যে সকল পোকা মাকড় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কোন না কোন উপকার করে সে সকল পোকাগুলোকেই উপকারী পোকা বলে।

- যে সকল পোকা অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকার করে সে সকল পোকাকে অর্থনৈতিক কীট পতঙ্গ বলে। যেমন-রেশম পোকা, লাক্ষা পোকা।
- যে সকল পোকা ফসলের ক্ষতিকর পোকা মাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করে সে সকল পোকাকে পরভোজী পোকা বলে। যেমন-ড্রাগন ফ্লাই, ক্যারাবিড বিটল।
- যে সকল পোকা ফসলের ক্ষতিকর কোন কোন পোকার ডিম/কীড়া/পুত্তলী /পূর্ণাঙ্গ পোকার উপর ডিম পেড়ে নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে ও আশ্রয় দাতা পোকার মৃত্যু ঘটায় সে সকল পোকাকে পরজীবী পোকা বলে। যেমন-বালেতা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। পোকা ধরার জাল ২। পানির পাত্র ৩। ড্রইং পেপার ৪। পেন্সিল ৫। রাবার ৬। ফরসেপ ৭। স্কেল ৮। ইনসেক্ট কিলিংজার ৯ শস্যক্ষেত (ফলের গাছ/ফলের বাগান) ১০। পেট্রিডিস বা ছোট প্লাষ্টিক কৌটা।

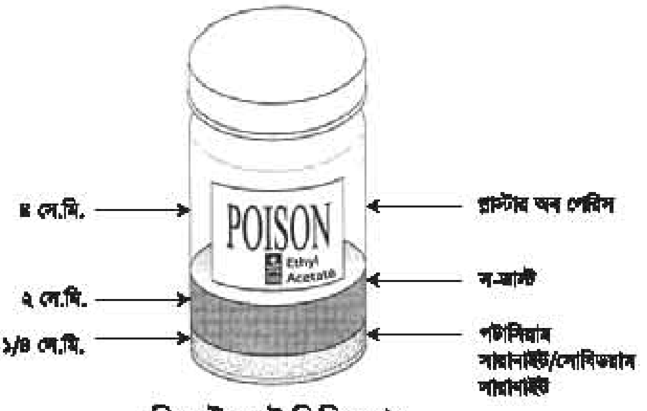

চিত্রঃ ইনসেক্ট কিলিং জার

কাজের ধাপ

১। পোকা ধরার জাল নিয়ে শস্য ক্ষেতে যেতে হবে (কলা, পেঁপে, আনারস, আম, পেয়ারা, লিচু, কাঁঠাল, লেবু ইত্যাদি বাগান

২। জাল দ্বারা পোকা ধরতে হবে।

৩। পানির পাত্রের সাহায্যে পোকা ধরতে হবে।

৪। এরপর পোকা গুলো ইনসেক্ট কিলিং জারে অথবা (ক্লোরোফর্ম দ্বারা ভেজাতুলা বিশিষ্ট কাচের পাত্র) কিছুক্ষণ ঢাকনা বন্ধ করে রাখতে হবে। এতে পোকাগুলো মারা যাবে।

৫। এবার জার থেকে মৃত পাকাগুলো বের করতে হবে।

৬। মৃত পোকাগুলো ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

৭। সংগৃহীত পোকাগুলো বইয়ে দেয়া বর্ণনার সাথে মিলিয়ে কোনটি কি পোকা তা সনাক্ত করতে হবে।

৮। এখন ড্রইং পেপারে সনাক্তকৃত পোকা গুলোর চিত্র অঙ্কন করতে হবে।

৯। অতঃপর অঙ্কিত পোকার চিত্রে এর বিভিন্ন উপাঙ্গ চিহ্নিত করতে হবে।

চিত্রঃ লম্বা চোয়াল বিশিষ্ট মাকড়সা
(টেট্রাগনাথা জ্যাভানা প্রজাতি)

চিত্রঃ লম্বা চোয়াল বিশিষ্ট মাকড়সা
(ট্রোগনাথা ম্যানডিবু লাটা প্রজাতি)

চিত্রঃ ড্রাগন ফ্লাই

চিত্রঃ ড্যামসেল ফড়িং

লম্বা শুড় ঘাস ফড়িং

পরজীবী বোলেতা পরজীবী বোলেতা পরজীবী বোলেতা

সতকর্তা

১। কিলিং বাতেল সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। এটি যাতে ভেঙ্গে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

কিলিং বোতলে ভুলেও শ্বাস নেয়া বা গন্ধ শুকা যাবে না।

অনুশীলনী- ১৬ঃ ক্ষতিকর পোকা সংগ্রহ ও হার্বেরিয়াম তৈরিকরণ অনুশীলন

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

ফসলের ক্ষতিকর পোকা মাকড় সনাক্তকরণের একটি সহজ উপায় হলো নমুনা স্থাপন কাগজের বা হারবেরিয়াম সিটের অ্যালবাম তৈরি। এতে সংগৃহীত ক্ষতিকর পোকার শুষ্ক নমুনা থাকে এবং তার পাশে নামসহ সনাক্তকণের বৈশিষ্ট্য লেখা থাকে। এতে ব্যবহারিক শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য সংরক্ষিত নমুনা অত্যন্ত কাজে লাগে। শিক্ষার্থীরা ফসলের ক্ষতিকর প্রধান প্রধান পোকার নাম জানা, চেনা ও সনাক্তকরণের কাজ অতি অল্প সময়ে সহজেই করতে পারে।

হারবেরিয়াম শিটের একটি অ্যালবাম তৈরির একটি নমুনা নিচে দেয়া হলো

পোকার নমুনা নং	পোকার নাম (বৈজ্ঞানিক নাম ও গোত্র সহ	আক্রান্ত ফসল	ক্ষতির প্রকৃতি ও লক্ষণ	অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। নমুনা পোকা ২। বোর্ড কাগজযুক্ত বড় খাতা ৩। কলম ৪। কসটেপ ৫। বড় পুরাতন খবরের কাগজ বা চোষ কাগজ ৬। পোকা ধরার হাত জাল ৭। কিলিং জার ৮। পেট্রিডিস ৯। ফরসেপ বা চিমটা ১০। ক্লোরফম ইত্যাদি দ্বারা ভেজা তুলা ১১। স্কেল ১২। ফসলের ক্ষেত বা বাগান ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১। ফসলের ক্ষেত বা বাগান হাতে হাতে জাল বা অন্যকোন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পোকা ধরে সংগ্রহ করতে হবে।

২। সংগৃহীত পোকা কিলিং জারে রেখে মেরে ফেলতে হবে।

৩। কিলিং জার হতে মৃত পোকা বের করে পেট্রিডিসে নিতে হবে।

৪। পেট্রিডিস হতে সংগৃহীত পোকাগুলো একে একে পুরাতন খবরের কাগজ বা বড় বই-এর ভাজে রেখে শুকাতে হবে।

৫। কয়েক দিন পর পোকাগুলো বের করে নিতে হবে।

৬। প্রাসঙ্গিক তথ্য সারণি অনুযায়ী খাতায় ছক কেটে শিরোনামগুলো লেখে নিতে হবে।

৭। পোকার নমুনার শিরোনামের নিচে এক এক করে একাধিক পোকা স্কচটেপ দিয়ে লাগাতে হবে।

৮। শিরানোম অনুসারে বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যবেক্ষণ কার প্রতিটি পোকার সামনের ঘরগুলো লিখতে হবে।

৯। এভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় একাধিক ক্ষতিকর পোকার নমুনা লাগিয়ে হারবেরিয়াম বা এলবাম তৈরি করতে হবে।

সতর্কতা

১। একটি পোকার নমুনার উপর আর একটি পোকার নমুনা লাগানো যাবেনা।

২। পোকা চাপ খেয়ে ভালোভাবে শুকানোর পর লাগাতে হবে।

৩। উন্নত মানের হারবেরিয়াম সিট ও কচ টেপ ব্যবহার করতে হবে।

২০২২

তথ্য সূত্র

১। ডঃ মোঃ ফেরদৌস মন্ডল- ফল চাষ।

২। এম এফ মন্ডল ও এম রায় ১৯৯৮ - আধুনিক ফল বিজ্ঞান।

৩। এফ.এম. মনিরুজ্জামান- বাংলাদেশের ফলের চাষ-১৯৯৮ বাংলা একাডেমি ঢাকা।

৪। ডঃ তরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিভাস চন্দ্র মজুমদার ও শ্রী অলোক নন্দী - বিজ্ঞান ভিত্তিক ফলের চাষ।

৫। ডঃ ফেরদৌস মন্ডল ও মৃত্যুঞ্জয় রায় - আধুনিক ফল বিজ্ঞান।

৬। আঙ্গুর উৎপাদন পদ্ধতি- মোঃ নুরজ্জামান।

৭। ডঃ কামাল উদ্দিন আহম্মেদ - ফুল ফল ও শাক সবজি।

৮। ডঃ মোঃ ফেরদৌস মন্ডল ও মোঃ রুহুল আমিন - ফলের বাগান।

৯। এ,এস, এম কালাম উদ্দিন- ফলের চাষ।

১০। ডঃ মামুনুর রশিদ, ডঃ আবদুল কাদের ও মোঃ মাফোজ্জল হোসেন - বাংলাদেশের ফল।

১১। সালেহ আহমেদ-উদ্যান নার্সারী ব্যবস্থাপনা।

১২। মোঃ আলাউদ্দিন পিকে-ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কালটিভেশন।

১৩। ডঃ হাসান আশরাফ উজ্জামান- ফসলের রোগ ও আগাছা।

১৪। ডঃ মোঃ মহসিন আলী সরদার, ডঃ মাজ্জোফর হোসেন, মোঃ আবু তালেব-ফসলের পোকা মাকড় ও ইঁদুর দমন।

১৫। এফএম শরফুদ্দিন ও মোঃ আলাউদ্দিন পিকে- ফল চাষ আবাদ।

১৬। ডঃ মোঃ বাহাদুর মিয়া - ফসলে রোগ ও প্রতিকার।

১৭। কৃষি কলথা- জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫, আষাঢ় ১৪১৫, মাঘ-১৪১৪, আষাঢ় ১৪১৬ সংখ্যা

১৮। মাসুদুজ্জামান - সেচ ব্যবস্থাপনা।

১৯। ড. বিমলাকিংকর জানা ও অরিবিন্দ ঘাষে - আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ।

২০। ডঃ সন্তোষকুমার সরকার-ফুল ও ফলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা।

২১। বিএআর আই - কৃষি প্রযুক্তি হাত বই।

২২। মোঃ মোসারফ হোসেন - ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কালটিভেশন- (একাদশ ও দ্বাদশ)।

সমাপ্ত

২০২২

স্বাধীনতার
৫০
বছর
উন্নয়ন আমারও

বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ জয়

২০২০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এই জয় বাংলাদেশের ক্রিকেটে একটি স্মরণীয় সাফল্য। আকবর আলির অধিনায়কত্বে ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে এই শিরোপা অর্জন করে বাংলাদেশ দল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে জয়ী দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই জয়কে মুজিববর্ষে জাতির জন্য সেরা উপহার হিসেবে অভিহিত করেছেন।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-২

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য